আর্টস না সায়েন্স

আর্টসে-সায়েন্সে মিলিত চর্চায় মানুষের বিশ্ব-দৃষ্টি

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

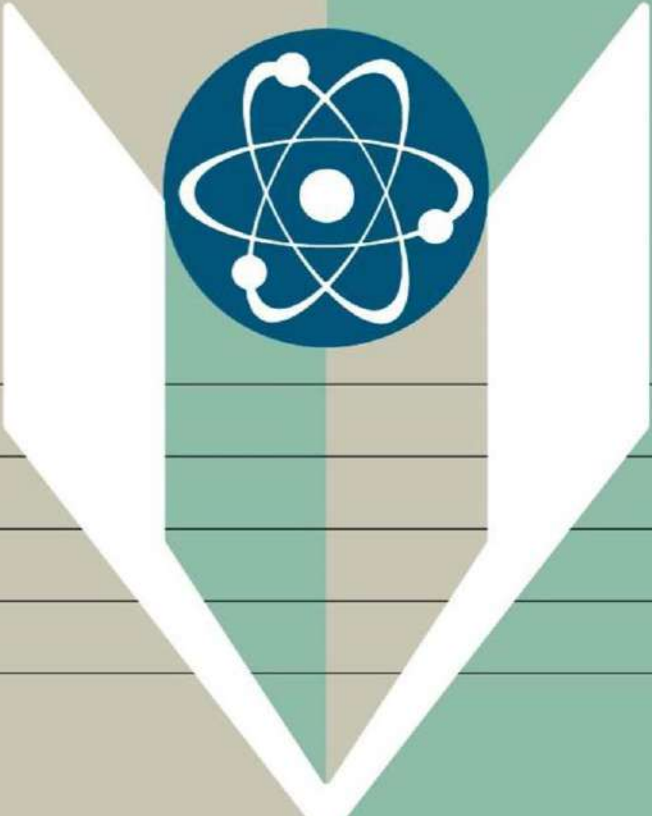

আর্টসে পড়েছি না সায়েন্সে পড়েছি পোষাকী জীবনে তার যত গুরুত্বই থাকুক মননের জগতে তা মূল্যহীন। আর্টস-সায়েন্সের মিলিত দৃষ্টিতেই শুধু প্রত্যেক মানুষের পক্ষে যথার্থ বিশ্ব-দৃষ্টি গড়া সম্ভব। গতানুগতিকতার থেকে বের হয়ে এসে অভিনবত্বের চমক দিয়ে মনকে নাড়া দেয়াটাই তো আর্ট– দেখার আর্ট, শোনার আর্ট, করার আর্ট, পড়ার আর্ট- আরো কত কি। সেটিকে নান্দনিক ভাবে পেতে চাই আমরা, তবে নান্দনিকতা ব্যাহত হয়েও এটি মনকে প্রতিবাদে নাড়া দিতে পারে। লক্ষ্য করলে দেখা যায় অনেক আর্টই তার সৃষ্টিকারীদের হাতে খুবই বিজ্ঞানময়, কারণ অভিনবত্ব ব্যাপারটিই যে বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তা ডিজিট্যাল প্রযুক্তি, ভার্চুয়াল রিয়ালিটি ইত্যাদির কারণে আজকেই শুধু হচ্ছে তা নয়, আর্টে-বিজ্ঞানে এই সংযোগটি চিরকালই মানুষের সহজাত। প্রাচীন কাল থেকে একেবারে সাম্প্রতিকতম সময়ে পর্যন্ত এর অনেকগুলো উদাহরণ নিয়ে এ বই বিষয়টি দেখাবার চেষ্টা করেছে। কারণটি স্পষ্ট– মানুষ সর্বোত্তম একটি বিশ্ব-দৃষ্টি সব সময় পাওয়ার চেষ্টা করেছে। আজও তাই শুধু পাণ্ডিত্যময় আর্টে বা সায়েন্সে নয়, সাধারণ মানুষের সাধারণ চর্চায়ও এই মিলিত আকাঙ্খাটি কাজ করছে। আগামী দিনে এতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অবদানটিও যে খুব বড় ভাবে আসবে তাও বেশ স্পষ্ট।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

আর্টস না সায়েন্স

আর্টসে-সায়েন্সে মিলিত চর্চায়
মানুষের বিশ্ব-দৃষ্টি

আর্টস না সায়েন্স

আর্টসে-সায়েন্সে মিলিত চর্চায়
মানুষের বিশ্ব-দৃষ্টি

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

প্রকাশ
অনন্যা
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

উ|ৎ|স|র্গ

১৯৬০ থেকে ২০১৮ এই দীর্ঘসময় প্রায় নিরবচ্ছিন্ন নিয়মিত প্রকাশে মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী যাঁদেরকে পাশে পেয়েছিল তাঁদের সবার উদ্দেশ্যে। বিশেষ করে এর প্রথমদিকের কষ্টসাধ্য যাত্রায় যাঁরা লেখক, ব্যবস্থাপক, মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের অনুদান সহায়ক, বিজ্ঞাপন দাতা হিসেবে সহায়ক ইত্যাদি নানা ভূমিকায় শরিক হয়েছেন তাঁদের স্মরণে ও তাঁদের উদ্দেশ্যে।

ভূমিকা

আর্টসে পড়েছি না সায়েন্সে পড়েছি পোষাকী জীবনে তার যত গুরুত্বই থাকুক মননের জগতে এটি মূল্যহীন। কারণ আর্টস-সায়েন্সের মিলিত দৃষ্টিতেই শুধু প্রত্যেক মানুষের যথার্থ বিশ্ব-দৃষ্টি গড়ে ওঠতে পারে। নানা দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এ কথাটি এই বইয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু বিশ্বে নিজেকে স্থাপন করার মত বড় কাজে কেন, দৈনন্দিন ছোট ছোট আনন্দ উপলব্ধিগুলোকে যদি আর্ট করে না তুল্‌তে পারি, বিজ্ঞান চেতনায়ও না নিতে পারি– তা হলে কি সত্যিকারের তৃপ্তি আসে? গতানুগতিকতার থেকে বের হয়ে এসে অভিনবত্বের চমক দিয়ে মনকে নাড়া দেয়াটাই তো আর্ট। সেটিকে আমরা নান্দনিক ভাবে দেখতে চাই, তবে কখনো তাতে নান্দনিকতাকে রূঢ়ভাবে ব্যাহত করে আর্টিস্ট আমাদেরকে প্রতিবাদীও করে তোলে, অন্তত চিন্তায় ও মননে। লক্ষ্য করলে দেখবো আর্টের সৃজনকারীরা যা নিয়ে আসছেন তা খুবই বিজ্ঞানময়, কারণ অভিনবত্ব ব্যাপারটির সঙ্গেই বিজ্ঞান জড়িয়ে থাকে। আমরা যখন সে আর্ট উপভোগ করি বিজ্ঞানের কথাটি ভুলে থাকতে পারি, কিন্তু সেটি চিন্তায় রাখলে নিজের কাছে আর্টের দ্যোতনা অনেক বাড়ে। অন্যদিকে যে কথাটি আমরা ভুলে যাই তা হলো বিজ্ঞান নিজেও পাথরে খোদাই করে লেখা কিছু নয়, বিজ্ঞানীর মস্তিষ্কই কতকটা আর্টের প্রেরণাতেই এর তাত্ত্বিক কাঠামোটি খাড়া করে। আবিষ্কারের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্যই সেই মস্তিষ্ক খোঁজে। বিজ্ঞানের মসৃণ নান্দনিকতা যদি কখনো ওই আবিষ্কারের ফলে ভেঙ্গে যায়, তখন তা নতুন বিকল্প নান্দনিকতা সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু ওই ভাঙ্গাটি বিজ্ঞানীকেও ব্যথা দেয়। আসলে আর্টসের ও সায়েন্সের উৎপত্তি একই জায়গায়।

এসব কিন্তু পাণ্ডিত্যের জবরদস্তি চর্চার বিষয় নয়, বরং বহু আগের ও আজকের অনেক উদাহরণ দিয়ে এ বইয়ে দেখাবার চেষ্টা করেছি আর্টস-সায়েন্সের সৃষ্টি-সুখ সবার কাছে স্বাভাবিক ভাবেই দেখা দেয়; তা মননশীলতার নিরিখে আমাদের সবার জীবনমান অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। মনের সখে আপন ভূবনে ছোট ছোট চর্চায় এ যেমন সুন্দর বিকশিত হতে পারে, তেমনি ওখান থেকেই ওই চর্চা হাউই বাজির মত অনেক উঁচুতে চলে

যেতে পারে কখনো কখনো। ওই আনন্দ-চর্চা যে কাউকে আর্টের সমজদার করতে পারে, সৃষ্টিকারও করতে পারে; বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি পারে। আর্ট একটি আকাঙ্খা– নিজেকে অন্যত্র নিয়ে যাবার আকাঙ্খা; বিজ্ঞানও তাই। রোমান্টিকতা জিনিসটিকে শুধু আর্টের মধ্যে খোঁজাটি বোকামি, কারণ যাঁরা বিজ্ঞানে রোমান্টিকতা খুঁজে পাননি তাঁরা বিজ্ঞানের প্রথম কথাটিই বোঝেননি। উদাহরণ স্বরূপ পালতোলা জাহাজে অভিযাত্রার যুগে যাঁরা নতুন দেশ-মহাদেশ আবিষ্কার করতে অজানা সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন তাঁদের কথাটি ভাবি। সমুদ্রের জীবনের রোমান্টিক হাতছানি ছাড়া এটি কি সম্ভব হতো? আবার অজানা উপকূলের চার্ট বানিয়ে চলার এবং আকাশের নক্ষত্র, জাহাজের ঘড়ির মাপজোকের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের যোগ খোঁজার মধ্যে রোমান্টিক হাতছানি না থাকলেও কি এটি সম্ভব হতো? এই বইয়ের একটি অধ্যায়ে অভিযাত্রার দিনে মিশ্রিত এই যুগল রোমান্টিকতার খোঁজ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

দেখার আর্ট, শোনার আর্ট, করার আর্ট, পড়ার আর্ট সব কিছুতে সব মানুষের আকর্ষণটি সহজাত। এর সবই দিন দিন নতুন অভিনবত্ব হাজির করছে আমাদের সামনে– যে প্রক্রিয়ায় ক্যানভাসের আর্টের সঙ্গে এসেছে ডিজিট্যাল আর্ট, সাহিত্যের পরাবাস্তব আর্টের অন্য মাধ্যমে ভার্চুয়াল রিয়ালিটি হয়ে দৃষ্টি-শ্রবণ সহ পুরো মস্তিষ্কের চেতনাটি দখল করে ফেলছে। তাহলে এই যে আর্টে বিজ্ঞানের যোগ এটি কি একেবারেই আধুনিক, একেবারেই সাম্প্রতিক? মোটেই না আর্টে-বিজ্ঞানে এই সংযোগটাও প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের সহজাত। কারণটি স্পষ্ট, মানুষ সর্বোত্তম একটি বিশ্ব-দৃষ্টি সব সময় পাওয়ার চেষ্টা করেছে। তাই বহু হাজার বছর আগের দক্ষিণ আফ্রিকার শিকারি-সংগ্রাহক জীবনে শিল্পী লাল পাথরের পাহাড়ের গায়ে অল্প একটু জায়গায় ঘন করে শত শত নানা রকম প্রাণীর পায়ের চিহ্ন অদ্ভুত সুন্দর একটি প্যানেলে খোদাই করে গেছে। আকার-আকৃতি-গভীরতায় তার প্রতিটি বিন্দু এত নিখুঁত যে আজ তাদের উত্তরসূরী আদিবাসী বিশেষজ্ঞও এটি দেখে বলে দিতে পারছেন কোন্ প্রাণী, কী তার বয়স, কী লিঙ্গ একেবারে নির্ভুল ভাবে। আবার ১৬০০ শতকের ডাচ মাস্টাররা দুই মাত্রার ক্যানভাসের চিত্রে গভীরতার তৃতীয় মাত্রাটি যোগ করতে পেরেছিলেন জ্যামিতি ও আলোক বিদ্যায় বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির রীতিমত পড়াশুনা ও চর্চা করে। সে কারণে

ভূমীয়েহ, রেমব্রান্ট, জান স্টীল প্রমুখের ছবিগুলো দেখে এখনো মনে হয় যেন আসল দৃশ্যটির মধ্যেই বসে আছি। এ বইটি এগোবার সঙ্গে সঙ্গে এমনি বিজ্ঞানময় আর্টের দৃষ্টান্ত আর্টের অন্যান্য সবদিক থেকেও পেতে থাকবো; সাম্প্রতিক কালে কোন কোন ক্ষেত্রে দুয়ে তো একেবারে মাখামাখি হয়ে আছে।

আর্ট মানেই হলো গতি, ভাবনার গতি; বিজ্ঞান মানেও তাই। এক আর্ট থেকে আরেকটি আর্টে, এমনকি সেখান থেকে কোন বিজ্ঞানে উত্তরণ, এমনটি খুবই স্বাভাবিক। দেখবো কী ভাবে অনেকে কার্টুন বা অ্যানিমেশনের নেশা থেকে চলে যাচ্ছেন সায়েন্টিফিক ইলাসট্রেশনে, বিজ্ঞানের নতুন উদ্ঘাটনে সাহায্য করছেন সেখানে; দেখবো অতীতের চিত্রশিল্পীর স্কেচ পরীক্ষা করে আজকের বিজ্ঞানী উদ্ঘাটন করছেন শিল্পীর মনস্তত্ত্ব– তিনি কীভাবে নিজেকে তাঁর আঁকা স্বর্গীয় দৃশ্যে নিজেকে ঈশ্বরের মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছেন, সবার অজান্তে। ডিজিট্যাল আর্টে ইন্টারনেটের সাহায্য নিয়ে দশ হাজার মানুষ প্রত্যেকে যার যার মত করে একটি ভেড়া আঁকছেন বটে, কিন্তু আসল চূড়ান্ত ভেড়ার ছবিটি তৈরি হচ্ছে ওই সবার ভেড়ার সারমর্ম তথ্য নিয়ে– এক ছবি, দশ হাজার শিল্পী! এ যেন জনতার আর্টের সামগ্রিক রূপ। লক্ষ মানুষকে প্রতি মুহূর্তে আর্ট আবহে বা বিজ্ঞান আবহে বা অন্য কোন আবহে রাখছে সরল নতুন একটি শিল্প-মাধ্যম পডকাস্ট। এটি সারা দুনিয়াকে যেন সারাক্ষণ কথার বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে, যেই কথাগুলো নিজের ফোনের ডিভাইসেই তুলে রাখা যায় লাইব্রেরী করে, যখন তখন শোনার জন্য। তাহলে কি সবকিছুই এত আয়োজন করে হতে হয়? না, মোটেই না। গুন্ গুন করে গানের চর্চা করার মত অসংখ্য মানুষ নানা সুন্দর জ্যামিতিক ও নান্দনিক গঠনে সব্জী টুকরা করছেন হয়তো বিশেষ রান্নার জন্য, যত্রতত্র পকেট বাগান করছেন বাইরে দেয়ালের ফোকরে ছোট্ট চারার ফুল ফুটিয়ে বা এমনিতরো জায়গায়, নিজের স্মার্টফোনের বেশ ভাল ক্যামেরাটি দিয়েই ঘরে বা ঘরের আনাচে কানাচে আর্ট-ফটো তোলার চেষ্টা করছেন– একেবারেই ব্যক্তিগত সখের চর্চা চল্‌ছে, কিন্তু আর্ট নয় একথা কেউ বলবেনা।

আর্ট যেহেতু মানুষের মননের আকাঙ্খা, এটি বিজ্ঞানীরও আকাঙ্খা। বিজ্ঞানীর মত সংবেদনশীল মানুষের চিন্তায় বিজ্ঞানের সমস্যা চিহ্নিত করার

কাজে, অথবা সে বিষয়ে কল্পতত্ত্বের ভাবনায়, তাঁর মাথায় আর্টের ঝিলিকগুলো দারুণ কাজ করবে, এটিই স্বাভাবিক। তিনি হয়তো একে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-ভাবনা হিসেবে নিচ্ছেন, তার পশ্চাদপটে কী ভাবে কোন্ আর্টে তাঁর মস্তিষ্ক অনুরণিত হয়েছিলো ওই বিষয়টি স্পষ্ট করতে পারেননি। কিন্তু কেউ কেউ তা সুন্দর করতে পেরেছেন– যেমন আইনস্টাইন পেরেছেন কী ভাবে তরুণতর বয়সে অনেকদিন আগের জার্মান ঔপনাসিকের উপন্যাস তাঁকে আলোর গতির অদ্ভুত সব আচরণের কথা নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করেছিলেন; সেই চিন্তা কখনো তাঁকে ছেড়ে যায়নি, আপেক্ষিক তত্ত্বের ভাবনা অবধি। সাধারণ নানা গবেষণার পেছনে প্রায়শই এরকম অনুপ্রেরণার উদাহরণ দেখা যায়। যেমন প্রাচীন মিশরের লিপিতে, প্যাপিরাসে পাওয়া উপকথায় এবং ছবিতে বিষধর সাপের ছড়াছড়ি দেখে কোন কোন বিজ্ঞানী অনুপ্রাণিত হয়েছেন মিশর ও আশপাশের এলাকায় আজকের সাপের নানা প্রজাতি এবং ঐ মিশরীয় সভ্যতার সময়ের সাপের নানা প্রজাতির মধ্যে তুলনামূলক গবেষণা চালাতে। বৃটেনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিচিত্র বন্য ফুলের সমারোহের যে সৌন্দর্য গ্রামবাসী, পর্যটক ও আর্ট-প্রেমিক অনেকের আকর্ষণ ও সংরক্ষণ-ইচ্ছার কারণ হয়েছে, তা ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে বিশেষ গবেষণায়। ক্যাম্ব্রিজের কিংস কলেজের পেছনের বিখ্যাত ঘাসের লনের একাংশকে বনফুলের গুল্মক্ষেত্রে বদলে নিয়ে উভয়ের মধ্যে জীববৈচিত্র সম্পর্কিত তুলনামূলক গবেষণা তাঁরা চালিয়েছেন। দেখা গেছে বনফুলে জীববৈচিত্র অনেক গুণে বেশি। এমনি ঘটনা হরদম বিজ্ঞান জগতে ঘট্‌ছে।

এই যে আর্টসে-সায়েন্সে মিলে মানবিকতার ধারাবাহিক চর্চা, আগামী দিনে সেটি কোন্ পথে যাচ্ছে এটি হয়েছে বইয়ের সমাপ্তির বিষয়। সেখানে খুব বড় আকারে জীবনকে বদলে দেবার সম্ভাবনা দেখাচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আগামী দিনের জন্য বড় প্রশ্ন এখন এটি কতখানি স্বশাসিত ভাবেই আর্ট সৃষ্টির দায়িত্ব নিতে পারবে, এবং সায়েন্স সৃষ্টিরও। মানুষের ভূমিকা কতখানি থাকবে? তাতে মানুষের এই যুগল চর্চার উপভোগ্যতা বজায় থাকবে কী? এই জটিল প্রশ্নের কিছু উত্তর অন্য অনেকের মত এই বইও দেবার চেষ্টা করেছে।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম

১২ জানুয়ারী ২০২৪

সূচিপত্র

সায়েন্স-আর্টসের আপন ভূবন ১২
সেদিনের সমুদ্র যাত্রা: আর্ট-সায়েন্স অভিযান ৫৩
আর্টের ঝিলিক ১৪০
বিজ্ঞানময় আর্টস ১৭৯
বিজ্ঞানের পেছনে যখন আর্টের প্রেরণা ২৬২
আগামী দিন ৩৫১

সায়েন্স-আর্টসের আপন ভূবন

সমন্বিত সৃষ্টি-সুখ

মানুষের ইতিহাসে তার সাংস্কৃতিক উন্মেষের পর থেকে একই সঙ্গে সায়েন্স আর্টসের দিকে কিছু মনোযোগ ছাড়া পরিপূর্ণ মানুষ হবার সুযোগ কখনোই ছিলনা। এখন আমরা কলেজে ভর্তির সময় সায়েন্স নিয়ে পড়বো নাকি আর্টস নিয়ে পড়বো এ নিয়ে দ্বিধায় পড়তে পারি– সেটি একটি কৃত্রিম ভাবে তৈরি বিভাজন। তারপর তো স্কুল হোক, কলেজ হোক সব সময়েই অবধারিত ভাবে যে প্রশ্নটি প্রত্যেককে করা হয় সায়েন্স না আর্টস? একে খুব কড়াকড়ি ভাবে নিয়ে অতীতে অনেক দেশ আফসোস করেছে, বেশ উন্নত ধনী দেশগুলোসহ। এখন সেই ভুল কেউ করেনা, অন্তত যারা এগিয়ে যাচ্ছে তারা করেনা। মানব সত্ত্বাকে যে দুভাগ করা যায়না সেটি বোঝা কঠিন নয়। সাহিত্য, ইতিহাস সমাজ, সুকুমার কলা উপভোগ না করে, সৃষ্টির চেষ্টা না করে মানবিক আনন্দ কোথা থেকে আসবে? একই ভাবে বিজ্ঞানকে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে যদি জ্ঞানের এবং চিন্তার ভিত্তি না করি তা হলে এই মহাবিশ্বের মধ্যে নিজেকে চিনবো কীভাবে, এর সঙ্গে নিজের সম্পর্কই বা কীভাবে স্থাপন করবো? প্রতিকূল প্রকৃতির মধ্যে অনুকূল মানব জীবনই বা রচনা করবো কী দিয়ে? এক সময় দার্শনিকরা এই সব কিছুকে 'আর্ট' বলতেন। আমরাও সেভাবেই অনুভব করি, যদিও ডাকি ভিন্ন ভিন্ন নামে।

আসলে দুনিয়াটি খুব দ্রুত বদলাচ্ছে প্রধানত প্রযুক্তির কারণে। মানুষের মনের ইচ্ছেগুলো পারঙ্গম কিছু বিশেষজ্ঞের হাতে হু হু করে প্রযুক্তি হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে; এতো দ্রুত যে ওই ইচ্ছে করা মানুষই সেগুলোকে আর চিনতে পারছেনা– সেগুলোর সমালোচনা করছে। আজ তথ্য প্রযুক্তি এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দিকে তাকালে সেটি বেশ বোঝা যায়। সমালোচনা করছে, কিন্তু তাকে জীবনে বরণ করতে এবং উপভোগ করতে কেউ দেরি করছেনা। আর্ট-সায়েন্সে যার যেই আপন ভূবন সেখানে সুযোগ মত প্রযুক্তির ব্যবহার করতেও কার্পণ্য করছেনা, কারণ প্রযুক্তির ছোঁয়ায় সেই আর্ট সেই সায়েন্স নতুন নতুন

উচ্চতায় যেতে পারছে, সেই সঙ্গে মানুষের আশা নিজেদের জীবনেও নতুন উচ্চতায় যাবে।

বিজ্ঞান তো বটেই সেই সঙ্গে সাহিত্য, সঙ্গীত, ইতিহাস সবই প্রযুক্তির দূতিয়ালিতে এবং পরস্পরের রসে সিক্ত হয়ে শুধু আনন্দের হবে, কখনো পাণ্ডিত্যের জবরদস্তিও হবে না, মানবিক জীবনের অন্তরায়ও হবেনা, এটি আশা করার প্রচুর কারণ রয়েছে। অনেক উদাহরণ দিয়ে সে কারণগুলোকে সামনে নিয়ে আসাটিই এই বইয়ের উদ্দেশ্য। সায়েন্স-আর্টসের সমন্বিত সৃষ্টি-সুখ সেদিন যা করেছে তারও কিছু তুলে ধরতে চাই এর একটি ক্ষেত্র নির্বাচন করে– সেটি হবে পালতোলা জাহাজে বিশ্ব অভিযানে। সমন্বিত ভাবে আজ যা করছে তাকেও নানা কলার মধ্যে বিজ্ঞানের অদ্ভুত সুন্দর সব সাহচর্যের উদাহরণে আনতে চাই। ভবিষ্যৎ যে জীবনের হাতছানি এখনই দিচ্ছে তারও একটি রূপকল্প নির্বাচন করতে চাই আশাবাদীর দৃষ্টিতেই বিজ্ঞান, কলা, প্রযুক্তি এমন ভাবে আমাদেরকে তাদের প্রত্যেকটিই চর্চায় উদ্বুদ্ধ করবে যেখানে মানবিকতা তার এতদিনের না পাওয়া স্পর্শগুলোও লাভ করবে। আর ভবিষ্যতের বড় পরিবর্তনটি হবে সবকিছু সব মানুষের জন্য হবে, এখনকার মত দুনিয়ার অসংখ্য বঞ্চিত মানুষকে এড়িয়ে যাবেনা। বিজ্ঞান, কলা আর প্রযুক্তির গণতন্ত্রীকরণের যে সুযোগগুলো দেখতে পাচ্ছি তার কারণেই সেই আশা। যে কথাটি উহ্য থেকেও স্পষ্ট হবে, তা হলো এর মূল চাবিকাঠি– একটিই– সর্বজনীন সমন্বিত শিক্ষা।

হ্যাঁ, বিশ্ব পাসপোর্ট বলে এখনো আমাদের হাতে কিছু নেই বটে, কিন্তু বিশ্ব নাগরিকই আমরা সবাই হতে চলেছি। বিজ্ঞান, কলা, প্রযুক্তিতে সিক্ত হওয়াটাই সেই বিশ্ব পাসপোর্ট- এসবের কোন দেশীয় সীমানা নেই। দেশজ কলা, দেশজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিষয়টিও আসলে সেই বিশ্বচর্চার অংশমাত্র বিশিষ্ট সুন্দর একটি হীরার স্ফটিকের নানা তল। ভবিষ্যৎটাও একেবারেই বিশ্ব-সমঝোতার ওপর নির্ভরশীল। এটি মানুষের সৃষ্টি-সুখের উল্লাস– তাকে দেশীয় বা মহাদেশীয় ভাবে ভাগ করে দেখার উপায় নেই। আবার বিশেষজ্ঞ আর আমজনতার মধ্যে বিভাজন করার সুযোগও এতে নেই। বিশেষজ্ঞ হওয়া, সমজদার হওয়া, উপভোগ করার দর্শক হওয়া, সব কিছুতেই কিছু সাক্ষরতা লাভ করা এগুলো যার যার পছন্দের ব্যাপার, অবশ্য-কর্তব্যের

ব্যাপার নয়। সব কিছু নিজের আনন্দের ব্যাপার এবং নিজের অস্তিত্বকে সার্থক করার চেষ্টার ব্যাপার। সেটি সে কোন জায়গা থেকে পেতে চাইবে সেটি তার পছন্দের ব্যাপার। শুধু শিক্ষিত এবং বিভিন্ন বিষয়ে সাক্ষর হিসেবে সেই পছন্দটি করার সুযোগ আছে কিনা সেটি নিশ্চিত করাটাই বড় কথা। সে সুযোগ আজ বাড়ছে, ভবিষ্যতে আরো অনেক বাড়বে আশা করা যায়।

সমন্বিত সৃষ্টির উদাহরণ

বিজ্ঞানে-আর্টে সমন্বিত হবার কথাটি যে খুব নতুন একটি কথা তা মোটেও নয়। বিজ্ঞানের সব কাজ একটি বাক্সে বন্দী, নানা কলার চর্চা তেমনি বন্দী আরেকটি বাক্সে– এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিলো শুধু উনবিংশ শতাব্দীর দিকে এসে। তখনই বিশেষজ্ঞ হওয়াটি একটি ফ্যাশনে পরিণত হয়– এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অন্য কিছুর চর্চা করলেও তা নিয়ে কথা না বলাটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। পাল্লা ভারী অবশ্য থাকতো সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, আইন ইত্যাদির বিশেষজ্ঞদের দিকে, যেহেতু ধরেই নেয়া হয়েছিলো যে নেতৃত্ব দিতে গেলে শুধু এ সবেরই দরকার তা দেশের নেতৃত্ব, ব্যবসার নেতৃত্ব, এমনকি বিদ্যৎ-সমাজের নেতৃত্ব যাই হোক না কেন। বিজ্ঞানের সঙ্গে অবশ্য তাঁদের মোটেই কোন সম্পর্ক থাকতো না, তাতে কোন পরোয়া নেই। কিন্তু এর আগে আমরা যখন আধুনিক বিজ্ঞানের প্রথম উন্মেষের সময়ে চলে যাই, দেখি এমনকি যারা বিজ্ঞানের প্রথম সংগঠিত প্রতিষ্ঠান ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি গড়ে তুলছিলেন তাঁদের অনেকেই পেশায় অন্য কিছু ছিলেন; যেমন নগর পরিকল্পনাকারী ক্রীস্টোফার রেন ছিলেন একেবারে প্রথম সারির একজন। আর এই যুগান্তকারী প্রতিষ্ঠানটি বিজ্ঞানকে যাঁর দার্শনিক মতবাদ অনুসরণে এক্সপেরিমেন্ট ও জন-সম্পৃক্ততার পথে নিতে উৎসাহিত করছিলো সেই ফ্রান্সিস বেকন ছিলেন একজন আইনজ্ঞ এবং রাজনীতিবিদ।

আর্টস-সায়েন্সের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ মানুষের সন্ধান তো গ্রীক স্বর্ণযুগের প্রধান আকাঙ্খা ছিল– ওরা সায়েন্সকেও আর্টসই বলতো। এই ট্র্যাডিশন চলেছে এর হাজার বছর পর পুরো ইসলামী সাম্রাজ্য জুড়ে জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চায়– যেখানে ওমর খৈয়ামকে একই দিনে আধুনিক গণিতের বাইনোমিয়াল থিওরেমের পূর্বসূরি সূত্র আবিষ্কার করতে এবং আরো কিছু অনবদ্য রুবাইয়াৎ কবিতা রচনা করতে দেখা গেছে। ইউরোপীয় পুনর্জাগরণে

রেনেষাঁর আগেপরে চিত্রশিল্পীদেরকে যেভাবে বিজ্ঞান, বিশেষ করে আলোকবিদ্যা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে দেখি সেখানে বিজ্ঞান আর সুকুমার কলার মধ্যে ভেদরেখা টানা অসম্ভব। মোনালিসার শিল্পী লিওনার্দো দাভিঞ্চিকে মূর্তিমান রেনেষাঁ ম্যান বলার কারণ হলো বিজ্ঞানে, প্রকৌশলে, স্থাপত্যে তাঁর একই রকম প্রতিভা ও সাফল্যের কারণে। তাঁর আর এক অপূর্ব শিল্পকর্ম লাস্ট সাপার তিনি এঁকেছেন মিলান নগরে একটি চার্চের দেয়ালে, দেয়ালচিত্র হিসেবে, তার মধ্যে দৃশ্যের যে দৃষ্টি-প্রেক্ষিত তিনি সৃষ্টি করতে পেরেছেন তাঁর অন্য বিজ্ঞানধর্মী কুশলতার কারণেই। মিলানের ওই ছোট্ট চার্চের দেয়ালে ছবিটি আমিও দেখেছি– রঙগুলো কিছুটা নিষ্প্রভ মনে হয়েছে, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতায় মনে হয় সত্যি সত্যি ওই চার্চের মধ্যেই যেন টেবিল পেতে যিশু আর তাঁর শিষ্যরা খাবার সামনে রেখে আলাপ করছেন প্রভুর শেষ খাবারের সময়টিতে– এটি দেয়ালের সঙ্গে মোটেই লেপটে নেই। আবার প্রাণীদেহের ও মানব দেহের প্রত্যেকটি পেশি, প্রত্যেকটি রেখার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক পরিচিতির কারণেও তিনি জীব বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে সহায়ক অসংখ্য বৈজ্ঞানিক চিত্র আঁকতে পেরেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি যে কত রকমের উদ্ভাবনের কথা চিন্তা করেছেন এবং সেগুলোর সম্ভাব্য কারিগরি স্কেচ এঁকেছেন তার ইয়ত্তা নেই, যার কিছু কিছু বাস্তবায়িতও হয়েছে তখন। কিছু কিছু পরে হয়েছে, বা কখনো বাস্তবায়িত হবার নয়। তবে তাঁর ৪০০ বছর পর বাস্তবায়িত হয়েছে এমন একটি উদ্ভাবন হেলিকপ্টারের প্রায় নিখুঁত স্কেচও যখন তাঁর স্কেচ বুকে অন্তর্ভুক্ত হতে দেখি তখন সেটি রেণেষাঁ ম্যান ছাড়া আর কার পক্ষে সম্ভব?

এই সমন্বিত সৃষ্টিকর্মে প্রয়োজন মত বিজ্ঞান যেমন এসেছে আর্টও এসেছে; তা ধারাবাহিক ভাবেই যুগে যুগে আমরা দেখেছি। এসবের সৃষ্টিকাররা উভয়কে একই সঙ্গে তাঁদের চিন্তায় ধারণ করেছিল বলেই এমন হতে পেরেছে।

সঙ্গীত মানে সংখ্যার সারল্য:

সঙ্গীতের সঙ্গে গণিতের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন পিথাগোরাস– যেই গ্রীক গণিতবিদের সঙ্গে আমাদের সবার পরিচয় হয়ে যায় স্কুলে তাঁর বিখ্যাত থিওরেম বুঝতে গিয়ে। পিথাগোরাসও সে কালের অন্য সব জ্ঞানী মানুষের

মত ছিলেন প্রথমে দার্শনিক তারপর অন্য কিছু। গ্রীক যুগের শুরুর দিকে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর একজন নামকরা দার্শনিক ছিলেন তিনি– শিষ্যদের সঙ্গে মিলে যিনি রীতিমত একটি বিশেষ মতবাদী গোষ্ঠিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পিথাগোরিয়ান নামে যারা তাঁর মৃত্যুর পরও টিকে ছিলেন। পিথাগোরাসের দর্শনের মূল কথাটিই ছিল গণিতকে, বিশেষ করে সংখ্যাকে, সব কিছুর পেছনে আসল জিনিস মনে করা। তাই তিনি বস্তু ও জীবের নানা গুণাগুণ আরোপ করেছেন সংখ্যার ওপর– কোন্‌টি সদাচরণ করছে, কোনটি করছেনা; কোনটি যৌক্তিক, কোন্‌টি অযৌক্তিক, এমনকি কোন্‌টি পুরুষ, কোন্‌টি স্ত্রী। এগুলোর নেহাৎ কথার কথা ছিলনা– ওরকম গুণ আরোপের সুনির্দিষ্ট গাণিতিক কারণ ছিল প্রত্যেকটির। যেমন ২ এর বর্গমূল $\sqrt{২}$ এই সংখ্যাটির একটি অস্থিত্ব জ্যামিতিক রেখার দৈর্ঘ হিসেবে সব সময় দেখানো যায়; কারণ সমকোণী ত্রিভুজের লম্ব ও ভূমি দুটিরই দৈর্ঘ ১ হলে এর অতিভূজের দৈর্ঘ পিথাগোরাস থিওরেম অনুযায়ী $\sqrt{২}$ হবে যার অস্থিত্ব একটি রেখার দৈর্ঘ হিসেবে একেবারে বাস্তব। কিন্তু একটি রুলারের ওপর তার স্কেল অনুযায়ী ০ থেকে শুরু করে সব সংখ্যা ও তাদের ভগ্নাংশ ইত্যাদি দেখিয়ে দিতে পারলেও ওই স্কেলের ওপর $\sqrt{২}$ সংখ্যাটি কেউ খুঁজে পাবেনা– সেখানে এর অস্থিত্ব নেই, তাই একে অযৌক্তিক বা অমূলদ বলা হয়েছে, পাটিগণিতে সে রকম বেশ কিছু সংখ্যা আছে। জ্যামিতিতে বাস্তবে দেখা যায়, কিন্তু পাটিগণিতে নয় এরকম সত্ত্বাগুলোর কারণে পিথাগোরিয়ানরা এবং অধিকাংশ প্রাচীন গ্রীকরা জ্যামিতির ওপর জোর দিতেন। এটি তাঁরা যাবতীয় আর্টের চর্চায়ও করতেন যেমন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন দৈর্ঘের তারের কম্পনে।

পিথাগোরাস সঙ্গীতের সুরের গুণও সংখ্যার ওপর আরোপ করেছেন। সঙ্গীতে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানতেন যে টান করে রাখা দুই বিভিন্ন দৈর্ঘের তারে টোকা দিলে এক সঙ্গে যে দুটি আওয়াজ হয় তার সম্মিলিত সুর সব সময় শ্রুতিমধুর হয়না অর্থাৎ তাতে সুর থাকেনা। সুর থাকে শুধু তখনই যখন ওই দুই তারের দৈর্ঘ কতগুলো বিশেষ অনুপাতে হয়। আসলে এও বুঝেছেন যে দুই দৈর্ঘের আওয়াজে পার্থক্য আসে তাদের কাঁপুনির হারের পার্থক্যের জন্য। তাই অন্য যে কোন বাদ্যযন্ত্র দুটির কাঁপুনির হারের বিশেষ বিশেষ অনুপাতই শুধু সুর দিতে পারে– অথচ অনুপাতটি গণিতের ব্যাপার।

কাঁপুনির হারের অনুপাত যখন ৪:৩ হয় তখন সঙ্গীতের ভাষায় বলা হয় ওই দুই তারের টোনের ব্যবধান ৫। সেই অবস্থাতে উভয়ের সমস্বর বাজনা একটি মাধুর্য সৃষ্টি করতে পারে। সঙ্গীতবিদরা এখনো একে নিখুঁত চতুর্থাংশ বলেন। তেমনি অনুপাত ৩:২ হলে টোন ব্যবধান হয় ৭, আর একে বলেন নিখুঁত পঞ্চমাংশ– এও আর একটি মাধুর্যের জায়গা। তবে পিথাগোরাসের আবিষ্কৃত যে টোন ব্যাবধানটি এখনো যে কেউ চট্ করে চিনতে পারবেন তা হলো ৮টি টোনের– বলা হয় অক্টেভ, যার জন্য তারের দৈর্ঘের অনুপাত ২:১। ওটা আমাদের অতি পরিচিত সারগাম সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি, র্সা। সা থেকে শুরু করে পরের সা পর্যন্ত, পরের অক্টেভের র্সা এবং কম্পন হার আগেরটির দ্বিগুণ। এই অনুপাতটিও দারুণ মাধুর্য সৃষ্টি করে, এক অক্টেভ উঁচুতে ওঠা টোন নিচেরটির সঙ্গে এক সুরে লীন হয়ে যায়, কোন অসঙ্গতি কানে বাজেনা।

আসলে দেখা গেছে ওই অক্টেভের মধ্যে যেন সবার জন্যই একটি জাদু আছে, যা দুনিয়ার সব মানুষের কানে ধরা পড়ে। আর্টের কাজ মানুষের মস্তিষ্কের এই জাদুগুলো আবিষ্কার করা। পিথাগোরাস দেখিয়েছেন এগুলো অঙ্কের খেলা। গণিতকে তিনি সবার ওপরে একটি বিমূর্ত আইডিয়া হিসেবে নিয়েছেন যার থেকে সব কিছুর উৎপত্তি; সুরের মত ইন্দ্রিয় বোধেরও। ওই প্রাচীন কালেই পিথাগোরাস বুঝতে পেরেছিলেন সঙ্গীত এবং গণিত উভয়েই একাকার ভাবে মানবিক, সেই অর্থে বিজ্ঞানও মানবিক। তাই সব সংস্কৃতির সব মানুষের কাছে এগুলো অভিন্ন।

দ্বিমাত্রিক ক্যানভাসে ত্রিমাত্রিক ছবির ভাবঃ

১৬ শতকের হল্যান্ডে দুর্দান্ত কয়েকজন মাস্টার চিত্রশিল্পী সবার নজর কেড়েছিলেন, যাঁরা এখনো সেই আদরেই আছেন। তাঁদের একজন হলেন ভূমীয়াহ অতি ঘরোয়া মানুষের আটপৌরে দৈনন্দিন দৃশ্যকে আলোর জাদুতে গভীর ভাবে যুগে যুগে দর্শকের মনে গেঁথে রাখতে পেরেছেন। তাঁর ছবি ‘আলোয় গড়া মহাসৃষ্টি’, ‘থম্‌কে দাঁড়ানো সময়’ ইত্যাদি নানা নামে জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু যে বিশেষ আর্ট-কৌশলের জন্য শিল্প আলোচকদের কাছে তাঁর সব চেয়ে বেশি খ্যাতি তা হলো ছবির নানা প্রেক্ষিতকে একেবারে বাস্তবের মত ফুটিয়ে তোলার সামর্থ্য। এটি সম্ভব হয়েছে ছবিতে বিভিন্ন দিক থেকে একটি গভীরতার ভাব নিয়ে এসে। ফলে দৈর্ঘ-প্রস্থ এই দুই মাত্রার সমতল

ক্যানভাসের ওপর যে ছবি লেপটে থাকার কথা মনে হয় তাতে যেন উচ্চতা বা গভীরতা দেখিয়ে তৃতীয় মাত্রা ফুটে উঠেছে- যে রকম সত্যিকার দৃশ্যতে থাকে আমরা অনেকটা তেমনি দেখতে পাই। কাজেই দর্শক অনুভব করতে পারেন তিনি যেন একটি কামরার ভেতরেই ঢুকে পড়েছেন যেখান থেকে এর চারদিক দেখছেন।

তিন মাত্রার এরকম দৃষ্টি বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারাটি আরো বেশ ক'জন ডাচ শিল্পীর হাতযশের মধ্যে ছিল, কিন্তু ভূমীয়াহের সাফল্যটি সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। অতীতে রেনেষাঁ কালের চিত্রশিল্পীরা বিভিন্ন সমকোণে দালানের কিনারা, সিড়ির কিনারা ইত্যাদি এমন ভাবে আঁকতেন যে তাতে একটি খেলার দানের ছক্কা বা কিউবের আঁকার মত করে তিন মাত্রার ভাব আনতে পারতেন। কিন্তু ভূমীয়াহ ও সমসাময়িক ডাচ শিল্পীদের কালে এসে ব্যাপারটি রীতিমত একটি গাণিতিক প্রশিক্ষণ নেয়ার পর্যায়ে চলে এসেছিলো। তরুণ শিল্পীদেরকে এজন্য জ্যামিতির নানা থিওরেমগুলো আয়ত্ব করার পরামর্শ দেয়া হতো। তাঁদের অনেকে অবশ্য একেবারে গণিতের শৃঙ্খলায় এগুলো পাঠ না করে সরাসরি ছবি আঁকার দিকে চলে যেতেন, এর নানা উপাদান আঁকার প্র্যাকটিসে– যেমন সিড়ির ধাপ, মেঝেতে দাবার ছকের মত চৌকা ডিজাইন, ইত্যাদির সঙ্গে পুরো কামরার অবয়ব ইত্যাদির প্র্যাকটিসে। তবে যাঁরা পরে ডাচ মাস্টার চিত্রশিল্পী হয়েছেন ভূমীয়াহর মত, তাঁদের কথা আলাদা। তাঁরা যে গাণিতিক অঙ্কনের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ নিয়েছেন সেটি নিঃসন্দেহ। এরকম একটি বই শিল্পী মহলে নাম করেছিলো ফরাসী গণিতবিদ ও প্রকৌশলী জিরার্ড ডেসার গিজের লেখা 'দৃষ্টিভঙ্গির কোষ গ্রন্থ'। এই বইয়ে চিত্রশিল্পীদের প্রতি একটি পরামর্শ ছিল তাঁরা যেন শিল্পে জ্যামিতিক সৌকর্য শেখার জন্য কাঠের কারুকাজ করা ছুতার এবং দেয়ালের গাঁথুনি দেয়া রাজমিস্ত্রিদের কাজ দেখতে না ভুলেন।

অন্য যেই বিজ্ঞানটিকে ডাচ মাস্টার চিত্রশিল্পীরা গুরুত্ব দিয়ে শুধু পাঠ করেননি তা নিয়ে রীতিমত এক্সপেরিমেন্ট করেছেন তা হলো আলোক বিজ্ঞান। অবশ্য কার্যক্ষেত্রে এই আলোক বিজ্ঞানের অনেকখানিই ছিল জ্যামিতি নিয়ে। এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য ভূমীয়াহ ও অন্যান্যরা যে দুটি পদ্ধতি বিশেষ ভাবে বেছে নিয়েছিলেন তার একটি হলো ক্যামেরা অবস্ক্যুরা,

যাকে আমরা এখন পিন্-হোল ক্যামেরাও বলে থাকি; আর অন্যটি ছিল পিন ও সূতা ব্যবহার করার পদ্ধতি। একটি চৌকা বদ্ধ বাক্সের একটি তলে ছোট্ট একটি পিনের ছিদ্র করা হয় তাতে। তার বিপরীত তলে একটি জানালা কেটে তা পাতলা পর্দা দিয়ে ঢেকে দেয়া হলে এবং ছিদ্রটি যে কোন আলোকিত দৃশ্যের দিকে তাক করলে ওই পর্দায় তার উল্‌টো করা ইমেজ দেখা যাবে অনেকটা ফটোর মত। আসলে এটি একটি ক্যামেরার কাজই করছে ছিদ্রটি লেন্সের বিকল্প হয়ে। আবার একটি রীতিমত বড় কামরাকে এমনি অবয়ব দেয়া যায়– বড় সড় একটি ক্যামেরা অবস্ক্যুরা রূপে। ডাচ চিত্রশিল্পীরা এরই সুযোগ নিতেন।

বদ্ধ কামরার একদিকে ছোট ছিদ্র দিয়ে বাইরের দৃশ্য থেকে আসা আলো ঢুকাবার ব্যবস্থা করে ঘরের বিপরীত দেয়ালে তাঁরা এই দৃশ্য ফেলতে পারতেন। তারপর তাঁরা পরীক্ষা করতে পারতেন দৃশ্যের কোন অংশ থেকে আলো এই ইমেজের কোন অংশে কীভাবে পড়ছে। এমন কাজে বিভিন্ন জায়গায় পিন আটকিয়ে তার থেকে সূতা টেনে তাকে আলোক রশ্মির বিকল্প হিসেবে মনে করতে পারতেন। এভাবেই একেবারে মাপজোক করে বুঝে নিতেন আলো কী ভাবে কী রকম জিনিস থেকে প্রতিফলিত, প্রতিসরিত ও বিচ্ছুরিত হয়, এবং তা নিজেদের আঁকা ছবিতে প্রয়োগ করতেন। ভূমীয়াহর মত শিল্পীরা শুধু ছবি আঁকতে আঁকতেই বড় শিল্পী হয়ে ওঠেননি, তাঁকে রীতিমত বিজ্ঞানীর মত আলোর ব্যাপারগুলো বুঝতে হয়েছে, এবং তা নিয়ে ল্যাবোরেটরিতে গবেষণার মত কাজ করতে হয়েছে।

ভিট্রুভিয়ান ম্যান:

সময়ে একটু পিছিয়ে গিয়ে রেনেসাঁ কালের লিওনার্দো দাভিঞ্চির আঁকা আরেকটি ছবি দেখি যেটি সায়েন্স-আর্টসের সমন্বয়ের একটি চমৎকার উদাহরণ হতে পারে। কিছু জ্যামিতিক, কিছু স্বাধীন রেখায় আঁকা এই ড্রইংটি ছবি হিসেবে খুবই সরল বলতে হবে। দাঁড়িয়ে থাকা একজন নগ্ন পুরুষের পুরো দেহটা আঁকা হয়েছে সব অঙ্গের প্রতিসাম্যের ওপর বিশেষ জোর দিয়ে। এই প্রতিসাম্য এবং তার দেহের নানা অংশের মধ্যে অনুপাতগুলোর মধ্যে যে একটি নান্দনিক শৃঙ্খলা আছে সেটি দেখাবার জন্য তাকে আঁকা হয়েছে একটি বৃত্ত ও একটি বর্গক্ষেত্রের ভেতরে। সোজা খাড়া পা, আবার ছড়ানো পা

উভয়ে যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি দু পাশে ভূমি সমান্তরালে বিস্তৃত হাত, আবার মাথার ওপর একটু কোণ করে তুলে ধরা হাতও আছে। হাত ও পায়ের এই দুই বিকল্পের প্রান্তগুলো এবং মাথার প্রান্ত এসব হয় বর্গক্ষেত্রের, নয় বৃত্তের, নয় উভয়ের, রেখাকে ছুঁয়েছে। এভাবেই প্রতিসাম্য আর অনুপাতগুলোকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

এটি দেখাচ্ছে মানুষের স্বাভাবিক দেহ গঠনটি এমন প্রতিসাম্য ও অনুপাতে তৈরি যে তা একই সঙ্গে গাণিতিক এবং নান্দনিক। প্রাচীন গ্রীক স্থপতি ভিট্রুভিয়াস প্রথম মানবদেহের এই প্রতিসাম্য ও অনুপাতগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর দেখিয়ে দেয়া নান্দনিক অনুপাতগুলো অনুসরণ করেছেন বলেই দাভিঞ্চি এই ছবির নাম দিয়েছেন ভিট্রুভিয়ান ম্যান। মানব দেহকেও অবাধ শৈল্পিক ভঙ্গিতে প্রকাশটাই তো এর আর্ট, অথচ দেখা যাচ্ছে যে কিছু জ্যামিতিক নিয়মের মধ্য দিয়েই শুধু আসছে তার নান্দনিকতা। এ ভাবে আর্টস-সায়েন্সের সমন্বয় রেনেসাঁ আর্টের একটি নীতিই যেন হয়ে পড়েছিলো। তেমনি আরেকটি নীতি ছিল আরো মৌলিক, তা হলো স্বর্গ-মর্ত্য সবকিছুকে আর্টের বিষয়বস্তু করেও রেনেসাঁ আর্ট সে চিত্রশিল্পই হোক, ভাস্কর্যই হোক, সাহিত্যই হোক শেষ অবধি তা হয়ে ওঠে মানুষের চিত্রণ; মানুষই হয় আর্টের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যেমন মাইকেল এঞ্জেলোর বিখ্যাত পিয়েতা ভাস্কর্যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত যীশুকে কোলে নিয়ে বসে আছেন শোকার্ত মা মেরী। কিন্তু ভাস্কর্যটি এমন ভাবে সৃষ্ট যে এতে কোন অপার্থিব ভগবান সম্পর্কীয় কিছু নেই, বরং যা অনবদ্য ভাবে চোখে পড়ে এবং মানবিক দুঃখ অনুভূতি সৃষ্টি করে তা হলো মৃত সন্তানকে কোলে নিয়ে চিরন্তন মায়ের অভিব্যক্তি। অথচ রেনেসাঁর আগে এমন দৃশ্যকে স্বর্গীয় দৃশ্যে পরিণত করাটাই ছিল নিয়ম- ভগবানের বিষয় নিয়ে, মানুষ তার কেন্দ্রে ছিলনা।

ভিট্রুভিয়ান ম্যান ছবিতে দাভিঞ্চি এই শেষোক্ত নীতিটিও সুন্দর ভাবে, অনেকটা প্রতীকী ভাবে এনেছেন। ক্লাসিকাল গ্রীক দর্শনে মহাজাগতিক সব কিছুকে হতে হতো সব থেকে বেশি প্রতিসম এবং নিখুঁত যে জ্যামিতিক সৃষ্টি সেই বৃত্ত। অন্যদিকে বর্গক্ষেত্রেরও একটি প্রতিসাম্য আছে, তা একটি ঘরের প্রতিসাম্য– মানুষের ঘরোয়া পরিবেশের প্রতীক। বিজ্ঞান হচ্ছে মহাজাগতিক প্রকৃতিকে নিয়ে, তার সন্ধান মানুষ পেয়েছে বলেই সে মানুষ, তাই মানুষের

আকাঙ্খাটি বৃত্তের মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু মানুষের নিজের আর্ট, নিজের প্রকাশ তার দৈনন্দিন ঘরোয়া পরিবেশে, তাই বর্গক্ষেত্রের মধ্যেও তাকে ধারণ করা যায়। এই উভয়টি ব্যবহার করেই তার নান্দনিক অনুপাতগুলো দাভিঞ্চি খুঁজে পেয়েছেন। খাড়া মানুষের উচ্চতা যতখানি তার দুপাশে প্রসারিত হাতের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত ঠিক ততখানি। তার নাভি থেকে মাথার কিনারার দূরত্ব যতখানি, নাভি থেকে পারের পাতার দূরত্বও ততখানি।

শিকাগোর ক্লাউড গেইট:

উনবিংশ শতাব্দীতে এসে সায়েন্স-আর্টস যার যার অঞ্চলে ভাগ হয়ে ছিলো সে কথা বলেছি। দুইয়ের ক্ষেত্রেই যথেষ্ট উন্নতি হচ্ছিলো, কিন্তু পরস্পরের খোঁজ খবর করা বা পরস্পরের এই যে অগ্রবর্তী রূপ সেখান থেকে নেবার চেষ্টাটি তেমন ছিলনা। এ অবস্থা বিংশ শতাব্দীতেও গড়িয়েছিলো; কিন্তু তারপর আর নয়। বলতে গেলে বিজ্ঞান এবং সুকুমার কলা উভয় ক্ষেত্রে নেতৃত্ব আসছিলো যে ইউরোপ থেকে সেখানে বিজ্ঞানকে বিশেষজ্ঞের জায়গাটি দিয়ে বাকি সবকিছুতে যেন এক রকম মেকি আভিজাত্য চল্‌ছিলো। রেনেসাঁ ও তার পরবর্তী আর্টিস্টরা যেভাবে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত ভাবে বিজ্ঞান থেকে নিয়ে আর্টকে সমৃদ্ধ করেছেন, আর বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক বিজ্ঞান ধারণাগুলোকে আত্মস্ত করতে বিজ্ঞানীকে অনেক বেশি দার্শনিকের ও আর্টিস্টের মনোভঙ্গি নিতে হয়েছে তার উভয়েই আজ আরো জোরদার হয়েছে। তাই ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে একেবারে আধুনিক সাম্প্রতিক একটি উদাহরণ নেয়া যাক।

আমেরিকার শিকাগো নগরে নগরকেন্দ্রের কাছেই এই আকর্ষণীয় ভাস্কর্যের ভাল নাম ক্লাউড গেইট, কিন্তু ডাক নামটি বীন্‌স (শিমের বিচি); কেন তা একটু পরেই বোঝা যাবে। আজকালকার শহরে-নগরে যেমনটি বেশ জনপ্রিয়, মানুষ যেখানে বেড়াতে গিয়ে কিছু সময় কাটাতে পারেন, সেই সঙ্গে আর্টের বক্তব্য নিয়ে অভিভূতও হতে পারেন, এটি ওরকম পাবলিক আর্ট– সর্বসাধারণের কাছে উপভোগ্য হতে পারার মত। ক্লাউড গেইট ভাস্কর্যটি একটি বেড়াবার কেন্দ্রের প্রবেশ দ্বার হবার জন্য তৈরি– রীতিমত মজা করে উপভোগ করার মত। পুরো জিনিসটি কিন্তু নির্ভর করছে অনিয়মিত আকৃতির প্রতিফলক তল থেকে আলোর প্রতিফলনে সৃষ্ট ইমেজের ওপর। এমন ইমেজে

যত বৈচিত্র ঘটানো যায় সেই সবই রয়েছে এই পাবলিক আর্টটির মর্মে। এর ডিজাইন করেছেন বৃটিশ ভাস্কর অনিশ কাপুর। আমি নিজেও সম্প্রতি এই পাবলিক আর্ট দেখতে একজন পাবলিকের মত গিয়ে বার বার কলেজে ছাত্র থাকা কালে প্র্যাকটিকাল ক্লাসে দেখা কনভেক্স মিররের চমৎকারিত্বে ফেরৎ যাচ্ছিলাম। এই চকচকে শিমের বিচির ওপর প্রতিফলন দেখে দেখে মনে হয় অনন্তকাল এর বৈচিত্র দেখে কাটিয়ে দিতে পারবো।

চকচকে স্টেনলেস স্টিলের তৈরি এমন দুটি হাতের বালার মতো মোটা রিং পরস্পর যুক্ত হয়েছে যে এরা মিলে যেন একটি অতিকায় শিমের বিচির আকৃতির জিনিস তৈরি হয়েছে। এর বাইরের দিকে ফুলানো বক্রতল মসৃণ ও চকচকে, সম্পূর্ণ নিজেই নিজের মধ্যে প্রসারিত, তার কোন কিনারা নেই। শিমের বিচির মত হতে গিয়ে তলটি অধিকাংশ জায়গায় কনভেক্স বা স্ফীত আয়নার মত। কনভেক্স আয়না থেকে অনেক বড় জায়গার ইমেজ ছোট হয়ে পড়তে পারে– অনেক দূরের জিনিসের ইমেজও। আবার বীনের খুব এলোমেলো তলের অংশ থেকে লাফিং মিররের মত নিজেদের হাস্যকর বিকৃত ইমেজ দেখা যায়– কিছুটা দূরত্বের ও অবস্থানের ওপর নির্ভর করে বিচিত্র রকমের। গেইটের মত করে তৈরি ওই বীনের তলায় গেলে দর্শকরা নিজেদেরকে এমন হাস্যকর আকৃতিতে দেখেন বলে ওখানে খুব মজার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আবার যখন বাইরে দূরে থেকে গেইটের দিকে যেতে থাকি তখন ওই কনভেক্স আয়নায় কোন জায়গা থেকে আকাশে মেঘ ইত্যাদির আবার বাইরের পরিবেশ ও কাছের নগর-কেন্দ্রের দৃশ্যাবলীর ইমেজগুলো সুন্দর ওই বীনের পিঠের ওপর দেখা যায়। নিজেরা এগুতে এগুতে এসবের পরিবর্তন ঘটতে থাকে আর এর তলায় গেলেই তো সেই হাস্যরস। এখানে আলোর গুণ, বক্রতলের প্রতিফলন গুণ, নানা পরিস্থিতিতে ইমেজ সৃষ্টি ইত্যাদির বিজ্ঞান সুন্দর উপভোগের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়। আর এত সব কিছু হচ্ছে বিজ্ঞানের পাঠের মাধ্যমে নয় বরং চলমান আর্টের মাধ্যমে।

এর আরো একটি আর্ট আছে যেই বস্তু দিয়ে বীন তৈরি হয়েছে তাকে ঘিরে। সেই অদ্ভুত আকৃতির বীনটি আর তার অত্যন্ত মসৃণ চকচকে তল আয়নার মত, অথচ এটি বিশেষ ধরনের ধাতু স্টেনলেস স্টিল যার বস্তু-গুণ এখানে আর্ট হিসেবে প্রকাশিত। দর্শকরা কিছুটা নিজেরাই তা বুঝতে পারেন

প্রতিফলন দেখে এবং তার গায়ে অবাধে হাত বুলিয়ে তার বক্র পৃষ্ঠদেশের মসৃণতা, অত্যন্ত চকচকে ভাব ইত্যাদি অনুভব করে। দিনের পর দিন এত মানুষের হাত পড়ার পরও একটি আঁচড়ও এর চকচকে গায়ে না থাকাটিও কম কথা নয়। সব কিছু মিলিয়েই একটি নিটোল অভিজ্ঞতা– যার মধ্যে ভেতর বৈজ্ঞানিক চমক ও উপলব্ধি যেমন আছে তেমনি শিল্পবোধের তৃপ্তিটিও আছে।

অর্কেস্ট্রা মেটাস্টেসিস

সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গণিতের প্রেরণা আমরা একেবারে প্রাচীন কালেই পিথাগোরাসের চিন্তায় দেখেছি। সব সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ওভাবে আলোচিত না হলেও তার মধ্যে যে গণিত যে প্রচ্ছন্ন ভাবে রয়েছে সেটি বুঝতে পারা কঠিন নয়। কিন্তু আধুনিক কালেও কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞ নিজের সঙ্গীত রচনায় বিজ্ঞান ও গণিতের কিছু কিছু দিকের স্পষ্ট প্রাধান্যটি দেখিয়ে দিয়েছেন। এমনি একটি উদাহরণ হলো কম্পোজার ইয়ানিস জেনাকিসের ১৯৫৩-৫৪ সালে রচিত অর্কেস্ট্রা মেটাস্টেসিস। এর অভিনবত্বের কারণে অর্কেস্ট্রাটি তখন থেকেই এই ধরণের সঙ্গীতের জগতে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এসেছে। অভিনবত্বের উৎসটিও এর নামের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। মেটাস্টেসিস মানে হলো ইতস্ততত পরিবর্তন। অর্থাৎ কিনা নিয়মানুযায়ী প্রত্যাশিত ভাবে নয়, হঠাৎ এদিকে হঠাৎ ওদিকে বিচরণ। সঙ্গীত হবার কথা নিয়মবদ্ধ, নিয়মিত গণিতের অনুসরণ তাকে মাধুর্য্য দেয়। সাধারণত ইতস্তত পরিবর্তন একে বেসুরো করে তোলার কথা। কিন্তু মেটাস্টেসিসে তা হয়নি। অনেক রকম বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে অর্কেস্ট্রা গঠিত হলেও এখানে তার-যন্ত্রগুলোই প্রাধান্য পেয়েছে– ভায়োলিন, ভায়োলা, চেলো, ডাবল ব্যাস, ইত্যাদি। এই অর্কেস্ট্রায় স্ট্রিং গ্লিসান্ড নামের একটি কৌশলে তার-যন্ত্রগুলো মনে হয় এমন ভাবে পিছলে যাবার মত শব্দ সৃষ্টি করে যার বিভিন্ন খাদের মধ্যে ইতস্তত পরিবর্তন খুব মসৃণ ভাবে করা সম্ভব হয়।

জেনাকিস স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ইতস্তত পরিবর্তনেরও একটি গণিত আছে, তারও একটি সৌন্দর্য আছে। তিনি সেখান থেকে প্রেরণা খুঁজে নিয়েছেন। পদার্থবিদ্যার যে গ্যাসের নিয়ম আছে যেখানে বদ্ধ পাত্রে গ্যাসকে অসংখ্য অণু হিসেবে দেখা হয় যেগুলো ইতস্তত ভাবেই ছোটাছুটি করছে, গতি

পরিবর্তন করছে, কিন্তু তার ভেতরেও স্বাভাবিক বন্টনের (নরম্যাল ডিস্ট্রিবিউশন) মত অনিবার্য সৌন্দর্য আছে– স্বাভাবিক বন্টনে মাঝারি গতিতে থাকা অণু সবচেয়ে বেশি, খুব কম বা খুব বেশি বেগযুক্ত অণুর সংখ্যা খুব কম, কত বেশি বা কত কম তা সংখ্যাতাত্ত্বিক গণিতই বলে দেয়। সেভাবেই মেটাস্টেসিসের তার-যন্ত্রগুলোর সুর যখন বিভিন্ন খাদে একেবারেই ইতস্তত পরিবর্তিত হতে থাকে তা মধ্যেও স্বাভাবিক বন্টনের মত একটি মসৃণতা চলে আসে।

সঙ্গীতের সঙ্গে সময়ের গতি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। বলতে গেলে সঙ্গীতের তাল-লয়কে আমরা সময় যাপনের জন্য এক রকম ঘড়ি হিসেবেই দেখতে পারি। এটি সম্ভব কারণ সময়ের গতিকে চিরকাল একটি স্বাধীন পরম গতি হিসেবে নেয়া হতো– তা ক্ল্যাসিকাল ফিজিক্সে যেমন, তেমনি ক্ল্যাসিকাল মিউজিকেও। কিন্তু অর্কেস্ট্রা মেটাস্টেসিসে জেনাকিস এই নীতি থেকে বের হয়ে এসেছেন। তিনি সুরের এক এক জায়গায় তাঁর কম্পোজিশনে সঙ্গীতের নোটগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্ব দিয়েছেন, ভিন্ন তীব্রতাও দিয়েছেন। ফলে শোনার সময় মনে হয় তাঁর যে লয় তাতে সময় নিজেই যেন কখনো ধীর গতিতে চল্‌ছে, কখনো দ্রুত গতিতে। আইনস্টাইন তাঁর আপেক্ষিক তত্ত্বে অবলোকনকারীর গতির ওপর সময়ের এভাবে ধীর বা দ্রুত হবার বিষয়কে এনে বিজ্ঞান জগতকে চম্‌কে দিয়েছিলেন; জেনাকিস যেন সেভাবেই সঙ্গীত জগতকে চমকে দিতে চেয়েছেন।

জেনাকিসের ভাবনা-জগতের একটি বড় অংশ দখল করে ছিল স্থাপত্যবিদ্যা এবং সেই সুবাদে বিজ্ঞান। এজন্য সঙ্গীত সৃষ্টি করার সময় তাঁর ভাবনাকে ও স্মৃতিকে ওসব নানা দিকে নিয়ে যাওয়াটাই ছিল তাঁর স্বভাব। গ্রীক-ফরাসী বংশোদ্ভূত এই সঙ্গীত সৃষ্টিকার বলেছেন তিনি মূলত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রণাঙ্গনে যে একেবারেই ইতস্তত, একেবারেই হঠাৎ গোলাগুলির আওয়াজের মধ্যে কাটিয়েছেন স্মৃতির সেই আওয়াজকেই তিনি মূলত মেটাস্টেসিসে স্ট্রিং গ্লিসান্ডির মাধ্যমে সঙ্গীতে লীন করতে চেয়েছেন। তাঁর একটি আকাঙ্খা ছিল সঙ্গীতকে স্থাপত্যের মত করে তোলা। তাঁর কাছে সঙ্গীত আর স্থাপত্যের মধ্যে পার্থক্যটি হলো সঙ্গীতের যে স্পেস তা একমাত্রিক, তাই একই রেখায় একমাত্রিক ভাবে তাকে অনুভব করে যেতে

হয়। কিন্তু স্থাপত্যের স্পেস ত্রিমাত্রিক– একে ঘুরে ঘুরে সব দিক থেকে দেখতে হয়। মেটাস্টেসিসে তিনি সঙ্গীতকেও ত্রিমাত্রিক করতে চেষ্টা করেছেন। তাই এর স্কোরগুলো প্রথম যখন লিখেছেন তখন সাধারণত যেভাবে লেখা হয় সেভাবে না লিখে বরং অনেকটা গ্রাফের বা ম্যাপের আকারে লিখেছেন– গ্রাফের একটি অক্ষকে সময়ের জন্য এবং অন্য অক্ষকে ফ্রিকোয়েন্সির জন্য ব্যবহার করে। তাঁর সঙ্গীতটাও এভাবেই নেবার উপযুক্ত ছিল। তাঁর মন যেন দেখতে চাইছিলো সঙ্গীতেরও স্থাপত্যের মত একটি গঠন থাকবে, স্কোরটি যেন প্রচলিত সঙ্গীত নয় বরং স্থপতির ব্লু প্রিন্ট।

সবার জন্য আর্ট

ওপরে আর্ট-সায়েন্সের মিলিত চিন্তার যে ক'টা উদাহরণ দিলাম সেগুলোর হয় প্রাচীন দার্শনিকের অতীত মাস্টার আর্টিস্টের, অথবা আধুনিক বিখ্যাত শিল্পীর কাজ। তাঁরা অনন্য হতে পারেন কিন্তু তাঁদের আবেদনটি সবার উপভোগের জন্য, যাঁরা তাঁদের প্রভাবে নিজেরা আর্টের সমজদার হয়ে ওঠবেন, আনন্দ পাবেন তাঁদের উদ্দেশ্যে। আসলে মানুষ মাত্রের মধ্যেই আর্টের প্রতি সহজাত আকর্ষণ রয়েছে বলেই শিল্পীর শিল্পকর্মের এত মূল্য। এ আকর্ষণ শুধু উপভোগের নয়, সৃষ্টিরও বটে। উপভোগ করতে করতেই আমরা উপভোগকারীদের মনে আর্ট সৃষ্টিরও আকাঙ্খা জমে ওঠে। কীই এই আকাঙ্খা? কোন্ সৃষ্টিটাকে আমরা আর্ট বলবো। চুলচেরা করে বলা কঠিন, কিন্তু আপাতত মস্তিষ্ক-বিজ্ঞানের তত্ত্ব থেকে কাজ সারার মত করে বলতে পারি। আমাদের স্নায়ুকোষগুলো পরস্পর মিলে যে বর্তনীজাল গড়ে তাতে কোথাও কোথাও জ্বলে ওঠাটাই মস্তিষ্কের উপলব্ধি, চিন্তা। জ্বলে ওঠা বর্তনী জালের সীমানাগুলো ক্রমে প্রসারিত হয়, পরস্পরের জায়গায় যায়, পরস্পর ও আগের স্মৃতি-বর্তনীর সঙ্গে মিশে নতুন নতুন অভিনব উপলব্ধি সৃষ্টি করে– যা কল্পনা। মামুলি সব কল্পনা তেমন বিশিষ্ট কিছু না হলেও মাঝে মাঝে হঠাৎ করে ওই অভিনব জিনিসগুলো এমন কিছু হয়ে ওঠে, এমন কিছু পরীক্ষায় পাশ করে, যাতে নিজের কাছে ও অন্যদের কাছে তাকে মনে হয় সুন্দর, নান্দনিক, ব্যতিক্রমী কিছু। তখন সেটি হয়ে ওঠে আর্ট। শুরুতে হয়তো স্কুলে এমন আর্ট সৃষ্টির উন্মেষ হয় তারপর হয় স্বশিক্ষার মধ্যে। আর্টের সঙ্গে অন্য জগতের যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া– দৈনন্দিন জীবন যাপনের সাধারণ বিষয়গুলো

থেকে বিজ্ঞানের জগত পর্যন্ত সব কিছুর– সেটিও সবার মধ্যে সহজাত এবং অনেকেরই স্বশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। অনেকেরই চেষ্টা থাকে নিজের মামুলি সব কাজ ও সৃষ্টির মধ্যে যেন শিল্পের ছোঁয়া থাকে সে চেষ্টা করা। অনেকের চেষ্টা হাঁটি হাঁটি পা পা করে নিজের প্রায় অজান্তেই শুরু হয়ে এক সময় হয়তো জমজমাট আর্টেও পরিণত হতে পারে।

ফটোগ্রাফি অনেকেরই সখের আর্ট:
মোবাইল ফোনে থাকা ক্যামেরার কারণে ফটোগ্রাফি এখন যে কোন কারোই সখের মধ্যে চলে আসতে পারে। তাই একেই আমরা সর্বজনীন আর্টের একটি ভাল উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। কোন মুহুর্তকে বা ঘটনাকে ধরে রাখার জন্য ফটো তোলা এক কথা, কিন্তু কোন উপলব্ধিকে ধরে রাখা, অন্যের মধ্যে সেই উপলব্ধি জাগাবার চেষ্টা করার জন্য ফটো তোলা সেটি ভিন্ন কথা– সেখানেই আর্ট হবার সম্ভাবনাটি আসে। সেই সম্ভাবনাটি আরো বাড়ে যখন যা দেখছি তার দ্বারা আমার মধ্যে সৃষ্টি হওয়া উপলব্ধিটি সঠিক ধারণ করার জন্য আমি সেই ফটোর ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ খাটাতে পারি তখন। ঘটনাকে ধরে রাখার জন্য ফটোর ভেতর যেন ঘটনার অন্তর্ভুক্ত সবাই থাকে সেটি নিশ্চিত হয়ে ক্যামেরা ক্লিক করলেই অনেক সময় হয়ে যায়, কারণ খুব মৌলিক নিয়ন্ত্রণগুলো ক্যামেরা নিজেই করে ফেলে। কিন্তু উপলব্ধি ধারণ করার সময় নিজেকেও কিছু করতে হয়; নিজের নিয়ন্ত্রণ আনতে হয়।

যেমন আমার সেই ফটোর চৌহদ্দির মধ্যে কী কী থাকবে, কী কী থাকবেনা সেই কম্পোজিশনটা আমাকেই ঠিক করতে হবে। ওতে আলো-আঁধারের খেলাটি কী রকম হবে তাও ঠিক করে দিতে চাই। সেটিকে নেহাৎ ঘটনা রেকর্ড করার মত একটি উপায় হিসেবে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখতে আমি নাও চাইতে পারি। তাই ক্যামেরায় আলো ঢুকাবার ছিদ্র পথ কত বড় হবে, তা কতক্ষণ খোলা থাকবে ইত্যাদি আমি নিজেই ঠিক করে দিতে চাইতে পারি কোন বিশেষ উপলব্ধির ভাবটাকে বেশি ফুটিয়ে তোলার আশায়। ছবিতে আমার লক্ষ্যবস্তু কী বা কে, তার বিপরীতে যে পশ্চাদপট সেটিকে আমি কতখানি গুরুত্ব দিতে চাই, সবকিছু মিলে একটি যে ছবিগুণ সৃষ্টি হয় তা আমি কতখানি আন্‌তে পেরেছি? আনতে হলে যার ওপর ইমেজ বা ছবিটি সৃষ্টি হচ্ছে, সেটি ফিল্মই থেকে কিংবা আলোক-সংবেদী ইলেকট্রনিক পর্দাই

হোক ,তার সংবেদিতা সম্পর্কেও ধারণা রাখতে হবে; যেমন রাখতে হয় সেটির ওপর কতক্ষণের জন্য কত আলো পড়ছে তাও। এসবের মৌলিক বিজ্ঞানের ওপর ধারণা না রেখে এটি সম্ভব নয়। তাই এই প্রাথমিক ক্ষেত্রেও আর্টের সঙ্গে সায়েন্সের মেশাল অবশ্যম্ভাবী ভাবে আসছে।

দৈনন্দিন জীবনে সুখ:দুখের মুহূর্তগুলোকে ধরে রাখার জন্য হয়তো ক্যামেরা ব্যবহার শুরু হয়েছিলো। তা পরে এসে গেলো আর্টের আকর্ষণ। সব মিলে আবার কারো কারো জন্য ফটোগ্রাফি হয়ে পড়তে পারে দুর্দান্ত পেশা– যেমন সাংবাদিকতার পেশার এটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অনেকে একই সঙ্গে পরবর্তী ইতিহাসের উপাদানগুলোকেও ধারণ করে যেতে পারে এরই মাধ্যমে। সাংবাদিকতা বা ইতিহাসের দিকে মনোযোগ রেখেও সে রকম অনেকে ছবি তুলবেন সামাজিক বা অর্থনৈতিক গবেষণার দলিল হিসেবে। যে দলিল আরো ভালো, আরো কার্যকর দলিল হয়ে উঠতে পারে যদি তাতে আর্টের ছোঁয়া থাকে। সেই সঙ্গে ফটোর মাধ্যমেই যদি অমোঘ কিছু বৈজ্ঞানিক উপাত্তও ভেসে আসে যা বুঝিয়ে দেবার জন্য ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়না, তাহলে তার দালিলিক মূল্য আরো বেড়ে যায়। এমনি ভাবে আর্টে-সায়েন্সে মিলেই ফটোগ্রাফি সাধারণ সখ থেকে মুল্যবান অবদানের বিষয় হতে পারে। আর এটি শুরু করতে পারেন যে কেউ।

বাগান রচনাঃ

আর একটি সখ সবার হাতের কাছে সব সময় থাকতে পারে, ছোট বড় যে কোন আয়োজনে করা যায়– তা হলো বাগান করা। আর একে আর্টের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াটিও বেশ স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে। বারান্দার বাগান, ছাদের বাগান থেকে শুরু করে খামারে বেশ বড় পরিকল্পনার বাগানও সৃষ্টি হতে পারে; সবই উদ্যান-আর্টের এক একটি দিক। একটি ছবি আঁকা বা একটি ভাস্কর্য গড়ার থেকে কোন অংশেই তাতে আর্ট-সৃষ্টির সুযোগ কম নয়, বরং প্রকৃতির সঙ্গে মিলে সেটি আরো স্বাভাবিক সহজাত সৃষ্টিতে পরিণত হতে পারে। বাগান গড়ায় বৈচিত্রের কোন সীমা নেই– এর লক্ষ্য হতে পারে নানা রকমের উদ্ভিদের সমন্বয় ঘটিয়ে সার্বিক দৃশ্য সৃষ্টি করা, অথবা শুধু ফুল, শুধু শাকসব্জী, শুধু ভেষজ উদ্ভিদের বাগান এমনিতরো বিশেষ বাগান গড়া। বাগান গড়ার আর্টটি যে একটি ছবি আঁকা, একটি সুর সৃষ্টি বা কবিতা লেখার মতই

উপভোগ্য হতে পারে সেটি বাগান-প্রেমিক মাত্রই বুঝতে পারেন। তবে বাগান যিনি রচনা করেন তাঁকে প্রত্যেকটি আলাদা উদ্ভিদের কথা মনে রাখতে হয়, কারণ এই জীবন্ত আর্টের জীবনটি কিন্তু প্রত্যেকটি চারার মধ্যেই। শুধু তাই নয় একটি উদ্ভিদের আলাদা আলাদা অংশের নান্দনিকতা সেই অংশের স্বাস্থ্যের ওপর নির্ভর করে। এর পল্লবিত, ফুলেল প্রতিটি শাখা, প্রতি শিকড়গুচ্ছ, সব ক'টির নান্দনিকতার সঙ্গে বাগান-শিল্পীর একটি আত্মিক সম্পর্ক থাকে। শিশিরের স্পর্শ প্রথম পাতাযুগল যখন নিজেকে মেলে ধরে তা যদি হৃদয় উদ্বেল না করে তা হলে তিনি কি শিল্পী হয়ে উঠতে পারেন? তেমনি মাটি-সার-টব ইত্যাদি যে সবের আশ্রয়ে বাগান গড়ে ওঠে সে সবও মনোযোগের বাইরে রাখার উপায় নেই। নতুন আর্ট যদি সেখানে সৃষ্টি করতে হয় তখন সেখানকার জীবন ও স্বাস্থ্যের দিকটি দেখছে যে বিজ্ঞান তার সর্বশেষ খবরগুলোর দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয় বৈকি। একজন উদ্ভিদ পরিচারক মাত্রই, উদ্ভিদ নিয়ে পরিকল্পনাকারী মাত্রই, উদ্ভিদ বিজ্ঞানেরও ভক্ত হবেন সেটি একেবারেই অবধারিত। শুধু তাই নয় যতই নতুন বা যতই সৌখিন বাগান-শিল্পী তিনি হোন না কেন, অভিনবত্বের সন্ধানে তাঁকে নিজের বাগানের একজন গবেষকও হতে হয়, যাতে ঠিক এই জায়গার বিশেষ পরিস্থিতির তিনি হয়ে ওঠেন এক রকম বিশেষজ্ঞ। এর সব কিছুরই মর্মটি আসলে আনন্দ লাভের মধ্যে– আনন্দই আর্ট সৃষ্টি করে, সেই আর্টই আবার অন্যকে আনন্দ দিয়ে থাকে।

বাগান শুধু উদ্ভিদ নিয়ে নয়, প্রাণীকেও নিয়ে– পাখি, প্রজাপতি, ফড়িং এই সব কিছু। সেক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের গুরুত্বটি একই। বাগান প্রাণীদের জন্য একটি সমৃদ্ধ ইকোসিষ্টেম, নানা প্রজাতি মিলে সহযোগিতা প্রতিযোগিতার মধ্যে ওখানকার সম্পদে সমৃদ্ধ হয়। বাগান-আর্টিস্ট নিজেও যেন এই ইকোসিষ্টেমেরে সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান।

সাধারণ বাগানের সখও বড় কাজ, বড় আকাঙ্খা, বড় আর্টে রূপ নিতে পারে। অতীতে এমনি আর্টিস্টের খেয়াল থেকেই নতুন নতুন শাক-সব্জীর উদ্ভাবন হয়েছে যেমন একই কপিশাক উদ্ভিদ থেকে এমনি শিল্পীর হস্তক্ষেপেই উদ্ভাবিত হয়েছে বাঁধাকপি, ফুলকপি, স্প্রাউট, খোলরবি ইত্যাদি বিচিত্র সব্জী। তাঁদেরকে শিল্পী যেমন বলা যায় তেমনি বিজ্ঞানীও বলা যায়, তবে একথা

নিশ্চিত যে তাঁদের মধ্যে এই দুইয়েরই প্রেরণা একেবারেই মিলেমিশে ছিল। আজো এক একটি দেশে যে সব্জী বা যে ফলের চাষ আগে অপ্রচলিত ছিল তাকে সেখানেও জন্মানোর জন্য মানুষ একই প্রেরণা নিয়ে চেষ্টা করেন, সফলও হন। বাংলাদেশে স্ট্রবেরির চাষ করার চেষ্টা যাঁরা প্রথম করেছেন এমনই ছিল তাঁদের প্রেরণা। তবে অভিনবত্বের আর্টই হোক বা তার সঙ্গে উদ্ভাবনের প্রেরণাই হোক সবকিছুতে মিশে থাকে নান্দনিকতা এবং আনন্দ। ওই আনন্দ আছে বলেই অন্যরাও এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হোন। সখের উদ্যান রচয়িতাকে যখন কেউ দেখেন শহরের দালানের ভিড়ের মধ্যেও তিনি ছাদে সুন্দর বাগান সৃষ্টি করে আনন্দ পাচ্ছেন, তখন সে আনন্দ সংক্রমিত হয়, অনেকের মধ্যে তার অনুকরণ ঘটে। এমনকি আরো যে অনেক মানুষ সত্যি সত্যি অনুকরণ করেননা তাঁরা শুধু দেখার মাধ্যমেই আনন্দের জন্য আরো দেখতে ও জানতে চান।

বাগানকে ঘিরে যে অন্তহীন আর্টের সৃষ্টি হতে পারে তা আমি একভাবে জানতে পেরেছি বাংলাদেশে বসে অস্ট্রেলিয়ান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন এবিসির টেলিভিশন অনুষ্ঠান দেখে। ওখানে সপ্তাহে প্রায় প্রত্যেকদিন এমনি সব সাধারণ বাগান-শিল্পী নিজেদের কাজে এর এমন কোন না কোন দিকের পরিচয় দিয়ে যান যাতে দর্শককে কিছু বিখ্যাত স্থাপত্য অথবা অনবদ্য চিত্র দেখার মত একই রকম আনন্দে বিভোর করে রাখতে পারে। এমন স্থাপত্য গড়তে পারেন বা এমন চিত্র আঁকতে পারেন ক'জন? অথচ অসংখ্য মানুষ এসব বাগান সৃষ্টি উপভোগ করতে পারেন, তেমনি পারেন বাগান-শিল্পীর আর্টও।

ডিজাইন:

একেবারে ছোট ব্যক্তিগত সখে যে কারো মধ্যে যে নান্দনিক শিল্প চর্চা গড়ে উঠে থাকে তা হলো যে কোন কিছুতে নিজের সৌন্দর্যবোধ খাটিয়ে ডিজাইন করার চেষ্টা। নিজের বইয়ের বা খাতার মলাট দেয়া বা তাতে নাম লেখা থেকে শুরু করে এই ডিজাইনের প্রয়োগ ক্ষেত্র কী না হতে পারে? নিজ হাতে চিঠি লেখার রীতি যখন প্রচলিত ছিল তখন অনেকে চিঠির বক্তব্যের ওপর যতখানি মনোযোগ দিতেন, কোন কোন চিঠির আগাগোড়া অবয়বকে সাজিয়ে ডিজাইন করার ওপরেও সে রকম বা তার চেয়েও বেশি মনোযোগ দিতেন।

হাতে চিঠি লেখার অভ্যাস হারাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই চিঠির ডিজাইনের আকর্ষণটিও হারিয়েছি। যদিও কেউ কেউ কম্পিউটারেও এটি করতে ছাড়েন না। তারপর কিছুটা আরো ডিজাইন আমরা করতে চাই নিজেদের ক্লাব বা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি মনোগ্রাম, অথবা নিজের চিঠির লেটারহেডটি নিজেই করে নিয়ে। অনেকে নিজের ঘর সাজাবার জিনিসগুলো, কি নিজের পোষাকের ডিজাইনে কিছু নতুনত্ব ও সৃজনশীলতা দেখাবার সুযোগ তাঁরা নেন। আসলে সুন্দর করে নিজে কিছু করতে গিয়ে ডিজাইনের প্রতি সে ঝোঁক দেখা দেয় সেই ঝোঁকটি যে অনেকের ক্ষেত্রে কোন্ উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছতে পারে তার কোন সীমা নেই।

ভাল ডিজাইন মানে যে কোন জিনিসের দৃষ্টিগ্রাহ্যতার মধ্যে আর্টের দ্যোতনা নিয়ে আসা। অনেক ক্ষেত্রে সেটি গ্রাফিক্স, অঙ্কন, জ্যামিতিক বিন্যাস ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে। কিন্তু আরো অনেক কিছুকে এটি গড়ার বস্তু নির্বাচন, সে বস্তুর বস্তুগুণ ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগ, সলিড জ্যামিতিক গঠন ইত্যাদির ব্যবহারও কাজ করে। বস্তুগুলো ধাতব, প্লাস্টিক, বুনোনো প্রাকৃতিক আঁশ, নানা সিনথেটিক বস্তু ইত্যাদি দিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা করাটিও ডিজাইনের অংশ। জ্যামিতি, বস্তুবিদ্যা, বস্তুর তলের ওপর আলোর খেলা ইত্যাদির সঙ্গে কোন না কোন ভাবে পরিচিত না হয়ে এসব সম্ভব হয়না। বস্তু যদি টেকসই না হয়, আবহাওয়া ইত্যাদিতে শিগ্‌গির তার নান্দনিকতা হারায় তা হলেও চলবেনা। অন্যদিকে ডিজাইন শুধু সামগ্রীটির বাইরের সৌন্দর্যে নয় ব্যবহারের সৌন্দর্যেও মনোযোগী হবে।

আধুনিক কালে ডিজাইনের যে অনেকখানি কম্পিউটারের সাহায্যে অপেক্ষাকৃত সহজে করা যায় তা আবার উচ্চতর স্তরের ডিজাইন করাটিকেও সাধারণ সৌখিনদের হাতে এনে দিয়েছে, কম্পিউটার যুগের আগে যা সম্ভব হতো তার থেকেও অনেক বেশি। তবে এক্ষেত্রে রীতিমত বৈপ্লবিক ভূমিকা নিয়ে এসেছে থ্রি-ডি প্রিন্টিং, যা এখন সৌখিন যে কোন ডিজাইনারের ব্যবহারের মধ্যে চলে আসতে পেরেছে। এখানেও কম্পিউটার আসলে আর্ট-সৃষ্টিকারের কাছে কলম বা রঙ-তুলির মত একটি বাড়তি সরঞ্জাম, প্রিন্টারও তাই। মূল সৃষ্টিটি কিন্তু শিল্পীর। তবে তাঁকে এই সরঞ্জাম ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে। ডিজাইন যখন ব্যাপক ব্যবহার্য জিনিসের ওপর করা হয় তখন তার

আর্টের সঙ্গে ফ্যাশনের সম্পর্কটিও এসে পড়ে, যা কিন্তু সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। প্রচলিত ফ্যাশনের মধ্যে থেকে কারো ডিজাইন যদি অভিনবত্ব দেখাতে পারে, মানুষকে নতুন ভাবে ভাবাতে পারে তার কৃতিত্ব কিন্তু কম নয়। আবার ফ্যাশনের ওই যে পরিবর্তন করে ডিজাইন যদি সম্পূর্ণ নিয়ম ভাঙ্গা আর্ট সৃষ্টি করে নতুন ফ্যাশনের সূচনাটিও করতে পারে তা হলে তো মস্ত বড় কৃতিত্ব। আসলে আর্ট জিনিসটার বড় আকর্ষণই হলো এই সচলতা, এই নিয়ম-ভাঙ্গা চমক; সমজদার দর্শককে যা হকচকিয়ে দেয়, ভাবায়, আনন্দ দেয়।

ওই যে বলেছি ডিজাইনের সখ যে এক এক জনকে কী উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে তার সীমা নেই– এ কথার কারণ হলো অনেক কিছু আছে যার ডিজাইন ছুঁয়ে যেতে পারে অসংখ্য মানুষকে, যা অন্য বেশির ভাগ আর্ট পারেনা। ডিজাইনটি যত আটপৌরে সাধারণ জিনিসের হবে এই ছুঁয়ে যাওয়াটি তত বেশি মানুষের হবে। একটি জনপ্রিয় মোবাইল ফোনের ডিজাইনটি যিনি করেছেন লক্ষ মানুষের মধ্যে তাঁর এই আর্টটি পৌঁছে যাওয়া কোন ব্যাপারই নয়। আমরা এখানে দেখছি সবার জন্য আর্টের কথা। কিন্তু কেউ হয়তো বল্‌বেন এমনি ডিজাইনের কাজগুলো তো আজকাল খুব বড় পেশাদার কোম্পানীকে দিয়েই করা হয়ে থাকে। কিন্তু শেষ বিচারে সেখানেও এটি ওই সৌখিন ডিজাইন-পাগল মানুষটির শিল্প সৃজনশীলতার ওপরেই নির্ভর করে যিনি হয়তো ছোটবেলায় শুরু করেছিলেন তাঁর খাতার মলাটের ডিজাইন করে, তারপর আর্ট-সায়েন্সের টান তাঁকে হাউই বাজির মত তুলে নিয়ে গেছে আরো অনেক বড় সৃষ্টিতে।

সবার জন্য বিজ্ঞান

সবার জন্য আর্টসের উদাহরণগুলো দেখতে গিয়ে আমরা সেখানে বিজ্ঞানের সংযোগ দেখতে পেয়েছি- তা ফটোগ্রাফি, বাগান রচনা, ডিজাইন করা যাই হোক। কিন্তু তার জন্য কোনটিতেই বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ হবার প্রয়োজন পড়েনা, যেটি পড়ে তা হলো বিজ্ঞানে আগ্রহ ও তা নিয়ে সাধারণ জ্ঞান– অর্থাৎ কিনা সবার জন্য যে বিজ্ঞান সেটি। এরও আগে আমরা আর্টসের কিছু বড় বড় দিকের বড় বড় কাজ দেখেছি যাতে বিজ্ঞানের স্পষ্ট প্রভাব আছে তা সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য যাই হোকনা কেন। সেখানেও দেখেছি ওই বিখ্যাত

আর্টিস্টদের কারো বিজ্ঞানের কোন বিশেষজ্ঞ-জ্ঞান ছিলনা, তবে বিজ্ঞানে তাঁদের আগ্রহ ছিল এবং এ সম্পর্কে তাঁরা এতোটা খবর রাখতেন যে নিজেদের আর্টে তার প্রভাব পড়েছে, অনেক সময় হয়তো তাঁরা বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞের পরামর্শও নিয়েছেন।

বিজ্ঞানকে সবার কাছে তুলে ধরার প্রচেষ্টা বহু কাল ধরে রয়েছে বলেই আর্টে-সায়েন্সে এমন মিলন ঘটতে পেরেছে– এমন কি হাঁটি হাঁটি করে যাঁরা আর্টের জগতে এগুচ্ছেন তাঁদের ক্ষেত্রেও। এও অনেকের জন্য সখের কাজ হিসেবে শুরু হয়ে সাধনার কাজে পরিণত হয়েছে– বিজ্ঞানকে তুলে ধরার কাজ। কেউ কেউ জনপ্রিয় লেখার মাধ্যমে কাজটি করেন যার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে বিশ্বব্যাপী সমৃদ্ধ একটি বিজ্ঞান সাহিত্য। আজকাল তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে সেই সাহিত্যের শতধা শাখা-প্রশাখা। এখন বক্তৃতা বা পডকাস্টের মাধ্যমেও তার আস্বাদন করা যায়। হাতে কলমে বিজ্ঞানকে প্রদর্শনের মাধ্যমেও এমনি প্রচেষ্টা রয়েছে। এজন্য বিজ্ঞান জাদুঘর জিনিসটি দেশে দেশে আদর পেয়েছে; অনেক জায়গায় বিজ্ঞান গবেষণায় যে রকম উদ্যোগ আয়োজন করা হয় পাশাপাশি বিজ্ঞান জাদুঘরের কাজেও তা করা হয়; অনেক সময় জাদুঘরও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় যোগ দেয়। এও অনেকের ব্যক্তিগত সখের ওপর শুরু হয়ে ওই পর্যায়ে যেতে পারে- বিজ্ঞান সংক্রান্ত মডেল, নিদর্শন, ফসিল ইত্যাদি সংগ্রহের সখ থেকে শুরু করে বিজ্ঞানের নানা নীতি ও আবিস্কারকে ফুটিয়ে তোলা মডেল, এক্সপেরিমেন্ট ইত্যাদি প্রদর্শন করার সখ। এখন সেই প্রদর্শন তথ্য প্রযুক্তিতেই অনেকখানি পাওয়া যায়- যেমন ইউটিউবে, টেলিভিশনে। কম্পিউটার অ্যানিমেশন ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হস্তক্ষেপে একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞানকে আরো মনোগ্রাহী ভাবে উপস্থাপন সম্ভব হচ্ছে।

বিজ্ঞান সাহিত্য:

বিজ্ঞানের ওপর লেখালেখি এবং সেই লেখাগুলো পড়ার আগ্রহ দিন দিন সারা দুনিয়ায় বেড়েছে; আমাদের দেশেও। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে মানুষের ঔৎসুক্য বেড়েছে এতে চমকপ্রদ আবিষ্কার ও উদ্ভাবন বেড়ে যাওয়ার ফলে। সাধারণ মানুষের বিজ্ঞান-সাক্ষরতা বৃদ্ধিও এর একটি কারণ। ব্যাপারটি বোঝা যায় বিজ্ঞান গবেষণা জার্নালের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জনপ্রিয় বিজ্ঞান

সাহিত্যের পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি দেখে। আরো যা হচ্ছে অনেক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা জার্নাল নিজেই পাশাপাশি জনপ্রিয় লেখাও প্রকাশের ব্যবস্থা রাখছে দেখে; গবেষণা নিবন্ধ পড়বেন বিজ্ঞানীরা আর এই লেখাগুলো লড়বেন বিজ্ঞানোৎসাহী সবাই। তাছাড়া এমনকি জগদ্বিখ্যাত দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকার একটি বড় অংশ এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত জনপ্রিয় লেখালেখিতে ভরপূর থাকে।

লেখালেখির আরেকটি জায়গা সম্প্রতি হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে হলো। সেখানে শুধু বিজ্ঞানের ওপর সংগঠিত ‘গ্রুপ’ ‘পেইজ’ ইত্যাদির খোঁজ করলে দেখা যায় তাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। আর বেড়ে চলেছে সেগুলোর সদস্য সংখ্যা অথবা ফলো করা মানুষের সংখ্যা। অনেকগুলো গ্রুপ আবার বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখায়– যেমন মহাকাশ বিজ্ঞান, মনোবিদ্যা, জেনেটিক্স, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি। সবদিক থেকে বলা যায় কালক্রমে বিজ্ঞান সাহিত্যের বিকাশটিও বেশ দেখার মত একটি ব্যাপার, আর সেই সাহিত্যকে ধারণ করার মাধ্যমেরও বিকাশ। আমি নিজে প্রায় ছোটবেলা থেকে এর সান্নিধ্যে রয়েছি বলে আমার কাছে এই বিকাশটি খুবই আনন্দদায়ক। এক সময় সাধারণ পত্রিকায় কালেভদ্রে বিজ্ঞানের লেখা পড়তে পেরেছি, সেখান থেকেই নিজে লেখার আগ্রহ অনুভব করেছি। কলেজের ছাত্র থাকতেই নিজে বিজ্ঞানের পত্রিকা বের করেছি তা তখন এতই বিরল একটি ব্যাপার যে সব দিক থেকে উৎসাহ পেয়েছি। অবাক হয়ে দেখেছি বিদেশের বিজ্ঞান পত্রিকার সমৃদ্ধি, এমনকি কার্টুনের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিষয় সহজ করে বলতে তাদের পারদর্শিতা। বাংলাভাষী দুই দেশের লেখকরা বাংলাতেও যে বই প্রবন্ধ সম্ভার সৃষ্টি করেছেন তাও লক্ষ্য করার মত; তবে প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। কাজেই আমাদের কাজটি অনেকের নজরে এসেছে। বিজ্ঞান সাহিত্যের বড় একটি কৌশল হলো উপমা ব্যবহার করা। আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক ধারণা খুব জটিল এবং গাণিতিক। কিন্তু তাকেও যদি ওই সাধারণ পাঠকের পরিচিত খুবই বোধগম্য ঘটনার নিরিখে তুলে ধরা যায় তা হলে তাও বোঝা সম্ভব। বিজ্ঞানের বড় বড় সাহিত্যিকদেরকে এটি করতে দেখেছি জর্জ গ্যাময় বা কার্ল সাগান বা বার্ট্রান্ড রাসেলের মত বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকদেরকে, এবং নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী আবদুস সালামের মত হৃদয়গ্রাহী বিজ্ঞান বক্তাকে। নিজের মত করে নিজে যদ্দূর পেরেছি ওই কৌশল আয়ত্ব করার চেষ্টা করেছি শুরু

থেকেই লেখার ক্ষেত্রে এবং বলার ক্ষেত্রে। মনে হয়েছে সঠিক উপমা খুঁজে পেলে বিজ্ঞানকে সবার কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করা যায়।

আর ওই যে প্রযুক্তি ও তথ্য প্রযুক্তির সহায়তা নেয়ার সুযোগ সেটিও এক ভাবে আমার মিলে গিয়েছিলো টেলিভিশনের কল্যাণে। লেখার মাধ্যমে যতটুকু না পৌঁছানো গেছে টেলিভিশনে অনেক বেশি সফল ভাবে সেটি করা গেছে। শেষ পর্যন্ত যখন সামাজিক মাধ্যমের দিকে পাল্লা ভারী হয়েছে; বিশেষ করে এ তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে কথোপকনে– তখন সেখানে যোগ দিয়ে ফেলা ছাড়া উপায় ছিলনা। কাজেই ওই লেখালেখি, বক্তৃতা ইত্যাদিকে পুঁজি করে এখানেই একটি পেইজে ওদের সঙ্গে নিয়মিত কথোপকথনের একটি ব্যবস্থা করে নিতে হয়েছে। সেটি বিশ্বময় যে কথোপকথন চল্‌ছে তারই অতি ক্ষুদ্র অংশ। ছোট্ট আশা হলো আমি যে ভাবে, যে উপমা দিয়ে বইয়ে যে কথাগুলো বলেছি তার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, বিজ্ঞান জগতে দৈনন্দিন যা ঘটছে সেগুলোর দিকেও।

দুনিয়াজোড়া বিজ্ঞান নিয়ে কথোপকথনের বড় জায়গা সৃষ্টি হয়েছে, অসংখ্য মানুষ তাতে অংশ নিচ্ছে। সামাজিক মাধ্যম তো নিচ্ছেই– পত্রিকা, টেলিভিশন, ইউটিউব কিছুই বাদ যাচ্ছেনা। আর এখন সব পক্ষ থেকেই কথা চল্‌ছে, শুধু এক পক্ষে নয়। এটি কোন দেশের মধ্যেও মোটেই সীমাবদ্ধ নয়, ‘সবার জন্য বিজ্ঞান’ আর কাকে বলে? তবে যারা ব্যাপারটি আগে থেকে দেখ্‌ছি তাদের মনে হবে এ নতুন কিছু নয়। বিজ্ঞানের প্রতি মানুষের আগ্রহ বরাবরই ছিল, সে আগ্রহ মেটাবার মজাদার সব উপায়ও ছিল। তখন বিশ্ব সেরা কিছুটা বিরল বিজ্ঞান সাহিত্যিকদের কেউ কেউ যা অর্জন করছিলেন তার তুলনায় এই ব্যাপক কথোপকথনের কোন কোন অংশকে কোলাহলও মনে হতে পারে। কিন্তু অনেকের যে কথোপকথন হচ্ছে তার বেশির ভাগ অতি চমৎকার হচ্ছে, তার মূল্য আরো বেশি।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী:

লেখার আর বলার আর্টে যেমন বিজ্ঞানকে বহু আগে থেকে সবার কাছে নেয়া হয়েছে, তেমনি করার আর্টেও একে হাতে কলমে দেখানোর মধ্য দিয়েও তা হয়েছে। এর জন্য দরকার হয়েছে নানা মডেলে ও প্রদর্শনযোগ্য বিজ্ঞান কর্মে

সহজ করে বিজ্ঞানের ঘটনাগুলো তুলে ধরার। এটি বিজ্ঞান জাদুঘরে ও বিভিন্ন বিজ্ঞান-সংস্থার নিজস্ব প্রদর্শনীগুলোতে নিয়মিত করা হয়েছে– তার ইতিহাস বহুদিনের। যেমন বৃটেনের দুটি নাম করা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান রয়্যাল সোসাইটি এবং রয়্যাল ইনস্টিটিউশন একেবারে ঘটা করে নিয়মিত বিভিন্ন বিজ্ঞান এক্সপেরিমেন্ট সাধারণ দর্শকদের সামনে নিয়মিত করে আসছে শত শত বছর ধরে। আর দেশে বিদেশে বিজ্ঞান জাদুঘর, প্রাকৃতিক ইতিহাস জাদুঘর, এগুলোও বিভিন্ন নামে সর্বসাধারণের আনন্দের ও কৌতুহল মেটাবার খোরাক যুগিয়ে গেছে তাও শত শত বছর ধরেই।

এর আরেকটি দিক হচ্ছে শুধু প্রদর্শনী দেখে আনন্দ না পেয়ে নিজেরাই প্রদর্শনীর আয়োজন করার। দেশে দেশে এটি করে গেছেন নাগরিক বিজ্ঞানী নামে পরিচিত সৌখিন ভাবে বিজ্ঞানের কাজ করা মানুষরা। বিশেষ করে প্রকৃতির অনুসন্ধানে ছোটার ব্যাপারে তাঁদের জুড়ি নেই। অনেক বড় বড় প্রাকৃতিক রহস্য উদ্ঘাটন, ফসিলের সন্ধান ইত্যাদি তাঁদের দিয়েই সম্ভব হয়েছে। এরকম কাজে স্কুল-কলেজের ছাত্র ছাত্রীদেরকেও বরাবর উৎসাহিত করা হয়েছে। এ কারণে আমাদের দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখন বার্ষিক বিজ্ঞান প্রদর্শনী নিয়মিত ব্যাপার। কোন কোন ক্ষেত্রে এ রকম প্রদর্শনীর পেছনে ওই ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি থাকে কিছুটা নিজস্ব গবেষণার আকারে- যাতে তারা সেই গবেষণার ফলাফলগুলো প্রদর্শনীতে ধরতে পারে। বিজ্ঞান ক্লাবের মত সংগঠনগুলো এরকম গবেষণাকে উৎসাহিত করে। তবে আনুষ্ঠানিক পরীক্ষার জন্য লেখাপড়ার চাপে এমন গবেষণার রীতিটি আমাদের দেশে কিছুটা কমে গেছে বলেই মনে হয়।

এই ক্ষেত্রেও অন্তত নিজের পারিপার্শ্বিকতায় পুরো ব্যাপারটির চড়াই উৎরাইয়ের সঙ্গে আমার একটি সম্পর্ক ছিল। স্কুল জীবনে নিজে নিজে সহজ যন্ত্রপাতি বানিয়ে বিজ্ঞানের নানা জিনিস ভাইবোন ও বন্ধুবান্ধবদেরকে বাড়িতেই দেখাবার একটি অভ্যাস ছিল– ঘটা করে এর একটি নামও দিয়েছিলাম 'ল্যাবোরেটরি' বলে। এই প্রদর্শনীকে বাড়ি থেকে স্কুলে নিয়ে গিয়ে সেখানে সাহস করে একক প্রদর্শনী করার উদ্যোগ নিয়েছিলাম। অনেক দর্শকের সামনে সেগুলো দেখাবার সময় পরিবেশনায় একটি 'আর্ট' আনার দিকেই মনোযোগ প্রায় স্বয়ংক্রিয় ভাবেই এসেছে। আর্ট-সায়েন্সের পার্থক্য যে

খুব বুঝতাম তা নয়, কিন্তু পরিবেশন যে মনোগ্রাহী হতে হবে তা ঠিকই বুঝেছি। এরপর একটি সময়ে এসেছে আমাদের বিজ্ঞান পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত দেশব্যাপী বিজ্ঞান ক্লাব 'অনুসন্ধানী' সংগঠনের পর্যায়। তারপর একই বিষয়ে রীতিমত একটি এনজিও বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র। এর সবগুলো পর্যায় যে কতখানি আনন্দের খোরাক হতে পারে তার থেকে বুঝেছি করার আর্ট দিয়ে বিজ্ঞানের মর্ম।

দেশে দেশে বিজ্ঞানকে মানুষের কাছে নিয়ে যাবার এই প্রচেষ্টাতেও ধীরে ধীরে বিবর্তন এসেছে। বিজ্ঞান প্রদর্শনের কাজগুলোতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে, নিজেরা হাতে কলমে করার বদলে বা সেই করাকে সরাসরি দেখবার বদলে সফ্টওয়্যারের সাহায্যে কম্পিউটারের স্ক্রীনে তার কাজ সেরে ফেলাটাই এখন অনেককে বেশি আনন্দ দেয়। এতে কাজ সহজ হয়, বোঝার কোন ত্রুটি হয়তো হয়না কিন্তু সরাসরি সশরীরে যোগাযোগটি ঘটেনা। এর বিপরীতে কোন কোন দেশে তরুণ তরুণীদের মধ্যে ওই নাগরিক বিজ্ঞানী আন্দোলনটি জোরদার হচ্ছে। ওদের অনেকেই প্রয়োজনে স্কুল কলেজ থেকে অবকাশ নিয়ে সত্যিকার জীবনের বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত হচ্ছে, ওরা যখন বিজ্ঞান জাদুঘরে যাচ্ছে তখন শুধু দেখতে যাচ্ছেনা, করতেও যাচ্ছে; সে কারণে জাদুঘরগুলোকে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হয়েছে তাদের কাজে সেখানে ওরা আর শুধু দর্শক নয় বরং অংশগ্রহণকারী– রীতিমত গবেষণা করতে পারে এখানে। পরিবেশ অবক্ষয়, জলবায়ু পরিবর্তন বা জীববৈচিত্র ধ্বংসের মত আসন্ন বিপর্যয়গুলোর ওপর ওরা কাজও করছে, আন্দোলনও করছে।

সরজমিনে হাতে কলমে যাঁরা এভাবে গবেষণা করছেন, তাঁদের কাজের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান গবেষণার যোগসূত্র কম। প্রাতিষ্ঠানিক বিজ্ঞান গবেষণার অনেকখানি সরকার বা বড় কোম্পানীদের অর্থে পরিচালিত হয় বলে নানা উদ্যোগের নেতিবাচক অনেক ফলশ্রুতি সেখানে সাধারণত ধরা পড়েনা। নাগরিক বিজ্ঞানীরা এই দিকগুলো উন্মোচনের চেষ্টা করেন এবং এগুলো প্রদর্শনের মাধ্যমে সবার কাছে তুলে ধরেন। এই তুলে ধরার কাজটি বিজ্ঞানের উপাত্তের ওপর নির্ভর করলেও সাফল্যের জন্য এর প্রদর্শনের আর্টটিও খুবই গুরুত্ব বহন করে। যেমন আমাজন বনকে বলা হচ্ছে যে

বাতাস থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে নিয়ে গ্রীন হাউজ গ্যাস ক্রিয়া কমাবার একটি প্রধান অবলম্বন। এজন্য আমাজন বনের বিনষ্ট অংশে নতুন কিছু গাছ লাগিয়েই কর্তৃপক্ষ দেখাতে চান যে আমাজনের এই ইতিবাচক ভূমিকা বজায় রাখা যাবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনকে রোধ করা যাবে। কিন্তু অন্য এই গবেষণা আমাজনের বিভিন্ন অঞ্চলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘনত্ব মেপে দেখিয়েছেন আমাজন যতটা না এই গ্যাস শোষণ করছে, তার থেকে বেশি নির্গত করছে, যেখানে বন মোটামুটি অক্ষত আছে সেখানকার অবস্থাও এর থেকে খুব ভিন্ন নয়। ফলাফলগুলো বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সবার সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে এই নাগরিক বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিবর্তনে আরো প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের দাবি করছেন।

বিজ্ঞান চিত্রণ:

স্কুলে জীব বিজ্ঞানের, স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের অথবা ভূগোলের ক্লাসে কিছু না কিছু বিজ্ঞান চিত্রণ সব ছাত্রছাত্রীকেই করতে হয়েছে। হয়তো আঁকতে হয়েছে একটি ফুলের বিভিন্ন অংশের ছবি, হয়তো একটি ব্যাঙের পরিপাক তন্ত্র কিংবা পৃথিবীর প্রধান অক্ষ রেখাগুলো দেখিয়ে ছবি অনেকে একটি বাধ্যতামূলক কাজ হিসেবে করলেও অন্য বহুজনের কাছে এটি প্রথমে আনন্দের কাজ এবং তারপর সৃজনশীল একটি আর্টে পরিণত হয় যার মায়া কেউ কেউ জীবনভরও ছাড়তে পারেনা। এই আর্টের প্রশ্নটি আসে এর বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটিগুলোকে কতটা জীবন্ত ও মনোগ্রাহী করে তুলতে পারে সেখানে। অনুবীক্ষণের ভেতর দিয়ে যা দেখা যায় তাকে আঁকা, যেমন ক্ষুদ্র জীবাণুর বিভিন্ন পরিস্থিতির ছবি আঁকা ইত্যাদি যখন সামনে আসে বিজ্ঞান ও আর্ট তখন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। কম্পিউটারের ব্যাপক ব্যবহার এসে বিজ্ঞান চিত্রণের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিবর্তন করেছে। শুধু জীব বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের সব ক্ষেত্রে সায়েন্টিফিক ইলাস্ট্রেশনের বিষয়টি একটি বড় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটি এখন বিজ্ঞান গবেষণার একটি প্রয়োজনীয় অঙ্গও বটে, সেখানে থেকে নানা রকম বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তেও পৌঁছানো সম্ভব হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বায়োফিজিক্সের ওপর গবেষণা করেছেন এমন একজন বিজ্ঞানীকে কী ভাবে তাঁর উপাত্তগুলোকে বিশ্লেষণের জন্য বিজ্ঞান চিত্রণের ওপর নির্ভর করতে হতে পারে তা দেখা যাক। বায়োফিজিক্সে জীবের জৈবিক

প্রক্রিয়াগুলোকে বুঝতে তার ভেতর যে নানা ভৌত বা যান্ত্রিক বিষয় রয়েছে সেগুলোকে পদার্থবিদ্যার আধুনিক সব তত্ত্বের প্রয়োগে বিশ্লেষণ করা হয়। এখানে বিশ্লেষণটিকে অনেক প্রাঞ্জল করে তোলে বৈজ্ঞানিক চিত্রণ। এতে যেখানে যান্ত্রিক বিক্রিয়াগুলো, বলের প্রয়োগ, শক্তির আদান প্রদান এসবকে জৈবিক ঘটনাগুলোর সঙ্গে একই জায়গায় উপস্থাপিত করা হয়। চিত্রণের দিকটি যাঁর হাতে থাকে তাঁকে একই সঙ্গে জৈবিক ঘটনাগুলোর সংবেদনশীলতাকে যেমন বুঝতে হয় তেমনি পদার্থবিদ্যার তত্ত্ব ও ফরমুলাগুলো সম্পূর্ণ আয়ত্বে রাখতে হয়। আর সেখানেই শেষ নয়– এ পর্যন্ত যা জ্ঞান এসব বিষয়ে আছে তাই যথেষ্ট নয়; গবেষণা সীমান্তে কী ঘটছে তাও তাঁকে মাথায় রাখতে হয়। কারণ গবেষণার অংশ হিসেবেই এই চিত্রণের দরকার হয়েছে।

অথচ বিজ্ঞান চিত্রনের মূল প্রেরণাটি কিন্তু আসে ছবি আঁকা থেকে, একটি ছবির কী রকম আলো-ছায়া আমাদের অনুভূতিকে কিভাবে নাড়া দেয় তার থেকে, হাজার হলেও কাজটি কিন্তু আর্টের। এটি আর যাই হোক যান্ত্রিক ভাবে ড্রাফ্টসম্যানের করা বাড়ির কোন নকশার ব্যাপার নয়, বহুরকম গতি ও জৈব প্রক্রিয়ার ক্রিয়া-বিক্রিয়াকে নিখুঁত ও জীবন্ত ভাবে ধারন করার ব্যাপার যার জন্য শিল্পবোধটি খুবই প্রয়োজন। আর ওই বোধের সৃষ্টিটি হয়তো হয়েছিলো ছোট বেলার আনন্দের কাজ থেকে।

এমনি পূর্বসৃষ্ট আরেকটি প্রেরণা বিজ্ঞান চিত্রণকে অনেক দূর নিয়ে যেতে পারে অ্যানিমেশন চিত্র হিসেবে। এক টানে ছবি এঁকে কার্টুন ছবি আঁকা অনেকের ছোটবেলা থেকে আনন্দের বিষয়। সেই আনন্দকে যখন তারা কম্পিউটারে কার্টুন ছবি এঁকে তাকেই সফ্টওয়্যারের সাহায্যে চলচ্চিত্রে পরিণত করে তখন বিজ্ঞান চিত্রণের এই পর্যায়টি সৃষ্টি হতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ জৈব রসায়নে জটিল অণুগুলোর মধ্যে যে ক্রিয়া-বিক্রিয়া তার পূর্ণ ফলাফলকে শুধু ফরমুলা থেকে মাথায় ধারণ করা কঠিন হয়। তখন যদি অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রে কম্পিউটারে এর একের পর এক পর্যায়গুলো ছবির মত উন্মোচিত হতে থাকে তখন এ নিয়ে মাথা খেলানো সহজ হয়ে পড়ে। গবেষণায় এর পরবর্তী আইডিয়াটিও মাথায় খেলে যেতে পারে। কিন্তু যিনি ওই অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রটি তৈরি করেছেন তাঁকেও কি ওই ক্রিয়া-বিক্রিয়ার

কথা ভেবেই সব কিছু করতে হয়নি? অথচ এই মানুষটির মূল প্রেরণাটি এসেছিলো ছোটবেলায় কার্টুন আঁকতে গিয়ে।

ছোটবেলায় বিভিন্ন আর্টের মাধ্যমে বিজ্ঞান বা অন্য কোন জ্ঞানের সাক্ষাৎ পাওয়ার বিষয়টি শুধু এক ধরনের সুকুমার বৃত্তি দিয়ে ঘটেনা, অনেকের ক্ষেত্রে এটি ঘটে নানা রকম বই পড়ার মাধ্যমে, নানা সাহিত্যের স্বাদ থেকে তার বিজ্ঞানেও আগ্রহ জন্মে, তার চর্চাও ঘটে। কারো কারো ঝোঁক বাস্তব দেখা, বাস্তব করার দিকে বেশি। যখনই সুযোগ পাচ্ছে অনেকটা খেলাচ্ছলেই সে কাজ করছে– যেমন দুটি চুম্বক যদি পায় অমনি এদের আকর্ষণ- বিকর্ষণ নিয়ে সে খেলায় মত্ত হয়ে যায়। ওখান থেকে লক্ষ্য করে চুম্বকের নিয়মগুলো এমন ভাবে আনন্দের সঙ্গে আয়ত্ব করে যে কখনো আর ভোলেনা। এটি অন্যদের কাছে পরিবেশন করার জন্য সে নিজের থেকেই হয়তো একটি ভঙ্গি বা খেলা উদ্ভাবন করে যাকে তার সৃষ্ট একটি আর্ট না বলে উপায় নেই। ওভাবে হাতে কলমে করায় তার আনন্দ থাকার মানে এই নয় যে বই পড়ায় তার আগ্রহের কিছু কমতি আছে। উভয়টিতেই হয়তো তার দারুণ উৎসাহ। অথবা কারো কারো ক্ষেত্রে বই পড়ার থেকে এটির ওপরেই তার ঝোঁক বেশি। আবার তারই সহপাঠি আরেক জনের আনন্দ হয়তো চিত্রণে। পড়ে জানা, করে জানার পাশাপাশি সে দরকারে বেদরকারে কিছু এঁকে ফেলতে, তার নকশা করে ফেলতে বেশি ভালবাসে। ওখান থেকেই সে ভাল শিখতে পারে ব্যাপারটি আসলে কী। অনেক সময় সঙ্গে সঙ্গে আঁকতে না পারলে বইয়ের জটিল ব্যাখ্যা সে ঠিকমত বুঝতে পারেনা।

শিক্ষা সামগ্রী হিসেবে কার্টুন আঁকার কথা যদি বলি তা হলে তার কিছু ব্যবহার একেবারে হাতে নাতেই পাওয়া যায়। যেমন আজকাল কমিক বইয়ের আদলে শুধু গল্পের বই নয় বিজ্ঞানসহ শিক্ষণীয় অনেক বিষয়ের বই ওভাবেই প্রকাশিত হয়। জটিলতর বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোকে সহজ ভাবে বোঝাবার জন্য ও ভাবে কমিক বইয়ের মত করে লেখা খুবই সহায়তা দিতে পারে। এতো শুধু মানুষের কাজের বা কথোপকথনের কমিক নয়, বরং ডিএনএ অথবা আপেক্ষিক তত্ত্বের মত বিষয়ের ভেতর কোন জিনিসটির কী আচরণ হয় তাও কমিকের মজার কার্টুনে বুঝিয়ে দেয়া সহজ হয় খুব মজা করেই। যে ছাত্র-ছাত্রী শুরুতে নিজেদের জন্য যে কোন একটি বিষয়ের কমিক

সৃষ্টি করতে পারে তারা একদিন এমন বইয়ের সৃষ্টিও করতে পারবে। এমনি ভাবে চিত্রণের অন্য যে কোন আর্টের পরবর্তী অনেক উচ্চতর ব্যবহার ঘটতে পারে। বিজ্ঞানে চিত্রণের বহু রকম সম্ভাবনার মধ্যে এখানে এই একটি মাত্র বলা হলো।

নবীনের কিছু প্রজেক্ট– আর্টে-বিজ্ঞানে মিলিয়ে

নবীনরা, অথবা সাধারণ নাগরিক সৃষ্টিশীলরা যখন কিছু সৃষ্টি করতে চায়, করে আনন্দ পায়, তখন তারা সেটি কোন্ সংস্থার কোন্ ডিপার্টমেন্টের অন্তর্গত তা নিয়ে মাথা ঘামায়না- সৃষ্টির কোন ডিপার্টমেন্ট নেই। কখনো কখনো তার কাজকে এমন স্পষ্ট করে চিহ্নিত করা যায় যে এতে অনেক বিপুল অনুপাতে একটি বিজ্ঞানে কাজ হয়েছে, অথবা সঙ্গীতের কাজ, অথবা চিত্রশিল্পের কাজ ইত্যাদি। তখন ওই শেষেরগুলোকে আমরা স্পষ্ট করে আর্টই বলি। কিন্তু তার বাইরে আরো শত সৃষ্টি রয়েছে যেগুলোকে সেভাবে আটঘাট বেঁধে চিহ্নিত করা কঠিন। আজকাল এমনিতরো কাজের সংখ্যা বাড়ছে। এর কারণ মানুষের জীবনটাই আজ নানা চর্চায়, আনন্দের ও সমস্যার নানা উপাদানে একেবারেই মিশ্রিত হয়ে আছে। তার সৃষ্টিশীলতায়, উপলব্ধিতে এ মিশ্রণ থাকবে এটিই তো স্বাভাবিক। বলা যায় এটি একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভাবধারা। যাকে আগে ‘আর্ট’ কথাটি অথবা ‘মানবিক’ কথাটি দিয়ে বাক্সবন্দী করতাম এখন তা করা যাচ্ছেনা। যেদিন থেকে মানুষের জৈব অনুরণনগুলো সরাসরি বিজ্ঞানের বিশ্লেষণের মধ্যে এসেছে, এবং মস্তিষ্ক নিজেই তার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, বলা যায় সেদিন থেকেই ব্যাপারটি ঘটেছে। প্রায়শ দেখা যায় বিজ্ঞানকেই এমনকি প্রযুক্তিকেই আর্ট হতে হচ্ছে, ‘মানবিকের’ থেকেও বেশি মানবিক হতে হচ্ছে। ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে এক গাদা বৈজ্ঞানিক কাজের মধ্যে ঢুকে পড়ছি, আবার বিজ্ঞান গবেষণা পরিকল্পনা করতে গিয়ে মানবিক নৈতিকতার সীমা কোথায় টান্‌বো তা নিয়ে অন্য গবেষণা করতে হচ্ছে। তাই নিরাপদ কাজটি হবে আধুনিক কর্মজীবন থেকে নিয়ে ‘প্রজেক্ট’ শব্দটি ব্যবহার করা। আমরা শুধু ইতস্তত কিছু উদাহরণ দিতে পারি।

টেকসই বাড়িঃ

স্বাভাবিক ভাবে টেকসই কথাটিও ব্যবহার হবে আধুনিক অর্থে ওই আজকের আনন্দ আজকের সমস্যার দিকে চেয়ে। বাড়ির নির্মাণ-বস্তু শক্ত ইট পাথর একে টেকসই করবেনা- প্রকৃতির ওপর, আমাদের একটি মাত্র বিশ্বকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টার ওপর এই বাড়িটির 'পদচিহ্ন'কে কত ছোট করে তোলা যায় সেটিই টেকসই হওয়া। আমরা যে বলি পিঁপড়াও যেন টের না পায় সে রকম প্রকৃতির কোন অংশ যেন টের না পায় যে বাড়িটি আছে, তার নামই টেকসই হওয়া। নতুন বাড়ি তৈরি হয়তো নবীনের জন্য অনেক বড় প্রজেক্ট; কিন্তু তেমনি নতুন বাড়ির কথা ভেবে পুরানোটাকেই যদি যথাসম্ভব সেই ভাবনার নতুন বাড়ির মত করে নেয়া যায় তাও কম কথা নয়। কিন্তু প্রজেক্টের কথায় আইডিয়ার দিক থেকে নতুন বাড়িটির কথাই সামনে থাকা উচিত।

এমন বাড়ির প্রধান শর্ত হলো এর সব বিদ্যুৎ আসবে বাড়ির সঙ্গে লাগানো সৌর প্যানেল থেকে– একেবারেই নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ। ছাদে, দেয়ালে এবং সামনের উঠানে লাগানো এই প্যানেলগুলো প্রয়োজনীয় সব বিদ্যুৎ যেন তৈরি করতে পারে, রাতের জন্য এবং মেঘলা দিনের জন্য ব্যাটারিতে বিদ্যুৎ জমিয়েও রাখতে পারে। যদিও আমাদের দেশে খুব বেশি জায়গায় উপযুক্ত হবেনা, তবে স্থান বিশেষে উইন্ড টারবাইন বসিয়ে বায়ু-বিদ্যুৎও এতে বাড়তি যোগান দিতে পারবে। নিজের বিদ্যুৎ দিয়ে নিজে চলতে পারাটি একটি পদ্ধতি যেমন হতে পারে, তেমনি নিজের উৎপাদিত বিদ্যুৎকে সরকারি গ্রিডে দিয়ে বিনিময়ে সরকারি গ্রিড থেকে বিদ্যুৎ নেয়া যেতে পারে। যদি সেভাবে যা নিলাম তার সব দিয়ে দেয়া যায় তা হলে অন্তত বিদ্যুতের জন্য কোন পদচিহ্ন পড়লোনা।

সোলার প্যানেল লাগানো বাড়িটিকে যে বিশ্রি ভাবে প্যানেলের স্তুপ করে রাখতে হবে তা কিন্তু নয়– এখানেই আসে আর্টের প্রশ্ন; একজন স্থপতিকে নান্দনিকতার যে বিষয়গুলো দেখতে হয় এখানেও তাই। আজকাল নানা আকৃতির সৌর প্যানেল পাওয়া যায় এমনকি যেখানে লাগানো হচ্ছে তার সঙ্গে সুসমঞ্জস করা। এগুলোর ওপর ভিত্তি করে ডিজাইন করার সুযোগ আছে। সব জরুরি কাজের জন্য বিদ্যুৎ যেন পাওয়া যায় সে জন্য বিদ্যুতের চাহিদা কমানোর ব্যবস্থা থাকবে বাড়িটিতে। যেমন ঘর যেন প্রাকৃতিক

ছায়াতে গরমে ঠাণ্ডা থাকে আর রোদ লেগে শীতে গরম থাকে সেভাবে বাড়ির পরিকল্পনা করা যায়। দিনের আলো যেন যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ির সব ঘরে ঢুকতে পারে সেই ব্যবস্থাও করা যায়– যাতে দিনে বাতি জ্বালাতে না হয়। এর প্রত্যেকটি বিষয়ে বিজ্ঞানের সাহায্য তো নিতেই হবে, তাছাড়া রোদের, ছায়ার, আলোর এই ব্যবস্থাগুলো যথেষ্ট শিল্পবোধ নিয়ে করার সুযোগ আছে। প্রকৃতির কোলে একটি বাড়ি প্রকৃতির সাহায্য নিয়ে কাজ করছে এটিকে ফুটিয়ে তোলা একটি আর্টের চ্যালেঞ্জও বটে।

এ বাড়ির সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা হলেও জায়গা থাকে সেখানে বাগান রচনা করা যেতে পারে। যদি আর্টের সৃজনশীলতা দিয়ে করা যায় সে বাগান যেমন খাদ্য দেবে তেমনই নান্দনিক দৃশ্যও দেবে। বাড়ির মানুষের প্রয়োজনীয় যতটা খাবার ওখানেই করা যাবে ততখানি আর দূর থেকে আনতে হবেনা যার জন্য যানবাহন ইত্যাদির কারণে বাড়তি পদচিহ্ন রাখতে হয় পরিবেশের ওপর, হয়তো গ্রীন হাউজ গ্যাস বাড়াবার ক্ষেত্রেও। রান্নাঘরের জন্য জ্বালানিকে যদি দক্ষ ভাবে ব্যবহার করা যায় উন্নত চুলাতে, সে চুলা যদি গ্যাস, তেল, কয়লা, কাঠ ব্যবহার না করে বা খুব কম করে তা হলে নবায়নযোগ্য জ্বালানির ভেতর থাকাটা যেমন আরেকটু বেশি সার্থক হবে তেমনি রান্নাঘরকে ও পুরো বাড়িকে দূষণমুক্ত সুন্দরও রাখা যাবে। রান্নাঘরের বর্জ্যটিকে যদি বর্জ্য সংগ্রহকারী ট্রাকের জন্য জমিয়ে রেখে সেখানে দিয়ে দিই সেটি কোথায় কী ভাবে পরিবেশ নষ্ট করছে জানতেই পারবোনা। তার থেকে বাড়িতে কম্পোস্ট করে যদি বাগানে দিতে পারি সবদিক থেকেই চমৎকার– বাড়িতেই যেন সব কিছু পুনরাবর্তিত হয়ে গেলো। এটি বিজ্ঞানের যেমন ব্যাপার, তেমনি জীবনযাত্রার একটি চমৎকার আর্টও তো বটে। শক্তিকে নবায়নযোগ্য রাখছি আবার জৈব বস্তুকে নবায়নযোগ্য রাখছি।

এ বাড়ির কতগুলো নীতি থাকবে একে আরো টেকসই করার জন্য। যেমন এখানে কোন কিছু ফেলে দেয়া হবেনা সহজে। নানা সামগ্রী ও আসবাব পত্র যতদিন সম্ভব মেরামত করে আবার ব্যবহার করা হবে। ফেলে দিলে যা হয় তা শেষ পর্যন্ত বর্জ্যে পরিণত হয়ে দূষণ বৃদ্ধি করার সম্ভাবনাই বেশি। এই যে মেরামত করে আবার ব্যবহার করা এটি যেনতেন ভাবেও করা যায়, আবার এই কাজটিকে একটি আর্টে পরিণত করা যায়। এই আর্টের হাত ধরেই তো

পুরানো আসবাবপত্র অ্যান্টিকে পরিণত হয়ে তার মূল্য বরং অনেক বেড়ে যায়। তবে খুব সাধারণ আসবাবের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শিল্পবোধ ও সহজ প্রযুক্তি ব্যবহার করে চমৎকার ভাবে তাকে সুন্দর রেখে দীর্ঘজীবী করা যায়।

এ বাড়ির আনাচে কানাচে যেখানে সম্ভব জীববৈচিত্রকে প্রশ্রয় দেয়া হবে। নানা উদ্ভিদে সমৃদ্ধ হতে পারে সবটুকু জায়গা– যেমন সেগুলোই ব্যবহৃত হতে পারে বাড়ির কিনারা সীমানা হিসেবে। তার ফাঁকে ফাঁকে ফড়িং, প্রজাপতি, পাখি যতটা পারা যায় যেন আশ্রয় নিতে পারে তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দেয়া যায়। সাধারণ ভাবে স্থাপত্যের যে আর্ট তাতে এমন জৈব পরিবেশ ঘটানোকে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়। এখানে সেই আর্টের সঙ্গে যোগ ঘটবে জীববৈচিত্র রক্ষাটিও, যেটি টেকসই হবার পথে একটি বড় পদক্ষেপ।

স্থানীয় ইতিহাসের উপাদানঃ

ইতিহাস আমরা জানতে পছন্দ করি; কেমন করে সেই ইতিহাস খুঁজে পেলাম তার সেই উপাদানগুলো দলিল, নিদর্শন ইত্যাদি হিসেবে দেখতে পারলে ও বুঝতে পারলে আনন্দটি আরো বেড়ে যায়। কিন্তু ধরা যাক ওরকম কোন উপাদান আমি নিজেই খুঁজে পেয়েছি, তা হলে আনন্দটি কোথায় গিয়ে পৌঁছবে তার কি সীমা আছে? অথচ যদি ইতিহাসের উপাদান খোঁজাকে এক রকম সখ বা অভ্যাসে পরিণত করতে পারি তা হলে এটি কোন অসম্ভব কাজ নয়– কিছু না কিছু সাফল্য আসতেই পারে। এরকম সব উপাদান যে শুধু বিশেষজ্ঞরা খুঁজে বের করেছেন তা নয়, উৎসাহী সাধারণ মানুষের হাতেই তার অনেকগুলো প্রথম ধরা পড়েছে, পরে হয়তো বিশেষজ্ঞরা মনোযোগ দিয়েছেন। নবীনরা, নাগরিক ইতিহাসবিদরা, যদি ইতিহাস-উপাদান অনুসন্ধানকে রীতিমত প্রজেক্টের মত গ্রহণ করেন তা হলে সাফল্যটি নেহাৎ ঘটনাচক্রে নয় সক্রিয় অনুসন্ধানেই আসতে পারে।

ইতিহাসকে আমরা একটি মানবিক বিষয় হিসেবে নিয়ে থাকি, মনে করি এর উদ্ঘাটন একটি আর্ট। কিন্তু সেটি পুরোপুরি বলা যাচ্ছেনা অন্তত আজকের ইতিহাস গবেষণার দিক থেকে। উপাদানগুলোও তাই শুধু আগের লেখা বই, বর্ণনা, চিঠি ইত্যাদি নয়– বরং জীবন যেমন বিচিত্র ওগুলোও সেরকমই বিচিত্র। যেমন মনে করি একটি জায়গা এখন খুবই ব্যস্ত ও উন্নত–

নানা কল কারখানা, উৎপাদন স্থল, ব্যবসা বাণিজ্যে মুখরিত অনেকদিন থেকে। কিন্তু চিরকাল কি এসব এখানে ছিল? শোনা যায় একশ' বছর আগেও এটি ছিল একটি গণ্ড গ্রাম– বন জঙ্গল ও কিছু চাষ ছাড়া কিছুই ছিলনা। তা হলে এই পরিবর্তন কবে কেমন করে হলো? যদি জানতে হয় এখানকার প্রবীণদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। যাঁরা পরিবর্তনের কিছুটা অন্তত তাঁদের জীবদ্দশায় হতে দেখেছেন। এখানে যে পরিত্যক্ত কিছু যন্ত্রপাতি পড়ে আছে সেগুলোর কাছে গিয়ে ভাল করে দেখতে হবে। এক সময় এই শহরেই বেশ কয়েকটি কামারের ওয়ার্কশপ ছিল সেগুলোই মেরামত ইত্যাদি করে দিতো। সেই ওয়াকর্শশপের যে চিহ্ন রয়ে গেছে তা দেখে কিছুটা বোঝা যায় তখন ঠিক কি তৈরি হতো, অনেক পুরানো মরিচা ধরা টিনের সাইনবোর্ড এখন কোন জায়গায় বেড়া হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে, দেখতে হবে সেই সাইনবোর্ডে কী লেখা আছে। এরকম একটি উপাদান যা বলছে তা আরেকটির সঙ্গে মিলিয়ে একে একে দুই করা যায় কিনা তা দেখতে হবে। এই ছোট জায়গার জন্য এমন কাজকে মামুলি মনে হতে পারে। কিন্তু ঠিক এই রকম অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েই পৃথিবীর প্রথম পুরো শিল্প বিপ্লবের ইতিহাস উদ্ঘাটিত হয়েছে, এখনো হয়ে চল্ছে। ইংল্যান্ডের উত্তরাঞ্চলে যে জায়গাগুলোতে শিল্প বিপ্লবের উন্মেষ হয়েছিলো ১৭ শতকের মাঝামাঝি, এখনো সেখানে ওই ইতিহাসের গবেষণা করা হয় এক একটি পরিত্যক্ত কারখানা, চিমনি, খনি, পড়ে থাকা রেলের লাইন ইত্যাদি অনুসন্ধান করে সেগুলোর তত্ত্ব নিয়ে। এই পুরো বিষয়ের একটি গালভরা নামও আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল আরকিওলোজি– এও এক রকম প্রত্নতত্ত্ব, শিল্প প্রত্নতত্ত্ব।

আমরা স্কুলে কলেজে পুরো রাজ্য-সাম্রাজ্য ইত্যাদির ইতিহাস সামগ্রিক ভাবেই পড়ি, সেভাবেই মনের মধ্যে তার ছবি আঁকি। কিন্তু ইতিহাসকে তৈরি হতে হয়েছে স্থানীয় ভাবে– এক একটি গ্রাম, শহর, এলাকায় কিসের পর কী হয়েছে তা জানার চেষ্টা করে। আর যে প্রজেক্টের কথা বল্লাম তা স্থানীয় ভাবে করাটাই সবার জন্য সম্ভব। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ইতিহাসের উপাদান কোথায় আছে, বল্তে হবে সব জায়গায় আছে– ওই ওপরে বলা কলকারখানা ওয়ালা শহরটির মত। তবে যেভাবে বলেছি শুধু পরিত্যক্ত মেশিন বা পুরানো কামার বাড়ির খোঁজ করলেই তা পাওয়া যাবে সেটিও নয়। যেমন অনেক পুরানো স্থানীয় খবরের কাগজে যে বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিলো

সেখান থেকেই অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে যায়। ওই বিজ্ঞাপনটিই তখন হয়ে পড়ে ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান; ৫০ বছর, ৭০ বছর পুরানো একটি পত্রিকা হাতে পাওয়া এবং তাতে বিজ্ঞাপন থাকা এটিও তো খুব সাধারণ ব্যাপার নয়। যদিও বা কখনো কারো অজান্তে নিজের সংগ্রহে ওরকম কিছু এসেও যায় তিনি হয়তো জানেনও না যে ওতে কত মূল্যবান জিনিস আছে। কাজেই নিজের আনন্দময় অভ্যাসটি গঠন করতে হবে এরকম সব দিকে নজর রাখার।

সেদিন ফেইসবুকে দেখলাম সৌখিন ফটোগ্রাফার কেউ একজন বাংলাদেশের একটি রেল ষ্টেশনে এখনো থাকা একটি অতি পুরানো ওয়েটিং রুম ঘরের ফটো দিয়েছেন। সেখানে দেয়ালে আটকানো একটি জরাজীর্ণ টিনের ওপর লম্বা একটি বিজ্ঞপ্তি লেখা আছে যাতে এক, দুই তিন করে চা পানের নানা উপকারিতার কথা লেখা আছে স্পষ্ট গোটা গোটা অক্ষরে। ঘরটির ওপর নির্মাণের বছর দেয়া আছে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। বোঝা যাচ্ছে বৃটিশ সরকার তখন ভারতে চা পানকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করছে একেবারে দেশের ছোটখাট জায়গাতেও। ওসময়ের কিছু পর উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রকাশিত 'আচার্য বাণী' নামে একটি একটি বই পুরানো বইয়ের দোকান থেকে কিনেছিলাম। এতে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের রসায়নের বিখ্যাত অধ্যাপক এবং খ্যাতনামা রসায়নবিদ ও বাঙ্গালীর শিল্প উদ্যোগের পথিকৃৎ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের কিছু বক্তৃতা রয়েছে যেগুলো তিনি বাংলাদেশে নানা মফস্বল কলেজে গিয়ে সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের সামনে দিয়েছেন। একটি বক্তৃতার বিষয়বস্তু দেখলাম 'চা পান আর দেশের সর্বনাশ'। চা পানের মত বিষয় যে সে সময় একটি বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলো এবং তার সঙ্গে বিলাতি ও স্বদেশিয়ানার যে একটি সম্পর্ক থাকতে পারে সেটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের দিকে নির্দেশ করে বৈ কি। অথচ ইতিহাসের এই উপাদানগুলো অনায়াসে মানুষ ভুলে থাকতে পারে– কিন্তু উপাদানের খোঁজে থাকা নাগরিক ইতিহাসবিদ সেভাবে ভুলে থাকবেননা।

ইতিহাস যে শুধু রাজা বাদশাহদের হয়না শহরের কামার কিংবা ষ্টেশনের চা ওয়ালাকে নিয়েও হয় সে তো ওপরে দেখতেই পেলাম। ওর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অভ্যাসের ইতিহাস যেমন দেখলাম সে রকম

মানুষের জীবনের আরো অনেক দিকের ইতিহাস-উপাদান খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। নানা ছোট ছোট স্থানের ইতিহাস যেমন রাজ্য-সাম্রাজ্যের ইতিহাস গড়ে তোলে তেমনি জীবনের এক একটি দিকের ইতিহাসগুলোকে জুড়ে মানুষের পুরো জীবনের ইতিহাস গড়ে ওঠেছে। আর্টের ইতিহাস, বিজ্ঞানের ইতিহাস সে রকমই এক একটি দিক তারও ছোট ছোট উপাদান। যেমন এক সময় কোন প্রক্রিয়া খুবই সচল ছিল, যার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম, হঠাৎ একদিন টের পাই যে ওটি ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। এমন একটি উদাহরণ নেয়া যাক। দেশের নানা ছোট ছোট শহরে ঐতিহ্যবাহী সব কলেজ আজো রয়েছে। এর কোন কোনটিতে শহরটি এক সময় খুবই ছোট ছিল কিন্তু কলেজের নাম পুরো দেশে ছড়ানো ছিল। তার প্রত্যেকটিতে কলেজের গর্ব করার মত সুন্দর ভবনগুলোর মাঝে কোথাও এক জায়গায় থাকতো কয়লা থেকে কোল গ্যাস তৈরির ব্যবস্থা– লোহা লক্কড়, গ্যাস ট্যাংক, তার উপরের অংশ টেনে তোলার কপিকল ইত্যাদি সব নিয়ে চোখ কাড়ার মত একটি ব্যবস্থা। সায়েন্সের ছাত্র হোক, আর্টসের ছাত্র হোক কলেজের ছাত্র-ছাত্রীর সবাইকে তা লক্ষ্য করতে হতো, তার দৃশ্যের জন্য। এখন এরকম একটি কলেজে গেলে দেখবো পুরানো সুন্দর অনেক কিছুই আছে, আজো ব্যবহৃত হচ্ছে কিন্তু কোল গ্যাস ব্যবস্থাটি এখন একটি ধ্বংসাবশেষের মত পড়ে আছে। এমন জবড়জঙ্গ জিনিস যে অব্যবহৃত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও সেটি ওভাবেই আছে। এটি মনে করিয়ে দিচ্ছে আমাদের দেশে প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কার আর তার ফলে প্রযুক্তির কিছু কিছু অংশে বিরাট পরিবর্তনের কথা। এসব কলেজের একটিতে গিয়ে পুরানো কোন গ্যাস প্লান্টের কাছে দাঁড়ালে যে ছাত্র-ছাত্রীরা এখন প্রবীণ তাঁদের অনেক কথাই মনে পড়বে।

অনেকেই ইতিহাসের উপাদানকে ইতিহাসের কথা মনে রেখে হয়তো লক্ষ্য করেননা বা রেখে যাননা। যেমন কবি শামসুর রহমান তা রেখে গেছে সাহিত্য হিসেবে– তাও রীতিমত প্রযুক্তির ইতিহাস। তিনি চিরকাল পুরানো ঢাকার মাহুতটুলিতে থেকেছেন। ছোটবেলায় তিনি দেখেছেন চামড়ার মশকে পানি ভরে 'ভিস্তি' (পানি সরবরাহক) বাড়িতে বাড়িতে পানি সরবরাহ করতেন, যার চমৎকার বর্ণনা তিনি তাঁর বইয়ে দিয়েছেন– ওই বিশাল কালো মশকটি ভিস্তির শরীরে এমন ভাবে জড়িয়ে থাকতো তাঁর কাছে মনে হতো ওটি যেন তাঁর শরীর থেকেই গজিয়েছে। কিন্তু একদিন মাহুতটুলির মোড়ে

পানির কল বসলো; এরপর ভিস্তিকে আর দেখা যায়নি। একইভাবে তিনি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন একজন বাতিওয়ালা কী ভাবে একটি মই কাঁধে নিয়ে আসে মোড়ের ল্যাম্পপোস্টের তেলের বাতিটি জ্বালিয়ে দিয়ে যেতেন প্রতি সন্ধ্যা। একদিন শহরের এ অংশে বিদ্যুৎ এলে বাতিওয়ালাও আর আসেনি। আমরা তাঁর লেখায় এসবকে কী হিসেবে দেখবো– সাহিত্য রস, কলমের মাধ্যমে চিত্রণ আর্ট, প্রযুক্তির ইতিহাসের উপাদান, না এক সঙ্গে সব কিছু।

আজকাল ড্রোনের ব্যবহার অনেকের হাতের কাছে চলে এসেছে। অপেক্ষাকৃত নিচু দিয়ে উড়ে যাওয়া ছোট ড্রোনের ক্যামেরায় পরিবেশের পরিবর্তনের অনেক কিছু খুব সহজে ধরা পড়ছে– আমাদের তরুণ-তরুণীরা সখ করে নিজেদের এলাকায় এটি করেছেন এমন উদাহরণ ইন্টারনেটে দেখেছি– কীভাবে বন উজার হচ্ছে, রাস্তার দুপাশে কী ভাবে বদলে গেছে ইত্যাদি। দুর্গম বিরান জায়গায় কারো চোখে পড়েনি এমন কিছু প্রথমে ড্রোনের কাছে ধরা পড়তে পারে। এই সবগুলো উপায়ের ক্ষেত্রে কাছাকাছি সময়ের ইতিহাসের কথা বেশি বল্‌ছি কারণ এর উপাদান নাগরিক ইতিহাস অনুসন্ধানীর কাছে সহজলভ্য। তবে স্থানীয় ইতিহাসের আরো পুরানো, এমনকি রীতিমত প্রাচীন উপাদানও যে পাওয়া যাবেনা এমন নয়। এসবের ক্ষেত্রে অবশ্য দৈবক্রমে পাওয়া যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি; তা হতে পারে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন– মাটি খোঁড়ায়, পানির তলায় হঠাৎ করে পাওয়া যেতে পারে। অথবা অনেক প্রাচীন বই, দলিল, পত্রিকার ভিড় থেকে ব্যতিক্রমী কিছু বের হয়ে আসতে পারে। তবে সেজন্য সব কিছু পড়ে দেখার অভ্যাস থাকতে হবে। লেখাজোকার লিপি যুগে যুগে রূপ পরিবর্তন করে– পুরানো দালান, মসজিদ, কবর ইত্যাদিতে যদি নতুন কোন লিপি চোখে পড়ে তাকে প্রাথমিক সনাক্ত করার জন্যও এগুলোর সঙ্গে পরিচিতি গড়ে তুলতে হয়। আর যে প্রাণী এখন এই স্থানে বা কাছাকাছি নেই তার কোন ফসিল পেয়ে গেলে তাকেও চিনতে পারার ক্ষমতাটিও গড়ে তুলতে পারলে প্রাণী-ইতিহাসের দিক থেকেও যথেষ্ট অতীতের উপাদান পাওয়া যেতে পারে। খুব পরিচিত প্রাণীর না হলে, অথবা খুবই উৎসাহী অনুসন্ধানী না হলে ফসিল চেনার মত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা নাও থাকতে পারে। কিন্তু পাথরের ওপর কোন পাতার বা গাছের ছাপ, মাছের ছাপ দেখে তা যে ফসিল সেটি অন্তত বোঝা যায়। আসলে উদ্ভিদ-প্রাণী সংক্রান্ত উপাদান অন্য ভাবেও আসতে পারে– স্থানীয় প্রবীণ মানুষরা কী

দেখেছেন, কী উপভোগ করেছেন, এমনকি কী খেয়েছেন সেই গল্প থেকেও তা আসতে পারে; তাঁদের আগের অবস্থা নিয়ে তাঁরা কী শুনেছেন যেখান থেকেও। একটি সময়ে আলু জিনিসটিও যে শুধু শীতের সব্জী হিসেবে খাওয়া হতো এ সাম্প্রতিক কথাটিও কি সবাই জানে? তারও বহু আগে এটি যে আদৌ পাওয়া যেতো না সে কথাও– যে কারণে তার নাম বিলাতি আলু।

আর্টে আর্টে বিজ্ঞান ওয়ার্কশপ:
মনে করি কিছু মানুষের আলোচনা সভায় মিলিত হয়ে কাজ করার জন্য একটি ওয়ার্কশপ বসেছে, যাঁরা এতে আছেন সবাই কোন না কোন আর্টে আগ্রহী এবং তার চর্চা করেন– তাতে অবদানও রেখছেন কিছু কিছু। সেই সঙ্গে আছেন কয়েকজন বিজ্ঞানী। তাঁরা সবাই মিলে বিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় আলোচনা করছেন, অনেকটা সবার জন্য বিজ্ঞানের পর্যায়ে। আলোচনা ও এক সঙ্গে কাজের ফলে যখন তাঁরা সবই এক একটা বিজ্ঞান-বিষয়কে মোটামুটি বুঝে উঠেছেন, একে উপভোগ করতে পারছেন, এর সম্পর্কে প্রশ্ন-উত্তরে যোগ দিতে পারছেন, তখন ওটিকেই নিজ নিজ আর্টের রূপে প্রকাশ করার একটি চেষ্টা গ্রহণ করেন। কেউ ওটিকে কবিতায় প্রকাশের চেষ্টা করেন। ধরা যাক আলোচনার বিষয় ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞানের নতুন কিছু– সাম্প্রতিক স্পেস টেলিস্কোপটি কেমন কাজ করছে তা। ওটি মহাবিশ্বের একেবারে কিনারার যে ছবি তুলে পাঠাচ্ছে, সেখানে আমাদের কাছে আলো এসে পৌঁছতে পৌঁছতে কী ঘট্‌ছে তাই নিয়ে কবিতা। কেউ কার্টুন এঁকে দেখাবার বোঝাবার চেষ্টা করলেন এটি। কেউ এটি নিয়ে একটি গান লিখে তাতে সুর দিলেন। কেউ হয়তো একটি সায়েন্স ফিকশনই লিখে ফেললেন এই টেলিস্কোপকে কেন্দ্র করে। কেউ হয়তো একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করেছে। বড় কথা হলো সবার চেষ্টা থাকবে তাঁর আর্টের মাধ্যমে যে বিজ্ঞানটি প্রকাশিত হয়েছে সেটি অন্যদের কাছে কিছুটা নতুন দ্যোতনায় দেখা দিতে পারে কিনা। আর্টের নতুন দৃষ্টিভঙ্গিটি, অভিনবত্বটি যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। এতে বিজ্ঞান বদলে যাবেনা, কিন্তু বিজ্ঞানকে উপলব্ধি করার ভঙ্গিটি বদলাবে। যেই বিজ্ঞান হয়তো অনেকটা যান্ত্রিক ভাবেই অনুসরণ করে গেছি, তার ভেতর তখন অন্য সব আনন্দের মাত্রা খুঁজে পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়, ওই বিভিন্ন আর্টের মাধ্যমে তার প্রকাশ ঘটাতে। তাছাড়া এক আর্টকে অন্য

আর্টের পাশে রেখে দেখার সুযোগও এখানে ঘটে– মাঝখানে বিজ্ঞান থাকে একটি নিশ্চিত, নিখুঁত, বিশেষ বিষয় হিসেবে। পরে সবাই মিলে বিবেচনাও করতে পারে কী রকম আর্ট এই বিশেষ বিজ্ঞান-বিষয়টির জন্য সব থেকে বেশি গভীর উপলব্ধি নিয়ে আসতে পারছে।

এই ওয়ার্কশপ থেকে আরেকটি জিনিস সৃষ্টি করা যেতে পারে যাকে বলা যায় বিজ্ঞান-দেয়াল। এ যেন স্কুলের দেয়াল পত্রিকা প্রদর্শনীর মতো, অনেক বড় দেয়ালে সব সাজানো– বিজ্ঞানের এক একটি একটি বিষয় নিয়ে কয়েকটি আর্টে প্রকাশ করে তা ওই দেয়ালে সাঁটা। ওই যে কবিতা, সায়েন্স ফিকশন, চিত্রণ, কার্টুন ইত্যাদি তো দেয়াল পত্রিকার প্রদর্শনীর মতই লাগানো যায় ওই দেয়ালে। গান, মিউজিক অডিয়ো বা ভিডিয়ো চালাবার ব্যবস্থা রাখলে ওই সব ফরমেও আর্টের মাধ্যমে ওয়ার্কশপের বিশাল বিষয়টিকে দেখার-শোনার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কোন ক্ষেত্রে ভাস্কর্যের মত কিছু গড়ে তুল্‌লে তাও দেয়ালের সঙ্গে যুক্ত করা যায়।

এই বিজ্ঞান-দেয়ালের সুবিধা হলো ওয়ার্কশপে যাঁরা আছেন তাঁরা বার বার প্রয়োজনে তাঁদের সৃষ্ট আর্টটিতে ফেরৎ যেতে পারবেন, এর ওপর আলোচনা করতে পারবেন; একে আরো সমৃদ্ধ করতে পারবেন। আর ওয়ার্কশপে যাঁরা নেই এমন আগ্রহী সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন এসব উপভোগ করার জন্য। তাছাড়া এ নিয়ে তাঁদের মতামত, আলোচনা সমালোচনা শোনারো সুযোগ হয়।

বিজ্ঞানের ক্যানভাসটি, এমনকি জনপ্রিয় এবং জরুরী বিজ্ঞান বিষয়গুলোর ক্যানভাসটি এতো বড় যে সবাই মিলে এর ওপর কাজ করতে পারেন, এক একটি বিষয়কে আলোচনায় আনতে পারলে এমনিতেই দিগন্তটি অনেক বিস্তৃত হয়। সেটি করতে গিয়ে নিজের আর্টের সৃজনশীলতাকেও এভাবে কাজে লাগাতে যদি পারি তা হলে অল্প পরিসর থেকে অনেক বড় পরিসর পর্যন্ত সব রকম অসংখ্য সম্ভাবনা সৃষ্টি হতে পারে।

থ্রি-ডি প্রিন্ট দিয়ে বিজ্ঞান ভাস্কর্য:

আমাদের দেশে এখনো সবার জন্য থ্রি ডি প্রিন্ট চালু হয়নি, যা অন্যত্র হয়েছে; শিগ্‌গির নিশ্চয়ই হবে। এতে কম্পিউটারে যেই ডিজাইন আছে তার ত্রিমাত্রিক বাস্তবায়ন ঘটানো হয়, ঠিক যে ভাবে কাগজের ওপর মুদ্রিত করে সাধারণ

প্রিন্টার ডিজাইনের দ্বিমাত্রিক বাস্তবায়ন ঘটায়। এতে প্রিন্ট করার সময় ছিদ্রপথে নরম প্লাস্টিক জাতীয় জিনিস বেরিয়ে আসে। যেই জিনিসটির ডিজাইন কম্পিউটারে আছে ওই নরম প্লাস্টিক সেই জিনিসটির অবয়বে সব কিছু তৈরি করে ফেলে– যেমন একটি চেয়ারের ডিজাইন থাকলে একটি চেয়ার তৈরি হয়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিক শক্ত কঠিন হয়ে গিয়ে এটি স্থায়ী জিনিসে পরিণত হয়। কম্পিউটারে ডিজাইন করতে পারেন এরকম যে কেউ তাঁর ডিজাইনকে বাস্তব রূপ দিতে পারেন এভাবে। এটি ঘরের বা অফিসের ছোট খাট কাজের জিনিস তৈরি করে নেবার জন্য যেমন হতে পারে, তেমনি কোন আর্ট-বস্তুও হতে পারে। নিজের শিল্পবোধ থেকে কোন ছোট আকারের ভাস্কর্যের ডিজাইন করে তাকে মূর্তিমান রূপে এত সহজে পাওয়ার সুযোগ ভাস্কর্য চর্চাকে বহু গুণে বাড়িয়ে দিতে পারে।

এমনি ডিজাইন হতে পারে বিজ্ঞান নিয়েও। বিজ্ঞানকে বোঝার সুবিধার জন্য, এর শিক্ষা-সামগ্রী তৈরির জন্য বিভিন্ন রকম মডেল এভাবে তৈরি করা যেতে পারে। তা করার সময় নান্দনিকতা এবং আর্টের দিক থেকে বক্তব্যটি যদি যোগ করা যায় তা হলো তো কোন কথাই নেই। উদাহরণ স্বরূপ একটি জীবকোষ একটি রহস্যময় জায়গা। জীবের যত জৈব প্রক্রিয়া সবই এই একটি কোষেও ঘট্ছে– এ নিয়ে অনেক কিছু আমরা জানি, কিন্তু জানার প্রক্রিয়া শেষ হয়নি। এই জীবকোষই হতে পারে কোন বিজ্ঞান-ভাস্করের আর্টের একটি উপজীব্য। এর নানা অংশ নানা রঙে, এর ভেতর-বাহির, এর বিভিন্ন কাজের অংশগুলোর অত্যন্ত জরুরি সব বিক্রিয়া তুলে ধরেও পরিবেশনার সৃজনশীলতার পরিচয় দেবার প্রচুর সুযোগ আছে। একই মডেলে সব কিছু থাকতে হবে এমন কোন কথা নেই– ঠিক যেই জিনিসটিকে নিয়ে ভাবাতে চাচ্ছি, যা উপভোগের জন্য দিতে চাচ্ছি শুধু সেইটুকু নিয়েই তৈরি হতে পারে থ্রি-ডি মডেল– হয়তো মজার, হয়তো রহস্যময়, হয়তো সূক্ষ্ম অনুভূতি সৃষ্টিকারী ভাস্কর্য।

বিজ্ঞান পথ-নাটক:

বিজ্ঞানকে একেবারে সরাসরি সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার একটি জমজমাট আর্ট হচ্ছে নাট্যকলাকে ব্যবহার। যে ক্ষেত্রে যে রকম দরকার নাটকের সেই আর্ট এখানে ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে বিজ্ঞানের জরুরি

কথাগুলো যত সহজে মনোগ্রাহী করে নাটকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছানো যায়, অন্য কিছুতে তেমন নয়। দু'ভাবে সাধারণত এর রূপায়ন ঘটে– নাটকের পাত্র-পাত্রীরা বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষ হতে পারেন, যাঁদের কথাবর্তার ও কাজের মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো ফুটে ওঠবে। অথবা বিজ্ঞানের জিনিসগুলোই নাটকের পাত্র-পাত্রী হয়ে উঠতে পারে– তাদেরকে মানুষের মত কথা বলিয়ে, অবশ্য আচরণ বিজ্ঞানে তারা যে ভাবে করার কথা সেভাবেই করবে। দু'রকম ক্ষেত্রেই এগুলো প্রায়শ হাসির নাটকের রূপ নেয়; তবে গম্ভীর বা করুণ রসেরও প্রাধান্য ঘটতে পারে কোন কোনটিতে। সব থেকে জমজমাট নাটক হয় গীতিনাট্য বা নৃত্য নাট্যরূপে– অথবা রীতিমত পাশ্চাত্য ঢঙের মিউজিক্যালরূপে। যদিও আসল উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের কিছু কিছু বিষয়কে প্রাঞ্জল করে তোলা, এই ব্যাপারে দর্শকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা; অবশ্য সবই আনন্দের মাধ্যমে।

নাটকের সৃষ্টিশীল দিকগুলোর সঙ্গে যারাই জড়িত তাঁদের সবার কোন না কোন রকম অবদান ওই উদ্দেশ্য সফল করার ক্ষেত্রে থাকতে পারে। এতে যদি সত্যিকারের আর্টের ছোঁয়া না থকে তা হলে নাটকটি একটি সাধারণ গণ-সংযোগ বা প্রচারধর্মী অভিনয়ের পর্যায়ে পড়ে যাবে। তখনো বার্তাটি পৌঁছাবার চেষ্টা থাকবে, কিন্তু যে চমৎকারিত্বের কারণে দর্শকরা কৌতুহলী হবে ও উপভোগ করবে সেটি থাকবেনা। নাট্যকার তাঁর রচনাতে এবং পাত্র-পাত্রীরা তাদের অভিনয়ে ওই আর্টগুলোর পরিচয় দেন আর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার সার্বিক বাস্তবায়ন করেন। বিজ্ঞানের বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁদের সবার ভাল ধারণা থাকা উচিত, আর এ নিয়ে তাঁদেরকে পরামর্শ দেবার মত বিশেষজ্ঞরাও থাকতে পারেন। বিজ্ঞান নিয়ে নাটক মঞ্চে অভিনীত হলে তাতে আর্টের বিভিন্ন খুঁটিনাটির প্রকাশটি সহজ হয়। বিজ্ঞানের বিষয়টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মঞ্চ সজ্জা করে তার আবহটি সৃষ্টি করা সম্ভব। যেমন কোথাও যদি এটমকে দেখানোর প্রয়োজন হয় তা হলে এটমের রূপসজ্জায় অভিনেতারা কেউ কেউ ইলেকট্রন, কেউ প্রোটন, কেউ নিউট্রনের সাজে এটমকে গড়তে পারে। বিভিন্ন কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো কী ভাবে সাজানো থাকে, এক এটমের সঙ্গে আর এক এটমের ইলেকট্রন দান, গ্রহণ বা ভাগ করে নেবার মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো দেখানো যায়, এসব বিস্তারিত দৃশ্য তৈরি করতে মঞ্চ ও সাজঘর সহায়ক হয়।

মঞ্চ-নাটকে মানুষকে মঞ্চের কাছে আসতে হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের জরুরী বার্তাগুলো সব মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হলে দরকার পথ-নাটকের, সেক্ষেত্রে মানুষের সমাগম যেখানে সেখানেই স্বল্প আয়োজনে ওই নাটকের আয়োজন করতে হয়। এরকম পথ-নাটক আয়োজনের কিছু অভিজ্ঞতা আমার নিজেরও রয়েছে। আমাদের এনজিও বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র 'গণবিজ্ঞান চারণ দল' নামে একটি নাট্য দল গঠন করে কিছু জরুরী বৈজ্ঞানিক বিষয়কে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে। সাধারত বাজার, মেলা ও জন সমাবেশের অন্যান্য জায়গায় পথ-নাটক হিসেবে এই গীতিনাট্যগুলো পরিবেশন করা হতো। এতে যাত্রার পালার কিছু উপাদানও ব্যবহৃত হয়। যেমন শিশুদের মধ্যে ব্যাপক হারে রাতকানা যে রোগ ভিটামিন এ'র অভাবে হচ্ছে সে ব্যাপারে সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা একটি নাটকের মূল লক্ষ্য ছিল। গীতিনাট্যটি রচনাই করা হয়েছে ভিটামিন জিনিসটা ও বিশেষ করে ভিটামিন এ' কে পরিচয় করিয়ে দিতে। এই ভিটামিন এ সাধারণত কী রকম খাবারে পাওয়া যায়, যে সব খাবার গাঢ় রঙে রঙীন– মিষ্টি কুমড়া, আম, গাজর, লাল শাক, কচু শাক ইত্যাদি; সত্যিকারের এ খাবারগুলোরও একটি ভূমিকা নাটকে ছিল। তবে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেয়া হয়েছে কচু শাকের ওপর। কারণ গ্রামে এই খাবারটি বলতে গেলে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে, অথচ তা খুব একটি আদর পায়না। সে আদর যেন পায়, শিশুদেরকেও যেন তা খাওয়ানো হয় এবং অন্য রঙীন খাদ্যগুলোও। এমনিতরো বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিজ্ঞান নিয়ে ছিলো গণবিজ্ঞান চারণ দলের পথ-নাটক।

সাধারণ মানুষের জন্য হলেও এর ক্ষেত্রে আর্টের কোন কম্‌তি ছিলনা, বিজ্ঞানকে বোধগম্য করার চেষ্টারও কমতি ছিলনা। এই ক্ষেত্রে আর্ট এসেছে লোকজ সংস্কৃতি থেকে– গীতিনাট্যে– গানে গানে জরুরী কথাগুলো বলা, যাত্রার ঢঙে ভাল ও মন্দ, বিজ্ঞান ও কূসংস্কার এসবের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়া; দর্শককে প্রশ্ন করা, তার উত্তরের প্রশংসা করে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেয়া। কিন্তু সব পরিস্থিতিতে এমন হবে সে রকম নয়। বিজ্ঞানের সন্ধানে কিছুটা এগিয়ে গেছেন এমন দর্শকের কাছে এ নাটক বরং বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম ধারণাগুলোকে আর্টের মাধ্যমে আরো খোলাসা করারই চেষ্টা করে।

সেদিনের সমুদ্র যাত্রাঃ আর্ট-সায়েন্স অভিযান

একের মধ্যে সব

যদি এমন একটি জগতের কথা বলি, এমন একটি জীবনধারা যেখানে মানুষ প্রতি মুহূর্তে অদ্ভুত অন্য রকম আবহে জড়িয়ে আছে যা সাধারণ আর দশ জন মানুষের থাকেনা তাহলে তার দিকে আমরা একটু বিশেষ ভাবে তাকাতেই পারি। পালতোলা জাহাজে সমুদ্র যাত্রা এমনি একটি জগৎ, এমনি একটি জীবন ধারা যেখানে প্রতি মুহূর্তে জানার ও আবিষ্কারের ব্যাপার ছিলো, অত্যন্ত ঝুঁকি ছিলো, প্রযুক্তি-আর্টের অপূর্ব ব্যবহার ছিলো।

লক্ষ্যস্থলে যাওয়ার সংগ্রাম, দৈনন্দিন একেবারে রুটিন বাঁধা কাজ করে যাওয়া এর মধ্যে কিন্তু থাকতো ক্ষণে ক্ষণেই বিজ্ঞানের প্রয়োগ, আবার বিজ্ঞানেরই আলোকে জলস্রোত, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রবিদ্যা, নতুন দেশ-উদ্ভিদ-প্রাণী-ভূতত্ত্ব ইত্যাদির নতুন জরিপ। অথচ জাহাজের চেহারা থেকে শুরু করে যাত্রার ও জীবনের প্রতিটি পর্যায়কে নিয়ে গড়ে ওঠেছে নানামুখি আর্ট– জলদস্যু কাহিনী থেকে শুরু করে জাহাজী সরঞ্জাম, গান, বেপরোয়া জীবন, পালের নানান সজ্জা এমনকি দড়ির গিট্টু দেবার সৌকর্যে পর্যন্ত জাহাজীরা আর্ট সৃষ্টি করেছে, সেই আর্টকে শত শত বছর ধরে বিকশিত ঐতিহ্যে পরিণত করেছে। আজ পালতোলা জাহাজ সেভাবে না থাকলেও ওই আর্টের চর্চায় কিন্তু ইতি ঘটেনি মোটেই। একদিকে সেই জাহাজীরা নিজেরা আর্ট সৃষ্টি করেছে, আবার অন্যদিকে তখন পৃথিবীর নতুন নতুন মানব সমাজের মধ্যে গিয়ে সেই অজানা মানুষদের আর্টকে আবিষ্কার করেছে, অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের জন্য আপন করে নিয়েছে। পৃথিবী যে অনেক বড়, তার আর্টও যে অনেক বড় সেটি দেখিয়েছে সেদিনের সমুদ্র যাত্রা। অথচ তার কাজের প্রতিটি ধাপেই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে এবং আরো বিজ্ঞান সৃষ্টি করেই সে তা করেছে– যেমন ওই কূল-কিনারাহীন সমুদ্রের কোথায় সে নিজে আছে তা জানার জন্য জ্যোতির্বিদ্যাকে ব্যবহার করেছে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের এবং ভূগোলের পরিধিও বাড়িয়েছে।

সেদিনের সমুদ্র পাড়ি দেয়া পালতোলা জাহাজকে দেখা যেতে পারে চারিদিকে সীমাহীন জলরাশির মধ্যে বাকি দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্কহীন একটি ছোট্ট বাড়ির মত। এতে অল্প কিছু মানুষ এক সঙ্গে অন্য সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাটাচ্ছে দুঃসাহসী এক জীবনে। তার নিরাপত্তার একমাত্র ভরসা বিজ্ঞান, আর তার দিনগুলো যাপনের অনুপ্রেরণা জাহাজী জীবনের আর্টগুলো। জাহাজ চালনাটি বিজ্ঞান-কারিগরি বিষয় হতে পারে, কিন্তু আনন্দ-উৎসাহের মধ্য দিয়ে এর একটানা শ্রমদানকে এবং ঝুঁকির শীতল পরশকে সহনীয় করেছে তার ওই আর্টগুলো। এ দুইয়ের মিশ্রণটি এখানে একেবারে ওতোপ্রোতো এবং তা প্রতি মুহুর্তে। এ জন্য এমন মিশ্রণকে কাছে থেকে দেখার জন্য সমুদ্র যাত্রার থেকে ভাল উদাহরণ আর হয়না। সেকালের প্রত্যেকটি জাহাজকেই তো গড়া হতো এক শিল্পকর্ম হিসেবে। কাজেই সেখানেই তো নান্দনিকতার শুরু। ওই জাহাজ গড়ার কাজটাকে বলা হয় সামুদ্রিক স্থাপত্য– স্থাপত্যের মতই বিজ্ঞান ও কলার সুন্দর মেশাল।

ওই জাহাজে যখন নাবিকরা কাটান তখন সামনে সমুদ্র আর ওপরে আকাশ ছাড়া তাঁরা আর কোন দৃশ্য সাধারণত দেখেন না। তাই ওই দুটি জিনিসের মধ্যেই তাঁদেরকে অনেক কিছু দেখতে হয়, অনেক কিছু নিত্য খুঁজে নিতে হয় কারণ এটিও তো তখন তাঁদের জগৎ! সমুদ্রের ঢেউ, সাদা ফেনা, ফুলে ওঠা পানি ঝড়ে জাহাজকে ধুয়ে এদিক থেকে ওদিক যাওয়া এগুলো তাঁদের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করে; আবার সামনের শান্ত দিনটির আশ্বাসও দেয়। আকাশের দিকে যন্ত্র তাক করে তাঁদেরকে হরদম মাপজোক করতে হয়– দিনেও, রাতেও। কিন্তু তার থেকেও বেশি তাঁরা রাতের আকাশের দিকে তাকান মেঘের খেলা এবং তাতে চাঁদের লুকোচুরি দেখার জন্য। এখানেও আকাশে ঘনঘটা, ঝড়ের আশংকা আর পরবর্তী অভিনবত্বের আশ্বাস বুক দুরু দুরু করায়। এ বৈচিত্র দরকার, কারণ সাধারণ নাবিকের জীবন বড় বেশি একটানা গৎবাঁধা পরিশ্রমের। এমন অবস্থায় আর্টকে নাবিক জীবনের অনেকটা জীবন রক্ষাকারী যতি বলা যায়– শুধু সমুদ্রের ও আকাশের দিকে তাকিয়েই যত আর্ট খুঁজে পাওয়া যায় তাও কম নয়। কিন্তু তার বাইরেও রয়েছে জাহাজী জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসংখ্য আর্ট, যা সেই জীবনকে ছাড়িয়ে তীরবর্তী সাধারণ মানুষেরও চর্চার বিষয় হয়েছে কালক্রমে।

জাহাজের নাবিকদের গান জাহাজেই সৃষ্টি হয়েছে– সারাটা জাহাজ জুড়ে নানা মাস্তুলে যে পালের বিন্যাস সেগুলোকে যখন বাতাসের মতিগতি অনুযায়ী ওঠাতে হয়, মেলে ধরতে হয়, গুটাতে হয়, ঘোরাতে হয় সমবেত সেই গান তাদেরকে শক্তি যোগায়, ক্লান্তি ভোলায়। সমুদ্রের মাঝে নৌকা নামিয়ে সে নৌকায় যখন নাবিকরা তিমির সঙ্গে লড়তে গেছে, নতুন আবিষ্কৃত উপকূলের জরিপ করতে, ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে দাঁড় বেয়েছে ওই গান গেয়ে। ওই গানই ওই সুরই আবার তীরের মানুষদের জাহাজী সঙ্গীত চর্চার লোকজ আর্টের একটি দিকই সৃষ্টি করেছে।

অনুকূল বাতাস, প্রতিকূল বাতাস, ঝড়ো বাতাস সব কিছুতে নিজের গতি বজায় রাখার ও নিরাপত্তা বজায় রাখার কাজে প্রত্যেক নাবিককে প্রত্যেক মুহূর্তে তৎপর থাকতে হয়। এতে যে কৌশল তিনি গ্রহণ করেন তার পুরোটাই বিজ্ঞানের, যার সঙ্গে তাঁর পরিচিতি দৈনন্দিন ভিত্তিতেই থাকতে হয়। জাহাজের যে মাস্তুল, পাল, হাল সব কিছুকে থাকতে হয় দড়াদড়ির এক জটিল বিন্যাসে। সেটি একদিকে যেমন ঐতিহ্যগত ভাবে গড়ে উঠেছে, উন্নত হয়েছে, তার মধ্যেও বিজ্ঞান আর শিল্পবোধ হাত ধরাধরি করে থেকেছে। এমনকি কী পরিস্থিতিতে ওই দড়িতে ঠিক কী ঠিক গিট্টু দিতে হয় তারও সুনির্দিষ্ট রূপ রয়েছে জাহাজীদের মধ্যে। দক্ষ ও সুন্দর ভাবে সৃষ্টি হওয়া সেই গিট্টুগুলো সর্বজনীন আর্টে পরিণত হয়ে আজো রয়েছে অনেকের চর্চায়। জাহাজী সায়েন্স ও আর্ট উভয়ের প্রতি প্রত্যেক নাবিককে তো খুবই সংবেদী হতে হয়েছেই, কিন্তু বাইরের জগতেও জাহাজকে যেভাবে দেখা হয়েছে, কল্পনা করা হয়েছে, উপভোগ করা হয়েছে তাতেও এই সংবেদনশীলতাটি খুবই উপস্থিত। বিশেষ করে গুরুত্ব পেয়েছে আর্টের দিক থেকে সংবেদনশীলতা– সাহিত্যে, সঙ্গীতে, স্থাপত্যে, এবং দৃশ্যমান শিল্পগুলোতেও। জাহাজের সজ্জা, তার ফিগারহেড মূর্তি ইত্যাদি প্রত্যেক জাহাজকে একটি বিশেষ চরিত্রই যেন দেয় সাধারণ ভাবে আর্টের জগতে। বন্দরে, জাদুঘরে, এবং ব্যক্তিগত আর্ট সংগ্রহে এসব দেখা গেছে যুগে যুগে। পালের জাহাজের যুগ শেষ হয়ে গেছে বলে তার বিশেষ বৈজ্ঞানিক কৌশলগুলো এখন আর সবার চর্চায় থাকেনা, কিন্তু তার আর্টের দিন কিন্তু শেষ হয়নি। সেই আর্টের বরং ব্যাপক ভাবে চর্চা হচ্ছে। বহু মানুষ উপভোগ করছে জাহাজী সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য, এবং তারো চেয়ে বেশি আবিষ্কার, অভিযাত্রা,

ইতিহাস হিসেবে। পালতোলা জাহাজে সমুদ্র যাত্রা এখনো একটি জীবন্ত রোমান্সের আর্ট রূপ।

এই সব কিছুর পেছনে যে মানুষরা আছেন তাঁদের কেউ কেউ খুবই পরিচিত, অমর হয়ে আছেন; কিন্তু অনেকের নাম আবার কেউ জানেনা। এ নিয়ে বিখ্যাত সাহিত্যের সৃষ্টিকারদেরকে সবাই চেনে। কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গীত, নাবিক লোক-সঙ্গীত নানা দেশের নাবিকদের মুখে মুখে তৈরি হয়ে এখনো চল্‌ছে। বিখ্যাত অভিযাত্রার বিখ্যাত কিছু জাহাজের স্থপতিদেরকে আমরা চিনি এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা এখনো চলে। কিন্তু ওই জাহাজের সঙ্গেই যে নির্মিত হয়েছে আরো অসংখ্য জাহাজ, যার অনেকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য অভিনবত্বও ছিল সেগুলো কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে– বিশেষ করে যে সব জাহাজ দুর্ভাগ্যক্রমে তাদের কার্যকালের শুরুর দিকেই ডুবে গেছে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে সব থেকে বেশি যাঁরা অমর হয়ে রয়েছেন তাঁরা হলেন সেদিনের সমুদ্র অভিযাত্রী নেতারা– দুঃসাহসী ক্যাপ্টেন যাঁদের অধীনে পৃথিবীর এক একটি অজানা সমুদ্রপথ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিলো। তাঁদের কথা, তাঁদের জাহাজের কথা আজ শুধু মানুষের কথায় আর চর্চায় নেই, বরং সবার মানসপটে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। সেই ভাস্কো দা গামা, কলম্বাস, ম্যাজেলান, টমাস কুকের কথা, এবং তাঁদের মত আরো বেশ কিছু অভিযাত্রীর কথা ভোলার নয়। আরো কিছু সফল দুঃসাহসী অভিযাত্রী আছেন যাঁরা মূলত জলদস্যু নায়ক। কিন্তু সমুদ্র যাত্রার আর্টে তাঁদের স্থানটিও কম বড় নয়। বিখ্যাত অভিযাত্রীদের কারো কারো প্রাণ গেছে এই অভিযাত্রার মধ্যেই, কিন্তু সফল তাঁরা ঠিকই হয়েছেন। কৃতিত্বটি তাঁদেরকেই দেয়া হয় তাঁদের নেতৃত্বের জন্য। সেজন্য আমরা এমনভাবে দেখি যেন তাঁদের পুরো জীবনটাই একটি আর্ট। কিন্তু এটি যে জাহাজে তাঁদের সহকর্মী অন্যান্য অফিসার-নাবিক-সাধারণ খালাসি, সুখানি, সৈনিকদের সবার অবদানেই তৈরি হতে পেরেছিলো সে কথা আমরা সব সময় মনে রাখিনা।

আসলে একটি জাহাজের ছোট্ট পরিসরে কাটাতে হত সামনের নিচু সম্মুখ-কুঠিতে, অথবা ডেকের নিচে শত খালাসি নাবিককে প্রায় গাদাগাদি করে এক টানা মাসের পর মাস, অনেক সময় দীর্ঘ যাত্রায় বছর ঘুরে যাওয়া সময়। কারো কারো বিছানা হতো এক টুকরা কাপড়ের ঝোলানো দোলনায়।

নিশ্বাসের বাতাসের স্বল্পতা অথচ ঢেউয়ের দোলায় ঢোকা পানির উৎপাতের মধ্যেই তাঁদের সীমিত কিছু বিশ্রাম-ঘুমের সময়। বাকি 'প্রহর'গুলোতে ওই রুটিন বাঁধা পরিশ্রমের কাজ। কিন্তু তার মধ্যেও কি নাবিক জীবনের আর্ট ছিলনা? তাঁরা নিজেরাও কি ওই নাবিক ঐতিহ্যের আর্ট তাঁদের অবস্র মুহুর্তগুলোতে সৃষ্টি করে চলেন্‌নি? এমন জীবনেরও একটি অদ্ভুত মাধুর্য ছিল, যা সেই আর্টের সৃষ্টিতে ও উপভোগে প্রকাশ পেয়েছে। যখন দেখা গেছে বিকল্প সহজতর ও নিশ্চিততর জীবনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও নাবিক বার বার ওই কঠিন সমুদ্র-জীবনেই ফিরে যাচ্ছেন, সেখান থেকেই বোঝা গেছে তার আকর্ষণ। অথচ এই আকর্ষণ সহজ জীবনের বা অধিকতর আর্থিক লাভের জন্য নয়, বরং আরো সূক্ষ্মতর কোন মনের টানের কারণে। ডাঙ্গায় থাকার জীবনে তাঁকে খাবার পানি কখনো রেশন করে খেতে হয়নি, শুধু লবন দেয়া সংরক্ষিত খাবারের ওপর নির্ভর করতে হয়নি, অদ্ভুত কোন কিছুর প্রভাবে বিভীষিকার মত যন্ত্রনাদায়ক অসুখ স্কার্ভিতে অন্ধকার নিচের ডেকে কাৎরাতে হয়নি, পাগলি ঘন্টা শুনে বিশ্রামের সময়ের মধ্যেই জরুরি অবস্থা মোকাবেলা করতে ওপরের ডেকে ঝড়ের মধ্যে ছুটে যেতে হয়নি। কিন্তু তারপরও এগুলো তাঁকে ভয় লাগাতে পারেনি। এর একটি কারণ এই সবগুলো ক্ষেত্রেই তাঁরা ক্রমাগত উন্নতি দেখতে পাচ্ছিলেন বিজ্ঞানের কল্যাণে। আরো বড় কথা ওটি ছিলো বিশ্বের টান। আর্টের সর্বোচ্চ রূপ তখনই ঘটে যখন সেটি মানুষকে বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত করে, একজন অতি সাধারণ মানুষও একটি সঙ্গীতে বা একটি অনবদ্য শিল্পকর্মের মাধ্যমে বিশ্বের সংস্পর্শে চলে যেতে পারেন। আর সমুদ্র যাত্রা একজন নাবিককে একেবারে সরাসরি সেই বিশ্ব-চারণকারী হিসেবে তেমনি আর্টের স্পর্শে রাখতে পারে দৈনন্দিন। আকর্ষণটি সেখানেই।

জাহাজী সাহিত্য

ট্রেজার আইল্যান্ড:

অনুবাদে বা মূল ইংরেজিতে ছোটবেলা থেকেই সমুদ্র যাত্রা ভিত্তিক এ্যাডভেঞ্চার কাহিনী সুযোগ পেলেই গোগ্রাসে গিলেছি। সুযোগ পেলে এটি কে না করেছে? ওখান থেকে সেটির যে অংশগুলোর এখনো মনে জ্বলজ্বল করছে তাকে প্রাধান্য দিয়ে গল্পটি বলার চেষ্টা করি। সাহিত্যের এই দিকটিই

আমার মনে সেকালের পাল তোলা জাহাজের প্রতি প্রথম আকর্ষণটি সৃষ্টি করেছে– শুধু তার অভিযানের কাহিনীর কারণে নয়, তার সঙ্গে মেশানো বিজ্ঞানের কারণেও বটে। ট্রেজার আইল্যান্ড (রত্নদ্বীপ) তেমনি একটি বই।

স্কটিশ ঔপনাসিক লুই স্টিভেনসনের রচিত বইটি ১৮৮৩ সালে বের হলেও এর কাহিনীকে কিন্তু আরো শ'খানেক বছর পিছিয়ে ১৭ শতকের মাঝামাঝিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ইংল্যান্ডের খুবই ব্যস্ত সমুদ্র খাঁড়ি ব্রিস্টল চ্যানেলের কাছে এ্যাডমিরাল বেনবো নামের একটি পুরানো ধাঁচের ছোট হোটেলে সব সময় নাবিকদের আনাগোনা। এ হোটেলের মালিকের ছেলে কিশোর জিম হকিন্স এ কাহিনীর নায়ক, যে আপাতত হোটেলের খদ্দেরদের ফাইফরমাশ খাটে। এ হোটেলের খদ্দেরদের মধ্যে বহু সন্দেহজনক লোকও থাকতো না যে তা নয়, ও নিয়ে মাথা ঘামালে হোটেলের চলেনা। নিজেকে 'ক্যাপ্টেন' নামে পরিচয় দেয়া পুরানো নাবিক গোছের এক লোক একটানা বেশ ক'দিন থাকছিলো– জিমকে বলে রেখেছিলো একপেয়ে এক লম্বা নাবিককে আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে তাকে খবর দিতে। পরে জানা গেলো এই তথাকথিত ক্যাপ্টেন আসলে কুখ্যাত বিলি বোন্‌স। শিগ্‌গির আরো কয়েকজন এসে হোটেলে জুটলো– ব্ল্যাক ডগ আর পিউ নামে আরো দুই নাবিক, পিউ অন্ধ নাবিক। বাইরের থেকে হোটেল আক্রমণ করলো আরেকটি দল যেই সাংঘাতিক মারামারিতে হোটেলের মালিকদেরই জীবন বিপন্ন। এর মধ্যে হঠাৎ বিলি বোন্‌স আর জিমের বাবা একই দিনে মারা গেলেন। পুলিশ এসে জিম আর তার মাকে ওখান থেকে উদ্ধার করলো। অনুসন্ধানে জানা গেলো এই সব লোকগুলো আসলে দুর্ধর্ষ জলদস্যু ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের জাহাজে এক সঙ্গে কাজ করেছিল– ওখান থেকেই কিছু নিয়ে তাদের বিবাদ।

সাধারণত নাবিকদের একটি ব্যক্তিগত সিন্দুক থাকে। হোটেলে থাকা বিলি বোন্‌সের সিন্দুক থেকে জিম পেয়ে গেলো এক গোপন নির্জন দ্বীপের ম্যাপ। জলদস্যু ক্যাপ্টেন ফ্লিন্ট তার লুটের সব রত্নগুলো সেখানে লুকিয়ে রেখেছিলো। জিম ম্যাপটি দু'জন সম্ভ্রান্ত মানুষ চিকিৎসক ড লাইভসে এবং স্কোয়ার জন স্ট্রেলনেককে দেখালো। নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে তাঁরা একটি জাহাজের ব্যবস্থা করে রত্নদ্বীপে একটি অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত

নিলেন, জিম সে জাহাজের কেবিন বয় হিসেবে কাজ করবে। এর পরের কাহিনী রত্নদ্বীপে অভিযানের কাহিনী। হিসপানিওলা নামের একটি জাহাজ কিনে ফেলে স্ট্রেলনেক এতে নাবিক ভর্তি করিয়ে জাহাজটির পরিচালনার কর্তৃত্ব দিলেন অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন স্মলেটকে। হিসপানিওলার খুঁটিনাটি বর্ণনা– একে অভিযানের জন্য সাজিয়ে নেয়া, নাবিক ভর্তি, তাঁদের পরিচয়, এসব আমার কাছে বাকি অ্যাডভেঞ্চারের থেকে কম কিছু বলে মনে হয়নি। ওটি একাধারে জাহাজের বিজ্ঞান ও আর্ট উভয়ের প্রতি আমার কৌতুহলের জন্ম দিয়েছে বলা যায়– যা কখনো আর ছেড়ে যায়নি।

হিসপানিওলা জাহাজটি একটি মাঝারি সাইজের শ্যুনার। শ্যুনারের বৈশিষ্ট হলো এতে ত্রিভুজাকার পালগুলো সামনে-পেছনে করে খাটানো থাকে– বড় অধিকাংশ জাহাজের মত আয়তাকার স্কোয়ার পাল হিসেবে জাহাজের আড়াআড়ি নয়। এমন পালে বাতাসের বিপরীতেও যাওয়ার কাজটি সহজ হয়, পাল ঘুরিয়ে নিয়ে বাতাসের দিকে তো যেতেই পারে। হিসপানিওলার তিনটি মাস্তুল। তার নানা আড়াআড়ি দণ্ড (ইয়ার্ড) থেকে নেমে আসা ত্রিভুজাকার পাল টান টান রাখার জন্য নিচে থাকে বুম নামে দণ্ড। জাহাজ যখন ডানে-বামে ঘোরে তখন পালে বাতাসের চাপে বুমটি ডানে-বামে দুলতে পারে– ডেকে দাঁড়ানো মানুষের বুক বরাবর বলে এর ধাক্কায় মানুষ জাহাজ থেকে পড়েও যেতে পারে। কিন্তু বালক জিমের সে সমস্যা নেই; সে মাথা নিচু করে বসে পড়ে দিব্যি ছুটাছুটি করে আসা যাওয়া করতে পারে। ওটিই তার কাজ। নাবিক হিসেবে যাদেরকে ভর্তি করা হয়েছে, শিগ্‌গরি বোঝা গেলো ওতে ক্যাপ্টেন স্মলেট একটি ধোকা খেয়েছেন।

এ নাবিকগুলো বেশ দক্ষ, সমুদ্রের পাকা হাত। কিন্তু তাদের অনেকেই আসলে জলদস্যু ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের জাহাজের মানুষ। কেমন করে জানি শুনতে পেয়েছিল ফ্লিন্টের রত্নদ্বীপের সন্ধানেই জাহাজটি যাচ্ছে তাই ওতে নিজেদের ভাগ সময়মত দাবি করার উদ্দেশ্যে পরিচয় গোপন করে এখানে ভর্তি হয়ে গেছে। ওদের মধ্যে পালের গোদা ছিলেন জাহাজের বাবুর্চি লং জন সিলভার। খাড়া লম্বা দেহ, উঁচু নাক, কিন্তু এক পা হারানো সিলভারের ব্যক্তিত্বটি কিন্তু খুবই টনটনে। গোড়া থেকেই জিমকে খুব স্নেহের চোখে দেখে সিলভার, উভয়ের খুব সখ্যতা। পরে অনেক ঘটনা ঘটেছে, ক্যাপ্টেন স্মলেটের সঙ্গে

তাঁর জাহাজের লোকরা অসম্ভব শত্রুসুলভ আচরণ করেছে, কিন্তু সিলভার আর জিমের সখ্যতা নষ্ট হয়নি। লেখক এক রকম সূক্ষ্ম ভাবে দেখিয়েছেন জিমের অবচেতন মনে যেন জলদস্যুর কিছু ভাল দিকের একটি রোমান্টিক ধারণা ছিল যা বিশেষ করে সিলভারের মধ্যে সে দেখতো। আর সিলভার ভাবতো ছোটবেলায় সে জিমের মতই একজন চালাক চতুর ছেলে ছিলো। ট্রেজার আইল্যাণ্ডের একটি বড় সমৃদ্ধ চরিত্র জলদস্যু বাবুর্চি লং জন সিলভার। তার ছবিটি মনের মধ্যে না গেঁথে গিয়ে পারেনা।

রত্নদ্বীপের খোঁজে জাহাজ যখন চল্‌ছে অনেকটা স্বাভাবিক নাবিক জীবনের মধ্যে একটি গান নাবিকদেরকে বার বার গাইতে দেখা গেছে তাদের এক সঙ্গে কাজ করার সময় অথবা বিশ্রামের আড্ডায়। বইয়ের অনেক কথা ভুলে গেলেও এই সমবেত গানের কলিগুলো দিব্যি মনে আছে:

পনরো জন লোক মরা মানুষের সিন্দুকের ওপর
ইয়োহ হো হো, আর এক বোতল মদ–
মদ গিলে ও শয়তানী করে বাকিরা শেষ হয়েছে
ইয়োহ হো হো, আর এক বোতল মদ!

বইয়ে গল্পের সারমর্ম যেন এই গানে বলা হয়েছে, যদিও তখন সে কথা বোঝার উপায় ছিলনা কারো। তখন ওই মরা মানুষের সিন্দুকটি হয়তো বিলি বোন্‌সের সিন্দুকের কথা মনে করিয়েছে যার ভেতর জিম রত্নদ্বীপের ম্যাপ পেয়েছিলো। অথবা ক্যাপ্টেন ফ্লিন্টের লুটের মালের কথাও স্মরণ করাতে পারে– যার আশায় জিমরা যাচ্ছে, ছদ্মবেশী জলদস্যুরাও যাচ্ছে। নাবিকের জীবন মদে আসক্তিতেই বরবাদ হয়ে যেতো সেকালে, নাবিক জীবনে এমন আসক্তি সহজেই জীবন নাশের কারণ হতো। আর জলদস্যু হিসেবে তাদের জীবনতো লুটপাটের নানা কূটিল শয়তানিতে ভরা, যাও অনেক সময় আত্মঘাতী হতে পারতো। ট্রেজার আইল্যান্ডে শেষ পর্যন্ত হয়েছিলোও তো তাই, দু'একজন ছাড়া কেউই বাঁচতে পারেনি। এ গানে অন্যায় লুটপাট, রত্নের প্রতি লোভ এসবের অসারতার কথা মনে করিয়ে দেয়া হয়েছে বার বার। আর উপন্যাসটির কাহিনীও সেদিকেই এগিয়েছে।

এ কাহিনীর বড় ঘটনা ছিল হিসপানিওলা জাহাজে এই পুরানো জলদস্যুদের বিদ্রোহ, জাহাজের বাবুর্চি লং জন সিলভারের নেতৃত্বে।

তাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে যতদিন পারে জাহাজ চালনা, রত্নদ্বীপ খুঁজে নেয়া ইত্যাদির জন্য। ক্যাপ্টেন স্মলেটের বৈজ্ঞানিক পরিচালনার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে, যেমন দিনে সূর্য, রাতে ধ্রুবতারা দেখে দ্রাঘিমাংশ ও অক্ষাংশ নির্ণয় করে জাহাজের অবস্থান নির্ণয় করতে। অবশ্য বহুদিনের অভিজ্ঞতার কারণে তারাও কিছু কিছু পারদর্শী ছিলো অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও। বিদ্রোহ তখনই না হলেও জিম একদিন নিচের ডেকে আপেলের পিপার ভেতর লুকিয়ে সিলভারের সঙ্গে আরো কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারীদের বিদ্রোহ সংক্রান্ত কথাবার্তা শুনে ফেলেছিলো আর ক্যাপ্টেনকে গিয়ে বলেছিলো। কাজেই তখন থেকে জাহাজ কর্তৃপক্ষ সতর্ক। বিদ্রোহ অবশ্য রত্নদ্বীপে পৌঁছাবার আগে হলোনা। এর মধ্যে জিম নিজেই অনেক খবর সংগ্রহ করে ফেলেছিলো বিদ্রোহের পরিকল্পনা সম্পর্কে। কেবিন বয় হিসেবে তার কাজ ক্যাপ্টেন, অফিসারগণ আর প্রধান নাবিকদের মধ্যে বার্তা আনা নেয়া করা। দক্ষ নাবিক যাদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তাদের কাজ জিম খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতো। যেমন জাহাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন ছুতার আব্রাহাম গ্রে। গ্রে জিমকে খুব স্নেহের চোখে দেখেন, তাঁর কাছ থেকে জিম ছুতারের অনেক কাজ শেখে। কাঠের তৈরি জাহাজ সব সময় কিছু না কিছু ভাঙ্গছে এর খোলে, মাস্তুলে; কিছু ফুটা ফাটা দেখা দিচ্ছে যা দিয়ে পানি ঢুকছেই। ছুতারের কাজ ভাঙ্গা জায়গা মেরামত করা ও ফুটা সারানো। অন্য দক্ষ নাবিকরা অনেক সময় পাল সেলাই, নতুন পাল জোড়া এসবও কাজেও মন দিতেন, আর দড়াদড়ির মেরামত তো লেগেই থাকে। তা ছাড়া নাবিক সর্দাররা নেতৃত্ব দিতো পাল তোলা, পাল ঘোরানো, জাহাজে ঢুকে পড়া পানি পাম্প করে বের করা ইত্যাদি কাজে। জিম ঘুরে ঘুরে এসব দক্ষ নাবিকের থেকে নৌ চালনার অনেক বিদ্যাই শিখে ফেলেছিলো। নাবিকরা সবাই সম্মুখ-কুঠিতে থাকতেন ওই জায়গাটি যেন বিদ্রোহের শলাপরামর্শের আখড়া হয়ে ওঠেছিলো।

রত্নদ্বীপে পৌছার পরই বিদ্রোহ শুরু– অনুগত আর বিদ্রোহীদের মধ্যে যুদ্ধেরও শুরু, সে লম্বা কাহিনী। এর আগে বিদ্রোহ প্রস্তুতি পর্বেও কম ঘটনা ঘটেনি, যেমন সুকৌশলে ফার্স্ট মেইটের পদটি বাগিয়ে নিয়েছিলো বিদ্রোহীদের একজন, আসল ফার্স্ট মেইটকে মদ খাইয়ে জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার অবস্থায় নিয়ে যান। রত্নদ্বীপেই যুদ্ধগুলো হলো। দুপক্ষের বেশ কয়েকজন মারা গেলো, জিম নিজেও কয়েকবার মরতে মরতে বেঁচে

গিয়েছিলো। একবার সে বুদ্ধি করে দড়ি কেটে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা হিসপানিওলাকে একটু দূরে সাগরে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলো তার আয়ত্ব নৌ-বিদ্যা ব্যবহার করে– বিদ্রোহীরা যেন এর দখল না নিতে পারে। অনেক কথা জানা হয়ে গিয়েছিলো জিমের, বিদ্রোহীদের অসাবধান কথাবার্তা থেকে। ওরা জানতো দ্বীপের যে অংশে রত্ন লুকানো আছে সেখানে একটি কঙ্কাল এমন ভাবে আছে যেন সেটি রত্ন লুকানোর জায়গার দিকে আঙ্গুল মেলে রেখেছে। ওটি নিহত লুটেরাদের একজনের কঙ্কাল– তাই ওরা এ দ্বীপকে কঙ্কাল দ্বীপও বলতো। কুসংস্কার, ভয়, বিদ্রোহীদের কাবু করেছিলো, ওরা পরাজিত হয়েছিলো শেষ পর্যন্ত। একটি সমঝোতায় লং জন সিলভারকেই দোষী বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিলো। কিছু রত্ন পাওয়া গিয়েছিলো, যা এক ভাবে নানা জনের মধ্যে ভাগও করা হয়েছিলো। একেবারে শেষে এসে ওই গানের কথামতো এসব লোভের অসারতাই প্রমাণ হয়েছিলো বেঁচে থাকা সবার মধ্যে।

পনরো জন লোক মরা মানুষের সিন্দুকের ওপর ...

মবিডিক:

মবিডিক বইটির কিশোর সংস্করণ বহু আগেই পড়েছি অনুবাদে। তারপর এর ওপর করা বিখ্যাত ফিল্ম দেখে পরস্পরের প্রতি পূর্ব রোষ পুষে রাখা সাদা তিমি মবিডিক আর ক্যাপ্টেন আহাবের লড়াইয়ের স্মৃতি মন থেকে মোছা কঠিন হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু এর সাহিত্যিক গুণটির এবং তিমি শিকারের ভেতরের বিজ্ঞানটির খোঁজ পেলাম মূল উপন্যাসটি পড়ার পর। আমেরিকান লেখক হেরম্যান মেলভিন ১৮৫১ সালে উপন্যাসটি প্রকাশ করেন তিমি শিকারি জাহাজে একটি তিমি শিকার অভিযানের কাহিনী নিয়ে। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রে ম্যাসাচুসেট্স অঞ্চলের থেকে যাত্রা করা নাবিকদের একটি বড় অংশ তিমি শিকারি জাহাজে কাজ করতো এক এক মৌসুমে উন্মুক্ত মহাসমুদ্রে তিমি শিকার করে তার চর্বির তেল সংগ্রহ করে আনার উদ্দেশ্যে। এই তেল ঘরে বাইরে আলো জ্বালাবার কাজে ব্যবহৃত হতো বলে খুবই মূল্যবান একটি পণ্য ছিল। মেলভিন নিজেই এক সময় তিমি শিকারি জাহাজে কাজ করেছেন, আর ও সময় তিমি শিকার অভিজ্ঞতাকে ঘিরে নানা রচয়িতার অনেক বাস্তব বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছিলো; সেখান থেকেও মেলভিন এর খুটিনাটি কারিগরি ও

জীবতাত্ত্বিক উপাদানগুলো সংগ্রহ করেছিলেন। পরে তাঁর এই উপন্যাসটি এ বিষয়ে সব থেকে বেশি কালজয়ী হয়েছে।

উপন্যাসটি ইসমায়েল নামের এক নাবিকের জবানিতে আমরা পেয়েছি। তিনি ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের জাহাজ-বন্দর নানটেকাটে এসে পিকোড নামের একটি জাহাজে সাধারণ নাবিক হিসেবে নাম লেখিয়েছিলেন। নাম লেখাবার প্রক্রিয়া সারার সময় যে সস্তা হোটেলে ছিলেন সেখানে অত্যাধিক ভিড়ের কারণে তাঁর শোয়ার স্থান হয়েছিলো কুইকোয়েগ নামের এক অদ্ভুত-দর্শন দশাসই নাবিকের সঙ্গে একই বিছানায়। তিনি পলিনেশিয়ান কোন এক দেশের বাসিন্দা; এত আলাদা দুটি মানুষের মধ্যে একরকম পরিচয়ও হয়ে গিয়েছিলো। ঘটনাচক্রে কুইকোয়েগও নাম লিখিয়েছিলেন একই পিকোড জাহাজে, প্রধানত হারপুন ছোঁড়ার পারদর্শী হিসেবে। তাঁর এই কাজ হবে জাহাজের ফার্স্ট মেইটের অধীনে। সেকেন্ড মেইটের হারপুনার তাশুগো একজন আদিবাসী আমেরিকান। থার্ড মেইটের হারপুনার ডাগ্‌গু একজন দীর্ঘকায় আফ্রিকান। পিকোডে বেশ কিছু সময় কাটাবার পর অবশেষে সবাই জাহাজের কর্তা ক্যাপ্টেন আহাবের প্রথম দেখা পেলো জাহাজের পশ্চাত-কুঠির ওপরে অফিসারদের যে কোয়ার্টার ডেক তার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি সব নাবিকদেরকে প্রধান ডেকে ডাকলেন। যদিও অভিযানের উদ্দেশ্য হলো যত বেশি সম্ভব তিমির চর্বি সংগ্রহ করে করে বন্দরে ফেরা, আহাবের লক্ষ্য কিন্তু একটিই– ওই সাদা তিমি মবিডিক্‌কে খুঁজে বের করে তাকে শাস্তি দেয়া। সবার সামনে কোয়ার্টার ডেকের রেলিংয়ে গেঁথে দিয়েছিলেন একটি স্বর্ণমুদ্রা, যে প্রথম মবিডিকের দর্শন পাবে তার জন্য। কত দেশের কত কত রকম মানুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে পীকোডে ইসমায়েলের নাবিক জীবন শুরু হলো সেটিই ছিল যাত্রায় প্রথম লক্ষ্য করার কথা। এমন সান্নিধ্যে একেবারেই ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষও এক হয়ে যায়– একই জাহাজী সংস্কৃতিতে। ক্যাপ্টেন আহাবের পরিকল্পনা হলো দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর অঞ্চলে চলে যাওয়া, যেখানে রয়েছে তিমি শিকারের বিশাল ক্ষেত্র।

ইসমায়েলের বর্ণনায় আমরা নানা শ্রেণীর তিমির খুঁটিনাটি পার্থক্যগুলো জানতে পারি। তারা যে ক্ষুদ্র সামুদ্রিক প্রাণী খেয়ে এত বড় হয় সেগুলোও

বাদ পড়েনা ইসমায়েলের বর্ণনা থেকে। তিমি শিকারের জাহাজে কাজ করবো, অথচ তিমির সমস্ত বৈজ্ঞানিক খুঁটিনাটি জানবোনা এমনতো হতে পারেনা– ওই তিমির আনাগোনা, আচরণ, মনস্তত্ব সবই জানতে হয়। প্রথম কাজ হলো বিশাল সমুদ্রে তাদেরকে খুঁজে নেয়া, জাহাজের থেকে অনেক দূরে কোথাও হয়তো এক দল তিমির ডিগবাজির ওপর রোদের ঝিলিকটিই প্রথম চোখে পড়ে। তারপর নৌকায় চড়ে তাদের কাছে চলে যাওয়া, সরাসরি সামনাসামনি কোন কোনটির সঙ্গে যুদ্ধ করা। নাবিক চাইবে তাকে হারপুনে গেঁথে সঙ্গে বাঁধা দড়ি টেনে ও ছেড়ে দিয়ে খেলে কাবু ও নিস্তেজ করে টেনে জাহাজের কাছে নিয়ে আসতে, আর সে চাইবে নৌকা উলটিয়ে দিয়ে তাদের সবাইকে ডুবিয়ে মারতে, অন্তত পারলে ক্ষতবিক্ষত করতে। দূরে যখনই একদল তিমির ডিগবাজির বিন্দুমাত্র দৃশ্য নজরে এসেছে তখনই জাহাজের একটি বা একাধিক নৌকা পানিতে নামিয়ে প্রত্যেকটিতে একজন অফিসারের নেতৃত্বে এক দল নাবিক দাঁড় বেয়ে সেখানে এগিয়ে যায়। এরকম কোন্ নৌকার জন্য কার অধীনে কে কে যাবে সেই দল নির্দিষ্ট করা আছে। তিমির একদম কাছে গিয়ে যখন কোন একটির সঙ্গে রীতিমত চোখাচুখি তখন হারপুনার লক্ষ্য স্থির করে তার মাথা বা চোখ লক্ষ্য করে সমস্ত শক্তি দিয়ে হারপুন ছোঁড়ে। হারপুনের সঙ্গে লাগানো দড়ি নৌকায় নাবিকদের হাতে। ওই সময়টি ঝুঁকিপূর্ণ। যদি তিমি ভীষণভাবে নড়ে চড়ে ওঠে তখন নাবিকরা নৌকা থেকে সমুদ্রে ছিটকে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। সেটি না হলে তিমি ওই হারপুন ও দড়ি দিয়ে নৌকাকে টেনে নিয়ে যেতে যাইবে সীমাহীন সাগরে, ডুব দিতে চাইবে ওটিকে সহ। যদি ক্ষতি কিছু হবার আগে তিমিকে ক্লান্ত করে ফেলা যায়, যদি তার জখমটি যথেষ্ট গভীর হয়, প্রচুর রক্তপাত হয়, তা হলে শেষ পর্যন্ত তাকে কাবু করা সম্ভব হয়, কাছে এনে আরো আক্রমণে মেরে ফেলা যায়। জাহাজে টেনে এনে, সেখানে জাহাজের বাইরে সংলগ্ন করে এই বিশাল জন্তুকে কাটাকুটি ও তেল সংগ্রহ সেটিও আর একটি মহাযজ্ঞ। তবে বহুবার বহু তিমিকে আক্রমণ করে তবেই এরকম একটি সফল যজ্ঞের সুযোগ ঘটে। এক এক মৌসুমে এমন অভিযানে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী তেল সংগ্রহ করতে পারলে তবেই বাড়ি ফেরার ছুটি।

তিমির মাথাটাই বড় সম্পদ, তার কাছেই রয়েছে স্পার্ম তিমির সেই অতি মূল্যবান স্পার্ম চর্বি, যার থেকে আসে তেল। এজন্য তিমি কাটাকুটি শুধু

কঠিন নয় এটি অত্যন্ত বিতিকিচ্ছি একটি ব্যাপার– ইসমায়েলকে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হতে হয়েছে এ কাজে– চর্বি থেকে গরম করে তেল বানিয়ে বড় বড় পিপায় জাহাজের খোলের নিচের দিকের ডেকে সংগ্রহ করে রাখাটিই সবার কাজ। বহুদিন লবন দেয়া সংরক্ষিত খাবারের পর তাজা তিমির মাংস রান্না করে খাওয়াটি কিছুটা নতুনত্ব আনে বটে, কিন্তু মোটেই মুখরোচক কিছু না হওয়াতে এটিও তেমন উৎসাহ জাগাতে পারেনা। তবে ডেকের নিচে পিপাগুলো তেলে ভর্তি হচ্ছে, শিগ্গির বাড়ি ফেরার সুযোগ হবে সেটি অবশ্য উৎসাহ জাগায়। ইসমায়েল যেভাবে এসবের বর্ণনা দেন তা বিজ্ঞানের ভাষা নয়, বরং সাহিত্যের ভাষা; কিন্তু তাতেই বরং সব কিছু বুঝতে ও উপলব্ধি করতে সুবিধা হয়।

মবিডিক উপন্যাসটি কিন্তু শুধু তিমি নিয়ে নয়, তার থেকে বেশি উপন্যাসটির নানা চরিত্র নিয়ে। প্রধান চরিত্র অবশ্যই ক্যাপ্টেন আহাব যার একটি পা ওই সাদা তিমি মবিডিক আগের এক অভিযানে নষ্ট করে দিয়েছিলো– তখন থেকে শুধু তাঁর এক পা যে কাঠের শুধু তা নয় তিনি একাধারে অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং প্রতিশোধ-পরায়ণ, কিন্তু একই সঙ্গে খুবই মজাদার একটি চরিত্র, বিশেষ করে তাঁর নাবিকদের কাছে। কিছু কিছু পার্শ্ব-চরিত্রও এতে অমর হয়ে আছে। ওই যে দশাসই পলিনেশিয়ান কুইকোয়েগের সঙ্গে হোটেলে ইসমায়েলের প্রথম পরিচয় হয়েছিলো তিনিতো সে সময় আমেরিকার বর্ণবাদী ব্যবস্থায় দাস বৈ কিছু নন। কিন্তু ইসমায়েল তাঁর মধ্যে যতটা বন্ধুত্ব, উদারতা, সাহসিকতা দেখতে পেয়েছেন অতি কাছে থেকে, তেমনটি আর কারো মধ্যে নয়। মানুষের বর্ণ যে মানুষের চরিত্র ঠিক করে দেয়না তাঁর মধ্যে দিয়ে এটি জানাই যেন ইসমায়েলের ভবিতব্য ছিল। তাই শুরুতেই তাঁর বিছানার অর্ধেকে ইসমায়েলকে হোটেলে শুতে হয়েছে, আর তাঁর অপঘাত মৃত্যুও উপন্যাসের শেষের দিকে ইসমায়েলকে দেখতে হয়েছে। এই পুরোটা সময় আনন্দে সংকটে এই দুটি একেবারে আলাদা মানুষ পরস্পরের ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ছিল। মবিডিকের আক্রমণের জেরে পুরো জাহাজই যখন ধ্বংস হয়েছে, ইসমায়েল ছাড়া জাহাজের আর কেউ বাঁচতে পারেনি, আর ইসমায়েল রক্ষা পেয়েছিলেন কুইকোয়েগের ভেসে থাকা কাঠের কফিনটিকে আশ্রয় করে, কফিনে কুইকোয়েগের লাশ ছিল। এটাও যেন ভবিতব্য ছিল।

প্রতিশোধ-পরায়ণতা, শিকার, মৃত্যু, বিশাল তিমির ওপর বিতিকিচ্ছি কাটাকুটি এসবকে নিয়েই কি ছিল পিকোড জাহাজের মধ্যে জীবন? পিকোড জাহাজটাই কি ছিল একটি কসাইখানা? না তা মোটেই নয়। জাহাজটি ছিল অতি সুন্দর, তাও আমরা ইসমায়েলের কাছ থেকে জেনেছি। তার নির্মাণ-সৌকর্যে শিল্পের ছোঁয়া আনতে কোন ত্রুটি করা হয়নি। দামী সব অলঙ্করণে এই জাহাজের কোন কোন অংশ সাজানো হয়েছে যার অনেকটা হাতীর দাঁতের কাজের, এবং তিমির হাড় ও দাঁত দিয়েও। হাল ঘোরানোর দণ্ডের মত অনেক কাজের জিনিসও এভাবে দামী অলঙ্করণে চিত্রিত। জাহাজের ছোট্ট পরিসরে এত বিভিন্ন কালচার থেকে আসা মানুষের নিজ নিজ কালচারের গল্প, কথা বলার বিভিন্ন টান সব কিছু একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতিবান জীবনেরই ইঙ্গিত দিচ্ছিলো যা অফিসার নাবিক নির্বিশেষে উপভোগ করেছে।

মবিডিকের গল্প শেষ হয়েছে আহাবের পরিশোধ-পরায়ণতার পরিণতি ধ্বংসের মধ্য দিয়ে। মবিডিক আহাবকে মেরে ফেলেছে, জাহাজটিও ধ্বংস করেছে; যারা আহাবের ওই আক্রোশকে কখনো সমর্থন করেননি, মানুষ ও পশু নির্বিশেষ সবার প্রতি দয়ার ও সহানুভূতির পক্ষে ছিলেন তাঁরা সহ সবাই নিহত হয়েছিলেন– শুধু ইসমায়েল ছাড়া। তাঁকে যেন গল্পটি বলার জন্য বাঁচতে হয়েছিলো।

টু ইয়ারস বিফোর দি মাস্ট:

আমেরিকান লেখক রিচার্ড হেনরি ডানা ‘টু ইয়ারস বিফোর দি মাস্ট’ (মাস্তুলের সামনে দু’বছর) বইটি লিখেছেন তাঁর দুই বছরের জাহাজী জীবন নিয়ে, যেটির শুরু ১৮৩৪ সালে। প্রায় উপন্যাসের দ্যোতনা নিয়ে এবং এই জীবনের সামনে আসা সায়েন্স-আর্টসের সুন্দর প্রকাশ নিয়ে তাঁর এই আত্মজীবনীটি আমার বিশেষ প্রিয়। এটি আরো দুর্দান্ত লেগেছে ওই দুটি বছরের জন্য লেখক নিজের জীবনে একটি স্ব-আরোপিত অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব-পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন বলে। এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত লেখক উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সেখানে পড়াশুনার একটি পর্যায় শেষ করেছেন। এ সময় মনের এক ভাবান্তরে তিনি ঠিক করলেন অন্তত কিছুদিনের জন্য নিজের শ্রেণী পরিবর্তন করে সাধারণ

শ্রমজীবী নাবিক হিসেবে জাহাজে নাম লেখাবেন। সেখানে আদিবাসীসহ বিভিন্ন জাতীয়তার খুবই সাধারণ স্বল্পশিক্ষিত অন্যান্যদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবেন। উদ্দেশ্য সেই জগতটাকে দেখা, আর সব মানুষ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন।

পিলগ্রিম নামের পালতোলা জাহাজে আমেরিকার পূর্ব উপকূলে বোস্টন বন্দর থেকে যাত্রা করে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণতম বিন্দু কেইপ হর্ন ঘুরে ক্যালিফোর্নিয়ায় অর্থাৎ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে পৌঁছেছেন। সেখানে জাহাজটি ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল ঘেঁষে দক্ষিণ থেকে উত্তরে এবং আবার উত্তর থেকে দক্ষিণে বার বার আসা যাওয়া করে বন্দরে বন্দরে থেমেছে। এ সময় মাল ওঠানামার কাজ করেছেন নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত গরুর কাঁচা চামড়া নিয়ে। চামড়া নেয়া হয় বিশেষ কেন্দ্রে পাকা করার জন্য এবং তারপর আমেরিকার পূর্ব উপকূলের রমরমা উন্নত কেন্দ্রে পাঠাবার জন্য। নাবিকের কাজই বলি আর ওই বন্দরের কাজই বলি সবই ছিল অমানুষিক পরিশ্রমের কাজ। অবশেষে ফেরার সুযোগ হলো এলার্ট নামের আরেকটি জাহাজে প্রায় একই পথে কেইপ হর্ন ঘুরে আবার বোস্টনে, পুনরায় হাভার্ডে যোগ দিতে। পরে বইটি যখন লিখলেন (প্রকাশকাল ১৮৪০) তখন তাতে তিনি যতটা না সাহিত্যের আনুষ্ঠানিক ভাষা ব্যবহার করেছেন তার চেয়ে বেশি সহজ ভাষায় গল্প বলার ঢঙ অনুসরণ করেছেন। জাহাজী জীবন ও শ্রমিক জীবনটিকে পুরোপুরি তুলে ধরার চেষ্টা করলেন যেন যে কোন পাঠককে নতুন মানুষ হিসেবে এর মধ্যে টেনে আনার জন্য।

পিলগ্রিম জাহাজটি ছিল ছোট মামুলি একটি ব্রিগ শ্রেণীর জাহাজ, দুই মাস্তুলে আড়াআড়ি পালের জাহাজ। মাত্র আটজন সাধারণ নাবিক এবং তিনজন অফিসার নিয়ে– ক্যাপ্টেন, ফার্স্ট মেইট, সেকেন্ড মেইট। শ্রেণী বিভাজন অবশ্য ছিল আরো জটিল। ক্যাপ্টেন ও ফার্স্ট মেইট এক সঙ্গে খানা খেলেও সেকেণ্ড মেইট খেতেন পরে একা– শ্রেণী বিভাজনে তিনি পড়ে গিয়েছিলেন না অফিসার না সাধারণ নাবিক এমন একটি জায়গায়। অন্যদিকে নাবিকদের মধ্যে স্টুয়ার্ড, বাবুর্চি ও ছুতারের একটু আলাদা উচ্চতর স্থান ছিল। ফার্স্ট মেইটের অধীনে একটি প্রহরার পর আসতো সেকেন্ড মেইটের অধীনে আর একটি। প্রহরার সময় সবাইকে প্রতি মুহুর্ত ব্যস্ত রাখা হতো,

কিছু কাজ না থাকলে ঘষে ঘষে ডেক পরিষ্কার করো। তবে কাজের কমতি ছিলনা– ওপরে প্রধান ডেক থেকে মাস্তুলের ১০০ ফুট পর্যন্ত ওপরে উঠে পাল গুটাও, পাল নামাও– বাতাসের গতি অনুযায়ী এগুলো সারাক্ষণ লেগেই থাকতো। কখনো কিছুটা কোণ করে বাতাসের গতির বিপরীতে যেতে হলে আড়াআড়ি সব স্কোয়ার পাল সব এক সঙ্গে ঘোরাতে হতো এক সঙ্গে দড়ি টেনে। মাস্তুলের ওপরে উঠে কাজ করার সময় পা ফসকে পড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল পদে পদে। এই ঝুঁকি আরো বেড়ে যেতো যখন হিমশীতল বাতাসের ঝড়ের মধ্যেও ওপরে উঠে কাজ করতে হতো। ডানার চোখের সামনে এক বন্ধু নাবিক সমুদ্রে পড়ে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে।

ক্যাপ্টেনের হুকুমই আইন। সে হুকুম যতটা না বিবেচনা থেকে তার থেকে বেশি যেনতেন ইচ্ছে থেকে, যে সামনে পড়লো তাকেই কাজ চাপিয়ে দেয়া– তার পক্ষে কাজটা করা কতটা সম্ভব বিবেচনা না করে। হুকুম পালনে আপত্তি অথবা তাতে বিন্দুমাত্র গাফিলতির পরিণতি খুব ভয়াবহ হতো– চাবুক মারাটাই স্বাভাবিক শাস্তি। এমনি চাবুকের শাস্তি ডানা বার দু'য়েক দেখেছেন; একবার স্বয়ং স্টুয়ার্ডকে। বলা হতো নাবিকদেরকে এভাবে শাসনে না রাখলে নিরাপদে জাহাজ চালানো অসম্ভব।

ডানা হার্ভার্ডে পড়া মূলস্রোতের একজন মানুষ ছিরেন– হঠাৎ করে চলে গিয়েছিলেন এক অদ্ভুত বনবাসে। সেকালে সমুদ্রে জাহাজে থাকার মানে ছিল স্থানে ও কালে বিশ্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। টু ইয়ার্স বইটিতে পদে পদে এই বিচ্ছিন্নতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর যাতায়াতের পরিধি গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো জাহাজের ওইটুকু জায়গার মধ্যে, অথচ সেটিই আবার চলছিলো সীমানা বুঝতে না পারা সমুদ্রের ওপর দিয়ে। কোথায় আছি বুঝতে হয় অনেক কসরৎ করে। উত্তর-দক্ষিণের অবস্থান জানতে সেই কসরৎ বেশি নয়। ধ্রুব তারার কৌণিক উচ্চতা দেখে তা বোঝা যায়, যত দক্ষিণে বিষুব রেখার দিকে যাচ্ছি ধ্রুবতারা তত দিগন্তের দিকে নেমে আসছে। পূর্ব-পশ্চিমেরটিতে প্রায়ই ভুল হয়ে যায়, ভুল জমতেও থাকে। বোস্টনের সময় দেয়া ঘড়িটি ঠিক থাকলে সমস্যা হতোনা, কিন্তু তা থাকে কৈ? শিগগির ডানার ডায়রিতে এক জায়গায় লিখতে হয়েছে: 'ক্রোনোমিটারটি একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে আজ। এটি ঠিক থাকলে এর সঙ্গে জাহাজের নিজের ঘড়ির সময়ের তুলনা করে

বোঝা যেতো কতটা পশ্চিমে বা পূর্বে এসেছি। জাহাজের নিজের ঘড়িতে সময় ক্রমাগত পরিবর্তন করতে হচ্ছে সূর্য দেখে। তার ওপর জাহাজের প্রহর রাখার ঘন্টার শব্দেই সবাইকে চলতে হয়। ঝড়ে-দুর্যোগে জরুরি অবস্থায় তাও এলোমেলো হয়ে যায়।' সব কিছুর মধ্যে কিছুটা বোধ ফিরে আসে যখন পথে অন্য কোন জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়। তখন অল্পক্ষণের জন্য হলেও ওই জাহাজের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে অন্তত তারা সময়টি ও অবস্থানটি কী মনে করছে সেই আন্দাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। এমন সাক্ষাত পাওয়া যাত্রাপথের একঘেঁয়েমি অনেকটা দূর করে, যদিও কথা যা হয় তা দুই ক্যাপ্টেনের মধ্য, তাও পূর্ব-পশ্চিম অবস্থানের ব্যপারে প্রায়ই দু'জনের মতের মিল হয়না।

বোস্টন থেকে পুরো দুই মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণ অংশে সানডিয়াগোতে পৌঁছলে পিলগ্রিমের প্রধান সমুদ্র যাত্রা শেষ হলো; এরপর শুধু পশ্চিম উপকূলের কাছ ঘেঁষে দীর্ঘদিন ধরে উত্তর-দক্ষিণ করা। ক্যালিফোর্নিয়া তখনো মেক্সিকোর শাসনাধীনে, কিছু আগে স্পেনের শাসন শেষ হয়েছে। মেক্সিক্যান ক্যাথোলিক চার্চ বলতে গেলে এখানকার সবকিছুর কর্তৃত্বে আছে, যদিও অবশ্য সামরিক বাহিনীকেও কাজে লাগানো হচ্ছে। এক ধরনের শাসন শৃঙ্খলা তারা ধরে রেখেছে, ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য রাখছে। এই শেষের দিকটিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব বাড়ছে, সেখান থেকে আসা লোকসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। অন্য নাবিকদের মত ডানারও এখানে কিছুটা নাবিকের এবং অনেকটা শ্রমিকের ভূমিকা; দক্ষিণে সানডিয়াগো থেকে উত্তরে সোনোরা পর্যন্ত বন্দরে বন্দরে। সবই নেহাৎ ছোট ছোট শহর। এর বিস্তীর্ণ প্রান্তরে গরু চরাবার যে ব্যবস্থা, এবং গরুর মাংসের যে ব্যবসা, সেখান থেকে সংগৃহীত হতো কাঁচা চামড়া। সমুদ্র তীরে স্তুপ করে রাখা হতো সেগুলো। অনেক সময় হাঁটু পানিতে দাঁড়িয়ে চামড়াগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন জাহাজের দিকে আর চামড়াগুলো ঘুড়ির মত ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে জাহাজের ডেকে জমতো। পাকা করার কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াই উদ্দেশ্য– দ্রুত সেখানে না নিতে পারলে চামড়া নষ্ট হবে। সানিডায়াগো, মন্টেরেরী, সান ফ্রান্সিসকো সর্ব জায়গাতেই এই একই কাজ। পাকা চামড়াগুলো শেষ পর্যন্ত জমা হচ্ছে সানডিয়াগোর বড় গুদামে। নাবিকরা সব সময় সেখানে ঢুকে দেখছে কী

পরিমাণ চামড়া জমেছে। মোট ৪০ হাজার যখন হবে তখন বাড়ি ফেরার সময় হবে।

আগাগোড়া একেবারেই শ্রমিকের জীবন। কিন্তু যেখানেই থাকেন না কেন প্রতি রোববার ডানার রূপান্তর ঘটে। সেদিন তিনি শিক্ষিত মার্জিত রূপ লাভ করেন। ইতোমধ্যে স্প্যানিশ শিখেছেন। প্রত্যেক শহরে অভিজাত নানা পরিবার ও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সখ্যতা গড়ে ওঠে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে আসা অনেকের সঙ্গেও। ওখানে এক একবার এক সঙ্গে দেশ থেকে বহু দিনের খবরের কাগজ আসে। সেগুলো পড়ে তিনি জানতে পারেন দেশের হালচাল। ক্যালিফোর্নিয়ার আদিবাসীদের জীবনের সঙ্গেও তিনি পরিচিত হন। তাদের বেশির ভাগ মানুষ খুব গরীব– কিন্তু তাদের মধ্যেও মহিলাদের চেহারা কমনীয়, তারা সুন্দর গাউন পরে বেশ ফিটফাট, ভদ্র মার্জিত স্বভাবের। ক্যাথোলিক চার্চের প্রভাব স্পষ্ট। পুরুষরা তাদের কাজের ধরনের মতই রুক্ষ।

শ্রমের কাজে স্থানীয় গরীব আদিবাসীদের সঙ্গে যোগ দিতে এসেছে বহু দূরের বহু জাতীয়তার মানুষ– প্রধানত পলিনেশিয়ান দ্বীপগুলো থেকে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে স্যান্ডউইচ আইল্যান্ডের মানুষ (বর্তমান হাওয়াই)। চামড়ার কাজে এদের প্রাধান্য বলে ডানার সঙ্গে এদের অনেকের রীতিমত খাতির। তাদের সঙ্গে মেশার একটি সুযোগ ছিল চামড়া পাকা করার কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে দীর্ঘ সময় ডানাকে জাহাজের বাইরে সানডিয়াগোর সমুদ্রতীর এলাকায় পাকা করার কেন্দ্রের কাছাকাছি থাকতে হয়েছিলো। ওখানে কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই পাকা করার বিজ্ঞানের নানা খুঁটিনাটিও তুলে ধরেছেন। বলা বাহুল্য কাজটি খুব পরিবেশ-বান্ধব বা সুখকর কিছু ছিলনা। তিনি লিখেছেন কী ভাবে এক একটি চামড়ার থেকে চেঁছে চেঁছে চর্বির শেষ চিহ্নটুকুও তুলে ফেলতে হয়। তারপর প্রচুর লবন মাখাতে হয়, ক্যামিকালের দ্রবণে অনেকদিন ডুবিয়ে রাখতে হয়। এসব অত্যন্ত অপ্রিয় ও সময়সাপেক্ষ কাজ। শেষ পর্যন্ত অনেকটা শুকিয়ে নিয়ে সানডিয়াগোর সেই গুদামে আপাতত রাখতে হতো এই আংশিক পাকা করা চামড়া।

এই যে জাহাজ ছেড়ে ডাঙায় অনেক দিন থাকার সুযোগ পেয়েছেন এটি ডানাকে জাহাজের একটানা সময়ের মধ্যে একটি অন্য সুযোগ দিয়েছে। তিনি এক শহর থেকে অন্য শহরে নিজেও স্বাধীন ভাবে ভ্রমণ করেছেন রোববার ও

অন্য কিছু ছুটির দিনগুলোতে তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ– মার্জিত উচ্চ শিক্ষিত মানুষ হিসেবে। অনেক বড় বড় মানুষের কাছে আমন্ত্রিত হয়েছেন, এখানকার চার্চ ও প্রশাসন কর্তৃপক্ষের, মিশনারীদের এবং অভিজাত কিছু পরিবারের কাছাকাছি গিয়েছেন। পরে বোস্টনে বাড়ি ফিরে স্বাভাবিক জীবনে বেশ কিছু বছর কাটাবার পর তিনি অনেকটা পরিবর্তিত ক্যালিফোর্নিয়ায় আবার এসেছিলেন, এই আগের পরিচিত মানুষদেরকে খুঁজে নেবার চেষ্টা করেছেন। অবশ্য যাঁদেরকে খুঁজে নিতে পারেননি তাঁরা হলো তাঁর শ্রম দেবার বন্ধু ও সহকর্মীরা। তাঁদের মধ্যে সব থেকে দুর্দশায় ছিলো ওই সুদূর স্যান্ডউইচ আইল্যান্ড থেকে আসা কাঙ্কান গোষ্ঠির মানুষগুলো, কেউ কেউ ডানার বেশ ঘনিষ্ঠই হয়ে পড়েছিলো, নিজের দেশের জীবনের কথা ডানাকে অনেক শুনিয়েছে। ওরা অনেকেই গাদাগাদি করে থাকতো সমুদ্র তীরে অদ্ভুত ওভেনের (তন্দুর) মত আকৃতির একটি ঠুন্‌কো ঘরে, যাকে ডাকাও হতো ওভেন।

অবশেষে সেই বহু প্রতীক্ষিত ফেরার সময় এলো, কিন্তু জাহাজের অভাবে তাও বিলম্বিত হয়েই চল্‌ছিলো– ভাগ্যক্রমে ডানা এলার্ট নামে আরেকটি জাহাজে বাছাই হয়ে গেছেন। এটি পিলগ্রিমের থেকে আরো বড় আরো ভাল জাহাজ। তবে এর ক্যাপ্টেন টমসন খুবই অত্যাচারী– নাবিকদের চাবকানোর ঘটনা এই ফেরার পথেই বেশি দেখেছেন। এলার্টের ফার্স্ট মেইট অবশ্য ছিলেন ক্যাপ্টেনের ঠিক উল্‌টো খুব দয়ালু, খুবই চিন্তাশীল। তখনই ডানার মাথায় আসে যে বাড়ি ফিরে আরো পড়াশুনা করে জাহাজী আইন ও রীতিনীতিতে পরিবর্তন আনার জন্য তিনি জোর চেষ্টা চালাবেন। সত্যিই তিনি ঠিক তাই করেছিলেন– বোস্টনে ফিরে তিনি আইন পড়েছেন, আইনজ্ঞ হয়েছেন, রাজনীতিবিদও হয়েছেন– সত্যি সত্যি জাহাজী আইন সংস্কারে অবদান রেখেছেন ।

কিন্তু এখন এই এলার্টে সানডিয়াগো থেকে বোস্টন ফেরাটি কিন্তু মোটেই নির্বিঘ্ন হয়নি, যদিও তিনি তখন নাবিক হিসেবে অনেক বেশি দক্ষ ও স্বচ্ছন্দ। সমুদ্র যাত্রার সকল দুর্যোগই যেন ফিরতি পথে ভর করেছিলো, বিশেষ করে এই দিক থেকে শীতের মৌসুমের কেইপ হর্ন যেন ভয়ঙ্কর সমুদ্রপথ হিসেবে তার সকল দুর্নাম নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলো। যাত্রার এই দক্ষিণতম

বিন্দুতে জাহাজ এলার্টকে উত্তর পূর্ব দিকে পূর্ণ বাঁক নিয়ে উত্তর আমেরিকা ও বোস্টনের দিকে যাওয়া শুরু করতে হয়েছে আর এইখানেই ক্ষণে ক্ষণে অত্যন্ত শীতল সমুদ্রঝড়, সাগরের উত্থাল রূপ যে কোন জাহাজের জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। এলার্টকে এর মোকাবেলা করে কোন ভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। সমুদ্র ঝড়ের বিরুদ্ধে লড়তে ডানাকে অন্যদের মত ওই বরফ ঝড়ের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে মাস্তুলের ওপর একশ ফুট ওঠে পাল গোটাতে হয়েছে, খুলতে হয়েছে। এক একবার এই পথ সম্পূর্ণ ছেড়ে একেবারে উল্টো পথে চলে যাবার কথাও ক্যাপ্টেনকে ভাবতে হয়েছে। জীবনে এই প্রথম ভাসমান বরফ হিম শৈল দেখলেন ডানা, এর ভেতর দিয়ে জাহাজকে নিতে হলো। এ বইয়ে এর বর্ণনা বোধ হয় জাহাজী সাহিত্যের সুন্দরতম একটি অংশ। মবিডিকের লেখক বলেছেন টু ইয়ার্স বইটিতে কেইপ হর্ন অধ্যায়ে তাঁর বন্ধু ডানা যেন কলম দিয়ে লেখেননি, সর্বত্র ছুরির শলাকার মত চিকণ শক্ত যে বরফ জমেছিল তাকেই কলম হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

বিপদের ওপর বিপদ এসে পুরো জাহাজের নাবিকরা যেন এক সঙ্গে স্কার্ভি রোগে আক্রান্ত হয়েছে এর পরে পরেই। কেইপ হর্নের কাছে প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে গিয়ে জাহাজটির এত বেশি সময় লেগেছিল যে খাওয়ার মতো টাটকা কিছু জাহাজে অবশিষ্ট ছিলনা; কোন রকম শাকসব্জীর দেখা দীর্ঘ সময় না মেলাতে একেবারে কাহিল করা এই রোগের সূত্রপাত। বোস্টনের দিকে যখন নিয়মিত জাহাজী পথে এলার্ট অনেক দূর এগিয়ে গেছে তখন বোস্টন থেকে আসছে এরকম একটি জাহাজের সাক্ষাৎ পেয়ে গিয়েছিলেন। ক্যাপ্টেন টমসন ও কয়েকজন অফিসার ওই জাহাজে গিয়ে কিছু টাটকা খাবার দেবার অনুরোধ করেন। জাহাজটি পেঁয়াজের একটি বড় চালান নিয়ে যাচ্ছিলো, সেখান থেকে প্রচুর পেঁয়াজ এলার্টের নাবিকদের দান করলেন। তারপর যতদিন সমুদ্রে ছিলেন ডানা আর সহকর্মীদেরকে রাত দিন মহানন্দে শুধু কাঁচা পেঁয়াজ খেতে দেখা গেছে। বোস্টনে পৌঁছার আগেই স্কার্ভি সবার সেরে গিয়েছিলো।

তারপর আবার হাভার্ড, প্রথিতযশা একজন আইনজ্ঞ, সাহিত্যিক, জাহাজী আইন সংস্কারক, সদ্য যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে আসা ক্যালিফোর্নিয়ার বন্ধু।

অভিযাত্রায় পৃথিবী ও মানুষের মুখ

অভিযাত্রার যুগ ও তার আগেঃ

দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় দূরে যেতে হলে জাহাজের যে উন্নয়নগুলো দরকার ছিল তার অধিকাংশ এসেছে চীনাদের থেকে। তার মধ্যে প্রধানগুলো হলো দিগদর্শক কম্পাস, আগে-পিছু খাটানো পাল (ত্রিভুজাকার) যা বাতাসের প্রায় বিপরীতেও যেতে পারে, এবং জাহাজকে ডান বাম করতে পারার জন্য তার পেছনে পশ্চাৎ- হাল। এর আগে গ্রীক-রোমানদের আমল থেকে মধ্যযুগে চলে আসা চলে আসা ইউরোপীয় জাহাজ আড়াআড়ি স্কোয়ার পালে (আয়তাকার) শুধু বাতাসের ঠেলায় তার অনুকূলেই যেতে পারতো; আর খুবই পরিশ্রম করে বিশাল জায়গা ঘুরে দাঁড় বাওয়ার মত করে দাঁড় দিয়ে জাহাজ ঘোরাতে পারতো; আকাশের তারা দেখে দিক নির্ণয় করতো। এদের জাহাজ চালনা মোটামুটি ভূমধ্যসাগরে এবং অন্যত্র স্থানীয় সাগরে সীমাবদ্ধ ছিল। এসব সীমাবদ্ধতার কারণে এগুলো মহাসাগরে অবাধে বিচরণ করতে পারতোনা। ১২০০ থেকে ১৫০০ সালের মধ্যে কিং বংশের চীনা সম্রাটরা তাঁদের বাণিজ্য জাহাজ সারা ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর হয়ে আফ্রিকার উপকূল ও ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত পাঠাতেন। কিন্তু এপর মিং সম্রাটরা চীনকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করার নীতি গ্রহণ করেলে চীনের এই নৌ-বাণিজ্যে ভাটা পড়ে। জাংক নামে পরিচিত এই চীনা জাহাজ ছিল তখন পর্যন্ত সব থেকে উন্নত জাহাজ; আরব পরিব্রাজক ইবনে বতুতা তাঁর ‘রিহলা’ (ভ্রমণ) নামের ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন যে তিনি ১৩ শতকের প্রথম দিকে সিংহল থেকে একটি চীনা জাংকে চট্টগ্রাম বন্দরে এসেছিলেন, এবং চট্টগ্রাম-সিলেট অঞ্চলে কিছুদিন কাটিয়ে আরেকটি চীনা জাংকেই চট্টগ্রাম ছেড়ে চীনে গিয়েছিলেন।

প্রায় একই এলাকার মহাসমুদ্রে চীনাদের উত্তরসূরী ছিল আরবরা, মূলত চীনা প্রযুক্তির ব্যবহার করেই। তাঁরাই চীনা প্রযুক্তিকে মধ্যযুগের ইউরোপে নিয়ে গিয়েছিলেন। যাকে আমরা ‘অভিযাত্রার যুগ’ বলে চিহ্নিত করি সেটি ইউরোপীয়দের ব্যাপার– ১৪০০ শতকের গোড়ার দিক থেকে ইউরোপের রেনেষাঁর অংশ হিসেবে। এতে অগ্রণী ছিল পর্তুগীজ ও স্প্যানিশরা। অবশ্য পরে পরেই ইতালী, হল্যান্ড, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের নাবিকরাও এই অভিযাত্রার যুগে যোগ দিয়েছিলো যার রেশ বজায় ছিল উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। ওই অভিযাত্রাগুলোর ফলেই ইউরোপীয়দের কাছে এবং সেই সুবাদে সারা দুনিয়ার

কাছে, ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়েছিলো পৃথিবীর মুখ আর তার নানা প্রান্তের মানুষগুলোর মুখ। কিন্তু ওই ১৪০০ শতকেই ওভাবে অভিযাত্রার যুগটি শুরু হবার কারণ কী ছিল?

এর আগে ১২০০ শতক থেকেই মধ্য এশিয়া, চীন, ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য এগুচ্ছিলো স্থলপথে প্রধানত সিল্ক বোড বলে পরিচিত এক রহস্যময় বিচিত্র পথে। এতে ইতালীর দুটি সমৃদ্ধ নগর-রাষ্ট্র ভেনিস আর জেনোয়ার প্রাধান্য ছিল। ও সময় আবার ইসলামী আরব শক্তিকে রুখতে পোপের আহবানে পূর্ব দিকে আসা ইউরোপের নানা খৃষ্টান রাজ্যের সম্মিলিত ধর্মযুদ্ধ (ক্রুসেড) বাহিনীর সৃষ্ট সংঘাত তুঙ্গে উঠেছে। দুর্ধর্ষ মোঙ্গল আক্রমণকারী হালাকু খান ও অন্যান্যদের আক্রমণেও পুরো অঞ্চলটিই ছিল জর্জরিত। এশিয়ার কিছুটা কাছাকাছি খৃষ্টান শক্তি ছিল কনস্ট্যান্টিনোপলের বাইজানটাইন সাম্রাজ্য। সেলজুক ও পরে অটোমান তুর্কীদের সামরিক উত্থানে ও নানামুখী শক্তি সঞ্চয়ে সেটি ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়েছিলো। এদিকে ইবনে বতুতা আর মার্কোপলোর মত পরিব্রাজকদের রচিত বই থেকে ইউরোপের অগ্রসর অংশ চীনের, ভারতের ও মালয়-ইন্দোনেশিয়ার মশলাদ্বীপের অসামান্য বৈভবের কথা ও বাণিজ্য সম্ভাবনার কথা শুনে মোহিত। অথচ সিল্ক রোডের এশীয় বাণিজ্য দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছিলো। তাছাড়া তাতে ভেনিস ও জেনোয়ার একচেটিয়া প্রভাব উঠতি খৃষ্টান রাজ্য স্পেন ও পর্তুগালের হিংসের কারণ হয়ে দাড়িয়েছিলো। তবে স্থলের এশীয় বাণিজ্যের শেষ আশা-ভরসা ১৪৫৩ সালে অটোমান সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদের হাতে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের মাধ্যমে বিলুপ্ত হয়েছিলো। সেই থেকে এশীয় বাণিজ্যকে সমুদ্র-নির্ভর করার চেষ্টাই অভিযাত্রার যুগের সূচনা করেছিলো। এজন্য দরকার হলো একদিকে দীর্ঘ যাত্রার জন্য জাহাজের উপযুক্ত স্থাপত্য, অন্যদিকে নিরাপদ সমুদ্রপথের সন্ধান। সেখান থেকেই অভিযাত্রা যুগের কাহিনী। এই দিকটিতেও দেখবো নতুন আর্ট আর নতুন বিজ্ঞানের চমক এসে রেনেসাঁর অন্য এক সৃষ্টিময়তা।

স্পেন, পর্তুগাল, জেনোয়া, ভেনিস– এদের জাহাজগুলো ক্রমে দূরপাল্লার উপযুক্ত হলো, দীর্ঘ অভিযানের সুরক্ষা ও বাণিজ্যের উপযুক্ত করে জাহাজের আকার বড় ভারী দুর্গের মত হলো, যদিও বরাবরের মত বাতাসের অনুকূলে

চলার উপযুক্ত সমুদ্রপথই তার লক্ষ্য হলো। তবে প্রয়োজনে বাতাসের বিপরীতে চলার দুরূহ ব্যবস্থাও তাতে রইলো। কাজেই অধিকাংশ জাহাজ হলো আড়াআড়ি বড় বড় স্কোয়ার পালের; তার মধ্যে আগে-পিছু খাটানো ত্রিভুজাকার কিছু পাল। পুরো ব্যাপারটিই বিকশিত হলো হঠাৎ অদ্ভুত মনোযোগ পাওয়া বিচিত্র জাহাজী প্রযুক্তি এবং জাহাজী আর্টের এক অপূর্ব মিশ্রণে। এর প্রভাবে কিছুটা পরে উত্তর ইউরোপের প্রতিযোগী শক্তি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও হল্যান্ড প্রায় একই ধারায় সমুদ্র যাত্রায় অগ্রসর হলো।

উত্তরে আরো একটি সম্পূর্ণ পৃথক আগ্রাসী সংস্কৃতি বহু আগে থেকে জাঁকিয়ে বসেছিলো– সেটি হলো ভাইকিং জাহাজের। এটি ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন ইত্যাদি নর্ডিক দেশের মানুষের দুঃসাহসী সব অভিযানের ফসল। ৮০০ থেকে ১১০০ শতক পর্যন্ত শক্তিশালী ভাইকিং সাম্রাজ্যগুলোর দুর্ধর্ষ সৈন্যরা তাদের বিশেষ ধরনের জাহাজে সারা ইউরোপে এবং উত্তর আমেরিকায় ও তাদের দখলদারিত্ব বিস্তার করছিলো। তবে শেষ পর্যন্ত স্থানীয়দের সভ্যতার সঙ্গে মিশে গিয়ে সেখানে শুধু তাদের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবটিই বজায় ছিল। গ্রীনল্যান্ড, আইসল্যান্ড, কানাডা ইত্যাদি দুর্গম জায়গাগুলো আবিষ্কার করে সেখানে তারা আজ অবধি বসত করছে। তাদের দ্রুতগামী জাহাজগুলো ছিল ছোট ও সরল প্রকৃতির– বড় নৌকার মত বলা যায়, যার সামনের ময়ূরপঙ্খীর মত গলা বাড়ানো জায়গাতে ড্রাগনের মত ভীষণ-দর্শন কিছুর মূর্তি থাকতো। ওই নৌকার পাটাতনে শুয়ে বসে কাটিয়ে, একটি মাত্র চামড়ার মজবুত একটি মাত্র স্কোয়ার পালের সাহায্যে তারা এখানে ওখানে দ্রুত হানা দিতো সেই উত্তরাঞ্চলে। কিন্তু অভিযাত্রার যুগে এসে এই পৃথক জাহাজী সংস্কৃতিটি তেমন প্রভাব রাখতে পারেনি। তারা যে উত্তর আমেরিকায় প্রথম গিয়েছিলো বলে দাবি করা হয় তার কোন সুদূরপ্রসারী বিস্তারও ঘটেনি। তাদেরো পরবর্তী কালের জাহাজী সংস্কৃতি ওই পর্তুগীজ-স্প্যানিশ কায়দা অনুসরণেই বিস্তৃত হয়েছে।

অভিযাত্রা মানে অজানার পথে যাওয়া। নিয়মিত সমুদ্র বাণিজ্য চালু হবার পর একদিন দূর সমুদ্রের পথে যাওয়া সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। বহুল ব্যবহৃত সমুদ্রপথগুলো স্থলভাগের আন্তর্জাতিক মহাসড়কের মতই নাবিকদের বহু পরিচিত সাধারণ অভিজ্ঞতায় চলে এসেছে; সেই সঙ্গে পথের এবং

গন্তব্যের মানুষ ও তাদের সংস্কৃতিও। কিন্তু এগুলো সবই হয়েছে ঠেকে ঠেকে শিখে শিখে। যাঁরা প্রথম যাবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা কিছুই জানতেন না, তাঁদের কাছে পথের কোন নিশানা ছিলনা, অজানা জায়গার মানুষেরও না। তাঁরা সম্পূর্ণ অজানার পথে পাড়ি দিয়েছেন অসম্ভব রকম ঝুঁকি নিয়ে। পথ তাঁরা তৈরি করেছেন। তাঁরাই অভিযাত্রী। তাঁদের কাছে সমস্যাগুলোই সব জানা ছিলনা, এগুলো যখন দেখা দিয়েছে প্রাণ হাতে নিয়ে সমাধান করেছেন। যে পদ্ধতিতে তাঁরা তা করেছেন সেটিই জন্ম দিয়েছে বহু বিজ্ঞান ও আর্টের যা আজো আমরা উপভোগ করছি।

যে পথে ঘন ঘন কিছু দূরে দূরে সুবিধাজনক জনবসতি সম্পন্ন উপকূল বা দ্বীপে থাকার সুযোগ আছে কিনা জানা নেই, সেখানে সঙ্গের খাদ্য রসদ, খাওয়ার পানি কতদিন চলবে সেই মৌলিক খবরটিই তাঁদের জানা ছিলনা। ও পথে জাহাজ চলবে কিনা তাও জানা ছিলনা। জাহাজ চল্‌ছে বায়ু প্রবাহকে ভরসা করে। সেই বায়ু প্রবাহ কোথায় কী রকম আছে, আদৌ আছে কিনা, কী ভাবে পরিবর্তিত হয়, সমুদ্র স্রোত কোথায় কী রকম এসব না জেনেই তো পাড়ি দিতে হয়েছে। প্রত্যেকটি অঞ্চলের সামুদ্রিক ঝড়ের বাৎসরিক সম্ভাবনাগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকা চাই। সব জায়গা জাহাজের জন্য নিরাপদ নয়, সব মৌসুমে একই ভাবে নিরাপদ নয়– এমনকি কোন উপকূলে বা দ্বীপে জাহাজ ভেড়ানোর জায়গাটি কোথাও ধাক্কা না লাগিয়ে ভিড়ার উপযুক্ত না হলে সেখানেই ঘটতে পারে জাহাজটির ধ্বংস। পানির তলায় অদৃশ্য চরা, ধারালো শিলা, প্রবাল ইত্যাদিও গোপন শত্রু হিসেবে অপেক্ষা করতে পারে। জাহাজ জিনিসটা, বিশেষ করে সেদিনের কাঠের জাহাজ প্রকৃতির কাছে অত্যন্ত অসহায় এবং ভঙ্গুর একটি জিনিস, নিরাপদে রাখতে পারলেই শুধু এটি বিশ্ব জয় করতে পারে।

এর অনেক কিছুর একমাত্র উত্তর হলো পূর্ববর্তীদের করা ম্যাপ ও চার্ট। সেগুলো তৈরি হয়েছে পূর্ববর্তী অভিযাত্রীদের জরিপের ও পরিমাপের মাধ্যমে। ওই যা যা বলা হলো তার সবই সমুদ্র পথের চার্টে চিহ্নিত হয়ে থাকার কথা। চীনা নাবিকদের নিজস্ব কায়দায় তৈরি ভাল চার্ট ছিল। মধ্যযুগে একজন আরব পণ্ডিত আল ইদ্রিস নানা সূত্র থেকে তথ্য নিয়ে খুব ভাল চার্ট তৈরি করেছিলেন। পরবর্তী বহুকাল নানা দেশের জাহাজ আল ইদ্রিসের চার্টের

ওপর নির্ভর করতো। এ্যাস্ট্রালোব (আরবদের মহাকাশ কম্পিউটার), স্যাক্সটান্ট যন্ত্র তখনো ছিল। অভিযাত্রীরা নানা সমুদ্রে জ্যোতির্বিদ্যার মাধ্যমে সেখানকার অবস্থান ইত্যাদির পরিমাপ নেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সমস্যা হলো দীর্ঘ পথের যাত্রী জাহাজের জন্য সবকিছু বৈশ্বিক ভাবে করতে হয়েছে– প্রত্যেক জায়গার উপাত্তকে পরস্পর সম্পর্কিত করতে হয়েছে। সেজন্য পরস্পর জানের শত্রু প্রতিযোগী নৌশক্তিগুলোকেও সমঝোতায় আসতে হয়েছে সবার জন্য একটি সাধারণ মাপজোক, চার্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এটি সহজ কাজ ছিলনা, ধীরে ধীরে সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যখন হয়েছে তখন তার মধ্যে শুধু ভূগোল বিজ্ঞানের বিষয় নয়, বিশ্বজোড়া অদ্ভুত সুন্দর আর্টের সৃষ্টি হয়েছে যেখানে মানুষ মাত্রই পুরো পৃথিবীকে উপলব্ধি করতে পারে, এর প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের সূর্যোদয়-সূর্যাস্তকেও।

পর্তুগাল, স্পেন ও অন্যান্য কিছু ইউরোপীয় দেশের রাজন্যরা নিজেরা সরাসরি এই অভিযাত্রাগুলোতে মনোযোগ দিয়েছেন, অর্থাৎ বিনিয়োগ করেছেন এবং জাহাজ উন্নয়ন, চার্ট তৈরি ইত্যাদির মতো কাজে প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। উদাহরণ স্বরূপ অভিযাত্রার যুগের একজন প্রধান আয়োজক ও স্বয়ং অভিযাত্রী ছিলেন পর্তুগালের রাজার ছেলে প্রিন্স হেনরি। তিনি ১৪০০ শতকের প্রথমার্ধে পর্তুগালের কাছে আটলান্টিকের দ্বীপসমূহ আবিষ্কার, সেখানে বসত গড়ে তোলা, আফ্রিকার উপকূল জরিপ ইত্যাদি নিজের সরাসরি অভিযানে করেছেন, এবং পুরা এলাকার চার্ট তৈরিতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন। এজন্য তাঁকে সমুদ্রপথ সন্ধানী বা নেভিগেটর হিসেবেই ইতিহাস উল্লেখ করা হয়– হেনরি দি নেভিগেটর।

ভারত যাত্রা:

১৪০০ শতকের শুরু থেকেই সমুদ্র অভিযানের ব্যাপারে পর্তুগাল দেশটি সব থেকে এগিয়ে ছিল, যদিও স্পেন ঠিক তার পেছনেই ছিল। পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে হেনরি দি নেভিগেটর জাহাজী উন্নয়নের যে কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন সেটি এই শিল্পের সব দিকে বিকাশের জন্য গবেষণা করছিলো, সমুদ্রপথ আবিষ্কার, এর চার্ট তৈরি, এজন্য সামুদ্রিক তথ্য সংগ্রহ এসব কাজে অনেক দূর এগিয়ে যায় এই কেন্দ্র। আরো বড় লক্ষ্য ছিল দূরপাল্লার উপযোগী আরো উন্নত জাহাজ। পর্তুগালের একটি জাতীয় লক্ষ্য ছিল বিশেষ

করে ভারতে যাওয়ার জন্য একটি নিরাপদ সমুদ্রপথ আবিষ্কার এবং সেটি করার পর পুরো দক্ষিণ এশিয়া, আরো দূরপ্রাচ্য মালাক্কার (মালয়ের) এবং মালাকুর (ইন্দোনেশিয়ার) মশলাদ্বীপগুলো এবং চীন পর্যন্ত বাণিজ্য বিস্তার করা। এই মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে মধ্য আটলান্টিকে ছোট ছোট দ্বীপগুলো আজ্যুর, কেইপ ভের্দে, সাওতমো ইত্যাদি আবিষ্কার, ও সেখানে বসত স্থাপনের কাজ চলেছে। তাৎক্ষণিক আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল পর্তুগাল-স্পেনের অপেক্ষাকৃত কাছে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলের সঙ্গে নিয়মিত সমুদ্র যাত্রার সম্পর্ক ও সেখানে ব্যবসায়িক কেন্দ্র গড়ে তোলা। পর্তুগীজ অভিযাত্রী বার্টোলোমু দিয়াস ইতোমধ্যে আফ্রিকার দক্ষিণতম বিন্দু উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কার করেছিলেন এবং সেটি ঘুরে যে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে চলে যাওয়া যায় সেটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন ১৪৮৮ সালে। কাজেই আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তমাশা হয়ে নিরাপদে ভারত যাবার সমুদ্রপথই হয়ে ওঠেছিলো পর্তুগীজ নাবিকদের ধ্যান-জ্ঞান।

শেষ পর্যন্ত সেই লক্ষ্য সম্পন্ন করেন পর্তুগালের কিংবদন্তীতুল্য অভিযাত্রী ভাস্কো দা গামা, ১৪৯৭ সালে। সাহস করে চারটি জাহাজের একটি বহর নিয়ে তিনি লিসবন থেকে যাত্রা শুরু করেন। সে সময় পর্তুগীজদের উন্নত জাহাজ ছিল বেশ পেটমোটা ওপরের দিকে কিছু সঙ্কুচিত, দুই প্রান্তের কুঠি যথেষ্ট বড়সড়– সম্মূখ কুঠি ও পশ্চাদকুঠি নিয়ে ‘নাও’ (কারাকও বলা হতো)। যথেষ্ট ঢাউস হয়েও অনুকূল বাতাস এর আড়াআড়ি স্কোয়ার পালে লেগে একে লক্ষ্যে নিয়ে যেতে পারবে এই ছিল আশা। আর সদ্য চালু হয়েছিলো আরো ছোট ছিমছাম আগুপিছু পাল খাটানো দ্রুতগামী ক্যারাভাল– যা সব জায়গায় যেতে পারে, বাতাসের বিপরীতেও। দা’গামার বহরে ছিল দুটি মাঝারি নাও সাও গেব্রাইল এবং সাও রাফায়েল; আর একটি ক্যারাভাল বেরিও। দুটি নাওই বিশেষ করে সাও গেব্রাইল ছিল সে যুগের ফিটফাট খুব শিল্পমণ্ডিত নাওয়ের উদাহরণ এবং ক্যারাভালটিও চোখ কাড়া একটি। চতুর্থ জাহাজটি ছিল মামুলি মাল বহনকারী একটি বড় নাও। সে যাত্রার যে আঁকা ছবি পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় ঝুঁকিপূর্ণ এ যাত্রার জাহাজ সাও গ্রেবাইলকে শুধু সমুদ্রের উপযোগীই করা হয়নি, এর প্রতিটি অংশে নান্দনিক আর্টে সুন্দর করে তোলার চেষ্টাটিও কম ছিলনা। এটাই অবাক লাগে।

আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর দক্ষিণে যেতে গেলে খুব বৈরি কিছু সমুদ্রের সাক্ষাৎ মেলে– কোথাও অসম্ভব ঝড়ো হাওয়া, কোথাও একেবারে কোন বায়ুবেগ নেই। এগুলোকে এড়িয়ে উপকূলের অনেকটা দূর দিয়েই দা'গামা উত্তমাশার কাছাকাছি হেলেনা বে'তে গিয়ে পৌঁছান। দিয়াসের একজন সহযোগী সঙ্গে থাকায় দ'াগামার পক্ষে উত্তমাশা খুঁজে নেয়া সহজ হয়েছে। এখানে অন্তরীপটি ঘুরে আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরে উত্তর পূর্বে যেতে বৈরি আবহাওয়ায় আবার সঠিক পথ খোঁজার চেষ্টা করতে হয়েছে। এখানে মোজাম্বিকের সুলতানের কাছ থেকে পথ-প্রদর্শক নিয়ে তাদের সহায়তায় চলে যেতে পেরেছেন আজকের কেনিয়ার মোম্বাসাতে। পূর্ব আফ্রিকায় তখন থেকেই দূরে পারস্য উপসাগরের আরব নাবিকদের জাহাজী ও বাণিজ্যিক আনাগোনা ছিল, যেমন আজকেও আছে– দুবাই, ওমান, বাহরায়েন ইত্যাদির সঙ্গে। তাদের যোগাযোগ ভারতের পশ্চিম উপকূলের ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গেও ছিলো। তেমনি অভিজ্ঞ ভারতীয় পথ প্রদর্শকের সহায়তায় আরো ২৩ দিন একটানা চলে দা'গামা নিজের জাহাজ বহরকে ভারতের পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে নিয়ে যেতে পেরেছেন। সেই যে গেলেন ভারত যাওয়ার একটি নির্ভরশীল সমুদ্রপথের সৃষ্টি হলো। পর্তুগীজরা নানা কৌশলে ভারতের পশ্চিম উপকূলে স্থানীয় শাসকদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে বাণিজ্যিক সুযোগ নিলো এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যে গোয়ায় একটি পর্তুগীজ উপনিবেশেও স্থাপন করলো। ভাস্কো দা গামা নিজেই আরো দুবার এই পথে ভারত গিয়েছেন দশ বারোটি জাহাজের বড় বহর নিয়ে, শেষবার গোয়ার উপনিবেশে পর্তুগীজ রাজের ভাইসরয় বা প্রতিনিধি শাসক হিসেবে। কিন্তু এই ভূমিকা পালন করতে পারার আগে ভারতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভাস্কো দাগামার শুরুর অভিযাত্রাটিতে তাঁর প্রথম ভারত আসা সফল হলেও তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে অনেক চড়া। একটি লক্ষ্যস্থলের দিকে জাহাজ চালনার সময়ের দৈর্ঘের ক্ষেত্রে সেই যাত্রা ছিল একটি রেকর্ড যদিও অবশ্য কয়েকবার নানা বন্দরে জাহাজ ভেড়ানো এবং রসদ নেবার সুযোগ ঘটেছে। এই ক্ষেত্রে পূর্ব-অভিজ্ঞ কিছু মানুষ যারা স্থানীয় ভাবে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের সঙ্গে পারস্য উপসাগর ও ভারতের মধ্যে দীর্ঘকাল যাতায়াত করে এসেছে তাদের দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পেয়েছেন। ভারত যাওয়ার পথে

মৌসুমী বায়ু দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হওয়াতে তা মোম্বাসা থেকে তাঁর জাহাজকে প্রায় সোজা কালিকটে নিয়ে গেছে। কিন্তু ফেরার সময় উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসা বিপরীত মৌসুমী বায়ু তখনো শুরু না হওয়াতে অনুকূল বাতাস পাওয়া যায়নি; এদিক ওদিক করে কিছুটা প্রতিকূল বাতাসেই কালিকট থেকে মোম্বাসা আসতে হয়েছে। এর জন্য সময় লেগে গেছে অনেক, সেই সঙ্গে খাদ্যাভাব ও রোগে মোম্বাসা আসার পথেই ৩০ জন নাবিক মারা গেছে, যার বড় অংশ টাটকা খাবারের অভাবে স্কার্ভি রোগে। তারপর মোম্বাসা থেকে উত্তমাশা ঘুরে কেইপ ভের্দেতে আসলে সেখানে বড় দুর্যোগে অনেক বিলম্ব ঘটে। ফলে লিসবন পৌঁছবার মোট ফিরতি যাত্রায় প্রায় ১১ মাস লেগে যায়। দাগামা অভিযাত্রায় বের হয়েছিলেন ১৭০ জন নাবিক নিয়ে, নানা কারণে নাবিকরা মারা যাওয়াতে লিসবনে ফিরতে পেরেছিলেন মাত্র ৫৫ জন। নাবিকের অভাবে রাফায়েল নামের নাওটিকে পথেই ছেড়ে আসতে হয়েছিলো। সে সময়ের প্রায় অজানা পথে দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার সমস্যাগুলো এ ভাবেই প্রথমদিকে দেখা গিয়েছিলো। কিন্তু এ অভিযাত্রা পথিকৃতের কাজ করে শিগগির লিসবন থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলের এই যাওয়া আসাকে নিয়মিত বার্ষিক ঘটনায় পরিণত করেছে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য ভাবে।

শুধু তাই নয় এই যাত্রা প্রসারিত হয়েছে, দক্ষিণ এশিয়ার ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যত্রও বিস্তৃত হয়েছে, এমনকি চীনের উপকূল পর্যন্তও। মালাক্কার ও মালুকোর মশলাদ্বীপ, সিংহল, বঙ্গোপসাগর উপকূল, ইত্যাদির বাণিজ্যে এভাবে ধীরে ধীরে পর্তুগীজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। পুরো সমুদ্র যাত্রাকে দুটি প্রধান মৌসুমী বায়ুর ওপর স্থাপিত করে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ে আসায় অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে গেছে। লক্ষ্য রাখতে হতো কখন লিসবন ছাড়লে পূর্ব আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু সময়মত ধরা যাবে এবং দ্রুত ভারত পৌঁছা যাবে– একই বাতাসে ভারত ছাড়িয়ে মালাক্কায়। আবার সব জায়গা থেকে ঠিক সময় এসে উত্তর-পূর্ব শীতকালীন মৌসুমীতে ভারত থেকে পূর্ব আফ্রিকায় ফেরার পালা ঠিক সময়ের শুরুতে, যাতে নির্বিঘ্নে লিসবন ফিরে যাওয়া যায়। বড় বড় বাণিজ্য বহর এভাবে এসেছে আর গেছে; একে বলা হতো নিয়মিত 'ভারত যাত্রা'। গোয়ার পর্তুগীজ উপনিবেশ এবং নৌঘাঁটি ছিল এশিয়ার পর্তুগীজ বাণিজ্যের মূল রক্ষা কবচ; তা ছাড়াও অবশ্য

ভারত মহাসাগরের সর্বত্র পর্তুগীজরা নৌশক্তির কেন্দ্র স্থাপন করেছিলো এবং নৌ-প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেছে। যেমন আরাকানী প্রশাসনে থাকা চট্টগ্রামের বন্দর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এক সময় তাদের দখলেই ছিল তাদের নৌশক্তির সহায়তায়। সেই সঙ্গে স্থাপিত হয়েছে সাংস্কৃতিক প্রভাব এসব উপকূলের সর্বত্র, প্রধানত মিশনারীদের মাধ্যমে। কিন্তু তার পাশাপাশি এসবের সঙ্গে মিশে ছিলো স্রেফ জলদস্যুতা যা সেকালের সমুদ্র যাত্রায় এক ধরনের বৈধ বিষয়ে পরিণত হয়েছিলো– প্রতিযোগী জাহাজকে সমুদ্রের মাঝে দাঁড় করিয়ে সব কিছু লুট করে নেয়া। বাংলার উপকূলে পর্তুগীজ আর্মাডা (নৌবহর) শব্দটি তাই রূপান্তরিত হয়েছিলো হার্মাদ রূপে– যা দিয়ে জলদস্যু বোঝানো হতো।

অজানা পশ্চিম:

ভূগোল নিয়ে রোমান পণ্ডিতদের এবং মধ্যযুগীয় অনেক বিখ্যাত লেখকের লেখায় কল্পনা-নির্ভর বেশ কিছু কথাবার্তা ছিল। পৃথিবীর অনেক অঞ্চলের বিষয়ে তাঁদের প্রায় অজানা থাকার কারণে কল্পনাকে দিয়ে তা পূরণ করা হয়েছিলো। এতে ইউরোপের পশ্চিমে গিয়ে পৃথিবীর গোলকাকারের কারণে জাপান, চীন, ভারত ইত্যাদি জনশ্রুতিতে খ্যাত প্রাচ্যের দেশগুলোতে সহজে পৌঁছানো যাবে এমন ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হতো। পর্তুগীজরা যখন তাদের সর্বত্রগামী ক্যারাভাল জাহাজে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল জরিপ করছে সেখানে একজন বিশেষজ্ঞ অভিযাত্রী ক্রিস্টোফার কলম্বাস জড়িত ছিলেন, যাঁর মাথায় এই পশ্চিম দিক থেকে প্রাচ্যে যাবার ধারণাটি ঘুরপাক খাচ্ছিলো। উপকূল জরিপের সঙ্গে সঙ্গে সে সময় আরব, আফ্রিকান সর্দাররা এবং ইউরোপীয়রা মিলে কালো মানুষের যে আন্তর্জাতিক দাস ব্যবসা শুরু করেছিলো সে প্রক্রিয়ায়ও তিনি পর্তুগীজদের সঙ্গে ছিলেন। কলম্বাস অবশ্য পর্তুগীজ ছিলেন না তিনি ছিলেন ইতালীর জেনোয়ার মানুষ। যদিও পর্তুগীজরা তাঁদের দেশের পশ্চিমে আটলান্টিকে বেশ কিছু দ্বীপ ইত্যাদি আবিষ্কার করে তারও পশ্চিমে জাহাজ চালিয়ে খোঁজাখুজি করেছে, কিন্তু কোন নাবিক ওখানে আর ধর্তব্যে পড়ার মত কোন স্থল দেখেননি। তবুও কলম্বাসের মাথা থেকে ওই থিওরি কখনো দূর হয়নি, বরং আরো সব কাল্পনিক দৃশ্য জড়ো হয়েছে ওই দূরপ্রাচ্যের অর্থাৎ ভারতের কাছের জায়গাগুলো যাকে ইন্ডিজ বলা হতো সেখানকার অজানা মানুষগুলোর সম্ভাব্য

হালচাল সম্পর্কে। ক্রমে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো আটলান্টিক ধরে পশ্চিমে গেলেই ওই 'ইন্ডিয়ানদের' সঙ্গে তাঁর দেখা হবে এবং তিনি ওদেরকে সভ্যতার ও খৃষ্ট ধর্মের পথ দেখাতে পারবেন।

তাঁর পশ্চিমে যাওয়ার বিশেষ লক্ষ্য অবশ্য ছিলো কিংবদন্তীর জাপান ও মার্কোপলো কথিত চীনের ধনরত্নের দিকে। কিন্তু এ কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করতে হলে তো সমুদ্র যাত্রায় উৎসাহী কোন রাজন্যকে এ কাজে নামাতে হবে– পুরো অভিযাত্রাটিকে আর্থিক আনুকূল্য দেবার জন্য। যে দেশ তা করবে তার স্বার্থ হবে নতুন সাম্রাজ্য বিস্তার, তার রাজার আরো অসংখ্য প্রজার সৃষ্টি, ওখান থেকে ধনরত্ন সম্পদ অর্জন। ইতোমধ্যে কলম্বাস পর্তুগীজদের সঙ্গে বহুকাল কাজ করছিলেন তাই স্বাভাবিক ভাবে সেখানেই চেষ্টা করলেন প্রথম, কিন্তু সফল হলেননা। এরপর স্পেনের রাজা ও রাণীর কাছে প্রস্তাব করলে তাঁরা অনেক চিন্তার পর এই অদ্ভুত প্রস্তাবে বিনিয়োগ করতে সম্মত হলেন। শুধু তাই নয় এর ফলে কী গৌরব তাঁদের হতে পারে সেই ভেবে কলম্বাসকে আগেভাগেই 'এ্যাডমিরাল অফ দি সী' নৌবাহিনীর সর্বোচ্চ খেতাব দিয়ে বেশ ক্ষমতায়িতও করলেন। এসব ১৪৯২ সালের কথা। স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলা তখন যৌথভাবে দেশটি শাসন করছেন।

তিনটি জাহাজ সুসজ্জিত করলেন কলম্বাস স্পেনের উপকূলে, যেই বহর নিয়ে তিনি অজানা পশ্চিমে যাবেন কিংবদন্তীর প্রাচ্যের সন্ধানে। যে মূল জাহাজে তিনি থাকবেন তার নাম সান্তা মারিয়া– পর্তুগীজ নাওয়ের একটি নতুন মাঝারি সাইজের সংস্করণ। কাজেই ওটিকে করা হলো মূল রসদে, অস্ত্রে, এবং ৫২ জন নাবিকে ভারী। বাকি দুটি জাহাজ পিন্টা ও নিনা ছোট হালকা ক্যারাভাল জাহাজ, প্রত্যকটিতে মাত্র ১৮ জন নাবিক। হালকা হওয়া ছাড়াও আগু-পিছু পাল খাটানো ক্যারাভাল সহজে বাতাসের প্রায় বিপরীতেও যেতে পারে বলে স্থল দেখা গেলে এগুলো সহজে দ্রুত তার কাছাকাছি গিয়ে আরো খবর নিতে পারবে। অজানা পথ, আবার রসদ পাওয়ার আগে কতদিন যে সাগরে থাকতে হবে তার কোন ঠিক নেই– তাই বছর খানেকের সংরক্ষিত খাবার সঙ্গে নিতে হলো। ওই খাবারের ফর্দ সেদিনের সংরক্ষণ প্রযুক্তিকে যেমন জানান দেয় তেমনি পরবর্তী কয়েকশ' বছরেরও জাহাজী খাবারের

একটি ধারণা দেয়। মূলত শুকনা 'হার্ডট্যাক' বিস্কুট যাকে অতিরিক্ত শুকনা করার জন্য একবার বিস্কুট ভেজে তারপর তাকে গুড়ো করে আবার ভাজা হয়। লবনে সংরক্ষিত মাছ, মাংস, ও দু'এক রকমের আচার করা সবজি। ভাল করে শুকিয়ে নেয়া ডাল ও শিমের বিচি। এগুলো অত্যন্ত শুকনা অবস্থায় পিপাতে বদ্ধ রাখার আপ্রাণ চেষ্টা– বছরের খোরাক হিসেবে। পানির সংরক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ, আর অবশ্যই মদ। অফিসারদের জন্য বিলাসিতা হলো শুকনা ফল, জলপাই তেল, ভিনেগারে আচার। এত চেষ্টা সত্ত্বেও জাহাজে থাকা কলম্বাসের নিজের তরুণ ছেলের মতে খাওয়া দাওয়া কিছুটা অন্ধকারে করাটাই ভাল তাহলে খাবারে সব সময় থাকা কিলবিল করা পোকাগুলো দেখতে হতোনা। খাবারগুলো সাধারণ বাক্সের মত চুলাতে সেদ্ধ করে নেয়া হতো– রান্না বলতে ওইটুকুই।

কলম্বাসের নৌ-চালনার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। সাধারণত যারা স্পেন থেকে পশ্চিমে যান তাঁর সোজা পশ্চিমে পর্তুগীজ আজ্যুর দ্বীপগুলোর দিকে যান। কিন্তু তিনি জানেন ওখানে গেলে পশ্চিমা বাতাসের কবলে পড়তে হবে আরো পশ্চিমে নেবার বদলে যা জাহাজকে পূর্বদিকে ঠেলে আনার চেষ্টা করবে। তার চেয়ে বরং আপাতত দক্ষিণে ক্যানারি দ্বীপে গেলে সেখানে উত্তর-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু পাওয়া যাবে যা অনেকটা দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাবে বটে কিন্তু সেই সঙ্গে পশ্চিমেও এগুনো হবে। আসলে পৃথিবীর আবর্তন ও অন্য কিছু কারণে প্রায় সারা বছর কোন কোন নিশ্চিত বায়ু প্রবাহ সমুদ্রের দূর বাণিজ্যকে সে সময় সাহায্য করতো বলে ওগুলোকে বাণিজ্য বায়ু বলা হয়। আসলে তখন সব জাহাজ ওভাবে পালকে বাতাসে ঠেলে নিয়ে যাবার ওপরেই নির্ভর করতো– বাতাসের বিরুদ্ধে জাহাজ চালানো ছিল খুবই কঠিন, বিশেষ করে ভারী জাহাজকে। ঠিক সেই পরিকল্পনায় আপাতত ক্যানারিতে নিয়ে এলেন জাহাজগুলো, সেখানেই রসদ ওঠালেন। সেখানে থেকেই শুরু করলেন মূল যাত্রা ১৪১২ সালের সেপ্টেম্বর। তাঁর মনের ভেতর রইলো আসার সময় এই ক্যানারিকে লক্ষ্য করে আসা যাবেনা, বাণিজ্য বায়ু অনুকূল হবেনা বলে। তখন ওই উত্তরে আজ্যুরের দিকেই আসতে হবে সেদিকের পশ্চিমা হাওয়ায়।

এক মাসের ওপর জাহাজ চালিয়েও কোন রকমের স্থল চোখে পড়লোনা, সঙ্গী নাবিকরা অধৈর্য ও আশঙ্কিত হয়ে পড়লো এ কিসের মধ্যে পা রাখলো

তারা! সম্পূর্ণ অজানা এমন পথে তো কেউ কখনো যায়না– কিন্তু কলম্বাস নির্বিকার, তাঁর পড়া ওই সব কল্পনা মেশানো বিজ্ঞান বইয়ের ওপর আস্থা অবিচল– শিগ্‌গির আমরা ইন্ডিজে পৌঁছে যাবে, ভাগ্য ভাল হলে খোদ জাপানে। সত্যিই তাই হলো ১২ অক্টোবর স্থলের দেখা মিল্‌লো, খুব সম্ভব ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে বাহামাজের কোন দ্বীপ। ঠিকই তো প্রাচীন বইয়ে যেমন বলা ছিলো 'ইন্ডিয়ান' অনেক মানুষ প্রায় নগ্ন। এরা প্রচুর খাবার দাবার আর উপহার দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো– কিন্তু কলম্বাস পতাকা তুলে, হাঁটু গেড়ে বসে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়া আর রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসরাবেলার নামে ও জায়গার আনুষ্ঠানিক দখল নেয়ার অতিরিক্ত বেশিক্ষণ ওখানে থাকলেননা। এভাবে বেশ কয়েকটি দ্বীপে থেমে বুঝলেন ওটি তাঁর স্বপ্নের জাপান নয়, মার্কোপলো কথিত সমৃদ্ধশালী ক্যাথে বা চীনও নয়। সেগুলোর খোঁজে উত্তর দিকে ফ্লোরিডার দিকে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কী ভেবে আজকের হাইতির দ্বীপটিই তাঁর পছন্দ হয়ে গেলো। দেখে শুনে তাঁর মনে হলো এ যদি জাপান বা চীন নাও হয় তবে কিং সলোমন অনেক ধনরত্ন নিয়ে যে জেরুজালেমে গিয়েছিলেন এটি তা না হয়ে যায়না। তিনি একেই তাঁর কেন্দ্র করলেন, দ্বীপটির নাম দিলেন হিসপানিওলা। আপাতত এখানে দুর্গের মত একটা সুরক্ষা গড়ে ৩৯ জন নাবিককে এর প্রহরায় রেখে, নিজে ঝটপট এখান থেকে কিছু স্যাম্পল ধন রত্ন ও স্থানীয় মানুষকে নিয়ে স্পেনে ফিরলেন, শুধু পিন্টা আর নিনা জাহাজ নিয়ে, কারণ সান্তা মারিয়ার একটি অংশ এখানে দুর্ঘটনায় ভেঙ্গে গিয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিল দ্রুত রাজা-রাণীকে বিজয়ের খবর জানানো এবং এখানকার সব জায়গা শাসন করার উপযুক্ত লোক ও মালমাত্তা নিয়ে শিগ্‌গির ফিরে আসা। পরিকল্পনা মত আজ্যুর হয়ে যেতে গিয়ে সমুদ্র ঝড় ও সেখানকার পর্তুগীজ গভর্নরের হেনস্থায় কাহিল হয়েও তিনি দমলেননা; তাঁর রাজা-রাণীকে খুশি করতে পারলেন।

১৪৯৩ সালের সেপ্টেম্বর রীতিমত রাজকীয় বহর নিয়ে তিনি হিসপানিওলা ফিরে এলেন– কিন্তু হায় রেখে যাওয়া ৩৯ নাবিকের ও ওই দুর্গের কোন চিহ্ন আর সেখানে ছিলনা– স্থানীয়রা বিদ্রোহ করেছিলো। এবার কিন্তু তিনি রীতিমত গভর্নর হিসেবে এসেছেন ১৭টি জাহাজ, ১৩০০ নাবিক, বসতকারী, ব্যবসায়ী ও অশ্বারোহী সহ বেশ কার্যকর সৈন্যবাহিনী নিয়ে। শুধু হিসপানিওলা নয়, আজকের ক্যারাবিয়ান, মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ

আমেরিকার সংলগ্ন কিছু অংশেও কলম্বাসের জীবনকালে ও তার পরে পরে স্পেনের হুকুম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিলো- তবে আপাতত হিসপানিওলা আর কিউবায়। কলম্বাসের ডায়রী থেকেই অনেকটা বুঝে ফেলা গেছে যে তিনি আটঘাট বেঁধে জোর করে যেভাবে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করলেন তার পেছনে তাঁর পরস্পর বিরোধী দুটি ব্যক্তিত্ব কাজ করেছে। একটি হলো দয়ালু ধর্মপ্রচারকের ও মানুষকে সভ্য করার মিশনারীর, এবং অন্যটি হলো অত্যন্ত নিষ্ঠুর শাসকের– নির্বিচারে স্থানীয়দেরকে ধ্বংস করতে বেপরোয়া। মজার ব্যাপার হলো এই দ্বিমুখী ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে তিনি যেমন পরবর্তী কালের আমেরিকার সব স্প্যানিশ শাসকদের মনের কথাই প্রতিফলিত করেছেন, তেমনি গভর্নর হিসেবে তিনি ওখানকার মানুষদেরকে দ্রুত নিশ্চিহ্ন হবার পথে নিয়ে যেতে যা করেছেন পরবর্তী ইতিহাসটি যেন সেভাবেই আবর্তিত হয়েছে, যদিও সব জায়গায় একেবারে সমান ভাবে নয়। ওই ব্যক্তিত্ব সংঘাতের ও তার বাস্তব ফলটি দেখার আগে দেখা যাক হিসপানিওলা আর আশেপাশের ওই মানুষরা কারা। স্প্যানিশরা ওদেরকে আরাওয়াক বল্‌লেও সেটি ওদের ভাষা-গোষ্ঠির নাম। আসলে হিসপানিওলা শুধু নয়- এই অঞ্চলে কিউবা, পোর্টোরিকো, বাহামা ইত্যাদি অঞ্চলের অনেক প্রাচীন ইতিহাসধারী আদিবাসী ওরা মোটামুটি এর কাছাকাছি ভাষায় কথা বলে– নৃতাত্ত্বিক ভাবে তাদের পরিচয় তাইনো নামে। কলম্বাস শুরুতে তাদের দেহসৌষ্ঠব, অমায়িক ব্যবহার, জীবনযাত্রা ইত্যাদির উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন– তিনি যে সত্যি এক নতুন জগতে এসে পৌঁছেছেন তা বোঝাতে। তাদের মত মানুষ কল্পনা করা যায়না এমন কথাও বলেছেন। মূলত কাসাভা-শর্করা ও ভুট্টার ওপর নির্ভর করা কৃষিজীবী ওরা; যদিও মাছ, ছোট প্রাণী ইত্যাদি শিকারও করে। তবে তাঁর কাছে সব থকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হলো ওদের কাছে সোনা আছে, যেটি বেশির ভাগ রেণু হিসেবে সেখানে পাওয়া যেতো।

কলম্বাসের কাছে মনে হয়েছে তাইনোদের সব থেকে বেশি দরকার হলো সভ্যতা ও খৃষ্টধর্ম। এখনো তারা নগ্ন শিশুর মত– এদেরকে মানুষ করতে হবে, সাহায্য করতে হবে; এখানে তিনি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল আদর্শ ব্যক্তিত্বের মানুষ। কিন্তু পাশাপাশি শাসনের যত খুঁটিনাটি জানা গেলো তা শুধু সভ্য করার বিষয় নয়। যেমন স্থানীয় সর্দার কাচিকদেরকে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া হয়েছে এখানকার প্রত্যেক মানুষ থেকে রাজস্ব আদায়ের জন্য। ১৪

বছর বয়সের ওপরে প্রত্যেক পুরুষ বা স্ত্রী মানুষকে একটি করে ছোট শিশি দেয়া হয়েছে যা ভর্তি করে সোনার রেণু সে প্রতি মাসে কাচিকের মাধ্যমে কলম্বাসকে দেবে। কিছু কিছু অঞ্চল আছে যেখানে সোনার রেণু এই হারে সংগ্রহ করা খুব কঠিন, সেখানে একটি বিকল্প দেয়া হয়েছে মাসে ২৫ পাউন্ড কার্পাস তুলার সূতা পাকিয়ে এনে দিতে হবে প্রত্যেককে। কিছু দিনের মধ্যে দেখা গেলো কাচিকদের পক্ষে এটি সম্পাদন করা খুব কঠিন হচ্ছে– কারণ কলম্বাসের চাহিদার সঙ্গে ওদের দেবার ক্ষমতার কোন সামঞ্জস্য ছিলনা। তখন কাজটি স্প্যানিশরা সরাসরি নিজেদের হাতে নেবার সিদ্ধান্ত নিলো। শুরু হয়ে গেলো পুরা দমে দাসশ্রম ভিত্তিক অর্থনীতি ও শাসন ব্যবস্থা চালু করা, যেটি পরবর্তী সময়ে নতুন আবিষ্কৃত পুরো এলাকায় একটানা চলেছে। যা দিতে বলা হয়েছে দেবে, নইলে তার নির্ধারিত বিনিময় পণ্য বা শ্রম দেবে– তা যে কোন ধরনের দাসশ্রম হতে পারে, কিন্তু শাসক অন্য যে পণ্য চাইবে তাও হতে পারে। প্রায়শ সেটি পরিবারের কোন মানুষও হতে পারে; ওভাবে নারীদেরকেই বিনিময়-পণ্য হিসেবে ব্যবহার হতে লাগলো বেশি।

কলম্বাস দাসপ্রথার সঙ্গে তাঁর পশ্চিম আফ্রিকার নাবিক জীবন থেকেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তাইনোদেরকে দাস বানাবার তাঁর নীতি শেষ পর্যন্ত খুব সফল হয়নি। অত্যাচারে পিঠ ঠেকে গেলে তাইনোরা বিদ্রোহ করেছে, লড়াইয়ে মারা গেছে; অনেকে পাহাড়ে জঙ্গলে পালিয়েছে, জনসংখ্যা ওদের দ্রুত কমে গেছে। সব থেকে বেশি কমেছে স্প্যানিশদের আনা বিভিন্ন ছোঁয়াচে রোগের মহামারীতে, যে সবের বিরুদ্ধে তাদের কোন রকমের প্রতিরোধ ক্ষমতা ছিলনা। এই মারণ রোগগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল বসন্ত, নিউমোনিয়া এবং যৌনবাহিত রোগ। কলম্বাসের পরবর্তীরা শিগ্‌গির বুঝতে পেরেছিলেন যে এখানে দাসব্যবস্থা তাইনোদের ওপর নির্ভর করে চল্‌বেনা, ইতোমধ্যে যথেষ্ট গেড়ে বসা দাসপ্রথা আফ্রিকার অসহায় কালো মানুষদের ওপরেই নির্ভর করতে হবে এখানেও। কলম্বাস অবশ্য তার আগে ১৫০৬ সালেই স্পেনে মারা গেছেন, দীর্ঘ দিন নিজের আবিষ্কৃত অঞ্চলগুলো স্পেনের রাজা-রাণীর পক্ষ থেকে শাসন করার পর।

নতুন আবিষ্কৃত এই ভূখণ্ডের অন্যান্য কিছু অঞ্চলে কলম্বাসের পরে পরেই স্প্যানিশ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেখানে তাদেরকে যুদ্ধ করতে হয়েছে।

এর কারণ তাইনোদের এলাকায় তেমন কোন শক্তিশালী রাষ্ট্রীয় সংগঠন না থাকলেও ওই নতুন জায়গাগুলোতে শুধু খুবই শক্তিশালী রাষ্ট্রই ছিলনা বরং দীর্ঘস্থায়ী উন্নত সভ্যতা ছিল যার নিদর্শনগুলো দেখে আজও সবাই অবাক হন। কলম্বাসের কালের পর পর কিউবা স্প্যানিশ শাসনের বড় কেন্দ্র হয় একজন গভর্নরের অধীনে। এখানে এক সেনাপতি হেরনান্দো কোর্টেজ কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করে নিজেই একটি নৌবহর ও সেনাবাহিনী গড়ে তোলেন ইচ্ছুক স্প্যানিশ যোদ্ধাদের দিয়ে। তারা নৌবহরে করে বর্তমান মেক্সিকোর বন্দরে গিয়ে ঘাঁটি করে এবং সেখানকার বিশাল এলাকাজোড়া অত্যন্ত শক্তিশালী ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী আজটেক সাম্রাজ্যকে আক্রমণ করে। মাত্র ৫০৮ জন সৈন্য ও ১৬টি ঘোড়া কোর্টেজের সঙ্গে থাকলেও আজটেক শাসনাধীন কিছু অসন্তুষ্ট প্রজাদেরকে নিজের পক্ষে নিয়ে স্রেফ কৌশলে– বলা যায় খুবই অনৈতিক সব কৌশলে– তারা আজটেকদের পরাক্রমশীল ও বিখ্যাত রাজা মন্টেজুমার প্রায় স্বপ্নপুরীর মত হ্রদের ওপর তৈরি রাজধানী টেনোকটিটিলান (আজকের মেক্সিকো সিটি) দখল করে (১৫২০ সাল), আজটেক সাম্রাজ্য ধ্বংস করে। স্প্যানিশদের কূটকৌশল বুঝতে না পারা, ঘোড়া ও চাকা না থাকা, লোহার অস্ত্র এবং অগ্নেয়াস্ত্র না থাকা, তাদের কাল হয়েছিলো। এই বিজয় ওই অল্প সংখ্যক স্প্যানিশদের কনকুইসটাডোর বা বিজয়ী নামের অধিকারী করেছে, আজটেকদের বিপুল পরিমাণ সোনাও লুট করতে দিয়েছে। লুটের বড় অংশটি অবশ্য কোর্টেজ এবং স্পেনের রাজা-রাণীর জন্য বরাদ্দ হয়েছে, বাকিটা সৈন্যদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়েছে– ওই প্রাইভেট বাহিনীতে যোগ দেবার ওটাই ছিল প্রতিশ্রুতি। যুদ্ধবন্দী হিসেবে নারীদের ও শিশুদেরকেও বন্টন করা হয়েছিলো।

১৫৩২ সালে প্রায় একই ভাবে আর একজন কনকুইস্টোডোর নেতা ফ্রান্সিস্কো পিসারো মাত্র ২০০ জন সৈন্য নিয়ে আজকের পেরুর ইন্‌কা সাম্রাজ্যের সম্রাটকে হত্যা করে তাঁর রাজধানী দখল করেন ও শিগ্‌গির ইন্‌কাদের পতন ঘটান। অথচ এই ইনকা সভ্যতা আন্দিজ পর্বতের ওপরে তাদের রাজধানী থেকে বিশাল এলাকায় তার কীর্তি গড়ে তুলেছিলো হাজার বছর ধরে। এখনো মানুষ অবাক হয় কীভাবে ইন্‌কারা পর্বতের গায়ে ধাপ কেটে টেরাস তৈরি করে, পাথরে বাঁধিয়ে তার সুরক্ষা করে, চাষের ব্যবস্থা

করেছিলো। দীর্ঘ পার্বত্য রাস্তা নির্মাণ, অত্যন্ত শক্তিশালী দেয়াল তৈরি, আলু ফসলটির উন্নয়ন তাদের অন্য কীর্তি। এত কিছু তারা করেছিলো কী ভাবে? উন্নত সভ্যতা ও বড় সাম্রাজ্যের জনবল ব্যবহার করে। মধ্যআমেরিকার হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা ইত্যাদি অঞ্চলে কোর্টেজ নিজেই মায়া নামের আরেকটা সভ্যতার রাজাদের পরাজিত করেছিলেন। মধ্যআমেরিকার মায়া সভ্যতাও ছিল অত্যন্ত অগ্রসর সভ্যতা, স্প্যানিশ যোদ্ধারা ১৫০০ শতকে বলপূর্বক যার ইতি টেনেছে। ওই বিজয়ী স্প্যানিশ সৈনিকদের কেউ কেউ লেখক হিসেবে এসবের বিস্তারিত বিবরণ রেখে গেছেন। পরবর্তী গবেষণা থেকেও প্রচুর জানা যাচ্ছে।

ক্যারিবিয়ানে কলম্বাস ও তাঁর পরবর্তীরা যা করেছেন স্প্যানিশ বিজয়ীরা অন্যত্র ঠিক তাই করেছেন, আদিবাসীদেরকে নিশ্চিহ্ন করার চেষ্টা করেছেন, এবং তাদের মূল্যবান বিশ্বখ্যাত সভ্যতার ধ্বংস ঘটিয়েছেন। কিন্তু এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাঁদেরকে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয়নি, তাঁরা আমেরিকার আদিবাসী হিসেবে অবদান রেখেছেন এবং তাঁদের জনসংখ্যার মধ্যে স্প্যানিশ জেনেটিক মিশ্রণের ফলে নানা ঐতিহ্যের সংস্কৃতির ও ভাষার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা আজকের গর্বিত আমেরিকান জাতি গড়ে তুলেছেন– মেক্সিক্যান, গুয়াতেমালান, পেরুভিয়ান, বলিভিয়ান ইত্যাদি। কিন্তু এজন্য মূল স্প্যানিশ উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে তাঁদেরকে কম সংগ্রাম করতে হয়নি। সেই উপনিবেশবাদীদের থেকে তাদের জিন মিশ্রণ ছাড়াও ধর্ম, ভাষা, বেশ কিছু সংস্কৃতি গ্রহণ করেছেন বটে কিন্তু তার সবই নিজেদের হাজার বছরের প্রচলিত ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষার সঙ্গে মিশিয়ে একেবারেই পরিবর্তিত রূপে। বহু হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পুরানো জগত এবং নতুন জগত নিজেদের মধ্যে নিজে বাস করেছে, নিজেদের অবাক করা সব উন্নত সভ্যতা গড়ে তুলেছে একের কথা অন্যে একেবারেই না জেনে। কলম্বাসের অজানা পশ্চিমের পথে সমুদ্র যাত্রা এই দুইকে প্রথম পরস্পরের সামনা সামনি করেছে। এর ভাল দিক মন্দ দিক নিয়ে তর্ক আছে, তবে অন্তত পৃথিবীর মানুষ আর দুই জগতে বিভক্ত থাকেনি। সমুদ্র যাত্রা তাদেরকে এক করেছে।

ভূপ্রদক্ষিণঃ

অভিযাত্রার যুগের শুরুতে সমুদ্র যাত্রার একটি বড় নিয়ামক ছিল পর্তুগাল ও স্পেনের মধ্যে প্রতিযোগিতা। ঘটনাচক্রে কলম্বাসের আবিষ্কারটি স্পেনের পক্ষ থেকে ঘটেছিলো, তাই নতুন (আমেরিকান) জগতে পদার্পণ, দখলবাজি ও উপনিবেশ স্থাপনে তারাই কিছুদিন এগিয়ে ছিল। কিন্তু নৌবিদ্যা এবং নৌ শক্তি উভয় ক্ষেত্রেই তখন পর্তুগীজদের জয় জয়কার। ভাস্কো দা গামার নতুন সমুদ্রপথ অভিযাত্রার পর থেকে নিয়মিত ভারত যাত্রায় পর্তুগীজ নৌ-কৃতিত্ব মালাক্কায় ও মশলাদ্বীপ খ্যাত মালাকু অঞ্চলে বিভিন্ন মুসলিম সুলতান, হিন্দু-বৌদ্ধ মাতরম সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সব মিলে ভারত মহাসাগরে গড়ে ওঠেছিলো তাদের রমরমা ইউরোপীয় বাণিজ্য। মজার কথা হলো ওই অঞ্চলটিকে বলা হতে লাগলো ইস্ট ইন্ডিজ, অদ্ভুত এক কারণে। কলম্বাস ভুল করে ক্যারিবিয়ান ও অন্যান্য আমেরিকান আবিষ্কৃত অঞ্চলকে ইন্ডিয়া, জাপান, চীনের অংশ মনে করাতে আর এখানকার মানুষকে ইন্ডিয়ান বলার কিছুদিন পর ভুলটি ভেঙ্গে গিয়েছিলো। কিন্তু নাম তারা বদলাতে চায়নি- তাই ওটি যে আসল ইন্ডিয়া নয় সেটি বোঝাবার জন্য ক্যারিবিয়ানের সব দ্বীপের জায়গাটিকে বলতে আরম্ভ করলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ। ওটির সঙ্গে আলাদা করার জন্যই যেন বর্তমান মালয় ইন্দোনেশিয়ার এই এশীয় দ্বীপগুলোকে ইস্ট ইন্ডিজ বলা। পুরো আমেরিকার আদিবাসীদেরকে ইন্ডিয়ান বলাটি কিন্তু বজায় রইলো, এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত। এখন অবশ্য তাদেরকে নেটিভ আমেরিকান, ফার্স্ট ন্যাশন, আদিবাসী, ইত্যাদি নামে ডাকা হয়।

কলম্বাসের আবিষ্কারের পর সেখানকার লোভনীয় এত ভূখণ্ড স্পেনের হাতে ছেড়ে দিয়ে পর্তুগাল বসে থাকবে তা কি হতে পারে? বিশেষ করে নৌশক্তিতে সে যখন এগিয়ে? ওখানে স্পেনের সঙ্গে তার সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। ক্যাথোলিক খৃষ্টান ধর্মের প্রতি অতি অনুগত এই দুটি নৌশক্তি যেন সংঘাতমুখী না হয় সেজন্য ক্যাথোলিক ধর্মগুরু পোপ সালিশ করে দিতে চাইলেন আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর একটি রেখা টেনে যার এক দিকের সমুদ্রে পর্তুগীজ তার অভিযাত্রা ও সাম্রাজ্য বিস্তার চালাতে পারবে আর অন্য দিকের সমুদ্রে স্পেন তা করতে পারবে। ১৪৯৪ সালে এটি টোর্ডেসিলাম চুক্তি হিসেবে দু'দেশের ভেতর স্বাক্ষরিত হয়, ১৫২৯ সালে পরে জারাগোজা চুক্তি নামে কিছুটা পরিবর্তিত আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এতে ইস্ট ইন্ডিজের

পূর্বের সমুদ্রে উত্তর-দক্ষিণ একটি মধ্যরেখা থাকলো যার পশ্চিমে পর্তুগাল আধিপত্য থাকবে, আর পূর্বে স্পেন তার অভিযাত্রা-অনুসন্ধান চালাতে পারবে। অন্য দিকে আমেরিকার নতুন জগতে শুধু একেবারে পূর্ব প্রান্তে (আজকের ব্রাজিল অঞ্চলে) অভিযাত্রা চালাবার অধিকার পর্তুগালের থাকবে। পর্তুগাল এই অধিকার প্রয়োগ করতে দেরি করেনি।

ভারত যাত্রার পথটি পর্তুগালের দখলে থাকাতে স্প্যানিশদের পক্ষে এই পথে ইস্ট ইন্ডিজের পূর্বে গিয়ে তার অধিকার প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়েছিলো। ফার্ডিনান্ড ম্যাজেলান নামের এক পর্তুগীজ নাবিক মালাক্কা (মালয়) অঞ্চলে পর্তুগীজ নৌ বাণিজ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর মনে হলো এই বাণিজ্য এভাবে শুধু একদিক থেকে, ভারতের অর্থাৎ পশ্চিম দিক থেকে না করে, অন্যদিক থেকেও অর্থাৎ আমেরিকার নতুন আবিষ্কৃত অঞ্চল হয়ে পূর্ব দিক থেকেও মশলার দ্বীপে পৌঁছে করলে কিছু বাড়তি সুবিধা পাওয়া যাবে। পৃথিবী গোলাকার বলে এ ভাবে পর্তুগাল থেকে ক্রমাগত পশ্চিমে জাহাজ চালিয়ে ওভাবে পূর্ব দিক থেকে ওখানে যাওয়া সম্ভব হবে। তাত্ত্বিক ভাবে অবশ্যই সম্ভব, কিন্তু কেউ তো কোনদিন ওভাবে যায়নি, ওভাবে যাওয়ার কোন সমুদ্রপথও কারো জানা নেই। তিনি নিজে সেই পথ বের করার সংকল্প করলেন। কিন্তু এজন্য তাঁর রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন।

নিজে পর্তুগীজ হয়ে ও পর্তুগালের বাণিজ্যে যুক্ত থাকাতে স্বাভাবিক ভাবেই পর্তুগালের রাজাকেই তিনি এই প্রকল্পে বার বার আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছেন। অবশেষে স্পেনে চলে গিয়ে, সে দেশে নৌ-চালনা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে তিনি স্পেন-রাজাকেই আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছেন এ প্রকল্পে। ভারত হয়ে পথটি পর্তুগালের দখলে থাকাতে এই বিকল্প পথ স্পেনের জন্যই লোভনীয় ছিল– প্রাথমিক সন্দেহ দূর হলে ১৫১৮ সালে স্পেন-রাজ একজন পর্তুগীজ হওয়া সত্ত্বেও ম্যাজেলানের অধীনে এই ব্যয়বহুল অভিযাত্রাটি চালনা করতে সম্মত হলেন। এভাবেই সৃষ্টি হলো আর্মাডা দেই মালুকো (ইন্দোনেশিয়া যাবার নৌবহর)– পাঁচটি নাও সদৃশ জাহাজ নিয়ে। দুই জাহাজ ত্রিনিদাদ (ম্যাজেলানের পরিচালনায়) এবং সান এন্টোনিয়োর (এক স্প্যানিশ ক্যাপ্টেনের পরিচালনায়) প্রত্যেকটিতে ৬০

জনের মত নাবিক। ছোট আরো তিনটি জাহাজ কন্‌সেচিয়ান, সান্তিয়াগো, তার ভিক্টোরিয়ায় ৪০ জনের মত করে। নাবিকদের মধ্যে নানা দেশের মানুষ ছিল, তবে নেতৃত্বে ছিল স্প্যানিশ ও পর্তুগীজরা। এক রকম অতিথি-নাবিক হিসেবে ছিলেন ভেনিসের (ইতালী) এন্টোনিও পিগাফেট্রা নামের এক শিক্ষিত ধনী ব্যক্তি, অ্যাডভেঞ্চারের আকর্ষণে বহরে যোগ দিয়েছিলেন; শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত অভিযাত্রার দিনলিপি লিখে গিয়েছেন। অনেক কিছু সেখান থেকে জানা। বেশ কয়েকটি জাহাজের স্প্যানিশ ক্যাপ্টেনরা সর্বাধিনায়ক হিসেবে ম্যাজেলানের থাকাটি মোটেই পছন্দ করছিলেন না– কাজেই সব স্তরেই অসন্তোষ আর বিদ্রোহের বীজ শুরু থেকেই ছিল। অন্যদিকে পর্তুগীজ-রাজ এবং তাঁর গভর্নররা এ যাত্রার পথে পথে নানা রকম বিঘ্ন সৃষ্টি করছিলেন তাঁদের প্রাধান্য থাকা বন্দর ও সমুদ্রপথে। একবার পুরো বহরকে বাধ্য করে পর্তুগালে নিয়ে যাওয়ার একটি আশঙ্কা দেখা দিয়েছিলো। উভয়-সংকটে জর্জরিত ম্যাজেলানের বহরের মধ্যেই ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের কমতি হয়নি একেবারে শেষ পর্যন্ত। তাঁকে কখনো কৌশলে কখনো অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে এগুলোর দমন করতে হয়েছে।

১৫১৯ সালের সেপ্টেম্বরে ক্যানারি দ্বীপ হয়ে সোজা পশ্চিমে ব্রাজিলে পৌঁছেছিলেন ম্যাজেলান। মাঝখানে বিদ্রোহের কারণে নেতৃস্থানীয় বেশ কয়েকজনকে জাহাজে গ্রেপ্তার করে রাখতে হয়েছিলো। ব্রাজিলের পূর্ব অংশ ইতোমধ্যে পর্তুগীজরা আবিষ্কার করেছে এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে দখল নিয়েছে– কিন্তু তখনো তেমন কোন পর্তুগীজ উপনিবেশ বা প্রশাসন মোটেই গড়ে ওঠেনি। তাই তিনি পর্তুগীজ বাগড়া দেয়া এড়িয়ে নির্বিঘ্নে উপকূল ধরে দক্ষিণের বড় বন্দর আজকের রিও ডি জেনোরিওতে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর অধিকাংশ কারবার চলেছে ওখানকার গুররানি ভাষা-গোষ্ঠির আদিবাসীদের সঙ্গে (আজও এলাকায় ওই গোষ্ঠি, ওই ভাষা আছে)। এ অঞ্চলে কিছুটা ঘোরাফেরা করেছেন, ভাষা জানেন এমন ইউরোপীয় কিছু বন্ধু পেয়ে যাওয়াতে এই স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ সহজ হয়েছে। নানা জিনিস বিনিময় করে টাটকা খাদ্য, পানি সংগ্রহ করেছেন। ম্যাজেলান একটি নতুন নীতি নিয়েছিলেন যে গরু, ভেড়া, শূকর এসব জীবন্ত প্রাণী জাহাজে রাখা। তা ছাড়া স্পেন থেকেই প্রচুর শুকনা ফল সঙ্গে নিয়েছিলেন– এ দুটি বেশ সাহায্য করেছে পরে অজানা পথে স্বাস্থ্যের কিছুটা সুরক্ষায়।

রিও ডি জেনেরিও থেকে উপকূল ঘেঁষে যতই দক্ষিণে গিয়েছেন খুব ধীরে চলে একটি জিনিস অনুসন্ধান করে করে চলেছেন; তা হলো ঐ ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে যাবার পথ হিসেবে কোন প্রণালী পাওয়া যায় কিনা দেখা। এটি যত উত্তরে থাকতে পাওয়া যাবে তত দক্ষিণের শীতের হাত থেকে বেঁচে সহজে তাঁর সমুদ্র যাত্রার লক্ষ্যস্থলে যেতে পারবেন। এজন্য সমুদ্র থেকে যে সব খাঁড়ি স্থলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছে তার প্রত্যেকটিকে পরীক্ষা করে করে যেতে হচ্ছিলো। অন্তত একটি জাহাজকে ওই খাঁড়ির মধ্যে ঢুকে দেখতে হবে কোথাও গিয়ে এর গভীরতা ক্রমাগত কমে গেছে কিনা, পানির লবণাক্ততা ক্রমে কমে গেছে কিনা নদীর থেকে মিঠা পানি এসে। এসব হলে বুঝতে হবে এটির সমুদ্রের প্রণালী হবার আশা নেই, নেহাৎ কোন নদীর খাঁড়ি। প্রণালী হতে হলে পথ একই ভাবে বজায় থাকতে হবে– গভীরতা, লবনাক্ততা সব সহ। প্রত্যেকটির ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হলে অনেক সময় লাগে। কাজেই ম্যাজেলানের বহরের চলার গতি খুবই ধীর হয়ে গেলো, তাছাড়া এসব পরীক্ষার ঝুঁকিও অনেক, জাহাজ চরায় আটকানোর ভয়। এদিকে শীত ক্রমে বাড়ছিলো, সামুদ্রিক ঝড়ও। এটি দক্ষিণ আমেরিকার প্রচণ্ড শীত। এক পর্যায়ে এই কারণে আর এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হলোনা, একটি সুবিধামত বন্দরে (এখন সেন্ট জুলিয়ান) ৫ মাস ঠাঁই বসে কাটাতে হলো। এখানে ঘটলো অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা। নাবিকদের মধ্যেই দুর্ধর্ষ এক বিদ্রোহে অনেকের প্রাণ গেলো, বিদ্রোহের নেতাদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলা। কাছে প্রণালী খুঁজতে গিয়ে সান্টিয়াগো জাহাজটি ঝড়ে পুরো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো। বাকি চারটি জাহাজে যাত্রা শুরু করে সুখবর এলো একটি থেকে– মনে হচ্ছে প্রণালী পাওয়া গেছে, একটি খাড়ি থেকে ক্রমাগত ভেতরে যাওয়া যাচ্ছে গভীরতা, লবণাক্ততা না হারিয়ে। এটিকে নিশ্চিত করতে পাঠানো সেন্ট এন্টোনিও জাহাজটি কিন্তু আর কখনো ফিরে আসেনি। বহু পরে জানা গেছে ওটি হুবহু আসার পথ ধরেই স্পেনে ফিরে গেছে, এর ক্যাপ্টেন ও নাবিকেরা সেখানে রাজ দরবারে ম্যাজেলানের সম্পর্কে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলে অভিযোগ দিয়েছে।

বাকি তিন জাহাজ নিয়ে ম্যাজেলান নিজেই ঠিকই দেখলেন এটি প্রণালীই বটে। সরু প্রণালী দিয়ে জাহাজ চালিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ তাঁর চোখে

পড়লো সামনে মহাসমুদ্র, প্রশান্ত মহাসাগর! এটিই তাঁর সব চেয়ে বড় আবিষ্কার, পরে যাকে বলা হয়েছে ম্যাজেলান প্রণালী– আটলান্টিক থেকে দক্ষিণ আমেরিকার স্থল চিড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে যাবার পথ। কিন্তু এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। যে পথ দিয়ে এই তিন জাহাজ এগিয়ে গেলো তার কাছে প্রশান্ত মহাসাগর হলো এক অন্তহীন সমুদ্র– পথে কোন দ্বীপ কোন স্থল চোখে পড়লোনা। মাসের পর মাস ম্যাজেলান চল্‌লেন তো চল্‌লেন। সব খাবার ফুরিয়ে কাঁচা চামড়া, কাঠের গুড়ো পর্যন্ত খেতে হয়েছে নাবিকদের। সবাই যখন প্রায় জীবন্মৃত, ১৯ জন মারাই গেছে, এমনি অবস্থায় ১৫২১ সালের ৬ মার্চ গুয়াম দ্বীপে এসে কোন রকমে প্রাণ রক্ষা হলো। এটি এক বড় দুর্ভাগ্য! যদি প্রশান্ত মহাসাগরকে জানা থাকতো, যদি পথ জানা থাকতো, তা হলে সামান্য ভিন্ন পথে এগুলেই কিন্তু একের পর এক দ্বীপ সামনে পড়তো– মার্শাল, সোসাইটি, সলোমন্‌স, মারকুইসাস ইত্যাদি দ্বীপ। কিন্তু হায় সেটি হয়নি।

এখন যাদেরকে পেলেন ম্যাজেলান তারা এক এক দ্বীপে এক এক রকম– কেউ সাহায্য করে, কেউ নৌকা করে এসে জাহাজের সব কিছু চুরি করে নিয়ে যেতে চায়। এরা পলিনেশিয়ান গোছের মানুষ। ১৭ মার্চ এসে পৌঁছলেন হোমোনহোন দ্বীপে, এখানকার লোকজনকে দেখে তাঁর মনে হলো প্রাচ্য দেশে এসে পড়েছেন মালাকুর কাছেধারে। এখান থেকে লিমাসাওয়া দ্বীপে গিয়ে নেমে সেটি আরো নিশ্চিত হলেন, তিনি তাঁর লক্ষ্যের জায়গায় পৌছে গেছেন– সেখানে খৃষ্টান প্রার্থনা সভা করলেন। দ্বীপগুলো আজকের ফিলিপাইনস দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত– ইউরোপীয় কেউ এই প্রথম ফিলিপাইনস আবিষ্কার করলেন। কিন্তু যেটি ম্যাজেলান খুব বেশি লক্ষ্য করেননি তা হলো এই অঞ্চলে শত শত বছর ধরে আরবদের আসা যাওয়া তো ছিলই, বরং এখানে অনেক রাজা বা সুলতান আরবী প্রভাবিত মুসলিম, জনসাধারণও তাই। স্থানীয় প্রচলিত ধর্মের বিশ্বাসী অন্যান্য ‘রাজা’রাও আছেন (এখানকার ছোট বড় শাসকদেরকে রাজাই বলা হতো)। জায়গাটি যে লক্ষ্যস্থল মালাকুর ও মালাক্কার থেকে খুব দূরে নয় এটি ম্যাজেলান বুঝেছিলেন তাঁর এক ঘনিষ্ঠ সহকারী এনরিককে লক্ষ্য তরে। এনরিককে সবাই ডাকতো ‘মালাক্কার এনরিক’ নামে। সে মালাক্কার (সুমাত্রার) মুসলিম পরিবারের ছেলে– ম্যাজেলান সেখানে পর্তুগীজ বাণিজ্যে থাকার সময় স্থানীয় কিছু দাস

ব্যবসায়ীর থেকে তাকে কিনে নিয়েছিলেন। পর্তুগালে নিয়ে গিয়ে, খৃষ্টান বানিয়ে নাম দিয়েছিলেন এনরিক। বেশ চটপটে, শিক্ষিতও হয়ে ওঠেছিলো সে। তাই ম্যাজেলান তাঁর অভিযাত্রায় সঙ্গী করেছিলেন তাকে। ফিলিপাইনে এসে এনরিক লক্ষ্য করলো সে তাদের ভাষা বেশ বুঝতে পারছে– মালায়ান ও ফিলপিনো ভাষায় অনেক মিল।

ম্যাজেলান কিন্তু তাঁর হিসেবে ভুল করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন ফিলিপাইনের সব লোক এখনো সভ্য করার জন্য এবং খৃষ্টান করার জন্য উর্বর ক্ষেত্র। আর এই পুরো অঞ্চল হবে স্পেনের রাজার সাম্রাজ্য। এজন্য তিনি ওখানকার নানা রাজাদের মধ্যে আভ্যন্তরীন কলহে একের হয়ে অন্যের শত্রুতা শুরু করলেন, এবং এই সুযোগে কোন কোন রাজাকে ও তাঁর প্রজাদের খৃষ্টান করলেন বটে, কিন্তু অন্যদেরকে ক্রুদ্ধ করে তুল্‌লেন। এভাবে এমনি একটি স্থানীয় বিরোধে যোগ দিয়ে তিনি শত্রু পক্ষের মাকাতান দ্বীপটি দখলে তাঁর সৈন্যদের নিয়ে অংশ নেন। সেখানে জাহাজ থেকে নেমে হাঁটু পানিতে থাকতেই শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে হঠাৎ নিহত হন। মাকাতান দ্বীপের তীরে ১৫২১ সালের ২১ এপ্রিল ম্যাজেলানের নিহত হওয়ার ঘটনা মর্মান্তিক হলেও ফিলিপাইনে কিন্তু এখন এটিকে স্বাধীনতা রক্ষার আন্দোলনে প্রথম সাফল্য হিসেবে উদযাপন করা হয়। ম্যাজেলান ফিলিপাইনের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি হলেও স্বাধীনতা তখনো যায়নি। এর ৪৪ বছর পর অন্য এক স্প্যানিশ অভিযানে ফিলিপাইনস একটানা ৩০০ বছরের জন্য স্পেনের অধীনে চলে যায়।

ম্যাজেলানের মৃত্যুর পর তাঁর সহকর্মীদের মধ্যে নানাজন অধিনায়কত্ব নিয়ে বিবাদ করে। কনসেপচিয়ন জাহাজটিকে নষ্ট করে ফেলার সিদ্ধান্ত হয়। বাকি দুই অক্ষত জাহাজ ত্রিনিদাদ ও ভিক্টোরিয়ার মধ্য একমাত্র ভিক্টোরিয়া এলকান নামের নতুন অধিনায়কের অধীনে মালাক্কা, মালাকু হয়ে আফ্রিকার উত্তমাশা ঘুরে ১৫২২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর স্পেনে ফিরে যেতে পারেন। এদিক থেকে এলকান ও তাঁর অল্প কয়েকজন সঙ্গী পুরো পৃথিবী ঘুরে এসেছেন বলা যায়– স্পেন থেকে যাত্রা শুরু করে একই দিকে ভ্রমণ করে আবার স্পেনে পৌঁছার জন্য। এই অভিযাত্রাকে বলা হয় ম্যাজেলান-এলকানের ভূপ্রদক্ষিণ। আসলে ম্যাজেলান অভিযাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন

বটে, কিন্তু তিনি ভূপ্রদক্ষিণ করতে পারেননি, এলকান করেছেন। অনেক মনে করেন এলকানও প্রথম ভূপ্রদক্ষিণ করেননি– সেটি করেছিলেন মালাক্কার এনরিক ছেলেটি। মালাক্কা থেকে তাকে পর্তুগাল নেয়া হয়েছিলো। ম্যাজেলানের সঙ্গে এখনো পশ্চিম দিক গিয়ে ফিলিপাইনে আসার পর, সে পালিয়ে গিয়ে আবার তার বাড়ি মালাক্কায় ফিরে এসেছিলো, এলকান স্পেনে পৌঁছার বহু আগে। এলকান আরেকটি জিনিস আবিষ্কার করেছিলেন। ভূপ্রদক্ষিণের সময় তাঁরা ক্যালেন্ডারে যেভাবে দিনের হিসেব করছিলেন স্পেনে পৌঁছে দেখলেন সেখানে তারিখ একদিন বেড়ে গেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে ভূপ্রদক্ষিণ করলে যে ক্যালেন্ডার একদিন বাড়িয়ে নিতে হয় এটি এই প্রথম বাস্তবে বোঝা গেলো। তাত্ত্বিক ভাবে বিজ্ঞানীরা ব্যাপারটা জানলেও সত্যি-সত্যি মেলানোর সুযোগ এর আগে কখনো ঘটেনি। এই ভূপ্রদক্ষিণের ফলে পৃথিবীর মুখকে এবং পৃথিবীর মানুষের মুখকে এই প্রথমবার মনে হয় যেন সবাই এক সঙ্গে দেখার ও আত্মস্থ করার সুযোগ ঘটলো!

জরিপে ও চার্টে পৃথিবী:

১৫০০ শতকের প্রথম চতুর্থাংশেই অভিযাত্রার যুগের বড় চমকগুলো ঘটে গেলেও আবিষ্কারের তখনো অনেক বাকি। এ শতকের শুরুতেই বোঝা গিয়েছিলো যে পশ্চিমে যে জগত আবিষ্কার হয়েছে তা ভারত, চীন বা জাপান নয়, এটি সম্পূর্ণ নতুন মহাদেশ। ইতালির ফ্লোরেন্স নগর-রাষ্ট্রের বিজ্ঞানী ও ভূগোলবিদরা তখন পণ্ডিত সমাজে যথেষ্ট সমাদর পেতেন। তাঁদের একজন আমেরিগো ভেসপুচি নাবিক-অভিযাত্রী রূপে ব্রাজিল অঞ্চলটি পর্তুগীজ সম্রাটের পক্ষ থেকে জরিপ করছিলেন। তাঁর দীর্ঘ কাজ শেষে এই সব জায়গাকে নতুন মহাদেশ হবার কথাটি তিনি জোর দিয়ে বলেন এবং ১৫০৪ সালের দিকে এ সম্পর্কে তাঁর কিছু লেখা ফ্লোরেন্সের বুদ্ধিজীবী সমাজের প্রচার ও মুদ্রণে তাঁকে ইউরোপে জনপ্রিয় করে তোলে। সে সময়ের বিখ্যাত কিছু মানচিত্র নির্মাতা তাঁদের নতুন মানচিত্রে এই নতুন মহাদেশের একটি ধারণা দেয় এবং মহাদেশটির নাম হিসেবে আমেরিগো ভেসপুচির নাম ছাপায়– আমেরিগোর ল্যাটিন সংস্করণে আমেরিকা। ওভাবেই একের দেখাদেখি আরেকের প্রচারণায় ওই নতুন মহাদেশকে আমেরিকা বলার

রীতিটি চালু হয়ে যায়। তাই ভেসপুচির নামে পুরো মহাদেশের নাম হওয়াটি কিছুটা ঘটনাচক্রেই ঘটেছে বলতে হবে।

সেই ১৫০০ শতক থেকে শুরু হয়ে আমেরিকান বাণিজ্যে স্প্যানিশ ও পর্তুগীজ জাহাজের জলদস্যুতা ও লুটপাট প্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। একেবারে রাজকীয় জাহাজও একে অন্যের জাহাজের ধনরত্ন সহ মালামাল লুট করে জলদস্যুতা করা নিয়মে পরিণত হয়েছিলো। এ ছাড়া বেসরকারী জলদস্যুদেরও নিজস্ব জাহাজ বা জাহাজের বহরও গড়ে ওঠেছিলো, যাদের অনেকে জনশ্রুতিতে এবং সাহিত্যে যথেস্ট খ্যাতিও পেয়েছিলো। ১৫০০ শতকের শেষের দিকে ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইংল্যান্ডও আমেরিকায় অভিযাত্রা ও বাণিজ্যে যোগ দেয় এবং নৌশক্তিতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় উচ্চ পদের ও রাণীর খুব কাছের ব্যক্তিদের কয়েকজন আমেরিকাতে প্রথম ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনের জন্য অভিযান চালিয়ে ইংল্যান্ডে জন-নন্দিত হোন, কিন্তু এদেশের বাইরে তাঁদের পরিচয় ছিল স্রেফ জলদস্যুদের অধিনায়ক হিসেবে– বিশেষ করে আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন রত স্প্যানিশ ধনবাহী জাহাজ লুট করার ব্যাপারে। রাণী কর্তৃক এরকম সরকারী ভাবে সম্মানিত বিখ্যাত ‘জলদস্যুদের’ মধ্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন জন হকিন্স, স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে, স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক প্রমুখ। উত্তর আমেরিকার প্রথম ইংরেজ উপনিবেশগুলো স্থাপনে আনুকূল্য যোগানোর একটি বড় কারণ ছিল এমনি জলদস্যুতার কাজকে সহজ করা।

ওসময় এসব জলদস্যুতা ও নৌশক্তির পাশাপাশি নৌ বাণিজ্যের জন্যই সংগঠিত হয় বিভিন্ন কোম্পানী। সরকারের সহায়তায় বেসরকারী ভাবে নতুন আবিষ্কৃত দেশগুলো সহ দূর দূর অঞ্চলে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে সেখানে কর্তৃত্ব বিস্তারের চেষ্টা হয়েছে। নিজস্ব নৌ-বাহিনী ও কুঠির প্রতিরক্ষার নামে সৃষ্ট কোম্পানীর স্থল-বাহিনীর সাহায্যে এই কর্তৃত্ব বিস্তার সম্ভব হয়েছে। এভাবে একে একে স্প্যানিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয় এবং তারাই মূলত এশীয় উপনিবেশগুলো সৃষ্টি করে। একই ভাবে পশ্চিমে আমেরিকার জন্যও তাই হয়েছে। কোম্পানীর কাজ ও জলদস্যুতার কাজ প্রায় সমান্তরালেই চলেছে বহুদিন।

এবার জাহাজগুলো দূর পথে অভিযাত্রার প্রয়োজনের থেকেও যুদ্ধের প্রয়োজনকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পরিবর্তিত হতে লাগলো। পর্তুগীজ নাও গুলোর মত জাহাজে কেল্লার মত উঁচু-সম্মুখ কুঠি ও পশ্চাদ-কুঠি শত্রুর গোলা থেকে নিরাপত্তার জন্য ভাল নয় বলে সেগুলোকে নিচু করা হলো, অনেকটা ডেকের নিচে। জাহাজ এতটা পেট-বড় ঢাউস না হয়ে ছিমছাম লম্বাটে হলো। বেশি সংখ্যক কামানের জায়গা করাটিই এখন বড় কর্তব্য হলো। ওপরে খোলা জায়গায় বেশি না থেকে কামানগুলো বেশির ভাগই চলে গেলো নিচের এক বা দুই ডেকের দুই পাশে, খোলের মধ্যে জানালার ভেতর দিয়ে যাদের গোলা বর্ষণ চলে। ওই কামানের ফাঁকে ফাঁকে ঝোলা বিছানায় সাধারণ নাবিকদের শোয়ার ব্যবস্থা করতে হলো। প্রথম দিকে পেতলের ও ব্রোঞ্জের কামান থাকলেও শেষ পর্যন্ত ভারি লোহার কামানেরই সুবিধা দেখা গেলো। কামান যত ভারি ও শক্তিশালী হলো জাহাজের খোলের ওপর তার গোলার আঘাত যেন সহজে জাহাজকে ভাঙ্গতে না পারে সে জন্য তার পুরুত্ব বাড়াতে হলো, জাহাজের গলুইটি একটি শক্তিশালী মোটা দণ্ডের মত সামনের দিকে এগিয়ে আনা হলো এবং এর ওপর নানা ভাস্কর্যের ফিগারহেড নামক মূর্তির কারুকার্য থাকলো। কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য হলো জাহাজের সমস্ত ওজন নিয়ে দ্রুত এসে এই দণ্ড দিয়ে শত্রু জাহাজকে ধাক্কা দিয়ে ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা। এভাবেই গড়ে ওঠেছিলো সে যুগের প্রচলিত গ্যালিওন জাহাজগুলো– একাধারে বাণিজ্য ও যুদ্ধের জন্য।

১৭০০ শতকে এই গ্যালিওনের পরিবর্তিত রূপ এসেছে ইস্ট ইন্ডিয়া ম্যান হিসেবে। জাহাজ আগাগোড়া অনেকটা নিচু হয়ে এসেছে, তাতে দ্রুততা বেড়েছে। বেপরোয়া জলদস্যুতা চলে গিয়েছে তাই সাধারণ বাণিজ্যিক জাহাজ অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, তাতে কামানের বদলে পণ্যই বেশি। ইতোমধ্যে প্রতিরক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় নৌ-বাহিনী গঠনটির ওপর জোর দেয়া হয়েছে দেশে দেশে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে বা রাজানুগ্রহে বা কোম্পানীর দ্বারা অভিযাত্রা, সমুদ্র অনুসন্ধান ইত্যাদির কাল শেষ হয়ে এসেছিলো। তার বদলে এ দায়িত্ব ক্রমে ক্রমে নৌ-বাহিনীর হাতে চলে গিয়েছে। ওতেও মূল বড় যুদ্ধ জাহাজগুলো গ্যালিওনের আদলেই থাকলো– বেশি কামান, বেশি সৈন্য বহন করাটাই গুরুত্ব পেলো। প্রথম দিকে যুদ্ধ-কৌশল ছিল পরস্পরের জাহাজ যে যে ভাবে পারে গোলা দিয়ে ঘায়েল করা, গায়ে গায়ে ধাক্কাধাক্কি করা এবং

সুযোগ মত শত্রুর জাহাজে উঠে হাতাহাতি যুদ্ধ করা। এসবের জন্য কিছুটা উঁচু সম্মুখ কুঠি থেকে গুলি বর্ষণ সুবিধাজনক হতো। কিন্তু নৌযুদ্ধের কৌশল পরিবর্তিত হয়ে অনেক জাহাজের দলবদ্ধ যুদ্ধে পরিণত হওয়ায় প্রত্যেক জাহাজের পাশের থেকে এক বা দুই সারি কামান থেকে শত্রু জাহাজের পাশের দিকে সমবেত গোলা বর্ষণই নিয়ম হয়ে দাঁড়ালো, তখন প্রধান ডেকের ওপর কামানের বা গুলি বর্ষণের জন্য টাওয়ারের মত কিছু থাকার প্রয়োজন ফুরিয়ে ওটি নিচু হয়ে সমতলে থাকাই সুবিধাজনক হলো। প্রয়োজনীয় গোলা বারুদের ও খাদ্যের সংরক্ষণ এখন চলে গেলো একেবারে নিচের ডেকে, পানির তলেরও নিচে। বড় আকারে এসব জাহাজকে বলা হতো 'শিপ অফ দি লাইন'- সারিবদ্ধ নৌবহরের অংশ হয় বলেই। এর একটি হালকা দ্রুতগতির সংস্করণ হলো ফ্রিগেট। এগুলো দ্রুত এদিক ওদিক গিয়ে শিপ অফ দি লাইনের সহযোগিতায় যেমন আসতে পারে তেমনি একা পাহারা দেবার কাজ ইত্যাদিও করতে পারতো। এই শিপ অফ দি লাইনের জাহাজ অথবা ফ্রিগেটকেই কিছু বদলে নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও অভিযাত্রায় ব্যবহার করা হয়েছে।

সংঘবদ্ধ শক্তিশালী রার্ষ্ট্রীয় নৌ-বাহিনীর পাশাপাশি কিন্তু জলদস্যুদেরও সংগঠিত নৌবহর ছিল, যা প্রায়ই নানা প্রয়োজনে ভাড়াটিয়া জাহাজ ও নৌশক্তি হিসেবে সরবরাহ করতো যে কাউকে– যুদ্ধে, বাণিজ্যে, পাচারে, এবং সব থেকে বেশি আফ্রিকা কেন্দ্রিক দাস ব্যবসায়ে। দাস ব্যবসা ছিল সে কালের সব চেয়ে লাভজনক ব্যবসা। এর প্রত্যেকটিতে পর্তুগীজ, স্প্যানিশ, বৃটিশ, ফরাসী, ডাচ সবাই প্রায় সমান ভাবে অংশ নিয়েছে– সেটি রাষ্ট্রীয় নৌ-বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধের প্রতিযোগিতায়, বাণিজ্যে বিশেষ করে দাস বাণিজ্যে সুরক্ষা দেবার কাজে ভাড়াটিয়া বাহিনীর প্রতিযোগিতায়। দাস-জাহাজের গঠন, এর ব্যয় সংকোচের জন্য দাসপ্রতি জাহাজের স্থানের ন্যূনতম ব্যবহার ও ন্যূনতম রসদে দাসকে বাঁচিয়ে রাখা, পুরো ব্যাপারটিকে সুরক্ষা দেয়া ইত্যাদি প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। এগুলো জাহাজী স্থাপত্য ও পরিচালনায় রীতিমত ভিন্ন ভিন্ন আর্টে পরিণত হয়েছিলো– ইতিহাসের অত্যন্ত কুখ্যাত কালো আর্ট।

নৌশক্তির নানা বিকল্প দিক থাকা সত্ত্বেও ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় নৌ-বাহিনীর ওপর শুধু যুদ্ধের ভার এসে পড়েনি বরং বিস্তৃত পৃথিবীতে আরো উপনিবেশ স্থাপন, বিস্তার এবং সে উপনিবেশ রক্ষাকে মূল লক্ষ্য করে আরো কিছু কাজের ভার এসে পড়েছে। এর মধ্যে ছিলো নতুন নতুন আরো ভূখণ্ড আবিষ্কার, সুবিধাজনক সমুদ্রপথ আবিষ্কার, এসব পথের চার্ট তৈরি, ভূখণ্ডগুলোর উপকূলীয় চার্ট তৈরি, এদের প্রাকৃতিক সম্পদ নিরূপণ ইত্যাদি। এসব জায়গার মানুষদের সম্পর্কে জানা তাদের সবলতা-দুর্বলতার বিষয়গুলো, আচরণ-কালচার নিয়ে জানাও খুব প্রয়োজন। এর অনেক কিছু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের দ্বারাই সম্ভব। তাকে সহযোগিতা ও সমর্থন দেয়া নৌ-বাহিনীর কাজ হওয়াতে এর অফিসারদেরকে নৌযুদ্ধ ও নৌ চালনায় পারদর্শী হওয়া ছাড়াও ওই জরিপ, চার্ট তৈরি, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেও পারদর্শী হতে হয়েছে। কাউকে কাউকে হয়ে যেতে হয়েছে জীবনব্যাপী একজন সমুদ্র অভিযাত্রী। তার অনন্য উদাহরণ বৃটিশ নৌ-বাহিনীর ক্যাপ্টেন টমাস কুক এবং তাঁর তিনটি অবিস্মরণীয় বিশ্ব-সমুদ্র যাত্রা।

ব্যক্তিগত কিছু মৌলিক অসুবিধা নিয়ে কুককে তাঁর নাবিক জীবন শুরু করতে হয়েছিলো যা কখনো তাঁকে ছেড়ে যায়নি। ইউরোপীয় সেনা ও নৌ বাহিনী মাত্রই তখন অসম্ভব ভাবে শ্রেণী বিভক্ত ছিল। অফিসাররা সবাই অভিজাত পরিবার থেকে আসবে এটাই ছিল প্রত্যাশিত। সমাজের উচ্চতম শ্রেণী থেকে না এলে অফিসার হিসেবে উন্নতি করা যেতোনা। নৌ-বাহিনীতে নৌ পারদর্শিতাকে জায়গা দিতে গিয়ে এর কিছুটা ব্যতিক্রম করতে হতো বটে কিন্তু উচ্চতম পদগুলো এখানেও অভিজ্যতদের জন্যই বরাদ্দ। কুক জন্মেছিলেন গরীব কৃষক-শ্রমিক পরিবারে, কিন্তু নিজের প্রতিভা বলে লেখাপড়ায় ও পরে নৌ-বাহিনীর একাডেমিতে তিনি অসম্ভব কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। তা ছাড়া খুবই তরুণ নৌ-বাহিনীর অফিসার হিসেবে বৃটিশ উপনিবেশ কানাডায় বৃটিশ-ফরাসী যুদ্ধে এবং তারপর এর উত্তর-পূর্ব আমেরিকার সমুদ্র উপকূলের জরিপে সমান কৃতিত্ব দেখিয়ে তিনি এমন অর্জনের জায়গায় গিয়েছিলেন যে নৌ-বাহিনীর ক্যাপ্টেনের পদ তাঁকে দিতেই হয়েছিলো এবং পরপর খুবই বিখ্যাত ও সফল ভূপ্রদক্ষিণ করা সমুদ্র যাত্রার নেতৃত্ব নিয়েও তিনি দেশে কিংবদন্তীর অভিযাত্রী হিসেবে পরিগণিত

হয়েছিলেন– কিন্তু নৌ-বাহিনীর ওপরের স্তরের কাছে নিজেকে কখনোই গ্রহণযোগ্য করতে পারেননি।

ক্যাপ্টেন কুকের তিনটি ভূপ্রদক্ষিণকারী বিখ্যাত অভিযাত্রা পুরো সমুদ্র যাত্রার ইতিহাসেই অমর হয়ে আছে। তিনি এগুলোর মাধ্যমে পৃথিবীর অজানা আরো জায়গার জরিপ করেছেন, চার্ট তৈরি করেছেন, এবং প্রকারান্তে সেগুলোকে উপনিবেশবাদের অধীনে আনতে অবদান রেখেছেন যেখানেই সম্ভব হয়েছে। এ জন্য তাঁকে তাঁর জীবনও দিতে হয়েছে শেষ অভিযাত্রাটির মাঝখানেই ওই অজানা জায়গার মানুষদের হাতেই। তাঁর অভিযাত্রা ঘটেছিলো ১৭০০ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। আজ এত বছর পর ওই জায়গাগুলোর বাসিন্দারা, বিশেষ করে আদিবাসী বাসিন্দারা তাঁর আর এক রকম মৃত্যু ঘটাচ্ছে তাঁর যে অসংখ্য মূর্তি এসব নানা শহরে, বন্দরে ঔপনিবেশিক কালে গড়ে তোলা হয়েছে সেগুলোকে বিকৃত করে বা ভেঙ্গে ফেলে। এ মূর্তি তাঁদের জন্য ইতিবাচক কিছু নয়, বরং দাসত্ব চাপানো ও জাতি হিসেবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার চেষ্টার প্রতীক। সমুদ্র বিজ্ঞানের জন্য ও সমুদ্র যাত্রার আর্টের কাছে কুক বরণীয়, কিন্তু মানব সম্পর্কের দিক থেকে বর্জনীয়।

কুকের প্রথম অভিযাত্রাটি ছিল জানা পৃথিবীর ঠিক দক্ষিণে যে নতুন একটি বড় মহাদেশ রয়েছে বলে জনশ্রুতি ছিল সেটি সরজমিনে খুঁজে দেখার উদ্দেশ্যে। নির্দিষ্ট করে দক্ষিণ সাগরে সদ্য আবিষ্কৃত তাহিতি দ্বীপে এর একটি উপলক্ষও তৈরি হয়েছিলো– বোঝা যাচ্ছিল ওসময় শুক্র গ্রহটিকে সূর্যকে পশ্চাদপটে রেখে সূর্যের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অতিক্রম করতে দেখা যাবে পৃথিবী থেকে (যাকে বলা হয় শুক্রের ট্রানজিট)। সেটি সব থেকে ভাল দেখে রেকর্ড করার সুযোগ এই দ্বীপটাতেই বেশি। এজন্য তাঁকে অগভীর সমুদ্রে বিচরণের জন্য চেপ্টা-তল একটি কয়লা বহনকারী জাহাজ দেয়া হলো। একে তিনি তাঁর কাজের উপযুক্ত করে নিয়ে নাম দিলেন এনডেভর (প্রচেষ্টা)। তাঁর সঙ্গে ছিল পেশাদার ও সৌখিন অভিজাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানীদের একটি দল, তাঁদের জন্য জাহাজে বিশেষ ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো। ১৭৬৯ সালে ৩ জুন শুক্র গ্রহের ট্রানজিটটি ঘটবে বলে সেভাবে সময় হাতে নিয়ে এনডেভর পশ্চিমে আমেরিকার দিকে গিয়ে এর দক্ষিণ বিন্দু কেইপ হর্ন পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে সদ্য আবিষ্কৃত তাহিতি দ্বীপে

হাজির হলো। তাহিতির মানুষরা খুবই বন্ধুসুলভ ব্যবহার করলো– ফলমূল, মাছ, সব্জী ইত্যাদি দিয়ে দারুণ আতিথিয়তার ফুলঝুরি। ওরা পলিনেশিয়ান মানুষ যাদের মত অন্যান্যদের সাক্ষাত ইউরোপীয়রা কিছুদিন ধরে পাচ্ছিলো। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যে কয়দিন তাঁদের শুক্র গ্রহ ট্রানজিট দেখার কাজ করলেন কুক নিজে দ্বীপের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে এর উপকূলের জরিপ ও চার্ট তৈরির কাজ সেরে ফেলেছিলেন– এ কাজটিতে তিনি নিজেই ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। আশপাশের অন্যান্য দ্বীপও এভাবে জরিপ হয়ে গেলো। তারপর আরো দক্ষিণে চলে গেলো এনডেভর– সেই দক্ষিণ মহাদেশের কোন আলামত পাওয়া যায় কিনা দেখতে। তার আগে তাহিতিয়ানদের কথা যেভাবে অভিযাত্রীদের বর্ণনায় এলো ওরা নারী-পুরুষ সবাই অতি সুন্দরদেহী এবং নান্দনিক স্বভাবের। এমন নারী-স্বাধীনতা ইউরোপীয়রা কল্পনাও করতে পারেনা। স্থানীয়রা যেন চাচ্ছিলোনা যে এনডেভর জাহাজ ওখান থেকে কখনো আগন্তকদের নিয়ে চলে যাক। দক্ষিণ মহাদেশ পাওয়া না গেলেও সেখানে উত্তর দ্বীপ ও দক্ষিণ দ্বীপ দুটি পর পর দ্বীপ যার মাঝখানে একটি প্রণালী আবিষ্কার করলেন কুক (আজকের নিউজিল্যান্ড)। এখানকার লোক মাওরিরা কিন্তু তাহিতিয়ানদের ঠিক বিপরীত প্রকৃতির– যুদ্ধংদেহি, কেটে ফেল্‌বো, মেরে ফেলবো এমনই ভাব, সারাক্ষণ হুমকি দিচ্ছে। দেখতেও ভয়ানক, মানুষখেকো বলে দুর্নাম আছে, গায়ে ভয়ানক দেখতে সব উল্‌কি আঁকা। সহযাত্রী বিজ্ঞানীর কেউ কেউ সন্দেহ করছিলেন যে এর দক্ষিণ দ্বীপটি আসলে ওই জনশ্রুতির দক্ষিণ মহাদেশ। তা যে নয় তা কুক শিগগির দেখিয়ে দিলেন এর চারিদিক ঘুরে এসে জরিপ করে– উত্তর দ্বীপেও তাই করলেন। পরে এ দুই দ্বীপের মাঝখানের প্রণালীটিকে নাম দেয়া হয়েছে কুক প্রণালী। সব কাজ করা হলো মাওরিদেরকে যথাসম্ভব এড়িয়ে গিয়ে। তারপরও তাদের সঙ্গে কিছুটা বোঝাবুঝি যে হলোনা তা নয়। তাহিতি থেকে নিয়ে আসা মানুষের মাধ্যমে কথা বলা গেলো– কারণ দেখা গেল বিশাল দূরত্ব সত্ত্বেও তাদের ভাষায় মিল আছে।

ওখান থেকে পশ্চিম দিকে যাবার সময় ১৭৭০ সালের এপ্রিলে স্থল চোখে পড়লো। এটি ছিলো অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল যার দক্ষিণাংশ এর বহু আগে ডাচ অভিযাত্রীরা আবিষ্কার করে নাম দিয়েছিলেন নিউ হল্যান্ড। কিন্তু এখন যা দেখছিলেন তা নতুন জায়গা; ২৮ এপ্রিল একটি শান্ত সুন্দর প্রায় চারিদিকে

তীরে ঘেরা অনেকটা সমুদ্র সংলগ্ন হ্রদের মত জায়গা দেখে তাতে ভেড়ালেন এনডেভরকে। চারিদিকে সবুজে ঘেরা এই জলরাশির নাম দিলেন 'বোটানি বে'। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরের কাছে এই বোটানি বে'তে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বৃটিশদের প্রথম দেখা। অস্ট্রেলিয়ার উপকূল ধরে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে আরো এগিয়ে প্রবাল প্রাচীরে জাহাজ আটকে, জাহাজ প্রায় ভেঙ্গে গিয়ে দারুণ বিপদে পড়লেন। কোন রকমে আসল তীরে জাহাজকে তুলে মেরামত করতে পেরেছিলেন বলে রক্ষা। আনুষ্ঠানিক ভাবে জায়গাগুলোর দখল ঘোষণা করলেন বৃটিশ রাজের নামে। এখানে আদিবাসীদের সঙ্গে সংযোগের চেষ্টা করলেন- কিন্তু এরা বড় অদ্ভুত, কিছুতেই ধরা দেয়না। এদের সঙ্গে না তাহিতিয়ানদের মিল, না মাওরিদের মিল। কালো, শুকনাদেহী এই মানুষগুলো নিজের মধ্যেই নিজে থাকে, সামান্য ইঁদুর বা মাছ শিকার করে। তাদের ভাষা অন্য দ্বীপ থেকে থেকে নেয়া মানুষরা বুঝতে পারেনি– একেবারে আলাদা। বাণিজ্য, বিনিময়, আলাপ সালাপ এসবে এদের সভ্যতা অনেক যুগ পিছিয়ে– কুক আর তাঁর দলবল অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সংস্কৃতিকে ভুল বুঝেছিলেন।

অবশেষে ইন্দোনেশিয়ার বাটাভিয়া (আজকের জাকার্তা) হয়ে দেশে ফেরার চেষ্টা করলেন। বাটাভিয়া ডাচদের অধীনে রমরমা বন্দর কিন্তু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। এতদিন কুক নাবিকদের স্বাস্থ্য রক্ষা করে চলতে পেরেছিলেন, এমনকি ভয়ঙ্কর স্কার্ভি রোগ থেকেও, যদিও এখনো তার সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রতিষেধকটি (ভিটামিন সি, টাটকা শাকসব্জী, ফল) তিনি ধরতে পারেননি। কিন্তু সেটি না বুঝেও তিনি এ খাবারগুলো ব্যবস্থা করেছেন যখনই পেরেছেন। বাটাভিয়ায় এসে দলে দলে নাবিক অসুস্থ হলো, মারা গেলো। বহুদিন এখানে আটকে থেকে পরে যাদেরকে পারলেন নিয়ে ফিরে এলেন ইংল্যান্ডে। পুরো পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা হয়ে গেলো এ অভিযাত্রায়। বাটাভিয়া থেকে ইংল্যান্ড অভিমুখে অন্য জাহাজও নিয়মিত পাওয়া যেতো। তাই কুকের ধনী সহযাত্রীদের আগেই ফিরতে অসুবিধা হয়নি।

কুকের দ্বিতীয় অভিযাত্রাটিও ওই দক্ষিণ মহাদেশ এবং আরো দক্ষিণের দ্বীপগুলোকে ভাল করে অনুসন্ধান করার জন্যই, প্রথমটির অল্প কিছুদিন পরেই। পর পর দুই গ্রীষ্মে এটি করা হবে– শীতকালে অসম্ভব। মাঝখানে

শীতটি নিউজিল্যান্ড এবং তাহিতি এই দুই জানা ও মোটামুটি নিরাপদ জায়গায় কাটাতে হবে সেখানকার পূর্ব পরিচিতদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। ১৭৭২ সালের ১৩ জুলাই যাত্রা শুরু হলো এবার দুটি জাহাজে রেজোল্যুশন (সিদ্ধান্ত) এবং অ্যাডভেঞ্চার (অভিযান)। চরম দক্ষিণের ওই অজানা প্রকৃতির বিজ্ঞান চর্চার জন্য সঙ্গে রইলো জ্যোতির্বিদ, ভূগোলবিদ ও চিত্রশিল্পীদের একটি টিম, চিত্রশিল্পীরা সব কিছু রেকর্ড করবেন। জাহাজী বিজ্ঞানের দিক থেকে একটি বড় কাজ ছিল দীর্ঘ যাত্রায় বিখ্যাত ঘড়ি-নির্মাতা জর্জ হ্যারিসনের নতুন উদ্ভাবিত অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও অবিচল ঘড়ি ক্রনোমিটারকে পরীক্ষা করা। পূর্ব-পশ্চিমে জাহাজের অবস্থান নির্ণয়ের সমস্যাটি বরাবর থেকেই যাচ্ছিলো। স্থানীয় সময়ের সঙ্গে একটি বিশেষ জায়গার (এ ক্ষেত্রে লন্ডনের) সময় তুলনা করে এই অবস্থান বোঝা যায়। কিন্তু মাসের পর মাস ঝড়ের প্রচণ্ড দোলা জাহাজে লন্ডনের সময় দেয়া ঘড়িটাকে একই সূক্ষ্ম ভাবে সঠিক লন্ডনের সময়ে চালিয়ে রাখা অসম্ভব কাজ ছিলো। জর্জ হ্যারিসন এমন বহুদিনেও ফাস্ট বা স্লো না হওয়া ক্রনোমিটার উদ্ভাবন করেছিলেন অল্প কিছু দিন আগে। এবার তা পরীক্ষা করে দেখার ভার নিলেন কুক– খুব যত্ন করে জাহাজে ওটি রাখা হলো। কুক রইলেন অনেক বড় বা ভারী জাহাজ রেজোলুশনে, অ্যাডভেঞ্চার জাহাজটি বেশ ছোট।

উত্তমাশা হয়ে এবার আরো প্রচুর দক্ষিণে, সেখানে সমুদ্রে ভাসছে বরফ হিমশৈল। সেগুলো সশব্দে ফাটছে, ভাঙ্গছে, এর মধ্য দিয়ে জাহাজ চালানো অসম্ভব– নিরাপদ দূরত্ব রেখে চলতে হয়। জাহাজের দড়াদড়ি, পাল সব শীতে জমে শক্ত; নাবিকদের পক্ষে ওগুলো নিয়ে কাজ করা অসম্ভব, হু হু ঠান্ডা বাতাসে হাত যেখানে জমে যায়। সামনে অনেক পশ্চিমের ইস্টার আইল্যান্ডে থামলেন। এটি বহু আগে ডাচরা আবিষ্কার করেছিলো, কিন্তু তারপর ইউরোপীয় কেউ যে বেশি এসেছে তা নয়। এরাও পলিনেশীয়, বহু দূর থেকে এককালে এসেছিলো। এখন পরিবেশ বিপর্যয়ে তাদের মধ্যে চল্‌ছে দারুণ বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ। কাজেই সেই দুর্যোগে কুকের নাবিকরা এখানে না পেলেন বিশ্রাম, না পেলেন খাদ্যের রসদ। এমনকি কুকের কাছে সব থেকে দুঃখের বিষয় হলো ইস্টার আইল্যান্ড জরিপ করে চার্ট তৈরির অবকাশও হলোনা; এটি বহু পরে ফরাসীরা করেছে। দেখতে দেখতে শীতের আশ্রয়ে তাহিতি চলে যেতে হলো। খুব খাতিরে কাটানো তাহিতির মানুষের

আতিথিয়তায়, যদিও পরে ফরাসীরাই এখানে আধিপত্য বিস্তার করেছিলো, বৃটিশদের সেই সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু মাওরিদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও কুক নিউজিল্যান্ডকে বৃটিশ উপনিবেশ হিসেবে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন এ সময়। পরে সত্যি সত্যি এখানে বৃটিশ রাজ কায়েম হয়েছে, মাওরিরা ক্রমে নিজ দেশে সংখ্যালঘূতে পরিণত হয়েছে; কর্তৃত্ব হারিয়েছে, কিন্তু অন্যান্য অনেক উপনিবেশের মত নিজেদের স্বকীয়তা ও কালচার বজায় রেখেছে আজও বেশ সদর্পে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের তুলনায় ওরা এদিক থেকে ভাগ্যবান। বৃটিশ উপনিবেশ অস্ট্রেলিয়াতেও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু এর ফল স্বরূপ ওখানকার আদিবাসীরা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে– যদিও তাদের ৪০ হাজার বছর প্রাচীন কালচার, নান্দনিকতা, ভাষা, ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে বেশ উঁচু স্তরের ছিল। কুক অবশেষে দক্ষিণ মহাদেশের অস্থিত্ব চিরতরে নাকচ করে দিয়ে কেইপ হর্ন থেকে আরো দক্ষিণ দিয়ে পূর্বে উত্তমাশায় এসে দেশে ফিরলেন– এবারো পুরো ভূপ্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হলো– ১৭৭৫ সালের ৩০ জুলাই। এর এক বছরের মাথায় তৃতীয় অভিযান শুরু হলো ১৭৭৬ সালের ১২ জুলাই, জাহাজ সেই আগের রেজোল্যুশনই, সঙ্গে আরেকটি ছোট জাহাজ। এবার পৃথিবীর উত্তর প্রান্তের একটি কর্তব্য পালনই বড় উদ্দেশ্য, আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম কোণা থেকে সরাসরি এশিয়ায় আসার কোন সামুদ্রিক পথ আবিষ্কার করা যায় কিনা তা দেখা– এ পথ হবে সর্ব উত্তর আমেরিকা থেকে সর্ব উত্তর এশিয়া। তা হলে আমেরিকা থেকে প্রাচ্য দেশে সহজে আসা যাবে।

কিন্তু আমেরিকার ওই উত্তরে যাওয়ার আগে কুককে তাঁর আগের পরিচিত দক্ষিণের জায়গাগুলোতে কিছু বাকি কাজ সারতে হলো– গেলেন অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে টাসমেনিয়া দ্বীপে- ওই চার্ট তৈরির কাজ। নিউজিল্যান্ডকে এড়িয়ে উত্তর পূর্ব দিকে কুকস আইল্যান্ডে (বর্তমান নাম) গেলেন– জাহাজ মেরামতের দরকার বলে সেটি মেরামতের ভাল জায়গা খুঁজছিলেন। কাছেই তাহিতিতেও গেলেন। বন্ধুসুলভ হলেও এখানে স্থানীয়দের সঙ্গে তাদের চুরির অভ্যাস নিয়ে কুক খুব বিরক্ত ছিলেন। আবার তাঁর দু'জন নাবিক পালিয়ে গেলে ওরাই আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রেখেছে এমন খবর পেলেন। পালানোর সুযোগ পেলে শিগ্‌গির জাহাজ যে তাহিতিতে খালি হয়ে যাবে এমনটি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন– তাই কুক খুব কঠোর হলেন নিজের নাবিকদের ওপরও,

তাহিতিয়ানদের ওপরও। এখান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব বাণিজ্য বায়ু তাঁকে এক গুচ্ছ নতুন দ্বীপে নিয়ে এলো (আজকের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ); এটি কুকের মস্ত বড় একটি আবিষ্কার। এই আবিষ্কার যেন কুকের যাওয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় পলিনেশিয়ান দ্বীপগুলোর একটি ত্রিভুজ আকৃতির বিন্যাস সম্পূর্ণ করলো যার বাহুগুলো বেশ দীর্ঘ প্রত্যেকটি ৪-৫ হাজার মাইল। দক্ষিণে ত্রিভুজের ভূমির পশ্চিম প্রান্তে ইস্টার আইল্যান্ড আর পূর্ব প্রান্তে নিউজিল্যান্ড। আর এখন ত্রিভুজের শীর্ষ বিন্দুটি পাওয়া গেলো উত্তরে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ হিসেবে। এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রের মাঝখানে তাহিতি আর কুক্স আইল্যান্ড। কুকের সঙ্গে যাওয়া তাহিতির মানুষের ভাষা নিউজিল্যান্ডের লোকরা বুঝছে দেখে কুক অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এখন দেখলেন হাওয়াইতেও তাহিতির ভাষা বোঝে। এই সব দ্বীপের মানুষগুলোর মধ্যে ভাষার ও কালচারের মিল আছে– অথচ দূরত্বগুলো হাজার হাজার মাইল। এই সব মানুষের একই আদি পুরুষরাই সব দ্বীপে গিয়েছিলো বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু এতদূর সমুদ্র কীভাবে পাড়ি দিয়েছিলো তারা? এ এক বড় ধাঁধাঁ– তারা নিশ্চয়ই নৌ-চালনায় সামান্য মানুষ ছিলনা। অতি ছোট নৌকায় হাজার হাজার মাইল একটানা সমুদ্র পাড়ি দেবার কৌশল তাদের ছিল।

হাওয়াইয়ের নিজস্ব ধর্মের ও সামাজিক আচারের নিয়ম নিগড়ে বাঁধা মানুষগুলোর সঙ্গে কুকের সম্পর্কটি খারাপ ছিলনা। এখানে বিভিন্ন রাজাদের শ্রেণী সবার ওপরের– তাদের বলা হতো আলী। প্রত্যেক দ্বীপের একজন বড় রাজা– আলী নুই। আলীদের নিচে বিশেষজ্ঞ বা পুরোহিত কাহনা শ্রেণী। এই উচ্চ শ্রেণীর মানুষরাও খুব শিষ্ট ভদ্র ছিলো, তার নিচের সাধারণ মানুষ তো বটেই। তবে ওখানে কিছু বেপরায়া উগ্র তরুণও ছিল। এদিকে কুক নানা কারণে তখন অসহিষ্ণু ও নিষ্ঠুর আচরণ করছিলেন সব দ্বীপেই– বিশেষ করে নিত্য এটি সেটি চুরি হওয়াতে তিনি ধৈর্য হারাচ্ছিলেন। হাওয়াইতেও এ নিয়ে বিবাদ হয়, কুক গুলি করেন, মানুষ মারাও যায়। চুরি করা জিনিস উদ্ধারের চেষ্টায় আলীদেরকে জিম্মি করা যথেষ্ট খিটিমিটির কারণ হয়েছিলো। এর মধ্যে তাঁর অভিযাত্রা চলে গেলো উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে ক্যালিফোর্নিয়া ঘেঁষে উত্তরে– সেই উত্তরের সমুদ্রপথ খোঁজার কাজে। একেবারে উত্তরে ওরিগোনে (বর্তমান যুক্তরাষ্ট্রে) এবং ভ্যাঙ্কুবারে (কানাডায়) আদিবাসীদের সঙ্গে তাঁর পশু চামড়ার ব্যবসাটি ভালই জমেছিলো। কিন্তু

বেরিং প্রণালী পার হয়ে এশিয়ায় এসে দেখলেন রীতিমত বরফের দেয়াল, তার ভেতর দিয়ে এশিয়ার সঙ্গে সমুদ্র পথের কোন সম্ভাবনা নেই। ওই আবিষ্কারের আশা ছেড়ে কুক আপাতত আবার হাওয়াইতে চলে এলেন।

তিক্ততার মধ্যে হাওয়াই ছেড়েছিলেন– কিন্তু এবার দেখলেন আচরণ সম্পূর্ণ বদলে গেছে, তাঁদেরকে নিয়ে রীতিমত উৎসব; সম্মান দেখানোর, উপহার দেয়ার, আপ্যায়ন করার কোন শেষ নেই। বোঝা গেলো তাদের কোন বিশেষ দিনে আসায় ওরা কুককে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করেছিলো। এর পর পরবর্তী গন্তব্যের জন্য হাওয়াই ছেড়ে গেলেও কয়েক দিনের মধ্যে আবার ফিরতে হলো জাহাজের মাস্তুল ঝড়ে ভেঙ্গে গিয়ে মেরামতের প্রয়োজন হয়েছিলো বলে। এবার কিন্তু উৎসবের বদলে বরং তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা দেখা গেল– মনে হচ্ছিলো এভাবে ফিরে আসাটি দুর্ভাগ্যের প্রতীক হয়েছে। এর মধ্যে জাহাজের মূল্যবান একটি নৌকা চুরি হয়ে গেলে কুকের ধৈর্যের বাঁধ রইলোনা। বন্দুকধারী সৈন্য সঙ্গে নিয়ে হাওয়াই দ্বীপের আলী নুইকে গ্রেপ্তার করে জাহাজে নেবার জন্য নৌকায় তোলার চেষ্টা করলেন, উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে চাপ দিয়ে চুরি যাওয়া নৌকাটি উদ্ধার করা। বয়স্ক আলী নুই প্রথমে যেতে রাজি থাকলেও অন্যরা মানা করলেন যেতে, বল্‌লেন জাহাজে জিম্মি না হতে। এর মধ্যে এক দল উগ্র মানুষ অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে কুককে সমুদ্র তীরেই আক্রমণ করে মাটিতে ফেলে দিয়ে বার বার আঘাতে মেরে ফেল্‌লো। বন্দুকধারীরা বেশি কিছু করতে পারলোনা– চকিতে সব কিছু ঘটে গেলো। সেটি ছিলো ১৪ ফেব্রুয়ারী ১৭৭৯ সাল।

কুকের সহযাত্রীরা এই ভূপ্রদক্ষিণও সম্পূর্ণ করেছিলেন, অভিযাত্রার আরো কিছু দায়িত্ব সম্পন্ন করে। টমাস কুক মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর কর্তব্য করে গেছেন পৃথিবীর সমুদ্রের মানচিত্র সম্পূর্ণ করতে। আমেরিকার পূর্ব কোণ আর পশ্চিম কোণ যেখানে গিয়েছেন জরিপ করেছেন, চার্ট তৈরি করেছেন ও মানচিত্র সম্পূর্ণ করেছেন। আর তাঁর আসল বিচরণ ক্ষেত্র তো ছিল প্রশান্ত মহাসাগরের সেই দ্বীপগুলোতে যেগুলোকে আমরা প্যাসিফিক আইল্যান্ডস বলি, সেই সঙ্গে অবশ্যই অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। প্রত্যেক দ্বীপের উপকূল ঘেঁষে জাহাজ চালিয়ে জরিপ করেছেন। প্রত্যেকটির অধিবাসীদের সঙ্গে মিশতে চেয়েছেন, কারবার করতে চেয়েছেন, সেভাবেই তাঁর জীবনটাও দিয়ে

গেছেন। তাদেরকে কখনো নিজের কাজের সহায়ক হিসেবে নিয়েছেন, সম্ভাব্য প্রজা, উপনিবেশের যোগানদার ও দাস হিসেবে দেখেছেন; কখনো সত্যিকার অর্থে সম্মানের চোখে দেখেননি। বিজ্ঞান- মনস্ক হয়েও এটিই তাঁর ট্র্যাজিডি। পুরো অভিযাত্রা যুগেরও ট্র্যাজিডি।

জাহাজী গতির আর্ট-সায়েন্স

পাল ও হাল:

গতি জিনিসটি তো একেবারেই বিজ্ঞানের বিষয়। সেখানে আর্টটি কী? পালের জাহাজে গতি সৃষ্টি এবং এদিক ওদিক যাতায়াতের কারুকার্যের মধ্যে ওই বিজ্ঞানের পাশাপাশি একটি আর্ট আছে যার কায়দা-কানুন সবার কাছে উপভোগ্য। মনে রাখতে হবে সমুদ্রে যতক্ষণ আছে পালের জাহাজকে গতিতে থাকতে হয়, গতি ছাড়া তার অবস্থা টুঠো জগন্নাথের মতো। যেমন সামুদ্রিক ঝড় যখন তার পালে আঘাত হেনে তাকে উল্‌টিয়ে দিতে চাইবে তখনো তার পক্ষে সব পাল গুটিয়ে ফেলা উচিত হয়না। কারণ ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করতে হলেও তাকে গতিশীল থাকতে হয়, নিজের কর্মক্ষমতা বজায় রাখতে হয় যাতে হাল ঘুরিয়ে নিরাপদ বিশেষ দিকে ফিরতে পারে এবং চলার চেষ্টা করতে পারে। তার সকল শক্তির ও ক্ষমতার উৎস হলো এই গতি।

আমরা দেখেছি সেদিনের সমুদ্র যাত্রায় আড়াআড়ি স্কোয়ার পালে সরাসরি বাতাসে ঠেলার ওপরেই বেশি নির্ভর করা হয়েছে। সেজন্যই জাহাজকে সব সময় খুঁজে নিতে হয়েছে লক্ষ্যস্থলের দিকে অনুকূল বায়ু। গতির সামনে একটি বাতাসের বাধা ঠেলে যাবার দিক থেকে এর সঙ্গে প্যারাসুটের সাদৃশ্য আছে বলে একে আমরা প্যারাসুটের মত কাজ বলতে পারি। অনুকূল বায়ুতে যাওয়ার সময়ে অবশ্য লক্ষ্যস্থল যদি ঠিক বায়ু প্রবাহের দিকে নাও থাকে তখনও জাহাজের মুখ লক্ষ্যস্থল বরাবর রাখলে বায়ুর শক্তির একটি বড় উপাংশ ঠিকই জাহাজকে সেদিকে নিয়ে যায়। তবে সেটি একটি সীমার মধ্যেই সম্ভব। বায়ু প্রবাহের সঙ্গে ওই সীমার থেকে বেশি বড় কোণ করে যদি লক্ষ্যস্থলের দিকে যেতে হয় (যেমন সমকোণ বা আরো বড় কোণ) তখন তাকে আর অনুকূল বাতাসে যাচ্ছে বলে ধরা যাবেনা, বরং বাতাসের প্রতিকূলেই ধরতে হবে।

বাতাসের প্রতিকূলে যাওয়ার কৌশলটি চীনে প্রথম আবিষ্কৃত হওয়ার পর ধীরে ধীরে অন্যত্র চালু হয়। এর যে প্রক্রিয়া সেটি রীতিমত একটি আর্ট যেই অর্থে পাখির বাতাসে ভেসে থাকাটি একটি শিল্পসম্মত বিষয়, আর্টের আগ্রহ নিয়ে দেখার মত। তবে বোঝার সুবিধার জন্য প্রায় একই প্রক্রিয়া অনুসরণকারী বিমানের ডানার উপমাটি নিতে পারি। জাহাজকে যদি বাতাসের প্রতিকূলে যেতে হয় তাহলে পালকে খাটাতে হয় জাহাজের সঙ্গে লম্বালম্বি অর্থাৎ আগু-পিছু করে। ত্রিভুজাকৃতি লাতিন নামে পরিচিত পালই এর জন্য সুবিধাজনক। তবে আয়তাকার স্কেয়ার পালকে আড়াআড়ি অবস্থান থেকে ঘুরিয়ে জাহাজের লম্বালম্বি দিকে আগুপিছু করে নিলে তাও সই। এ অবস্থায়ও সোজা প্রতিকূল বায়ুর দিকে যাওয়া অসম্ভব বটে তবে সামনে থেকে আসা এই বাতাসের সঙ্গে ন্যূনতম ৩০ ডিগ্রির মত একটি কোণ করে যদি জাহাজ থাকে, পালও সে রকম কোণ করে থাকবে, এবং সেক্ষেত্রে ওই পাখির বা বিমানের ডানার প্রক্রিয়াটি প্রযোজ্য হবে। প্রতিকূল বায়ু প্রবাহ এক্ষেত্রে সামনে থেকে এসে পালের দু পাশ ঘেঁষে পেছনে যাবে। কিন্তু কোণ করার দিকের পাশটা দিয়ে যাবার সময় এ বাতাসকে একটু বেশি ঘুরে যেতে হয় বলে তা দ্রুততর হয় এবং ফলে সে পাশে পালের ওপর তার চাপটি অন্য পাশের তুলনায় কিছু কমে যায়। এই কমতি চাপের কারণে সেদিকে পালের ওপর একটি বলের সৃষ্টি হয়। ওই ন্যূনতম ৩০ ডিগ্রি বা বেশি কোণের জন্য জাহাজের মুখের দিকেই এই বলের বড় উপাংশটি কাজ করে এবং জাহাজকে সেদিকে নিয়ে যায়– যা রীতিমত বাতাসের প্রতিকূলে যাওয়ার মতই। অন্য উপাংশটি জাহাজের পাশের ওপর পড়ে বলে সেটির তেমন কোন কার্যকারিতা থাকেনা।

বিমান যখন সামনের দিকে গতিশীল থাকে তখন তার ডানার ওপর ও নিচ ঘেঁষে বিপরীত দিক থেকে বাতাস চলতে থাকে। সামনের কিনারা ওপরে রেখে ডানাটি তেরচা থাকে বলে ওপর দিয়ে যাওয়া বাতাসের একটু ঘুরে যায় ও ডানার ওপরের তলের গায়ে বাতাসের চাপ নিচের তলের থেকে কিছু কম হয়। এই কমতিটুকু বল সৃষ্টি করে ডানাকে ওপরের দিকে নিয়ে যেতে চায় এবং ভাসিয়ে রাখে। বিমানের ডানা ভেসে থাকার সঙ্গে মিলের কারণে আমরা বাতাসের প্রতিকূলে নেবার ক্ষেত্রে পালের কাজকে বিমানের ডানার মত কাজ বলতে পারি। এই সুন্দর ব্যাপারটিকে শুধু বায়ুর গতি সংক্রান্ত বিজ্ঞানের

ব্যাপার বল্‌লে ঠিক হবেনা। একটি জাহাজ যখন পালে বাতাসের ঠেলা না লাগিয়ে বাতাসকে বরং পালের দু'পাশ দিয়ে চলে যেতে দিয়ে দিব্যি বাতাসের প্রায় বিপরীত দিকে চলতে পারে তখন তাকে দেখে একটি নান্দনিক অনুভূতি হয় বৈকি। এ যেন আকাশে পাখির সামনের দিকে ভেসে যাওয়া বাতাসের কোন আপাত সাহায্য না নিয়ে। সাহায্য ঠিকই নিচ্ছে তার ডানায়, কিন্তু সেটি স্পষ্ট হয়না।

সব কিছুর মধ্যে এ তথ্য স্পষ্ট– বাতাসের অনুকূলেই যাই কিংবা প্রতিকূলেই যাই, সব নির্ভর করে বায়ুর গতি বজায় থাকার ওপর। এই যে বিশাল জাহাজ, তার এত সব আয়োজন এত মানুষের এতো কুশলতা আর শ্রম সবই বেকার হয়ে যায় যখন বাতাসে গতি না থাকে। জাহাজ বন্দরে নোঙ্গর করা যখন থাকে একমাত্র তখনই বাতাসের গতির তার দরকার নেই। যখনই যাত্রার সময় হলো ক্যাপ্টেনকে তাঁর মেইটদের মাধ্যমে হুকুম দিতে হয় 'স্কোয়ার কর'– এর মানে জাহাজের যাত্রা শুরু হবে, সবাই যেন প্রধান ডেকে যাত্রার প্রয়োজনীয় সব কিছু করে। তারপর থেকেই বাতাসের গতির ভূমিকা শুরু হয়ে গেলো। স্কোয়ার কর– এই একটি মাত্র কথা সবাইকে যার যার কর্ম বিন্দুতে ব্যস্ত করে তোলে, এসবের দিকে নজর দিলেই তার ছোট ছোট প্রত্যেকটি অংশে চোখে পড়বে জাহাজী সংস্কৃতির এক একটি দিক, এক একটি আর্ট। পালের সঙ্গে বিভিন্ন দড়ি থাকে যা টেনে পতাকা তোলার মত করে পালকে মাস্তুলে তোলা হয় বা সেখান থেকে নামানো হয়। আবার অন্য দড়ি দিয়ে গুটানো পালকে মেলার পর তার কোণাগুলো টান টান রাখা হয়, পাল যেই আড়দন্ডের থেকে ঝোলানো থাকে সেগুলোকে ঘুরিয়ে পালকে ঘোরানো হয়, তাও অন্য কিছু বিশেষ দড়ির টানেই। এই দড়িগুলোর প্রান্ত আলাদা করে ডেকের পাশে বিশেষ বিশেষ আটকাবার জায়গায় যেভাবে গুছিয়ে রাখা হয় সেটিও এক আর্ট। ওখান থেকে এই দড়ি খুলে নিয়েই যার যার কাজ। কাজ সেরে আবার সুন্দর গুছিয়ে রাখা হয়। স্কোয়ার করার সময় ডেকের ওপর অনেক কাজ হয় বটে, কিন্তু তারপরও সব ছিমছাম একেবারে ছবির মত।

তারপরের হুকুমটাই হতে পারে 'মেইন টপ গ্যালান্ট মেলো'– অথাৎ কিনা প্রধান মাস্তুলের ওপরের দিকের পাল টপ গ্যালান্টকে মেলে দাও; প্রধান

মাস্তুলের ওপরে যেখানে টপ গ্যালান্ট নামের পালটি আছে, সেখানে দড়ির সিড়ি দিয়ে উঠে পালের বাঁধন খুলে মেলে দাও, তার কোণা আটকিয়ে দাও, তাকে টান টান কর, এবার বাতাস লেগে সেটি যেন ফুলে গিয়ে জাহাজকে সামান্য চলমান করতে পারে। বড় জাহাজে সাধারণত তিনটি কি চারটি মাস্তুল থাকে তার প্রত্যেকটির আলাদা নাম আছে। আর প্রত্যেকটির একের ওপর এক ক্রমাগত ছোট যে পাল আছে সেগুলোরও আলাদা নাম আছে, কাজেই সব নাবিক বুঝতে পারে কোন্ পালের কথা বলা হচ্ছে। যত ওপরে তত বাতাসের গতি বেশি। পাল মেলে দিলে তবে গতি কার্যকর হয়; কতটি মেলা হলো সে ভাবেই জাহাজের গতি বাড়বে, আবার কতটি গুটিয়ে ফেলা হলো সেভাবে কমবে। যেমন ঝড়ের সময় জাহাজে ঝড়ের অতিরিক্ত ধাক্কা না লাগার জন্য প্রায় সব পাল গুটিয়ে ফেল্তে হয় দু'একটি বাদে যাতে একেবারে গতিহীন না হয়। ভাল গতির অনুকূল বাতাসে সব পাল মেলে দিয়ে দ্রুত চলা সেটিই জাহাজের সব থেকে নান্দনিক দৃশ্য, সব থেকে আনন্দের মুহুর্ত। এদিকে স্কোয়ার করার অংশ হিসেবে নোঙ্গর তোলার পালা। অত্যন্ত ভারী লোহার একটি জিনিস, দড়ি বা চেইন ক্যাপস্টান নামের সুন্দর একটি স্থির কপিকলের সঙ্গে পেঁচানো থাকে। বেশ কয়েকজন মিলে ঘানি ঘোরাবার মত ক্যাপস্টান কপিকলের সঙ্গে যুক্ত একটি চাকার লম্বা স্পোক ধরে নিজেরা ঘুরে ঘুরে সেই ভারী নোঙ্গর তুলতে হয়।

পালে বাতাস লেগেছে, জাহাজ এবার চলবে। বন্দরের কাছেই যে লক্ষ্যের দিকে বাতাস পেয়ে যাবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আপাতত তাকে হয়তো এদিক ওদিক বেশ খানিকটা গিয়ে তারপর যেই কাম্য বাতাস খুঁজে নিতে হবে। পথের মাঝেও এমন ব্যাপার ঘটতে পারে– অনুকূল বাতাস আর না থাকলে এদিক ওদিক গিয়ে তবে লক্ষ্যের দিকের আরেকটি অনুকূল বাতাস আবার খুঁজে নেয়া। এই অন্তর্বর্তী সময় খানিক্ষণের জন্য হলেও প্রতিকূল বায়ুর সঙ্গে কিছুটা কোণ করে চলতে হতে পারে বিমানের ডানার মত প্রক্রিয়ায়। এজন্য জাহাজের লম্বালম্বি বরাবর আগু-পিছু করা লাটিন পাল দরকার। অথচ এইটুকুর জন্য সব স্কোয়ার পালগুলো ঘুরিয়ে আগুপিছু করার ভারী কাজটি করতে হওয়াটি বাড়াবাড়ি, বিশেষ করে এটি যখন বার বার করতে হয়। তাই সাধারণ বহু স্কোয়ার পাল সজ্জিত বড় বড় জাহাজেও সামনে বেশ লক্ষণীয় এক বা একাধিক ত্রিভুজাকারে লাটিন পালও সব

সময়েই থাকে এবং নানা মাস্তুলের মাঝে এবং পেছনেও ছোট ছোট এরকম আরো লাটিন পাল। প্রয়োজনে আপাতত এগুলোর ওপর নির্ভর করেই বাতাসের প্রতিকূলে চলা যায়, যদিও খুব দ্রুত বেগে বা কার্যকর ভাবে নয়। তাদের উপস্থিতি জাহাজকে বেশ বিচিত্র করে তোলে।

নাওয়ের মত অথবা পরবর্তী গ্যালিওন ইত্যাদির মত স্কোয়ার পালের বড় জাহাজকে যখনই বেশি দূর বাতাসের বিপরীতে যেতে হয় তখনই নাবিকদের জন্য সেটি একটি মস্ত বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়ায়। এরকম জাহাজের স্বাচ্ছন্দ্য হলো বাতাসের অনুকূলে যাওয়া, বিপরীতে যাওয়া নয়। তবে ক্যারাভালের মত ছিমছাম জাহাজ যা শুধু আগুপিছে লাটিন পালেই সাজানো থাকে, তা হেসেখেলে অনুকূলে প্রতিকূলে সবদিকে যেতে পারে। বড় জাহাজের বিড়ম্বনাটি বেশি হয় যখন লক্ষ্যস্থলটি একেবারেই বাতাসের সোজা বিপরীতে থাকে, অর্থাৎ যেদিক থেকে বায়ু প্রবাহ এগিয়ে আসছে ঠিক সেদিকে। ওই দিকে কোন অবস্থাতেই জাহাজ যেতে পারবেনা– বিমানে ডানার মত প্রক্রিয়ায় যেতে হলেও সেদিকের সঙ্গে অন্তত ৩০ ডিগ্রি কোণে যেতে হবে। সামনের দিক থেকে আসা বাতাসের ৩০ ডিগ্রি ডানে ও ৩০ ডিগ্রি বামের মাঝখানের এই অঞ্চলটি হলো 'যেতে না পারার দিক'। তাহলে এর ভেতর থাকা লক্ষ্যস্থলে যাওয়ার উপায় কী?

উপায় হলো ঠিক লক্ষ্যস্থলের দিকে না গিয়ে বামে বা ডানে একদিকে কিছু কোণ করেই যাওয়া যা ওই 'না যাওয়ার দিকের' বাইরে হবে, কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর এবার অন্যদিকে একই রকম কোণ করে যাওয়া। এর মানে লক্ষ্যস্থলকে সামনে কাছাকাছি রেখে একবার তার এদিক আবার তার অন্য দিক জিগ জাগ করে যাওয়া– প্রত্যেকবার ওই বিমানের ডানার পদ্ধতিতে। একে বলা হয় ট্যাকিং করা। যে কোন নাবিককে যদি জিজ্ঞেস করেন স্বাভাবিক আবহাওয়ায় তার সব থেকে উদ্বেগের সময় কোন্‌টি তিনি বলবেন ওই ট্যাকিঙের সময়। উদ্বেগের কারণটি দেখার আগে কিছুক্ষণ পালকে ছেড়ে জাহাজের হালের দিকে একটু তাকাই। জাহাজের পেছনে খাড়া হয়ে থাকা একটি তক্তাই একটি হাল, যতক্ষণ জাহাজে গতিশীল হাল ঘেঁষে পানির প্রবাহ থাকে জাহাজের গতির ফলে বা সাগরে স্রোতের ফলে ততক্ষণ হালটি কার্যকর হবে। গতির দিকে হাল সোজা থাকলে তার ওপর পানির কোন চাপ নেই,

কাজেই জাহাজের দিক সোজা আগের মতই থাকবে। হালকে একটু বাঁকা করলেই হালের ওপর পানির যে প্রচণ্ড চাপ পড়বে তার ফলে জাহাজটি হালের বাঁকানোর উল্‌টো দিকে ঘুরে যেতে থাকবে। যত বেশি বাঁকানো হবে তত অধিক দ্রুত ঘুরতে থাকবে জাহাজ। হালের সঙ্গে থাকে একটি লম্বা দণ্ড যা দিয়ে হালকে অপেক্ষাকৃত কম শক্তি প্রয়োগ করে বাঁকানো যায়। এখনো ছোট লঞ্চ বা স্পীডবোটের হাল এভাবে দণ্ড দিয়েই বাঁকিয়ে বোটকে এদিক ওদিক করা হয়। সামনের দিকে দেখে দেখে যেন এটি করা যায় এজন্য এক সময় পালের জাহাজে ওই দণ্ডটির সঙ্গে সংযুক্ত দণ্ড কোয়ার্টার ডেকে সামনে নিয়ে আসা হয় যাতে সেখান থেকেই হাল ঘোরানো যায়। কলম্বাস-ম্যাজেলানের আমলে বড় বড় অভিযাত্রার জাহাজও এভাবেই চলেছে। যাঁর হাতে এর নিয়ন্ত্রণ থাকে তাঁকে বলা হয় হেলম্‌সম্যান বা সুখানি। পরে ১৭০০ সালের দিকে দেখা গেলো কোয়ার্টার ডেকের সামনে হুইল নামের একটি চাকার অক্ষদণ্ডে দড়ি পেঁচিয়ে, সেই দড়ির দুই প্রান্ত নিচে হালের কাছের দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে নিয়ন্ত্রণটি চাকা ঘুরিয়ে করাটাই সুবিধাজনক। তাহলে চাকা স্পষ্ট বেশ খানিক ঘুরিয়েও হালকে সূক্ষ্মভাবে খানিক মাত্র ঘোরানো যায়। সেই থেকে হালের নিয়ন্ত্রণ হুইল দিয়ে হচ্ছে, আর সেটি ওই কোয়ার্টার ডেকের ওপর মূল ডেকের থেকে কিছুটা উচ্চতায় ক্যাপ্টেন ও অফিসারদের বিচরণে জায়গাটিতে। আমাদের সুখানি সাধারণ দক্ষ নাবিক হয়েও ওই বড়দের চোখের সামনেই জাহাজের হাল নিয়ন্ত্রণ করেন। অনেক সময় খুব চাপে থাকা হুইল দ্রুত ঘোরানোর জন্য অন্য নাবিকও হুইলে হাত লাগান।

কম্পাস ইত্যাদি নিয়ে হুইলের যে মঞ্চটি সেটিই জাহাজের দিক নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রস্থল। হুইলের নিজের ও তার সঙ্গে থাকা কম্পাসের ও আনুসঙ্গিক সজ্জার উপর যথেষ্ট নান্দনিক গুরুত্বও দেখা যায়, প্রযুক্তির গুরুত্ব ছাড়াও। ওই নান্দনিকতাটি প্রধানত হুইল মঞ্চটির গাম্ভীর্য ও গুরুত্বকে ফুটিয়ে তোলার জন্য। হুইলটি হতো খুব টেকসই সেগুন বা মেহগিনি কাঠের চকচকে পালিশ করা। যুৎসই করে হ্যান্ডেলের মত ধরার জন্য তার চারিদিকে রশ্মির মত বিস্তৃত হওয়া শক্ত স্পোক হুইলকে তার আকৃতি দেয়। এগুলোর ডিজাইনে নির্মাতা শিল্পীদের অনেক মৌলিক চিন্তা দেখা যায়। পুরো মঞ্চে কাঠের খোদাই আর ভাস্কর্যের অনেক পরিচয়ও রাখা হতো, যার সঙ্গে কাজ করা পেতলের পাত সেঁটে একে আরো জমকালো করে তোলা হতো। এতো যে

অলঙ্করণ তা কিন্তু কোন বড়লোকের হলঘর বা মিউজিয়ামের প্রদর্শনীর জন্য নয় বরং সমুদ্রে চলমান খোলা কোয়ার্টার ডেকের অত্যন্ত ব্যস্ত পরিবেশে সমুদ্রের ঝড় ওঠা জল হাওয়ায় থাকা একটি জায়গা। হয়তো জাহাজীদের জীবনকে এতো উদ্বেগ-আশঙ্কার মধ্যেও আর্টের ছোঁয়ায় ঝলোমলো রাখারই এ একটি প্রয়াস।

অবশ্য যে সুখানি হুইলের সামনে দাঁড়িয়ে তার কর্তব্যের সময়টুকু পার করছেন প্রতিটি মুহুর্তে তাঁর মনোযোগ হুইল ও কম্পাসের দিকে। হাতও প্রায় সব সময় হুইলের ওপর, গতির দিক ঠিক রাখতে। কখনো বিশেষ পালের দিকেও একই সঙ্গে তাঁকে নজর রাখতে হচ্ছে– বাতাসে পাল কী রকম আচরণ করছে তা দেখতে।

সুখানির এবং জাহাজের আরো অনেকের বড় উদ্বেগের সময়টি হলো ট্যাকিঙের সময়। এতে লক্ষ্যস্থলের সঙ্গে বামদিকে কোণ করে কিছুটা পথ যাওয়ার পর যখন ঘুরে ডান দিকে কোণ করতে হয় তখন ঘোরার পথে সেই সরাসরি বিপরীত বাতাসের দিকে এক সময় মুখ করতে হয়। ওই এলাকায় থাকা কালে সামনে এগুবার কোন বল পাল থেকে পাওয়া যায়না, বরং সামনের থেকে আসা বায়ু প্রবাহ জাহাজকে থামিয়েই দিতে চায়, প্রায় নিশ্চল এই জাহাজে তখন হাল ঘোরালেও জাহাজ ঘুরতে চায়না। এসময় তার আগে থেকে যেভাবে ঘুরছিলো সেটির চলমানতা থাকতে থাকতে দ্রুত ঘুরে যেতে না পারলে বিপদ। সেটি করার জন্য বিশেষ পাল ব্যবহার করেই ঘোরাকে সাহায্য করার কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়; কিন্তু সামনের বিপরীত বাতাসের তোড় বেশি হলে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে মাস্তুল পর্যন্ত ভেঙ্গে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অবশ্য চারিদিকে যদি উন্মুক্ত সমুদ্র থাকে তখন ওভাবে না ঘুরে বরং আগেই জাহাজকে লক্ষ্যস্থলের উল্টো দিকে পুরাপুরি ঘুরিয়ে ফেলে এবার অনুকূল বাতাসেই অনেকটা ঘুরে এসেও ট্যাকিঙে দিক পরিবর্তন করা যায় নিরাপদে – সময় যদিও অনেক লেগে যায়। তাই ট্যাকিং করার মত দুর্ভাগ্য যদি হয় সঠিক বায়ুর দিকের অভাবে, তা বিড়ম্বনাই বটে।

সুখানি চাইবেন ওই না যাওয়ার দিক এড়িয়ে চলতে– জাহাজ এর ভেতরে আসলে পালের কিনারা টাইট আর থাকেনা, বরং পত পত করতে থাকে। সুখানির চেষ্টা পত পত করা জায়গায় না ঢোকা, কিন্তু তার কাছাকাছি থাকা,

কারণ তাতেই লক্ষ্যস্থলও কাছে থাকে। এ কারণে শুধু কম্পাস নয়, পালের দিকেও তাঁকে নজর রাখতে হয়। এসব অবশ্য মোটের ওপর প্রতিকূল বাতাসে চলার সময়।

চার্টরুমঃ

জাহাজ চালনার আসল সিদ্ধান্তগুলো অবশ্য হুইলের মঞ্চের কাছে নেয়া হতোনা, সেটি নেয়া হতো পশ্চাদ-কুঠির মধ্যে ক্যাপ্টেনের কেবিনের কাছের জাহাজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘর চার্টরুমে। তার কাজেরই উপযুক্ত করে জমকালো এই কাজের জায়গা চার্টরুম– গুটানো অবস্থায় রয়েছে সমুদ্রপথের বড় বড় চার্ট, আর হাতের কাছে হয়তো মেলে রাখা আছে এই মুহূর্তে সেখানে দিয়ে চল্‌ছে জাহাজ তার চার্ট। আশপাশে স্থল কোথায় আছে, উঁচু চরা কোথায় এসব যেমন সেখানে আছে, তেমনি দেখানো আছে সমুদ্র স্রোত ও বায়ু প্রবাহ। এই চার্টকে টেবিলে বিছিয়ে সেখান থেকে প্রটেক্টর, কম্পাস, স্কেল ইত্যাদি যন্ত্র দিয়ে মাপজোক করে সেই তথ্য অনুযায়ীই তার পরবর্তী পরিকল্পনাগুলো করা হয়– কম্পাসের কোন দিকে লক্ষ্য করতে হবে, পাল কী ভাবে খাটাতে হবে ইত্যাদি। এজন্য বেশ কিছু হিসেব নিকেষও করে নিতে হয়। সেদিনের চার্টগুলো নিখুঁত ছিলনা, অনেক ক্ষেত্রে চার্টের তথ্যগুলো খুবই অপূর্ণ থাকতো। কিন্তু তাও যতটুকু জানা যায় তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হতো– অভিজ্ঞ নাবিকদের যাঁরা এ পথে আগে এসেছেন তাঁদের পরামর্শও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

চার্ট থেকে পাওয়া তথ্যগুলোর সঙ্গে বাস্তবে পাওয়া সব কিছু সরজমিনে মিলিয়ে নিতে পারলে জাহাজের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় এবং জাহাজ চালনায় সতর্ক হওয়া যায়। সেটি ভাল ভাবে করতে পারার জন্য চার্টগুলোকে শিল্পীর ছোঁয়ায় যথেষ্ট সহজবোধ্য ও দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হতো– এক একটি চার্ট এক একটি শিল্পকর্মও হয়ে উঠতো। যেমন যে দ্বীপে তীরে বিশেষ ধরনের দৃশ্য চোখে পড়ে সেটিতে সেই দৃশ্য থেকে চার্টে কিছুটা দেখানোর চেষ্টা থাকতো– যেমন গাছ, সমুদ্রতীরের কাছের পাহাড়, বা বাড়ি-ঘরের দৃশ্য ইত্যাদি। ফলে দ্বীপটি জাহাজ থেকে দূরে থাকতেই তাকে সনাক্ত করা যায়, হয়তো দূরবীনের ভেতর দিয়ে। তারপরও অবশ্য জাহাজ যেখানে আছে সেখানে সত্যিকার মাপজোকের ব্যবস্থা করতে হয়– এর অক্ষাংশ এবং

দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করা স্যাক্সটেন্ট ইত্যাদি যন্ত্র দিয়ে আকাশ পর্যবেক্ষণে। চার্টরুমের বাইরে ক্যাপ্টেন ও অন্যান্য কিছু অফিসারকে এ কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যেতো।

এক সময় সমুদ্র যাত্রায় থাকা অনেকের কর্তব্যই হতো বিরল জায়গায় গেলে চার্ট তৈরির বা চার্টের উন্নয়নের উদ্যোগ নিতে। অনেক সময় দ্বীপের চেহারায় পরিবর্তন ঘটে, উপকূলের অগভীর পানিতে নতুন চরা জাগে যা জাহাজের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। কাজেই জানা চার্টের জায়গাগুলোতে আবার নতুন করে জরিপ করতে হয়। প্রায়শ সহজ ভাবেই তা করা হতো অন্য কাজের সঙ্গে। যেমন দ্বীপের উপকূলের যেখানটা মোটামুটি সরল রেখায় সেখানে উপকূল থেকে ধরা যাক এক মাইল দূরত্ব বজায় রেখে জাহাজ সোজা এগিয়ে গেলো সময় মেপে এবং একই সঙ্গে জাহাজের গতিবেগ মেপে। গতিবেগ মাপার জন্য জাহাজ থেকে একটি ভারী জিনিস (চিপলগ) ফেলে তার সঙ্গে বাঁধা জাহাজে থাকা একটি লাটাই থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব পরপর গিট্টু দেয়া সূতা ছাড়তে ছাড়তে এ কাজ হতো। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলো গিট্টু গেলো সেটিই বলে দেয় ও সময় জাহাজের গতি; গতি পরিবর্তন হলেও একটি গড় বেগ নির্ণিত হয়ে যায়। এই বেগে ওই সরল অংশটুকু পার হতে কতক্ষণ লাগলো তা দেখে তার দৈর্ঘ জানা হয়ে যায়– এভাবে পরপর বিভিন্ন মোটামুটি সরল অংশ। দ্বীপের ও মূল ভূখণ্ডের উপকূলের মানচিত্র এভাবে তৈরি হতো। দড়িতে ভারী জিনিস বেঁধে জাহাজ থেকে তা ফেলে দিয়ে দেখা হতো কত লম্বা দড়ি যাওয়ার পর তা সমুদ্রতল স্পর্শ করেছে। এভাবে গভীরতা মেপে উপকূলের কাছে নিরাপদ চ্যানেলগুলো চিহ্নিত করা হতো। জাহাজের যত রকম বিপদ আছে তার মধ্যে প্রধান একটি হলো অগভীর চরায় জাহাজ আটকে যাওয়া। এজন্য চার্টে আগের গভীরতার মাপজোক থাকতো। পানির অগভীর তলায় কী আছে তার ছবিও এক ভাবে চার্টে দেবার চেষ্টা করা হয়– আরেক আর্ট সৃষ্টি করে।

গতি যখন শিল্প:

'সমুদ্রঝড়ে জাহাজ'– এটিই বোধ হয় সব মানুষের মনে জাহাজী গতির চূড়ান্ত ভয়াল রূপ– চিত্রশিল্পেও প্রায়ই রূপায়িত। সমুদ্রে যখন ঝড় ওঠে, তার ঢেউ যখন উঁচু হতে থাকে, বাতাস যখন সবকিছু মথিত করে ছোটে তখন এমন

কিছু দৃশ্য সৃষ্টি হয় যাতে আতঙ্কের কোন সীমা থাকেনা। আকাশ তখন কালো করে আসে। উঁচু হওয়া ঢেউ ভেঙ্গে তা দূর থেকে সাদা ফেনারাশির মত দেখায়। এক সময় সে ঢেউ পর্বতমালা হয়ে কাছে চলে আসে, জাহাজের ডেকের ওপর দিয়ে চলে যায়- যেন একে ঢেউয়ের গভীরেই ঢুকিয়ে ফেলে। প্রধান ডেকের ওপরতো বটেই জাহাজের ভেতর বাতাসে আর পানির অবাধ যাতায়াত। সেখানে খোলে জানালাগুলো বন্ধ করে, নিচের ডেকে বাতাস ঢোকার চোঙাগুলো বন্ধ করে দিয়ে পানি ঢোকা কিছুটা ঠেকানো গেলেও অবস্থা ক্রমেই সঙ্গিন হয়ে ওঠে। পানি যা ঢুকছে তা যথাসম্ভব বের করার জন্য অনেক নাবিক প্রাণপণে পাম্প করতে থাকে। ওরকম অবস্থায় বিশাল সমুদ্রে জাহাজটিকে ছোট্ট একটি খেলনা বই কিছু মনে হয়না। সমুদ্রের ফুঁসে ওঠা আর বৃষ্টির ঝড় সব মিলে নিচে ও ওপর একত্র হয়ে যে ঘূর্ণি তার ভেতর বিপন্ন জাহাজের অস্থিত্ব এ দৃশ্য চিত্রকর্ম হিসেবে অসাধারণ।

এমনি ঝড়ের কবলে জাহাজের দৃশ্য বহুদিন ধরে চিত্রশিল্পীদের কাছে খুবই প্রিয়। ওই অসাধারণ দৃশ্যকে শিল্পের নানা পর্যায়ে নিয়ে যেতে তাঁদের উৎসাহের শেষ নেই। এ সময় নাবিকদের প্রধান কাজ যে জাহাজের ভারসাম্য রক্ষা করা তা এসব চিত্রে ভালই বোঝা যায়, পাশ থেকে ঝড় আঘাত করলে ভারসাম্য হারানোর সম্ভাবনা বেশি– তাই ক্যাপ্টেন চেষ্টা করেন মুখোমুখি এর সম্মুখীন হতে। সামনের থেকে আসা বাতাসে বিমানের ডানার মত কাজ করে তেরচা প্রতিকূলে যাওয়া যায় অনেকটা সেরকম ব্যবস্থায়। ঝড়ের সময় জাহাজ যদি বন্দরের কাছে থাকে, অথবা খোলা সমুদ্রেও এর কাছাকাছি যদি কোন উপকূল থাকে তা হলে সব চেয়ে বড় ভয় ঝড়ের তোড়ে জাহাজ যেন ওই স্থলের দিকে অনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলে না যায়, এবং সেখানে সজোরে আঘাত না করে; তা হলে মাটিতে-পাথরে আছড়ে পড়ে ভেঙ্গে চূরমার হবার সম্ভাবনা বেশি। তাই ক্যাপ্টেন চেষ্টা করেন পাল ও হালের যথাসাধ্য ব্যবহার করে উপকূল থেকে যত দূরে চলে যাওয়া যায় তাই যেতে। অর্থাৎ তাঁর কাজ তখন আশ্রয়ের কাছে থাকা নয়, এর থেকে দূরে খোলা সমুদ্রে চলে যাবার চেষ্টা করা। বোঝাই যাচ্ছে ঝড়ের কবলে জাহাজ, তাকে বাঁচাতে মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ, এমন একটি আবেগঘন পরিস্থিতি বিভিন্ন শিল্পে আদৃত হয়– এক সময় চিত্রশিল্পের মত পরবর্তী কালে অতীতের কাহিনীতে ঝড়ের কবলে পালের জাহাজকে সিনেমাতেও প্রচুর শিল্পায়িত করা হয়েছে।

অন্যদিকে সকল পালে সুসজ্জিত হয়ে জাহাজ যখন সর্বোচ্চ গতিতে চলে সেটিও শিল্পীদের জন্য আরেকটি অদ্ভুত আর্ট ভাবনা নিয়ে আসে। এটি সম্ভব হয় যখন অনেক সময় ধরে স্থায়ী খুব জোরালো বায়ু প্রবাহ স্থিতিশীল থাকে, সেটি বেড়ে ঝড়ো হওয়ার রূপ নেয়ার কোন সম্ভাবনা থাকেনা। তখন জাহাজের সব পাল পুরোপুরি মেলে দিয়ে এ বাতাসের সর্বোচ্চ সুবিধা নেয়া যায়। ধরা যাক একটি তিন মাস্তুলের জাহাজ তার প্রত্যেক মাস্তুলে একের ওপর এক সব পাল খাটানো হয়েছে– নিচে থেকে ওপরে বড়, টপ, টপ গ্যালান্ট, রয়্যাল। শুধু তাই নয় তিন মাস্তুলে এই সব পালের প্রত্যেকটির জন্য যে ইয়ার্ডে বা আড় দণ্ডে পালটি টাঙ্গানো আছে সেই ইয়ার্ডকে ডানে ও বামে উভয় দিকে বাড়তি প্রসারিত করার ব্যবস্থা করা যায়। সেগুলোতে স্প্যাঙ্কার নমের পাল কিন্তু জাহাজের আয়তনের ভেতরে নয়, সেগুলো যেন জাহাজ ছাড়িয়ে দুই দিকে মেলে দেয়া যায়। এই সব পালে ঢেকে যাবার পর জাহাজ একটি অদ্ভুত রূপ লাভ করে যা একমাত্র বাইরের থেকেই পুরোটা দেখা সম্ভব। বাড়তি পাল সহ নিচের বড় পালগুলো অনেকটা যেন জাহাজ থেকে দুদিকে প্রায় পানি ছুঁয়ে বিস্তৃত, ঠিক যেন একটি জলজ পাখির পানিতে সাঁতার কাটার মত। ওপরে পালগুলোও মনে হতে পারে তার ওপরে আরো পাখি উড়ে যাচ্ছে। পালের জাহাজের সর্বোচ্চ গরিমা এই দৃশ্যে প্রকাশ পায়, আর চিত্রশিল্পীরা একে মোটেই অবহেলা করেননি। তাঁদের তুলিতে এতে জাহাজের শত নাবিকের শত কাজ যেভাবে পালের পূর্ণ সমারোহে রূপ পায় সেটি যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি রূপ পেয়েছে এ জাহাজের পূর্ণ গতি। পালের জাহাজকে নিয়ে যে দৃশ্যমান আর্ট তার মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বোধ হয় এর গতিকে আর্টে ফুটিয়ে তোলা– ঝড়ো গতিই হোক আর প্রশান্ত গতিই হোক।

জাহাজী আর্ট

যে অসংখ্য আর্ট যুগে যুগে নাবিকদের জীবনের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠেছে তার সব আর নাবিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়– আর্টের জগতের একটি দিক হিসেবে সবার কাছেই তা উপভোগ্য; অনেকে নাবিক না হয়েও সেই আর্টের সৃষ্টিকারও হয়েছেন। কিন্তু উৎপত্তিটি গুরুত্বপূর্ণ।

জাহাজের ভাষা আর গানঃ

সারা দুনিয়ার জাহাজে জাহাজে নানা মিশ্র কথ্য ভাষা সৃষ্টি হয়েছে যার রেশ পালের জাহাজের যুগ শেষ হয়ে যাবার পরেও চলেছে। পর্তুগীজ প্রাধান্যের যুগে শুরু হয়ে তারপর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীগুলোর (বিশেষ করে বৃটিশ ও ডাচ) কালে ভারত মহাসাগরের জাহাজে এমনি কথ্য ভাষা খুবই প্রচলিত হয়েছে। আজো দুনিয়ার জাহাজে আমাদের খালাসিদের মুখে যার শব্দাবলী এখনো দেখা যায়। জাহাজে সৃষ্টি হওয়া এই মিশ্র কথ্য ভাষার অনেক শব্দই ইংরেজি, ডাচ, পর্তুগীজ জাহাজী শব্দ– যাতে ক্যাপ্টেনের হুকুম, নাবিকদের পরস্পর কারিগরি কথায় ব্যবহৃত শব্দ বেশি, অবশ্য প্রাচ্য দেশীয় ভিন্ন উচ্চারণ ও টানে যথেষ্ট বদলে গিয়ে। তাই শব্দ ইউরোপীয় হলেও এর টানের মধ্যে আমাদের চট্টগ্রাম-নোয়াখালী-সিলেটি টান থেকে ভারতের পূর্ব উপকূল, মালয়ী, এই সব নানা জায়গার কথ্য টান ও কথ্য শব্দের মিশ্রণ। পূর্ববঙ্গীয়, হিন্দুস্থানী, এবং মালয়ী নানা কথ্য ভাষার একটি অদ্ভুত মিশ্রণে তৈরি হয়েছিলো ভারত মহাসাগরীয় এই খালাসি ভাষা। পূর্বে বাটাভিয়া এবং পশ্চিমে লিসবন, লন্ডন, রটারডাম পর্যন্ত জাহাজেও শোনা যেতো এই ভাষা।

আরেকটি অনেক দূরের জাহাজী ভাষার কথায় আসি। মবিডিক উপন্যাসের এবং টু ইয়ার্স বিফোর দি মাস্ট আত্মজীবনীর সামান্য উল্লেখে আমরা দেখেছি কী ভাবে তিমি শিকার, চামড়া বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য প্রচুর নাবিকের চাহিদা মেটাতে ১৮০০ শতকে এবং তারো আগে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট্স রাজ্যের বোস্টন, নানটেকার ইত্যাদি বন্দরে দুনিয়ার নানা অঞ্চল থেকে অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়েছিলো। তার মধ্যে আমেরিকানদের সব রকম বৈচিত্র তো ছিলই– সাদা, কালো, আদিবাসী, ইউরোপীয় সব দেশের গরীব ভাগ্যান্বেষীরাও ছিল। বিশেষ করে দেখা যেতো আইরিশ, ইটালিয়ান, ইংরেজ ও স্কটিশদেরকে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো ইউরোপীয়দেরকে কাছে সদ্য আবিষ্কৃত পলিনেশিয়ান অঞ্চলের কিছু একেবারে ভিন্ন কিসিমের মানুষ, যাদের একটি বড় অংশ ছিল আজকের হাওয়াই এবং সেদিনের স্যান্ডউইচ আইল্যান্ডের মানুষ, কারণ এই দ্বীপপুঞ্জই ছিল প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সব চেয়ে কাছের, ও যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা সব থেকে বেশি ব্যবসায়িক ভাবে প্রভাবিত। ক্যাপ্টেন কুকের প্রসঙ্গে যাদের পূর্বসূরীদেরকে আমরা দেখেছি।

এত রকম এবং এতো ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষ জাহাজের ছোট্ট পরিসরে দিনের পর দিন থাকলে কী হয়, এবং তাদের জাহাজী ভাষা কী ভাবে গড়ে ওঠে তা ওই বইগুলো পড়লেই মোটামুটি বোঝা যায়। অবশ্য ইংরেজিই ছিল মূল ভাষা এবং তার ভিত্তিতে এসেছে জাহাজের কারিগরি ভাষা। অন্যরা সবাই যার যার মত করে যার যার টানে একে বরণ করেছে। অথচ তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রায় নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে কথা বলতে হয়েছে। এক্ষেত্রে কথ্য ভাষায় যা হয় পরস্পর কথার মাধ্যমে উভয়েরই ভাষা ও টান ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় এবং একটি মিশ্র ভাষার সৃষ্টি হয়– ওই আমেরিকার জাহাজগুলোতেও তাই হয়েছে, যার প্রভাব জাহাজে সীমাবদ্ধ থাকেনি। দুনিয়ার যে গ্রামগুলো থেকে ওই মানুষগুলোর বেশির ভাগ এসেছে এবং ফিরে গেছে, যে সব বন্দরে এসব জাহাজীরা প্রায় প্রতিদিনই নানা জাহাজ থেকে নেমে কিছুদিন বাস করেছে সেখানেও ওই ভাষা যুগে যুগে চলে এসেছে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে ওই নাবিকরা কাজের প্রহরার সময় যতটা না কথা বলার সুযোগ পেতো তার চেয়ে বেশি পেতো গানের। জাহাজের সব কাজে এসে যোতো গান– সমবেত কোরাসই বেশি, তবে নিজে নিজে কাজের সময় একক গানেও কম নয়। মাস্তুলের ওপর আড়দণ্ড ইয়ার্ডে সাবধানে বসে বা দাঁড়িয়ে পাল গুটাচ্ছে, পাল মেলছে অথচ গান গাইছেনা এমন কখনো হতোনা। সে রকম এক সঙ্গে সব পাল ঘোরাতে, বা নোঙ্গর তুলতে ঘানি টানার মত দল বেঁধে যখন তারা দড়ি কাঁধে নিয়ে তা টেনে টেনে ঘুরতো তখন তো তালে তালে গান না গাইলে সেই জোরও আসতোনা। এভাবে কাজ করার জন্য গান গেয়ে যাওয়া এক ধরনের 'চ্যান্ট' অর্থাৎ মন্ত্র পাঠের মত শোনাতো। তাই জাহাজী এই গানগুলোর নাম হয়ে গেলো চ্যান্টি– এবং পরে 'শ্যান্টি' শব্দটিতে। ক্রমে শ্যান্টি গানের একটি নিয়মও দাঁড়িয়ে গেলো। কাজের মধ্যে একজন চ্যান্টার শীর্ষ গায়কের স্থান নেন এবং গানের প্রথম কলিটি গেয়ে ওঠেন। তখন বাকি সবাই কোরাস হিসেবে সমস্বরে এর পুনরাবৃত্তি করেন। অনেক সময় চ্যান্টার এর মধ্যেই দ্বিতীয় কলিটি তাৎক্ষণিক ভাবে তৈরি করেন এবং নিজে গেয়ে কোরাস গায়কদেরকে শেখান। এভাবে গান তৈরি ও গাওয়া এক সঙ্গে চলতে থাকে, তবে কাজের তালের সঙ্গে গানের তাল মিলতে হয়।

কাজের সঙ্গে মিল রেখেই নানা রকম শ্যান্টির সৃষ্টি হয়েছে– সুর ও কথায় এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ যেই দড়িকে টেনে টেনে ভারী পালকে একটু একটু করে মাস্তুলে তুলতে হয় সেটিকে বলা হয় হেইলইয়ার্ড। আর এই কাজের সময় যে গান গাওয়া হয় সেগুলোকে বলা হয় হেইলইয়ার্ড শ্যান্টি। সেটি ঝটকা টানে অল্পই ওঠে, তারপর একটু থেমে আরেকটি ঝটকা– হেইলইয়ার্ড শ্যান্টির তালটিও এরকম স্বল্পদৈর্ঘ গানের কলি, বার বার যতি দিয়ে, প্রতি কলির শেষটায় জোর দিয়ে দিয়ে। এভাবে প্রত্যেক কাজের নিজস্ব শ্যান্টি যেমন মাস্তুলের অনেক ওপরে উঠে পাল বাঁধার কাজ– খুব পরিশ্রমের নয়, কিন্তু পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় অত্যন্ত ভয়ের সময় কাটে; তখন শ্যান্টির প্রকৃতিটিও অনেকটা ভয় তাড়ানোর গানের মত। আবার নোঙর তোলার সময় ক্যাপস্টানের মধ্যে পেচানো চেইনকে টানার জন্য ঘানি টানার মত পরিশ্রমে ঘুরতে হয় বিরাট একটি চাকার স্পোকগুলো ধরে। এর শ্যান্টি একাজে উৎসাহ যোগাবার জন্য গাওয়া হয়, বলা হয় ক্যাপস্টান শ্যান্টি। জাহাজের প্রয়োজনের বাইরে এসে এই শ্যান্টিগুলো সকল গ্রামে গ্রামে, বন্দরে বন্দরে মানুষের বিনোদনের জন্য মেলায় অথবা পানশালার গাওয়া হয় তখন এগুলোই হয়ে পড়ে জাহাজী লোকজ সঙ্গীত। ওই জাহাজী লোকজ সঙ্গীতে কি শুধু শ্যান্টিই আছে? না, এর আরো বহুতরো ঘরানা আছে। এর মধ্যে আছে স্থলের জীবনে ফিরে আসা জাহাজী মানুষের সমুদ্রের স্মৃতির গান, জাহাজে একাকী পরিবার-ত্যাগী বিরহের গান, জাহাজে মদ পানের সময় উদ্দাম নাচের গান। তবে যাঁরা এগুলোর সঙ্গে পরিচিত তাঁর এর যে কোন রকম গান যেখানেই শুনুন যে করে হোক বুঝতে পারবেন যে এটি জাহাজী সঙ্গীত– সবগুলোর মধ্যে এমন কিছু জাদু আছে যা জাহাজের কথা মনে করিয়ে দেয়। অনেক সময় এগুলোকে বলা হয় ফোর ক্যাসেল সং– অর্থাৎ সম্মুখ-কুঠির গান। চার ঘন্টা করে জাহাজের যে প্রহরা তাতে বিশ্রামের প্রহরাগুলো নাবিকদের কাটে সম্মুখ-কুঠিতে অবসরে। তখনই তাঁদের গলায় সুর আসে, একা বা এক সঙ্গে সঙ্গীত গাইতে এবং সৃষ্টি করতে।

দৃশ্যমান আর্টে জাহাজী প্রভাব:

জাহাজকে আর সমুদ্র যাত্রাকে উপজীব্য করে একটি ভিন্ন ঘরানার চিত্রকলাও অভিযাত্রার যুগ থেকে ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে জায়গা করে নিয়েছিলো; সেই

সঙ্গে জাহাজী বিশেষ ভাস্কর্য। প্রাচীন দৃশ্যমান আর্টেও অবশ্য জাহাজের একটি ভূমিকা ছিল বিশেষ করে মিশরীয় সভ্যতায়। নৌকার এবং জাহাজের মডেল ও চিত্রের খুব সুন্দর সব নমুনা মিশরের পিরামিডে ও সমসাময়িক মন্দিরে পাওয়া গেছে। তবে আধুনিক আর্টে জাহাজ একটি বড় আকারে এসেছে ১৬০০ শতকে। এর সর্বশ্রেষ্ঠ নমুনাগুলো তখনকার মাস্টার শিল্পীদের হাতেই সৃষ্টি হয়েছে; ইউরোপের আর্ট মিউজিয়ামগুলোতে বেশ সম্মানের আসনেই এগুলোকে দেখা যায়– বিশেষ করে ডাচ মাস্টারদের আঁকা ছবিগুলো। এতে শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করা কিছু জাহাজের নির্মাণ শৈলী, অলঙ্করণ ইত্যাদিই ফুটিয়ে তোলা হয়নি, বরং সমুদ্র যাত্রায় বিভিন্ন পরিস্থিতেই জাহাজের অবিস্মরণীয় মুহুর্তগুলোকে ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে সমস্ত শিল্প-সৌন্দর্য ও নান্দনিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে। এমন ভাবে এসব চিত্র তা করেছে যেভাবে হয়তো আজকের শ্রেষ্ঠ ফটোগ্রাফাররাও পারতেননা।

যেমন ডাচ মাস্টার শিল্পী ভ্যান ডে ভেল্লের (জুনিয়র) আঁকা 'ঝড়ের কবলে রেজোল্যুশন জাহাজ' (১৬৭৮ সাল) কিংবা বিখ্যাত বৃটিশ শিল্পী টার্নারের আঁকা 'ট্রাফালগারের যুদ্ধ' (১৮২২-২৪) ছবি যে কোন মানদণ্ডে ইতিহাসের সেরাদের মধ্যে। অন্যদিকে চিত্রশিল্পে এক সময় বিশিষ্ট মানুষদের এক এক জনের চেহারার পোট্রেট ছবি আঁকার যে ঘরানা চালু ছিল এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা আজকের পোট্রেট ফাটোগ্রাফির মত খুব বাস্তবানুগই হতো, জাহাজের পোট্রেট আঁকারও একটি জোরালো ঐতিহ্য ছিল সেই যুগে। এর কারণ সুপরিচিত এক একটি জাহাজের জন্য এক একটি মানুষের মত বিশেষ ব্যক্তিত্ব কল্পনা করা হতো, এবং জাহাজের জগতে উৎসাহী সাধারণ মানুষদের মধ্যেও তার একটি মোটামুটি ধারণা থাকতো। শিল্পমণ্ডিত ভাবে তা ফুটিয়ে তোলাকে শিল্পীর জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা হতো।

জাহাজী দৃশ্যমান আর্টের আর একটি দিক হলো জাহাজ সংক্রান্ত অলঙ্করণ, ও ভাস্কর্য। এখন আর্ট মিউজিয়ামে গিয়ে এগুলো যেমন দেখা যায়, তেমনি সংরক্ষিত কিছু পুরানো জাহাজে গিয়েও দেখা যায়। জাহাজের অলঙ্করণের এসব শিল্পকর্মের কোন কোনটি দেখে মনে হয় এ যেন রীতিমত একটি প্রাসাদের অলঙ্করণ। জাহাজের বাইরের দিকের অলঙ্করণের কথা যদি বলি পেছনের প্রায় সমতল বিস্তীর্ণ বহির্ভাগের ওপরেই হতো সব থেকে বেশি

অলঙ্করণ– প্রধানত কাঠের ওপর নানা মূর্তির, নানা দৃশ্যের নানা ফুলেল নক্‌শা খোদাই করে তার ওপর সোনালী গিল্‌টি করা হতো। ১৬০০ শতকের ডাচ জাহাজগুলো বিশেষ করে তার বিশাল সমতল পেছন ভাগের শিল্পকর্মের জন্য বিখ্যাত ছিল। একে বলা হতো স্টার্ন-কার্ভিং বা পশ্চাদ-চিত্রখোদাই। ১৮০০ শতকের শুরু থেকে এই পশ্চাদভাগের জৌলুষ হ্রাস পেতে থাকে, সেখানে বরং বেশ দামী বাড়ির সুন্দর জানালার সারি, বারান্দা, ব্যালকনি ইত্যাদি অনেকটা ঘরোয়া, নাগরিক ভাব– যেন জাহাজটি সাধারণ ধনীদের একটি বাড়ি।

জাহাজের বাইরের সামনের দিকের ভাস্কর্যটি অনেকটা পুরানো আমল থেকেই গলুইয়ে সামনের দিক থেকে বাঁকা হয়ে ওঠা বিরাট ফিগার হেড নামের মূর্তি। এ যেন পুরো জাহাজেরই মাথা, তার শারীরী পরিচয়। প্রথম যুগে এই ফিগার হেডগুলো সাধারণত হতো জাহাজী রূপকথার কোন এক চরিত্র, যাকে দিয়ে জাহাজের একটি আদর্শ বা পরিচয় ঘোষণা করা হতো। এসব হতো রূপকথার পঙ্খীরাজ ঘোড়া, ময়ূরপঙ্খী, ড্রাগনের মাথা ইত্যাদি, যেন জাহাজকে উচ্চাকাঙ্খী পরিচয়, সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে কিংবা ভয়ানক বিধ্বংসী যোদ্ধা হিসেবে দেখানো। বিভিন্ন পৌরানিক দেব দেবী, বিশেষ করে সমুদ্র দেবতা বা দেবীর মূর্তিও থাকতো, যেন অথৈ সাগরে জাহাজকে তাঁরা রক্ষা করবেন। পরবর্তীকালে যখন জাহাজগুলোতে ব্যবসায়িক কোম্পানীর মালিকানা বেড়েছে তখন কোম্পানীর মনোগ্রামের সঙ্গে মালিকের মূর্তি ইত্যাদি এসেছে। তেমনি জাতীয়তাবোধের চিহ্নগুলোও এসেছে যেমন বৃটিশ সিংহ কিং বা ফরাসী বিপ্লবের প্রতীক লিবার্টি মূর্তি। সবকিছুতে যেন রাষ্ট্র শক্তি অথবা বাণিজ্যি শক্তির পক্ষ থেকে ব্র্যান্ডিং এর কাজটিই হচ্ছিলো ফিগার হেডের মাধ্যমে। এর অর্থ এই নয় যে ফিগার হেডগুলোর জৌলুষ আগের থেকে কমে গেছে, বরং উল্‌টোটাই হয়েছে। অনেক জমকালো সাজগোজ করা ফ্যাশন-দুরস্ত রমণীর থেকে শুরু করে একাধিক মূর্তির সমন্বয়ে রীতিমত একটি নাটকের দৃশ্য। এভাবে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত মোটামুটি জমকালো ফিগার হেডের চল্‌ ছিলো, এমনকি যুদ্ধজাহাজেও। যুদ্ধ জাহাজের অলঙ্করণ সারিবদ্ধ কামানগুলোর মুখ বের করার জানালা পর্যন্ত গড়িয়েছিলো– প্রত্যেকটি জানালার কিনারায় মালার মত ফুলেল চিত্র থাকতো যেন কামানের গলাতেই মালা পরানো। সব মিলে এটি জাহাজের পাশের দিকের সুন্দর

সারিবদ্ধ অলঙ্করণ দাঁড়াতো। উদ্দেশ্য বাণিজ্যই থেকে আর যুদ্ধই হোক জাহাজ শুধু কাজের বাহন হিসেবেই গড়ে উঠতোনা, আর্টের বাহন হিসেবেও তাতে মনোযোগের অভাব থাকতোনা।

জাহাজের বাইরের দিকের এসব শিল্পকর্ম এখন কোথায় গেলে দেখা যাবে? সংরক্ষিত কিছু জাহাজে ছাড়া নানা মিউজিয়ামেই বেশি, বিশেষ করে জাহাজী মিউজিয়ামে। মজার কথা হলো এর কিছু কিছু ফিগার হেড কিংবা পশ্চাদখোদাই কাজ এতই টেকসই করে তৈরি করা হয়েছিলো যে জাহাজের কাজ ফুরোবার পর ওই পুরো ভাস্কর্যগুলো অন্য কাজে লাগিয়ে দেয়া হয়, যেমন ভবনের সৌন্দর্য বর্ধনে। কোম্পানীর ভবন কিংবা নৌ-বাহিনীর বা নৌবিভাগের ভবনের সামনে আগের জাহাজের ফিগার হেডের সারি, অথবা পুরো জাহাজের পশ্চাদ-অলঙ্করণটাই ভবনের সম্মুখ ভাগ হিসেবে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে বিখ্যাত হয়ে আছে এমন উদাহরণ রয়েছে। এর অর্থ খোলা আবহাওয়ার নিচে এই অংশগুলো দীর্ঘকাল টিকে থাকতে দেখে বোঝা যায় জাহাজের জন্য তৈরি এই শিল্পকর্মগুলোকে কখনোই হালকা করে দেখা হতোনা। এগুলো যতই জটিল কারুকার্যের হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট টেকসইও হতো।

জাহাজের শিল্প সৃষ্টির আরেকটি দিক ছিলো তার আভ্যন্তরীণ অলঙ্করণে। পশ্চাদ-কুঠির বাসিন্দা হতেন ক্যাপ্টেন-অফিসাররা তো বটেই, অনেক সময় জাহাজের মালিক, বড় এ্যাডমিরাল, তাঁরাও জাহাজে থাকতেন। তাঁদের অভিজাত জীবনের উপযুক্ত করে ঘরগুলো সাজানো হতো উন্নত চিত্র-শিল্প ও অন্যান্য শিল্পকর্মে। সেগুলোর উপযুক্ত করেই তাঁদের কাজের ও থাকার ঘর বেশ খোলতাই ও সুসজ্জিত করেই তৈরি হতো। ক্যাপ্টেনের চার্টরুম আর জাহাজ চালনার হুইল মঞ্চের কারুকার্যের কথাতো আগেই বলা হয়েছে।

জাহাজী শিল্প কর্মের আর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক রয়েছে যা জাহাজ নির্মাণের অংশ নয়, বরং কুশলী নাবিকদের অবসরকালীন সৃষ্টি। বহু সংস্কৃতির বহু মানুষকে এই জাহাজে মাসের পর মাস এক নাগাড়ে থাকতে হতো। তাঁদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত সৃজনশীল তাঁরা পরিবার পরিজন থেকে দূরে এভাবে অনিশ্চয়তার পথে দিন কাটাবার সময় মনকে ভাল রাখার জন্য যার যার কুশলতা অনুযায়ী আর্টে মন দিতেন। কেউ আঁকতেন, কেউ খোদাই

করতেন, কেউ বেত বুনতেন বা নক্‌শী কাঁথা করতেন। এভাবেই গড়ে উঠতো নানা শিল্পকর্ম। এ কাজে একটি বড় সমস্যা ছিল প্রয়োজনীয় সামগ্রী পাওয়া। জাহাজের কড়া নিয়মের মধ্যে ও স্থান সংকোচের মধ্যে এরকম কাগজ, ক্যানভাস, রঙ, কাঠ ইত্যাদির দারুণ অভাব হতো। কিন্তু তারপরও অদ্ভুত সব ছিটেফোটা, ফেলনা অনেক সামগ্রী যোগাড় হয়ে যায়– আর এমনি চাপের মুখে বিরল অবসরের মধ্যে করতে হওয়াটি শিল্পকর্মগুলোকে আরো গুরুত্বপূর্ণ করে তুল্‌তো। শিল্পের বিষয়বস্তুতে স্বাভাবিক ভাবেই জাহাজী জীবনের অনুভূতিগুলো প্রাধান্য পেতো, বা জাহাজ থেকে যেসব দৃশ্য দেখা যেতো, জাহাজ যে সব জায়গায় যেতো সেখানকার প্রতিফলনগুলো আসতো। এগুলোর একটি আদর ও চাহিদা ধীরে ধীরে শিল্প ভোক্তাদের মধ্যে গড়ে ওঠে– শিল্পী নাবিকদের সৃষ্টি হিসেবে– অনেক ক্ষেত্রেই নাম না জানা নাবিক শিল্পীর।

জাহাজী স্থাপত্য ও প্রত্নতত্ত্ব

কিছু বিজ্ঞান, কিছু কুশলতা, কিছু আর্ট:

হালকা কোন জিনিস যা না ডুবে ভেসে থাকে তাকে ভেলা হিসেবে ব্যবহার করে মানুষ যখন প্রথম কিছু পানির পথ পার হয়েছে তখনই জাহাজী স্থাপত্যের জন্ম হয়েছে। তখন মানুষকে করে করে ঠেকে ঠেকে শিখতে হয়েছে কী ভাবে এরকম ভেলাকে স্থিতিশীল রেখে তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। ওভাবেই দেখা গেছে যে একটি গাছের বড় গুড়িকে যদি মাঝখানটি খোদাই করে ফাঁপা করে নেয়া হয় সেটি আরো ভাল ভাবে ভাসে এবং বেশি ওজন নিতে পারে, যথেষ্ট টেকসই থেকেও। সামনে সরু করে নিলে এতে কম বাধায় চলাচলের সুবিধা হয়– এভাবেই সুদূর অতীতে নৌকার এবং পরে জাহাজের মুল আকৃতিটি ঠিক হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু একে যখন গুড়ি খোদাই করে নেয়ার থেকে অনেক বড় করতে হয়েছে তখন বহু নতুন নতুন সমস্যা এসে এই স্থাপত্যকে জটিল করে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত স্থাপত্যটিতে একটি ভবনের এমনকি একটি দুর্গের নির্মাণের মতই নানা দিকগুলো এসে গেলো, আবার একই সঙ্গে একে স্থিতিশীল ভাবে ভেসে থেকে দূর সমুদ্রে চলার ব্যবস্থাও করতে হলো। স্থাপত্যের জন্য বড় বড় সমস্যাই বটে।

তখন পুরাদস্তুর জাহাজী স্থাপত্যকে জাহাজের এমন আকৃতি, ওজন ইত্যাদির কথা বিবেচনা করতে হলো যার বিজ্ঞান প্রথম খৃষ্ট জন্মের শ'খানেক বছর আগে গ্রীক বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর সেই ইউরেকা মুহূর্তে। পানিতে ভাসার যে প্লবতার নিয়ম, ভাসমান জিনিসটি কতখানি পানিকে সরায় তার সঙ্গে তার ওজন হারাবার সম্পর্ক তিনিই আবিষ্কার করেছিলেন। জাহাজী স্থপতিকে মোটা দাগে, সেই নিয়মই প্রয়োগ করতে হয়। তার পরের প্রশ্ন হলো চলার সময় পানির বাধা, পাল খাটালে পালের ওপর বায়ুপ্রবাহের কাজ ইত্যাদির বিষয় যা ভেসে থাকার বিজ্ঞান বা হাইড্রোস্টাটিক্সের (তরলে স্থিতিবিদ্যা) থেকে বরং হাইড্রোডাইনামিক্সের (তরলে গতিবিদ্যা) এবং এ্যারোডাইনামিক্সের (বায়ু গতিবিদ্যা) অন্তর্গত। আটঘাট বেঁধে অংক করেই হোক, কিংবা মোটা দাগের হিসেবেই হোক জাহাজী স্থপতিকে এই নিয়মগুলো থেকেই জাহাজ নির্মাণের মৌলিক পদক্ষেপগুলো নিতে হয়। শেষ পর্যন্ত জাহাজটির ওপর এবং পালের ওপর বিভিন্ন বলের কাজগুলো হিসেব করাটাই এর কাজ। ওই সব বলের পরিপ্রেক্ষিতে টেকসই হবার মত জাহাজ কী সামগ্রী দিয়ে, কী আকৃতিতে তৈরি করা যায় সেগুলোই প্রশ্ন।

এর পরের প্রশ্নগুলো বসবাসের একটি ভবনের স্থাপত্যের মতই অনেকটা। এই জাহাজে মানুষের কাটানোর জন্য এবং কাজ করার জন্য স্থানের পরিসর কতখানি থাকবে, প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী, হাতিয়ার রসদ ইত্যাদির মজুত রাখার জায়গা বাদ দিয়ে? তাতে কত মানুষের ন্যুনতম ভাল আরামদায়ক ও নিরাপদ সংকুলান হবে; জাহাজ চালাবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে যতজন প্রয়োজন তার বেশ কিছু ওপরে কিনা? এ সময় মনে রাখতে হবে এই বাসিন্দারা কারা, স্তরবিন্যস্ত সমাজের কোন্ অবস্থান থেকে কজন থাকবে; তাদের জন্য স্থানের বরাদ্দ সেই অনুযায়ীই করতে হবে– ক্যাপ্টেন, অফিসার, দক্ষ নাবিক, সাধারণ নাবিক এমনি বিভাজনে। এর ওপর মালিক, অতিথি, যাত্রী ইত্যাদি বিশেষ মানুষরা বিশেষ জৌলুষে যেন থাকতে পারেন। অবশ্য বন্দরে বা সমুদ্রে দাঁড়ানো অবস্থায়, অথবা চলন্ত অবস্থায় জাহাজের স্থিতিশীলতা এবং মসৃণভাবে ভেসে থাকার ক্ষমতাটি সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রায় সবই একটি ভবনের সঙ্গে তুলনীয়, যদিও এটি যে ভাসমান এবং চলমান একথাটি পদে পদে মনে রাখতে হয়।

ওই ভাসমানতা ও চলমানতা, এবং বিশেষ করে যে কোন সময় ঝড়ের কবলে পড়ার সম্ভাবনায় স্থিতিশীলতার দিকটিই জাহাজের ডিজাইনে ও নির্মাণে প্রধান ভূমিকা নেয়। এমন ঘটনাও ঘটেছে যখন বিপুল আয়োজনে জাকজমকপূর্ণ রাজকীয় জাহাজ বহু বছর ধরে নির্মাণের পর উদ্বোধনের দিন বন্দরের থেকে বের হয়েই ডুবে গেছে, শুধু এই স্থিতিশীলতার অভাবে। অভিজ্ঞ স্থপতি ও ক্যাপ্টেনদেরকে অগ্রাহ্য করে জাহাজ ডিজাইন যে করা যায়না তা দেখতে টমাস কুকের বিখ্যাত দ্বিতীয় অভিযাত্রার প্রস্তুতির কথাটি স্মরণ করা যায়। কুকের প্রথম যাত্রায় যে পেশাদার ও সৌখিন বিজ্ঞানীরা ছিলেন তাঁদের মধ্যে খুবই প্রভাবশালী যিনি ছিলেন তাঁর নাম জোসেফ ব্যাংক– খুব ধনী ও অভিজাত একজন খ্যাতনামা উদ্ভিদবিদ। দ্বিতীয় অভিযাত্রায়ও ব্যাংকের নেতৃত্বে একটি বড় বিজ্ঞানী ও চিত্রশিল্পী দল থাকবে ঠিক হয়েছিলো, এবং তাঁদের সুবিধার জন্য প্রধান জাহাজ রেজোল্যুশনের ডিজাইনে প্রচুর পরিবর্তন এনে একে পুনর্নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। এতে ব্যাংক ও তাঁর সঙ্গের প্রভাবশালী বিজ্ঞানী ও চিত্রশিল্পীরা ডিজাইন পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়ে চল্‌ছিলেন এবং সেভাবে জাহাজের ভাঙ্গা-গড়াও হয়ে চলছিলো– যুৎসই ল্যাবোরেটরী, স্টুডিয়ো, তাঁদের থাকার ভাল ব্যবস্থা ইত্যাদি। এজন্য পশ্চাদ-কুঠির অনেক সম্প্রসারণ প্রয়োজন হলো যাতে আরো বড় বড় কামরার ব্যবস্থা করা যায়। সংস্কার কাজে অনেক টাকা খরচ হয়ে যাওয়ার পর অবশেষে স্থপতিরা টের পেলেন যে এই অবস্থায় জাহাজটি যাত্রা করলে তার স্থিতিশীলতায় দারুণ ঘাটতি দেখা দেবে। এবার ক্যাপ্টেন কুক পুরো অভিযাত্রার ওপর তাঁর যে কর্তৃত্ব সেটি প্রয়োগ করলেন– দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি জাহাজে ইতোমধ্যে আনা সব পরিবর্তন বাতিল করলেন, আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে। জোসেফ ব্যাংক এতে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে নিজেকে ও তাঁর দলকে কুকের অভিযাত্রা থেকে প্রত্যাহার করলেন। কুককে সম্পূর্ণ নতুন বিজ্ঞানীদল যোগাড় করতে হয়েছিলো, তবুও তিনি জাহাজের স্থিতিশীলতার ডিজাইনে কোন আপোষ করতে রাজি ছিলেননা।

জাহাজী স্থাপত্য আগাগোড়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরিক্ষার থেকে পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং মাস্টার কুশলীদের নির্মাণ দক্ষতার ওপর নির্ভর করেছে। নতুন ও অপরিচিত ডিজাইনের দিকে যাওয়ার ঝুঁকি খুব কমই নেয়া হতো,

কারণ বৈজ্ঞানিক মডেলের ওপর ছোট স্কেলে কৃত্রিম জলাশয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে বড় সড়ো পরিবর্তিত ডিজাইনের যথার্থতা দেখার প্রচলন তখন ছিলনা। হ্যাঁ মাস্টার কুশলীও জাহাজের অর্ধেকের একটি ছোট মডেল বানিয়ে কাজ শুরু করতেন যার মধ্যে কাটা জায়গা দিয়ে ভেতরের খুঁটিনাটি দেখা যেতো। কিন্তু সেটি সাজ সজ্জার নানা আইডিয়া কিংবা কামরা বিন্যাসের পরিকল্পনার জন্য যা মালিককে বা পৃষ্ঠপোষককে দেখাবার জন্য ওই অর্ধ মডেল দরকার ছিল। কিন্তু সত্যিকার মৌলিক পরিবর্তনের ঝুঁকি সাধারণত নেয়া হতোনা। তাই যখন দেখা গেছে পর্তুগীজ নাও দিয়ে মোটামুটি ভাল কাজ হচ্ছে তখন শত শত বছর ধরে নানা দেশে নানা নামে ওই মূল ডিজাইন রেখে দেয়া হয়েছে। পর্তুগীজরা যখন নতুন সমুদ্রপথ আবিষ্কারে একেবারে নতুন ধরনের জাহাজ ক্যারাভালে উপকার পেয়েছে, তখন সেটিও বহুদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

মাস্টার জাহাজ নির্মাতা এবং তাঁদের কুশলীরা নিজেদের অন্তর্নিহিত বোধ শক্তি ও হাতের কুশলতা ব্যবহার করেই সাধারণত কাজ করতেন– করতে করতেই তাঁরা পারদর্শী হতেন। এজন্য জাহাজ যতটা না একটি বৈজ্ঞানিক কীর্তি হতো তার থেকে বেশি হতো একটি ক্র্যাফ্‌ট বা আর্ট। ধীরে ধীরে এটি ক্র্যাফ্‌ট থেকে বিজ্ঞান হয়ে ওঠেছে ১৮০০ শতকে এসে; এর একটি বড় কারণ হলো এ শতকের মাঝামাঝি এসে পালের জাহাজকে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিত জাহাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে হয়েছিলো। কাজেই গতিবেগ, নিরাপত্তা, নিশ্চয়তা এই জিনিসগুলো না বাড়িয়ে উপায় ছিলনা। এর ফলে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক নিয়মনীতির প্রয়োগের প্রশ্ন ওঠেছে, পরীক্ষা নিরিক্ষা করে উন্নয়নের চেষ্টা এসেছে। যেমন হাজার হাজার বছর ধরে কাঠের তৈরি খোলে পালের জাহাজ চলার পর এবারই প্রথম লোহার তৈরি জাহাজের খোল দিয়ে তাকে এক্সপেরিমেন্ট করতে হয়েছে, অথবা লোহার কাঠামোকে কাঠের তক্তা দিয়ে ছাইয়ে, কখনো তলায় তামার আবরণ দিয়ে। যেই পুরানো ধাঁচের মাস্টার জাহাজ-নির্মাতা দিয়ে আর কাজ চলছিলোনা। ওদিকে জাহাজের মূল প্রয়োজনীয় অবয়বটি তৈরিতে মনোযোগ ও সময় দেয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেরকম তার অলঙ্করণ, পশ্চাদ-খোদাই, ফিগার হেড থেকে শুরু করে পশ্চাদ-কুঠির শান শওকতের সকল আর্টের ওপর মনোযোগ দেয়া হতো, সেই ফ্যাশনটিরও অনেকটা অবসান হয়েছে। কাজেই এক ভাবে

পালের জাহাজের রোমান্টিক যুগটি শেষ হয়ে আসছিলো; বলতে গেলে বাষ্পীয় জাহাজই এর ইতি টেনেছে।

ডিজাইন, খাঁচা, জাহাজঃ

জাহাজের ডিজাইন মোটামুটি হয়ে যেতো ওই যে অর্ধ মডেলের কথা বলা হলো তার ওপরেই। ওটার ওপরেই সিদ্ধান্ত হয়ে যায় নির্মাণের খুঁটিনাটির। মাস্তুল, দড়াদড়ি, পাল এসবও ওই মডেলেই ঠিক হয়ে যায়। যে বিভিন্ন কাঠের টুকরা দিয়ে প্রথমে জাহাজের খোলের খাঁচা, তারপর তার সারা গায় তক্তা সেঁটে সত্যিকার খোল, ভেতরে তক্তার পাটাতন গড়ে একের নিচে এক এক ডেক, সামনের গলুই ও পেছনে পশ্চাদভাগ এই দুই দিকে সম্মুখ-কুঠি ও পশ্চাদ-কুঠি এই ভাবে মডেলেও সব কিছু থাকে আলাদা আলাদা ছোট কাঠের টুকরা এবং ছোট তক্তা জুড়ে জুড়ে। এবার মডেলের মধ্যে থাকা প্রত্যেকটি কাঠের টুকরার মাপ ও আকৃতিকে তত গুণে গুণ দিয়ে নেয়া হয়, মডেল থেকে প্রকৃত জাহাজটি কতগুণ বড় হবে তা নির্ণয়ে। গুণ দেবার পর প্রত্যেক টুকরা যেই সাইজ ও আকৃতি দাঁড়ালো সেই হিসেবে মডেলের মতই টুকরাগুলোকে জোড়া অবস্থার রেখাচিত্র তৈরি করে ফেলা হয় যে কোন সুবিধাজনক স্কেলে। এবার অপর অর্ধেকের রেখাচিত্র তার আয়না প্রতিফলনের মত এঁকে ফেললে পুরো জাহাজের রেখাচিত্র পাওয়া যায় ও তার প্রত্যেক টুকরার আলাদা রেখাচিত্রও।

জাহাজের তলার মূল ভিত্তি হিসেবে ধরা হয় সামনে পেছনে বিস্তৃত একটি ভারী লম্বা বীম, আসলে কয়েকটিকে পরপর জোড়া দিয়ে একটানা বীম যাকে বলা যায় জাহাজের মেরুদণ্ড বা তলি, জাহাজী ভাষায় কীল। এর সামনের প্রান্ত থেকে সম্মুখ ভাগ গলুই হিসেবে ওঠে, আর পেছনের প্রান্ত থেকে পশ্চাদ-হালটি ঝোলে। এর নিচে একই রকম আরো বীম জুড়ে দিয়ে তৈরি হয় পানির মধ্যে নেমে যাওয়া একটি খাড়া তক্তার মত পূর্ণাঙ্গ কীল যা জাহাজকে স্থিতাবস্থায় রাখে, পানিতে বাধাপ্রাপ্ত হয় বলে এটি জাহাজকে এপাশ ওপাশ বেশি দুলতে দেয়না। কীল থেকে দুপাশে ঘুরে বেঁকে ওপরে ওঠা এক একটি ফ্রেইম বা পাঁজর তৈরি হয় সরু কাঠ দিয়ে। প্রত্যেক পাঁজরের আকৃতিতে জাহাজের খোলের আকৃতিরই অনুকৃতি থাকে। সামনের ও পেছনের প্রান্তের পাঁজর বা ফ্রেইম সব থেকে ছোট, তারপর কিছু দূর পর পর আর একটি

পাঁজর যেটি আরেকটু বড়, তার পরেরটি আরো বড়, মাঝেরটি অর্থাৎ জাহাজের পেটের কাছেরটি সব চেয়ে বড়। এভাবে কীলে এপ্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত কিছু পর পর পাঁজর যেন জাহাজের খোলের কঙ্কালটি তৈরি করে ফেললো, দেখতে একটি খাঁচার মত। এবার তক্তা দিয়ে খাঁচাটি বাইরের দিকে নিশ্ছিদ্র ভাবে ঢেকে দেয়া হয়- লম্বালম্বি তক্তা দিয়ে। পাশাপাশি দুটি তক্তার ফাঁক যেন নিশ্ছিদ্র হয় সে জন্য নানা উপায় নেয়া হয়, ছাদের টালির মত একটি কিনারা আরেকটির ওপর খানিকটা তুলে দেয়া হয়, পাটের বা শণের আঁশ আলকাতরায় ভিজিয়ে তা ফাঁকের মধ্যে ঠুকে ঠুকে দেয়া হয়। পরে বাইরের দিক আলকাতরা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দেয়া হয়। খোলটি এবার নিশ্ছিদ্র তৈরি। এর পেছনের প্রান্ত থেকে সামনের প্রান্তে গলুই পর্যন্ত আগে পিছে টানা কাঠ বাঁকা হয়ে এসে একে আরো শক্ত করে। খোল যেন দুদিকের পানির চাপে চুপসে না যেতে পারে সেজন্য ভারী কাঠের বীম জাহাজের আড়াআড়ি লাগানো হয় যা জাহাজের দুপাশকে জোর করে পরস্পর আলাদা রাখে ওই চুপসে যাবার চাপের বিরুদ্ধে। এদেরকে বলা হয় বীম। প্রান্তের বীম বেঁটে এবং মাঝের বীম লম্বা হবে তা বলাই বাহুল্য। এখন বীমগুলো ওপরে তক্তা দিয়ে নিশ্ছিদ্র ভাবে ছেয়ে দিলে তৈরি হয়ে যায় প্রধান ডেক। এর নিচে আরো ডেক থাকতে পারে। ডেকের তক্তার ফাঁকগুলোও নিশ্ছিদ্র করা হয় খোলের মত একই ভাবে আঁশ ঢুকিয়ে।

জাহাজের তলি থেকেই ডেক ফুঁড়ে খাড়া করা হয় মাস্তুল যাকে নানা দিকে দড়াদড়ির টানেই সোজা রাখা যায়। প্রয়োজনে মাস্তুল খুলে ফেলে বাড়ানো যায়, মেরামত করা যায়। এভাবে মূল খোলটি তৈরি হয়ে গেলে স্থপতি এবার মনের সুখে বাকি অংশ পড়তে পারেন– সেটি অনেকটা একটি কাঠের বাড়ি তৈরির মত। স্থপতিও মনের মাধুরি মিশিয়ে ডিজাইন অনুযায়ী তৈরি করতে পারেন পশ্চাদ-কুঠি– উঁচু দরের লোকেরা যেখানে থাকবেন, আর সম্মুখ-কুঠি– সাধারণ নাবিকরা যেখানে থাকবেন। মাস্তুলের মধ্যেই তো কত কারুকার্য– পাল খাটাবার আড়দণ্ড ইয়ার্ডগুলো একের ওপর এক। প্রধান মাস্তুলের একেবারে ওপরে 'কাকের বাসা'- একটি রেলিং দেয়া ছোট্ট খাঁচা যেখানে দাঁড়িয়ে একজন নাবিক সব সময় সামনে সমুদ্রের দিকে চোখ রাখেন, উচ্চতার কারণে অনেক দূর। কী দেখেন? কতকিছুই এক সময় দেখতে হতো জলদস্যুর জাহাজের কোন নিশানা, তা ছাড়া বন্ধু জাহাজও, দ্বীপের বা

উপকূলের সন্ধান, তারো থেকে বেশি দূর-ঝড়ের, সমুদ্র উত্তাল হবার কোন নমুনা। এর অনেক কিছু রীতিমত বাঁচা মরার সমস্যা। জাহাজের প্রত্যেক অংশই যেন জীবনের এক একটি আর্ট।

পালের জাহাজ একটি চলন্ত কারখানাও বটে। এই যে এই ভাবে পাঁজরের খাঁচার ভিত্তিতে তৈরি জাহাজ, এর কিছু সুবিধা আছে আমাদের শরীরের মতই। এটি দুমড়ায় বেশি, ভাঙ্গে কম। ফলে উত্তাল সমুদ্রে একেবারে ডিমের খোলের মত ভেঙ্গে যাবেনা, বরং এখানে একটু মচকাবে, ছিদ্র হয়ে যাবে, একটি তক্তা বদলাতে হবে, ছিদ্র ভরতে হবে– তাতেই পার পেয়ে যাওয়ার সুযোগ আছে। এ জন্যই ওই কারখানা– ছুতার, কুশলী, পাল সেলাইয়ের মানুষ সবাই আছেন, সাধারণ নাবিকরাও হাত লাগাতে পারেন, মেরামত সব সময় চলছেই। এমনকি কোন সময় কূলে তুলে ফেলে কাৎ করে খোলে রঙ করা, আলকাতরা মাখানো এসবও চলতে থাকে। পাল ছিড়ে গেছে ঝড়ে, তো কি হয়েছে; সেলাই করে দাও। আগামিতে লাগবে বলে আরো কিছু পাল তৈরি করতে থাকো। টাটকা খাবারে টান পড়েছে, দেখো কিছু মাছ শিকার করা যায় কিনা; এজন্য নৌকা নামাও এটি বেয়ে ঘুরে ফিরে দেখো। এজন্যই এসব কাজ আর্ট হয়েই ছিলো– কখনো ঠিক সায়েন্স হয়ে ওঠেনি।

ইতিহাসের সাক্ষী:

জাহাজী প্রত্নতত্ত্বের মূল্য নানান দিক থেকে। পুরানো ইতিহাস পুরানো জাহাজের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকে, সেটিকে উদ্ধার করতে পারলে এক সঙ্গে অনেক কিছুই জানতে পারার সম্ভাবনা দেখা দেয়। প্রথমত সেকালের জাহাজ সম্পর্কেই তো কত কৌতুহল। সব থেকে পুরানো জাহাজের খবর আমরা পাই মিশর থেকে ৬,৩০০ বছর আগের বড় নৌকার ছোট মডেল হিসেবে। ছবিতেও কিছু কিছু। অবিকল আমাদের নৌকার মত; দাঁড় বাওয়া মানুষের মডেলও আছে তার ওপরে, এবং ক্যাপ্টেনেরও। মাস্তুল আছে, পাল খাটাবার ব্যবস্থাটাও আছে। এমন ভাল ইতিহাস এর পর আর বহুদিন পাওয়া যায়নি– যদিও ফুলদানি ইত্যাদি চীনা মাটির পাত্রের গায়ে আঁকা ছবিতে গ্রীক রেমান ইত্যাদি জাহাজের কিছু নমুনা দেখা গেছে। এ সম্বন্ধে বাকি বর্ণনা আমরা তাদের সাহিত্য থেকে জেনেছি। কাঠ পচনশীল জিনিস তাই নেহাৎ ভাগ্যক্রমে না হলে আমরা প্রাচীন জাহাজের সন্ধান পাইনা। তবে ডুবে যাওয়া জাহাজ

লবন-পানিতে এবং অক্সিজেনবিহীন পানিতে থাকে বলে বহুকাল সে জাহাজের কাঠ ও অন্যান্য জৈব পদার্থ না পঁচে অক্ষত থাকে। আমাদের ডুবুরি প্রত্নতত্ত্ববিদরা এরকম অনেক জাহাজের সন্ধান পেয়েছেন– বেশির ভাগই ইউরোপীয় রেনেষাঁর পরের, হয়তো তখন থেকে প্রচুর জাহাজ সমুদ্রে গিয়েছে, এবং প্রচুর জাহাজ ডুবেছে বলে।

গভীর সমুদ্রতলে ডুবে থাকা ও ভেঙ্গে যাওয়া জাহাজকে তুলে আনা কঠিন। যদিও বা বহু পরিশ্রমে ও ব্যয়ে তোলা যায় তাকে শুকনায় বেশিদিন টিকিয়ে রাখা আরো কঠিন। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে প্রত্নতত্ত্ববিদরা ডুব দিয়ে ওগুলো সমুদ্রের মধ্যেই ডুবন্ত অবস্থায় অনুসন্ধান করতে পেরেছেন, যে সব জাহাজের খবর তাঁদের থেকেই কিছুটা পাওয়া গেছে। কিন্তু তাঁরা জাহাজ থেকে অন্য সব জিনিস তুলে আনতে পেরেছেন যেগুলো ওখানে এবং বাইরে পচনশীল নয়। ওখান থেকে আমরা শুধু প্রাচীন জাহাজের খবর নয়, সেই প্রাচীন রীতিমত একটি সমাজের, অর্থনীতির, সভ্যতার (অথবা অসভ্যতার) প্রামাণ্য নিদর্শনগুলো পেয়ে যাই। জাহাজে থাকা তৈজস, তাতে উঁচু-শ্রেণী নিচু-শ্রেণীর পার্থক্য, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি, বাণিজ্য-পণ্য, আর্ট সামগ্রী এবং সর্বোপরি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সোনা-রুপা-রত্ন যা হস্তগত করা অনেক জাহাজেরই উদ্দেশ্য ছিল সেগুলো প্রচুর পাওয়া গেছে এরকম নিমজ্জিত প্রত্নতত্ত্ব স্থান থেকে। সেগুলো বিজ্ঞান-প্রযুক্তির এগিয়ে যাওয়ার কথা যেমন বলেছে, আর্টের ভক্তির কথা যেমন জানিয়েছে, তেমনি দস্যুতার ও হানাহানির কথাও জানিয়েছে। সেখান থেকে রত্ন ও শিল্প সৌকর্যের দ্রব্য যেমন পেয়েছি তেমনি লোহার যে আংটা ও শেকল দিয়ে সারিবদ্ধ দাসদেরকে গায়ে গায়ে পণ্যের মত প্যাক করে মাসের পর মাস জাহাজের খোলে আটকে রাখতো সেগুলো থেকে দাস-ব্যবসার বহু অজানা অধ্যায়ও জানতে পেরেছি।

জাহাজী প্রত্নতত্ত্বের এসব দিকের সঙ্গে সরাসরি পরিচয় না হলেও আমার কিছুটা সৌভাগ্য হয়েছে এর মধ্যে যে অল্প কয়েকটা জাহাজ সমুদ্র থেকে তুলে সংরক্ষণ করে সবাইকে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে সেরকম দুটি দেখার এবং সেই বহু আগের আমলের জাহাজের জীবনকে বোঝার চেষ্টা করার। অবশ্য যেভাবে ডাঙায় তুলে জাহাজগুলোকে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেও এক উঁচু দরের আর্ট। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত পরের দিকের যে কয়েকটি বিখ্যাত

পালের জাহাজকে তার কাজ শেষ হবার পর বেঁচেবর্তে থাকতেই জাদুঘর-নিদর্শন হিসেবে সংরক্ষিত করা হয়েছে তারও দুটি দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। এক্ষেত্রে সংরক্ষণের ঝকমারি কম, রীতিমত তরতাজা জাহাজে ঢুকে ঘুরে ফিরে তাকে অনুভব করা যায়। আশপাশের আধুনিক বন্দরের কথাটি যদি কিছুক্ষণের জন্য ভুলে থাকতে পারি তা হলে ওসব দেখতে দেখতে কল্পনায় চলে যেতে পারি কয়েক শত বছর আগের গৌরব মণ্ডিত একটি জাহাজী জীবনে।

ওসেবার্গ জাহাজ। ১৯০৪ সালে নরওয়ের ওসেবার্গ নামের জায়গায় একটি প্রাচীন মাটির ডিবি খনন করার সময় পুরানো কাঠের টুকরা আর মানুষের কবর পাশাপাশি পেয়ে সন্দেহ হয়েছিলো যে ভাইকিং যোদ্ধাদেরকে তাদের জাহাজের সঙ্গে কবর দেয়ার রীতি এখানে অনুসরণ করা হয়েছে। ৮০০ শতকে তৈরি জাহাজটির কাঠগুলো কিন্তু প্রায় নতুন কাঠের মতই ছিলো। এর কারণ ডিবির ভেতরটা ছিল খুব স্যাঁতসেতে, পানিতে সম্পৃক্ত, আর তার কাদামাটির পরিবেশটিও ছিল কাঠ সংরক্ষণের উপযোগী। কিন্তু অনেক পাথরে পরিপূর্ণ ডিবিটিতে দীর্ঘদিন ধরে ওপরের চাপে জাহাজটি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিলো। বিশেষজ্ঞ জাহাজী প্রত্নতত্ত্ববিদরা ২১ বছর ধরে কাজ করে, জাহাজের টুকরাগুলো এক এক করে খুঁজে নিয়ে, কোন্‌টির সঙ্গে কোন্‌টি মিলে তা অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে নির্ণয় করে পরস্পর জোড়া দিয়ে দিয়েছেন। এর ফলে এত প্রাচীন একটি জাহাজকে হুবহু মূল অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়া সম্ভব হয়েছে– এর ৯০% কাঠ ৮০০ বছর আগের জাহাজেরই কাঠ, মাত্র ১০% নতুন কাঠ। আজ নরওয়ের রাজধানী ওসলোর ভাইকিং শিপ মিউজিয়ামে যে কেউ ওটি দেখতে পাবেন তার পুরানো গরিমায়। আমারো ওখানেই সুযোগ হয়েছে।

ভাইকিং জাহাজ হিসেবেও জাহাজটি তুলনামূলকভাবে ছোট– লম্বায় ৭০ ফুট আর প্রস্থ ১৬.৭ ফুট– দু'পাশে ১৫টি করে ৩০টি দাঁড়ের ছিদ্র থেকে বোঝা যায় এক সঙ্গে ৩০ জন দাঁড় বাইতে পারতো। সেই সঙ্গে জাহাজের পেছনের দিকে রয়েছে প্রায় ৩০ ফুট উঁচু একটি মাস্তুল যাতে ৯০০ বর্গ ফুট বড় আয়তাকার পাল লাগানো সম্ভব। সামনের আর পেছনের প্রান্ত শিল্প-সম্মত ভাবে বাঁকিয়ে ওঠা। সামনেরটি ময়ূরপঙ্খীর মত গ্রীবা বাঁকিয়ে

অনেকটা ওপরে উঠে এসে বার বার পেঁচানো একটি চক্রের আকৃতি নিয়েছে। জাহাজের পুরো কিনারাটিতে খোদাই করা একটি বর্ডারের মত অলঙ্করণ– তার ডিজাইনটা লতিয়ে ওঠা সাপের এবং পশুর থাবার। এমন অলঙ্করণ এই অঞ্চলে আরো দেখা গেছে, ওই জাহাজ থেকে এর নামই হয়ে গেছে ওসেবার্গ স্টাইল। কাঠের টুকরাগুলোর সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিলো জাহাজ ঘোরাবার লম্বা দাঁড় এবং একটি লোহার নোঙ্গর। সঙ্গে দুজন নারীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিলো– তাদেরকে এখন জাহাজের ওপরেই একটি পাতলা কাঠের তাঁবুর নিচে শুইয়ে রাখা হয়েছে। হয়তো ওদেরকে এভাবে জাহাজে রেখে কবর দেয়ার জন্যই পুরো আয়োজনটি করা হয়েছিলো। তবে এই দুই নারী বেশ রহস্যেরও সৃষ্টি করেছে– কারণ তাদের একজনের বয়স ৮০ ও অন্যজনের ৫০; এতে বোঝা যাচ্ছে এ কবর দু'জনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেয়া হয়নি; অথবা এটা কি স্বেচ্ছামৃত্যু ছিল? যেভাবে ভাইকিং ইতিহাস থেকে স্বেচ্ছামৃত্যুর কথা জানা যায়? গুরুত্বপূর্ণ কারোর সঙ্গে সহচর বা সহচরী কারো স্বেচ্ছা মৃত্যুর?

'ভাসা' জাহাজ। আরেক নর্ডিক দেশ সুইডেনেই আরো বিশাল আকারের জাহাজ যা সমুদ্রে ডোবা অবস্থা থেকে তুলে এনে সংরক্ষণ করার ও একই সঙ্গে মানুষের কাছে দেখানোর অবস্থায় দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। এটি ছিল ১৬০০ শতকে খুব শক্তিশালী রাজ্য সুইডেনের গৌরবধারী বড় জাহাজগুলোর একটি, নাম ভাসা। পোল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালেই নৌ শক্তি বাড়াবার জন্য ১৬২৬-২৮ সালে এটি তৈরি করিয়েছিলেন রাজা গুস্তাভাস আডুলফাস। রাজকীয় তত্ত্বাবধানে খুবই যত্ন সহকারে সেকালের সেরা গ্যালিওনগুলোর আদলে এটি তৈরি হলেও এর ডিজাইনে গুরুতর ত্রুটি ছিলো যা কেউ তখন ধরতে পারেনি। ওপরের কামান ডেক দু'টির কারণে এটি বেশ মাথা ভারী হয়ে গিয়েছিলো। ফলে উদ্বোধনী যাত্রার উৎসবমুখর বন্দরেই, মাত্র দেড় কিলোমিটার যাবার প্র এটি বাতাসের একটি ঝাপটায় কাৎ হয়ে গিয়েছিলো। যাত্রার বিদায়ী স্যালুট দেবার জন্য সে সময় নিজের ডেকের কামানের জানালাগুলো খোলা হয়েছিলো, ফলে ওই জানালা দিয়ে কাৎ হওয়া জাহাজে পানি ঢুকে সেটি আর সোজা হতে পারেনি। ওখানেই স্টকহোলম বন্দরে জাহাজটি ডুবে গিয়েছিলো সব দর্শকের সামনে, ৩০ জন নাবিকও ডুবে প্রাণ হারিয়েছিলো।

এমন জায়গায় ডুবে যাওয়াতে বন্দরে সব সময় আসাযাওয়া করা জাহাজের নোঙ্গরের আঘাতে, ঢেউয়ের উথালপাতালে ক্রমে ডুবে থাকা জাহাজের ক্ষতি হয়েছে, সাধারণ অবক্ষয়তো হয়েই চলেছে। বন্দরের জন্যও এটি একটি প্রতিবন্ধকতা ছিলো। তখনই একে ওঠাবার চেষ্টা হলেও সফল হয়নি, তবে কামানগুলো অধিকাংশ উদ্ধার করা হয়েছিলো। এক সময় জাহাজটির কথা প্রায় সবাই ভুলেই গিয়েছিলো। তারপর ১৯৬১ সালে এই পুরো জাহাজটি মোটের ওপর তার গোটা প্রায় অক্ষত অবস্থা বজায় রেখেই তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো ১৯৬১ সালে এই তুলে আনার অনেক আধুনিক প্রযুক্তি থাকা সত্ত্বেও নানা কারণে তার কোনটাই কাজ করেনি। যেটি কাজ করেছে তা ১৬২৮ সালে ভাসাকে তুলতে প্রথম ব্যবহার করা ব্যর্থ প্রযুক্তিই নতুন আঙ্গিকে ব্যবহার করে। প্রযুক্তিটি হলো অন্য দুটি জাহাজের খালি খোল পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে ডোবা জাহাজের দুপাশে ভাসমান রাখা হয়েছে। এদেরকে বলা হয় হাল্‌ক (বড় শরীর)। এদেরকে শক্ত চেইন দিয়ে ডোবা জাহাজের তলায় ঘুরিয়ে তার সঙ্গে বাঁধা হয়। এখন হালক দুটিতে পানি ঢুকিয়ে যতটা সম্ভব তাদেরকে ডুবোডুবো অবস্থায় এনে চেইনকে টাইট করা হয়। এবার হাল্‌ক দু'টার পানি পাম্প করে ফেলে দিলে এগুলো হালকা হয়ে যখন প্রচণ্ড উর্ধ্ব চাপে ভেসে উঠবে তখন টাইট চেইনে ডোবা জাহাজটাকে কাদামাটি থেকে আলগা করে কিছুটা তুলে ফেল্‌বে– যদিও এখনো সেটি পানিতে ডোবা। এভাবে বার বার করে একটু একটু করে তুলে ডুবে যাওয়া জাহাজটিকে একেবারেই পানির ওপরে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। ১৬০০ শতকের একটি সুসজ্জিত ও অলঙ্কৃত বিশাল জাহাজ ১৯৬১ সালের মানুষের চোখের সামনে জলজ্যান্ত অবস্থায় ভেসে ওঠাটি ছিল একটি অত্যন্ত চমকপ্রদ বিরল ঘটনা।

জাহাজটি সমুদ্রের অক্সিজেন-বিরল পানিতে থাকায় কাঠ সহ এর জৈব জিনিসগুলো এক রকম সংরক্ষিত অবস্থাতেই ছিল বলা যায়– চামড়া, কাপড় ইত্যাদিও। তবে লোহার তৈরি কামান, নোঙ্গর, পেরেক, হাতিয়ার এগুলো মরচে ধরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তার জন্য তৈরি বিশেষ ভাবে নির্মিত ভাসা শিপ ইয়ার্ডে যখন ভাসাকে আমি দেখতে পাই তখন তার সংরক্ষণ কাজ চল্‌ছিলো। জাহাজকে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মত অবস্থার নিচে ভিজিয়ে রাখা হয়েছিলো, ও

সময় শুকিয়ে যেতে দিলে জাহাজের পুরানো কাঠ ফেটে ভেঙ্গে যেতে পারতো। মরিচা ধরা পেরেক ইত্যাদির সঙ্গে ক্যামিকাল বিক্রিয়ায় যে সালফিউরিক এসিড তৈরি হয়েছে তখনো সেটি সবকিছুকে অবক্ষয়ের কাজ করছে। তবে এর মধ্যেই প্রত্নতত্ত্ববিদরা কাজ করে গেছেন সব নমুনা সংগ্রহ করে যেগুলো ওখানেই যথাস্থানে রাখা সম্ভব সেখানেই রাখতে। ওসব দেখে ১৬২৮ সালের জাহাজী জগতটি যেন চোখের সামনে ধরা দিলো, তাছাড়া সে সময়ের সুইডেনের সাধারণ জীবনযাত্রারও খানিক। নাবিকের বাক্সপ্যাটরা, তাদের বাড়তি কাপড়, পাট করে রাখা বাড়তি পাল এই সব পর্যন্ত। পানির ভেতর থাকা কালে কাপড়চোপড় পর্যন্ত সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ার এটিই সুবিধা। অবশ্য ঘুরেফিরে দেখা হলোনা, কারণ ওই ঝিরঝিরে কৃত্রিম বৃষ্টিতে থাকা অবস্থায় প্রত্যেকটি অংশ খণ্ডিত ভাবে দেখতে হলো ২০ ফুট দূর থেকে। দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ চলছিলো। এর মধ্যে প্রধান ছিল ১৭ বছর ধরে জাহাজের কাঠের ওপর ক্রমাগত পলি-ইথেলিন গ্লাইকোল (পিইজি) স্প্রে করা হচ্ছিলো যা ধীরে ধীরে কাঠের কোষের মধ্যে ঢুকে পড়ছিলো। ওটি পুরোপুরি ঢুকে গেলে কাঠ শুকালেও আর ফেটে যাওয়া বা ভেঙ্গে যাওয়ার ভয় থাকবেনা। পরে সত্যিই শুষ্ক, স্বাভাবিক ও শক্ত অবস্থায় ভাসাকে একটি নতুন মিউজিয়ামে স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে; এখন সবাই একে ঘুরেফিরে দেখতে পারে।

এইচ এম এস ভিক্টোরি। জাহাজী ইতিহাসের আলোচনায় ১৭০০ শতকে সেই বড় বড় গ্যালিওনের পরবর্তী সংস্করণ শিপ অফ দি লাইনকে আমরা দলবদ্ধ নৌ-যুদ্ধের জন্য তৈরি করতে দেখেছি বিভিন্ন নৌবাহিনীকে। আর এমনি যুদ্ধের অভাব হচ্ছিলোনা বিভিন্ন বড় বড় নৌশক্তিগুলোর ক্রমাগত সংঘাতে। সেই রকম একটি যুদ্ধ জাহাজ তার গৌরবময় দীর্ঘ দায়িত্ব পালনের পর বন্দরেই হুবহু রেখে সাধারণ দর্শকের জন্য পুরো জাহাজ উন্মুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছে। সেটি ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথ বন্দরে রাখা এইচ এম এস ভিক্টোরি। খুব ভাল ভাবে সেদিনের একটি সত্যিকার জাহাজে ইচ্ছেমত ঘুরে ফিরে দেখার সুযোগ পেয়েছি এই জাহাজের নানা অংশে। আর বড় কথা হলো এটি সেদিনের যে কোন দেশের যুদ্ধ জাহাজের মধ্যে একটি সেরা উদাহরণ। ডুবে যাওয়া অবস্থা থেকে উঠিয়ে নয়, বরং দায়িত্ব শেষ করে অবসরে যাবার পরে স্বাভাবিক অবস্থায় একে সবার চোখের সামনে রাখা

হয়েছে। ১৭৭৮ সালে তার দায়িত্ব শুরু করা এই আধুনিক গ্যালিওন ঘরানার যুদ্ধ জাহাজটি বহুবার বৃটিশ নৌ বহরের ফ্ল্যাগ-শিপ হিসেবে কাজ করেছে; অর্থাৎ যুদ্ধ বহরের প্রধান নৌ-সেনাপতি এ জাহাজে থেকেই পুরো বহরকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। জাহাজটির দায়িত্ব কালের একেবারে শীর্ষ গৌরবটি এসেছিলো অ্যাডমিরাল নেলসনের ফ্ল্যাগ-শিপ হিসেবে এটি যখন ট্রাফালগারের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলো। নেপোলিয়নের সময় ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের অংশ হিসেবে ফরাসী ও স্প্যানিশ যৌথ নৌ-বাহিনীর মোকাবেলা বৃটিশ নৌ-বাহিনী করছিলো স্পেনের কাছে ট্রাফালগারের সাগরে সেখানে তার নৌ-বহরের প্রধান ছিলেন বিখ্যাত নৌ-সেনাপতি নেলসন। যুদ্ধে বৃটিশ নৌ-বহরের জয় হয়েছিলো, কিন্তু সেই জয়ের মুহুর্তেই নেলসন ভিক্টোরির কোয়ার্টার ডেকে মুহুর্তের জন্য বের হয়েই সেখানে শত্রুর একটি গুলিতে বিদ্ধ হন। তাঁকে সবাই ধরাধরি করে জাহাজের একেবারে নিচের ডেকে সার্জনের অস্ত্রোপচারের ঘরে নিয়ে গেলে দীর্ঘ অস্ত্রোপচারে বাঁচাবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৮২৪ এর পর থেকে ভিক্টোরি সমুদ্রের দায়িত্ব আর পালন না করে বন্দরের দায়িত্বে ছিলো এবং পরে ১৯২২ থেকে একটি মিউজিয়াম জাহাজ হিসেবে সর্ব সাধারণের জন্য উন্মুক্ত থেকেছে।

এত পুরানো একটি জাহাজ আবহাওয়ায় খোলামেলা একটি ড্রাই ডকে রাখার ফলে স্বাভাবিক নিয়মে তার অবক্ষয়গুলো চল্‌ছে এবং ক্রমাগত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করতে হয়েছে, আমরা দর্শকরা যখন জাহাজের ভেতরে গিয়ে ঘুরে ফিরে দেখছিলাম তখনো এর গভীর ভেতরে তা চল্‌ছিলো। কিন্তু সেটি আমাদের চোখে পড়েনি খুব স্বাভাবিক ভাবেই বন্দর থেকে জাহাজে ওঠার মত করে গিয়েছি– তারপর প্রধান ডেক, কোয়ার্টার ডেক, ক্যাপ্টেনের কেবিন, চার্ট রুম ইত্যাদি সবই দেখা হয়েছে; সিড়ি দিয়ে নিচে নেমে কামান ডেকেও। প্রধান ডেকে যথারীতি মাস্তুলে পাল গুটানো, নানা দড়াদড়ি। প্রত্যেক জিনিস কাছে গিয়ে ধরে দেখতে পারছি, সেখানে বসে বিশ্রাম নিতে পারছি। ডেকের পেছনের দিকটায় কোয়ার্টার ডেক– নেলসন যেখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন সেই জায়গাটি চিহ্নিত করে দেখিয়ে দেয়া আছে। কোয়ার্টার ডেকের সঙ্গেই একটু নিচে অ্যাডমিরালের কেবিন, যুদ্ধ পরিচালনা কেন্দ্র, ক্যাপ্টেনের কেবিন ও চার্ট রুম; অন্যান্য অফিসারদের কক্ষ। বর্তমান যিনি ক্যাপ্টেন তিনি দর্শকদের প্রশ্নের উত্তর দিলেন এখানে,

ভিক্টোরির পুরানো ইতিহাস তুলে ধরলেন। কোয়ার্টার ডেকের সামনের দিকে হুইলের মঞ্চ। কাছেই সে সব বড় বড় অধিনায়কের কাজের ও খাবার জায়গা– যুদ্ধের সময় এগুলোর অস্থায়ী দেয়াল সরে যেতো, তাঁরা নিচের ডেকে চলে যেতেন, আপাতত নিচের থেকেই কাজ করতেন, উপরটা কামান চালনার জন্য ছেড়ে দিতে হতো কারণ কিছু কামান এখানেও সজ্জিত হতো তখন।

কিন্তু কামানের আসল শক্তি দেখা গেলো সিড়ি দিয়ে নিচে নেমে প্রথম কামান ডেকে। দুই পাশে দুই সারি কামান। প্রতিটি কামান রয়েছে একটি চাকাওয়ালা ট্রলির ওপর। গোলাবর্ষণের পর পর প্রতিক্রিয়ায় ট্রলির ওপর কামান সহজে পিছু হটে যেতে পারতো। তা ছাড়া টেনে নিয়ে নতুন গোলা বারুদে আগুন দেবার ব্যাপার ছিল। অধিনায়কের হুকুমে শত কামান একই সঙ্গে গর্জে উঠতো সবগুলো দূরে একটি শত্রু জাহাজের পাশের দিক লক্ষ্য করে। পরে ড্রাই ডকের মিউজিয়ামের হলঘরে সিনেমাতেও এরকম যুদ্ধের দৃশ্য দেখলাম। কিন্তু সেই সঙ্গে কল্পনা করে নিতে হলো এই সব বহু শত গোলন্দাজ ওই অন্যান্য সৈন্য এবং সাধারণ নাবিকরা যখন ঘুমাতে গিয়েছেন তখন এই কামানের ফাঁকে ফাকেই তাঁদেরকে ঝোলা বিছানায় শুতে হয়েছে। নিজের বিশ্রামের জন্য তেমন কোন জায়গা ও সামান্যতম একটু একাকী হবার সুযোগ তাঁদের ছিলনা। যুদ্ধের সময় প্রায় ৮০০ মানুষের বাস এই জাহাজে থাকতো দূর সমুদ্রে। আরো নিচের ডেকে খাদ্যরসদ, গোলা বারুদ সংরক্ষিত এবং কাছেই যুদ্ধের সময় আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা, অ্যাডমিরাল ও অন্যদের যুদ্ধ পরিচালনার স্থানটিও আপাতত সেখানে চলে যেতো। আমরা কিন্তু এত নিচে যেতে পারলামনা, কারণ সেখানে সংরক্ষণের কাজ চলছিলো।

কাটি সার্ক। পালের জাহাজের যুগের একেবারে শেষ দিকে এসে বাষ্পীয় জাহাজের সঙ্গে এক রকম সেয়ানে সেয়ানে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে পারছিলো কিছু জাহাজ– সেগুলোকে বলা হতো ক্লিপার। প্রতিযোগিতায় যেই দিকে তারা বেশি ভাল করছিলো তা হলো দূরপাল্লার যাত্রায় একটানা উচ্চ গতিবেগ। এরই একটি চমৎকার উদাহরণ সর্বসাধারণের দেখার জন্য রাখার সুবাদে আমারো দেখা হয়েছে, সে জাহাজটির নাম কাটি সার্ক। এমন একটি জাহাজকে তার পূর্ণ গরিমায় দেখতে পারাটি কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়।

ক্লিপার জাহাজগুলো বেশ কিছু দিক থেকে আগেকার ঐতিহ্যবাহী পালের জাহাজ থেকে ভিন্ন– যেমন ভিক্টোরি'র থেকে। এগুলো আগাগোড়া কাঠের তৈরি হতোনা, লোহার কাঠামোকে কাঠ দিয়ে ছেয়ে এগুলো তৈরি হতো। তাদের সামনে যে উদ্দেশ্যটি ছিলো তা অনেক ওজন নেবার ক্ষমতা নয় বরং সীমিত ওজন নিয়ে কত দ্রুত এগুতে পারে সেটি। দুই পাশে V অক্ষরটির মত কোণ করে ওঠা এবং সামনে-পেছনে বেশ সরু হয়ে থাক এই গঠনটি ক্লিপার জাহাজের দ্রুতগতি হওয়াকে সাহায্য করেছে। দ্রুতগতির আরেকটি বড় উপায় হলো পালের সর্বোচ্চ ব্যবহার। ক্লিপার জাহাজে যত পাল একসঙ্গে খাটানো হতো যে দূর থেকে একে পালে পালে ঢাকা দেখা যেতো। ১৮৬৯ সালে নির্মিত কাটি সার্ক খুব সফল কাজ করেছে চীনের সঙ্গে চা বাণিজ্যে, এবং পরে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে পশম বাণিজ্যে। এর মধ্যে সুয়েজ খাল খুলে দেয়ায় চীনের পথে বাষ্পীয় জাহাজগুলোর তুলনামূলক অনেক সুবিধা হয়ে গিয়েছিলো, তাই নিজের কৃতিত্বটি কাটি সার্ককে অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়াআসা করে দেখাতে হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত বাষ্পীয় জাহাজের জয় সব ক্ষেত্রেই হয়, এবং কাটি সার্ককে ১৯২২ এর পর দূরপাল্লায় নাবিক প্রশিক্ষণের কাজেই শুধু ব্যবহার সম্ভব হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৪ সালে একে একটি মিউজিয়াম জাহাজে পরিণত করে লন্ডনের কাছে গ্রীনিচে ড্রাই ডকে রাখা হয়। ২০০০ সালের পর এখানে রাখা কাটি সার্কের অবক্ষয় চরমে পৌঁছে এবং কয়েকবার আগুন লাগার ফলে এর অবস্থার আরো অবনতি হয়েছে। একে ভাল করে দেখার সুযোগ তাই অনেক সীমিত করে ফেলা হয়েছে সংরক্ষণের খাতিরে। কিন্তু তার আগে আমি যখন এটি দেখেছি তখন দেখার ভাল সুযোগ ছিল।

কাটি সার্কে প্রধান ডেকটায় গেলেই বোঝা যায় এ জাহাজের সব কিছু পরিকল্পিত হয়েছে গতির দিকে লক্ষ্য করে। মাস্তুলগুলো পার হয়ে পেছনে কোয়ার্টার ডেকের ও পশ্চাদ-কুঠির দিকে গেলেই বোঝা যায় সব কিছুকে নিচু ও চাপা রাখা হয়েছে গতির সুবিধার জন্য। এমন ভাবে সব আয়োজন করা হয়েছিলো যেন মাত্র ৮-১০ জন নাবিক আর কয়েকজন অফিসার দিয়েই পুরো পথ পাড়ি দেয়া যায়। কম ওজনের দামি পণ্য পরিবহন করাটাই যখন লক্ষ্য সেজন্য মানুষ ও পণ্য উভয়ের ওজন ও স্থান সীমিত রেখে জাহাজকে

যথাসম্ভব ছিমছাম করা হয়েছে। দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় ওই অল্প কয়েকজন কী ভাবে বসবাস করতেন তার একটি ধারণা জাহাজ থেকে পাওয়া যায়। এমনকি জাহাজের খোলের তলা যেন পানির সঙ্গে ঘর্ষণের কারণে গতিতে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সে জন্য তলটি তামা-দস্তা মিলিত ধাতুর পাত দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। ঘর্ষণ সৃষ্টির বড় কারণ হলো জাহাজের তলায় শ্যাওলা জমা। কাটি সার্কের ক্ষেত্রে তামা সমুদ্রের পানিতে খুব সামান্য একটু একটু করে ক্ষয় গিয়ে তলার গায়ে যে রাসায়নিক পরিস্থিতি তৈরি করে যে তাতে শ্যাওলা জমতে পারেনা।

যেই গ্রীনিচে কাটি সার্ককে রাখা আছে সেখানেই রয়েছে বিখ্যাত রয়্যাল গ্রীনিচ মান মন্দির বৃটিশ জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল ও নৌ-বিজ্ঞানের কেন্দ্র ভূমি। পালের জাহাজের বিশ্বজয়ের সঙ্গে এখানকার অর্জনগুলো ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত। এই মানমন্দিরের সামনে একটি উত্তর-দক্ষিণ রেখাকে শেষ অবধি পৃথিবীর মূল-মধ্যরেখা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা। তাই জাহাজীরা পূর্ব-পশ্চিম বক্র রেখায় পৃথিবীর ঠিক কোন জায়গায় আছেন যখন নির্ণয় করতে চান তখন শুধু একটি ঘড়িতে গ্রীনিচের স্থানীয় সময় বজায় রাখেন এবং তাকে জাহাজের স্থানীয় সময়ের সঙ্গে তুলনা করেন যেটি আকাশ দেখেই ঘড়িতে ঠিক করে দেয়া যায়। এভাবে বোঝা যায় জাহাজ গ্রীনিচের সেই মূল-মধ্যরেখা থেকে কত মাইল পূর্বে অথবা পশ্চিমে রয়েছে। গ্রীনিচ টাইমের এজন্যই এতো গুরুত্ব। এর আগে পৃথিবী আরো কিছু কিছু বিখ্যাত শহরকে মূল-মধ্যরেখার স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যুগে যুগে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্রীনিচ তথা লন্ডনেরই জয় হয়েছে। ওখানে মাটিতে একটি জায়গায় উত্তর-দক্ষিণ একটি সরল রেখা কিছুটা পেতলের পাত সেঁটে চিহ্নিত করা আছে। ওখানে দাঁড়িয়ে এক পা পূর্ব গোলার্ধ আর অন্য পা পশ্চিম গোলার্ধে রেখে ফটো তোলাই নিয়ম।

আর্টের ঝিলিক

জীবনটি যাপনের মধ্যে ঝিলিক হয়ে আসা

বিকল্পের সন্ধানঃ

মানুষ নিজের জীবনকে দু'ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। একটি হলো গতানুগতিকতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে। অন্যটি হলো জীবনটি যাপনের ভেতরেই নানা কিছুর বিকল্প খোঁজার ব্যবস্থাটিও রেখে। প্রথমটিতে প্রতি মুহূর্তে শুধু তাৎক্ষণিক সুখ-চিন্তায় আত্মতৃপ্তি সামনে আসে যা আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টিতে মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে অনুধাবনের ব্যাপার আছে এর কি অন্যথা কোথাও হয়েছে? অন্য কারো ক্ষেত্রে হয়েছে? এমনকি কল্পনায়ও হতে পারে? সে ক্ষেত্রে সবার আনন্দ কি বেড়েছে, নাকি কারো জন্য কমেছে, এমনকি দুঃখের সৃষ্টি করছে? গতানুগতিক যে জীবনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি ওই বিকল্পে কি তার মধ্যে আরো বেশি 'সৌন্দর্য' সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে? ওই দ্বিতীয় প্রকার জীবন যাপনে যে বিকল্পগুলো খোঁজা হয় বা সৃষ্টি করা হয় সেগুলোই আর্ট। ব্যাপারটি আমরা লক্ষ্য করতে পারি যখনই কোন আর্টে আকৃষ্ট হই– কবিতা বা উপন্যাস পড়ি, শিল্পীর আঁকা ছবি দেখি, গান শুনি তখন সে বিকল্পই খুঁজি। আবার নিজেই নিজের মত করে এই আর্টগুলোর মত কিছু সৃষ্টি করার চেষ্টা করি তখন আরো নিবিষ্ট ভাবে ওই বিকল্পেরই সন্ধান করি।

মানুষ মাত্রই জীবনে ওই বিকল্প, ওই আর্টের ছোঁয়া পেতে চায়; গতানুগতিক জীবন কেউ পছন্দ করেনা। অনেকে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই অপছন্দের জীবনটাই কাটাতে বাধ্য হয়, অধিকাংশ সময়। কিন্তু তাঁরাও যেটুকুই সম্ভব আর্টকে খুঁজে নেন। সেকেলে পল্লী জীবনের খুবই খাটাখাটনি ও ঘরে বন্দী জীবনে গৃহবধুও যখন কয়েকটি অবসর মুহূর্তে তাঁর সূচিকর্ম নিয়ে বসেন, তিনিও তাই করেন। কেউ বলতে পারেন এখানে বিকল্প কোথায়, সূচিকর্মটির মধ্যে তো নতুন কোন আইডিয়া নেই, একই রকম গাছের শাখায় পাখির ছবি, আর পাশে ভাঙ্গা ভাঙ্গা অক্ষরে লেখা আছে 'যাও পাখি বলো তারে, সে যেন ভুলেনা মোরে'। কিন্তু ভুললে চলবেনা যে এ গাছ, তার

ডালপালা, ওই পাখি এগুলো অন্য সাধারণ সব গাছ-পাখি নয়, এটি এক বিশেষ পল্লীবধূর হাতের স্পর্শে সৃষ্টি হওয়া খুবই বিশিষ্ট– কথাটাও নেহাৎ সবার কথা নয়, ওই স্পর্শে ওটিও নিতান্তই তাঁর কথা হয়ে ওঠেছে। ওই সূচিকর্মের মুহূর্ত ক'টাতে এবং পরে যখনই এই সৃষ্টিটির ওপর চোখ বুলিয়েছেন তখনই তিনি গতানুগতিকতাকে ভুলে গিয়ে একটি বিকল্প জীবন যাপন করেছেন– যেখানে একান্তই তাঁর সূচিকর্মে সৃষ্ট পাখির সঙ্গে তিনি কথা বল্‌তে পারেন এবং অনুপস্থিত দূরের যে মানুষটিকে না ভুলার বার্তা দিচ্ছেন তাকে অনুভব করতে পারেন। তিনি যদি ছবিটির কোণায় তাঁর নামটিও সূচিকর্ম করে দেন সবাই ছবিটিতে ওই গৃহবধূর সৃষ্টি হিসেবে জানবেন, মোটিফে অন্য ছবির সঙ্গে মিল থাকলেও।

আর্ট একটি আকাঙ্খা, নিজেকে অন্যত্র নিয়ে যাবার আকাঙ্খা। এজন্য হয়তো পুরো জগতটাকেই অন্য ভাবে ভাবতে দ্বিধা হয়না আর্টিস্টের। যাঁরা তাঁর গানটি শুনে, কিংবা ছবিটা দেখে, কিংবা মূর্তিটা নেড়েচেড়ে তাঁর সেই আকাঙ্খায় শরীক হোন তাঁরাও নিজেকে অন্যত্র নিয়ে যেতে পারেন, অন্তত খানিকটা। এই যে অন্যত্র নিয়ে যাবার কথা বলছি তার মানে একটি অভিনবত্বের আশা করছি। সব থেকে বড় কথা দুনিয়াকে দেখার নতুন একটি দৃষ্টিভঙ্গির আশা করছি। যে জিনিসের মধ্যে এমন অভিনবত্ব বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আশা করা যায়না তাকে আর যাই বলি আর্ট বলা যায়না। এক ভাবে দেখতে গেলে সত্যিকার অর্থে কোন কিছুতে মানুষের হাত পড়লে তার মধ্যে কিছুটা হলেও আর্ট সৃষ্টি না হয়ে উপায় নেই এটি সাধারণ কাজের জিনিস হলেও। যেমন একটি মাটির কলস যদি মানুষকে তৈরি করে নিতে হয় কাজের জন্য সে চেষ্টা করে এটি সুন্দর হোক, এটি শিল্প সম্মত বা নান্দনিক হোক। মানুষ যখন একটু ফুরসৎ নিয়ে কথা বলেছে তখন তাতে অনুপ্রাস ব্যবহার করেছ, ছন্দ ব্যবহার করেছে, মজা করে বলার চেষ্টা করেছে। আর্ট সৃষ্টি যেন মানুষের ডিএনএ'র মধ্যেই আছে। বিকল্প খোঁজার আকুতি মানুষের মজ্জাগত। কিন্তু যেহেতু অভিনবত্বই তার প্রাণ, তাই সব সময় তার মধ্যে আলাদা একটি ঝিলিক আমরা দেখতে পাই। সেদিনের জাহাজী জীবনের গল্পে তার পরতে পরতে এই ঝিলিক আমরা দেখেছি, অন্য সব কিছুর সঙ্গে মিশে গিয়ে– প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, ঐতিহ্য সব কিছুর সঙ্গে। আসলে এমন ঝিলিক

আমাদের সাধারণ জীবনকেও জড়িয়ে, সব কিছুর সঙ্গে। তবে তাকে উচ্চকিত করার জন্য আগ্রহ দরকার, চর্চার দরকার।

চর্চা ও অর্জনের জিনিস হিসেবে আর্ট:
সাধারণ দৈনন্দিন আটপৌরে বাস্তব জিনিসগুলোর মধ্যে থেকেই আর্টের প্রতি আমাদের ঝোঁকের সৃষ্টি হয়। কাজেই শুরুতে গতানুগতিক জীবনের সঙ্গে শিল্পময় জীবনের পার্থক্যটি এত বেশি থাকেনা। সাধারণ একটি বাজারের ফর্দ লেখার সময় একটু সুন্দর অক্ষরে সুন্দর বিন্যাসে লিখলাম, কেন তা করলাম– নেহাৎ ভাল লাগালো বলেই করলাম। এখানে আটপৌরে কাজের থেকে এর খুব বড় পার্থক্য হয়তো কেউ দেখবেনা। কিন্তু ঝোঁকটি ওখানেই প্রকাশিত হয়ে যায়। এই সামান্য পার্থক্যকে বড় পার্থক্যে নিয়ে যাবার কাজটি ঘটে চর্চার মাধ্যমে– আনন্দের চর্চা।

মন যখন প্রফুল্ল থাকে তখন ধরা যাক সাধারণ একটি কথাকে একটু টেনে সুরেলা ভঙ্গিতে বল্‌লাম। অথবা ছন্দ মিলিয়েই বল্‌লাম, সেটি মামুলি ব্যাপার। সেটি বেশি সুরেলা হলে বার বার হয়তো পুনরাবৃত্তিতে ভাল লাগবে। হয়তো গানের মধ্যে কথাগুলোকেই খেয়াল করি বেশি, অবশ্য সেই সঙ্গে সুরকেও। এক সময় কথা আর দরকার হয়না শুধু সুরটাকেই ভাঁজি। এমনকি যে কোন একটি ছোট্ট কথাকে নানা ভাবে বার বার সুরে ভাঁজি যার সর্বোত্তম উদাহরণ দেখি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে। এখানে কী হচ্ছে? সাধারণ দৈনন্দিন কাজ থেকে আর্টের চর্চাটি ক্রমে বিযুক্ত হয়ে যাচ্ছে, আর্ট নিজের পায়েই নিজে দাঁড়াচ্ছে। এভাবেই আর্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট বা বিমূর্ত হয়। বিমূর্ততাটি আর্টের মর্ম কথা। ক্যামেরা দিয়ে একটি দৃশ্যের ফটো তুলি তখন দৃশ্যটির ওপর আলো-ছায়ার খেলায় দৃশ্যটিকে সুন্দর ফুটিয়ে তুলতে পারি– তার মধ্যে গাছগাছড়া, গাছের ডালে পাখি, নিচের টলটলে পানি; এই ফটোটি সুন্দর একটি শিল্পকর্ম হতে পারে। কিন্তু এর গাছ, পাখি, পানি সব যখন বাদ দিয়ে বা অগুরুত্বপূর্ণ হয়ে শুধু আলো-ছায়ার খেলাটাই থাকে আর তাই যদি দর্শকের মনে কোন অভিনবত্ব, কোন বিকল্প ভাবনার জন্ম দিতে পারে তখন তা হয়ে ওঠে আরো বড় শিল্পকর্ম- অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট। এটি 'অ্যালিস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড' বইটির সেই চেশায়ার ক্যাটের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই বেড়ালটির একেবারে গাল লম্বা করা হাসিটিই তার আসল পরিচয়। অ্যালিস দেখলো এক সময় শুধু

হাসিটিই রইলো, বেড়াল অদৃশ্য হয়ে গেছে। ওই অ্যাবস্ট্রাক্ট হবার অর্থই হলো শুধু একেবারে সারাৎসারের ওপর গুরুত্ব দেয়া, সব বাহুল্যকে বাদ দেয়া। যেমন এই উদাহরণে এক পর্যায়ে গিয়ে আর্টিস্টের মনে হতে পারে ওই গাছ, পাখি, পানি এসব তাঁর কাজের জন্য বাহুল্য, শুধু আলো-ছায়ার খেলাটাই হলো সারাৎসার। অবশ্য এটি একটি ধারাবাহিক ব্যাপার– সব আর্টিস্টের এক্ষেত্রে তা একই রকম মনে নাও হতে পারে। যেমন কারো হয়তো মনে হবে ওই পাখিটিই পুরো ব্যাপারটির সারাৎসার– সব মনোযোগের, আনন্দের, অভিনবত্বের, বিকল্পের উৎস ওই পাখিটির মধ্যে, হয়তো তিনি ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার বলে প্রাণীটিই তাঁর কাছে আসল। গাছ নয়, পানি নয়, আকাশ নয়, পাখিটিই আসল। অবশ্য সফল হতে হলে তাঁকে তাঁর আর্ট-ফরম দিয়ে দর্শকের মনেও ওই প্রতীতী জন্মাতে হবে পাখিটিই একটি বিকল্প জগতের ঝিলিক দিয়ে আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাচ্ছে। সেই অর্থে অ্যাবস্ট্রাকশন সব আর্টেরই মর্মকথা।

তাই আর্টের চর্চার মানে হলো ওই ঝোঁকটি– মামুলি বিষয়টিকে অতিক্রম করে অভিনবত্বের দিকে, নতুন অন্তর্দৃষ্টির দিকে যাওয়া। এটি মহা কঠিন কোন ব্যাপার নয়, সব মানুষের মধ্যেই ঝোঁকটির বীজ রয়েছে, এখন তাকে যত্ন করে প্রতিপালন করলেই আর্ট সৃষ্টি হতে পারে, এবং আর্ট উপভোগ করার পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। প্রতিভাবানরা হয়তো কম চর্চাতেই চট্ করে সেই অভিনবত্বকে এমন একটি উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেন, অন্যরা বহুদিনের চর্চায় সৃষ্টির ও উপভোগের ক্ষমতা অর্জন করেছেন। ওই চর্চার মধ্যে কিছু পরিশ্রম আছে, অ আ ক খ থেকে শুরু করে শেখার আছে, যদিও এক্ষেত্রে এগুলোকে ভালবাসার শ্রম বলা যায়, কারণ আর্টের প্রতি ভালবাসাই কষ্ট করে শেখার ও চর্চার মধ্যে আর্টিস্টকে নিয়ে যাবে। এই শেখাটি যত সংকীর্ণ পরিসরে হবে, তত তার কার্যকারিতা কম হবে– পরিসর বড় করার অর্থ হলো অ আ ক খ থেকে শুরু করে এর পরের উপাদানগুলো আসা উচিত উন্মুক্ত বিশ্ব থেকে, ইতিহাস থেকে, বিজ্ঞান থেকে, মানব-সম্পর্ক গুলো থেকে। নইলে সেই শেখার জিনিসগুলো আর্টের কারিগরি কৌশল ঠিকই দেবে, কিন্তু তার বৃহৎ বিশ্ব-পটভূমিটি দেবেনা।

ধরা যাক আমি একটি প্রত্ন খনন কেন্দ্রে গিয়ে ছবি আঁকছি। প্রত্ন-ভূমির মধ্যে যে দৃশ্যগুলো আছে তা এমনিতেই যথেষ্ট চমকপ্রদ হতে পারে– এরকম জায়গার ছবি এঁকে আমি ঠিকই অনেক হাত পাকাতে পারবো। কিন্তু যদি এটিই আমার শেখার ও চর্চার পছন্দের ক্ষেত্র হয় তা হলে মানব-বসতের ইতিহাস সম্পর্কে এবং তা উদ্ঘাটনে প্রত্নতত্ত্ব যে বৈজ্ঞানিক কৌশলগুলো ব্যবহার করে সে সম্পর্কে বাস্তব এবং রোমান্টিক উভয় রকম একটি সম্পর্ক গড়ে তোলা আর্টিস্টের ছবিকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে। প্রত্ন-ভূমিতে একটি মাটির ডিবির, একটি দেয়ালের, একটি হাতিয়ারের গুঢ় অর্থটি তাঁর ছবিতে কোন না কোন ভাবে ফুটে ওঠবে। তাছাড়া ভুল্‌লে চল্‌বেনা আর্টের প্রায় সব দিক জুড়ে বিজ্ঞানের একটি বড় জায়গা রয়েছে– শুধু প্রযুক্তির নয় যেমন আর্টিস্টের রঙটি কেমন ভাবে তৈরি হচ্ছে শুধু সেটি নয়, তারও মূলে যে বিজ্ঞান রয়েছে সেটিই দরকার। প্রযুক্তিতে অ্যাবস্ট্রাক্ট কিছু নেই, কিন্তু বিজ্ঞানের মর্মবাণীর অনেকটাই অ্যাবস্ট্রাক্ট– বাহুল্য বর্জিত হয়ে সারাৎসারের দিকে তাকে যেতে হয়।

অন্যদিকে বিজ্ঞান যত এগিয়েছে তত অল্প থেকে অল্পতর মূলনীতির ভিত্তিতেই প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলেছে– যার অনেকগুলোই গাণিতিক অর্থাৎ কিনা অ্যাবস্ট্রাক্ট। বিজ্ঞান সেটি করেছে প্রকৃতির সারাৎসার পেতে, আমাদের পরিচিত আর্টগুলো চেয়েছে মানব মনের সারাৎসার পেতে– উভয়েই অ্যাবস্ট্রাক্ট হবার মাধ্যমে। এখন বিজ্ঞান মানব মনের বিশ্লেষণেও হাত বাড়িয়েছে। তাই সম্পর্কটি বেড়ে গেছে অনেক। আর্টের চর্চা যত বেশি বিজ্ঞানের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে যেতে পারবে তত তার সার্থক হবার সম্ভাবনা বাড়ে। আর মাথার মধ্যে আর্টের অভিনবত্বটি যতই ঝিলিক দিয়ে যায় তাকে আমাদের উপভোগ্য করে প্রকাশ করতে হলে শেষ পর্যন্ত প্রযুক্তিও একটি বড় উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। মুদ্রণ প্রযুক্তি, ক্যামেরা প্রযুক্তি, কম্পিউটার প্রযুক্তি একাজটি যুগে যুগে করেছে। বর্তমান বিশ্বকে যতভাবে বোঝা গেছে তার ওপর নাড়ি দেখার মত বিজ্ঞানের আঙ্গুলটি রাখতে পারলে আর্টের মাধ্যমে তার অভিনবত্বগুলোকে আবিষ্কারের কাজটি সহজ হয়ে যায়। এই বইয়ে এপর্যন্ত যতটুকু দেখেছি তাতেই এর প্রচুর উদাহরণ পেয়েছি; সামনের অধ্যায়গুলোতে আরো অনেক পাবো।

ভিশ্যুয়াল আর্ট বা দর্শন করার মত আর্টের উদাহরণ নিয়ে যদি বলি যে কোন আঁকিবুকিতে, ছবিতে, ফটোতে বা সলিড কোন বস্তুতে আমরা যদি কোন প্রতিসাম্য দেখি– কোন এক ভাবে ঘুরিয়ে দেখলে একইটি আবার ফেরৎ পাই, ডানের সঙ্গে বামের, এই কোণের সঙ্গে ঐ কোণের সাদৃশ্য দেখি; পুরো জিনিসটির মধ্যে যদি একটি ভারসাম্যের ভাব থাকে– তখনই যেন একটু পুলক অনুভব করি, ভাল লাগার ভাব যেন জন্মে। এটি আসলে আমাদের মস্তিষ্কের খেলা, মস্তিষ্ক এই প্রতিসাম্যটিকে তার প্রতি একটি 'পুরস্কারের' মত মনে করে। নান্দনিকতার সৃষ্টি ওখান থেকেই। এই যে ভাল লাগার ভাবটি মস্তিষ্কে সৃষ্টি হয় শিল্পী এটি নিয়েই কাজ করেন– একে কীভাবে বাড়ানো যায়; শুধু তাই নয় এর থেকে দর্শককে কী একটি অভিনব বার্তা দেয়া যায়। হয়তো এরকম আদর্শ ও নিয়ম মানা পৃথিবীটাই সেই বার্তা, যা দর্শকের পুলকিত ভাব অভিনব ভাবে আরো বাড়িয়ে দেয়। তবে অনেক সময় শিল্পী একেবারে উল্‌টো বার্তা দিতে চান্, তিনি জোর করে প্রতিসাম্যকে কোন এক জায়গায় ভেঙ্গে দেন্, হয়তো বল্‌তে চান যে দেখো এ সমাজে কী হচ্ছে, এখানে এখনো অন্য ছদ্মাবরণে দাস প্রথা রয়ে গেছে, চল আমরা এর প্রতিবাদ করি, অথবা হয়তো অন্য কোন অসঙ্গতি। নান্দনিকতা দিতে গিয়েও তিনি তা প্রত্যাহার করেন, এতে নান্দনিকতা নষ্ট হয়, কিন্তু আর্ট বেঁচে থাকে– দারুণ ভাবে দর্শককে নাড়া দিয়ে আর্ট তার কাজ করে।

যা ভিশ্যুয়াল আর্টের জন্য সত্য তা অন্য সব আর্টের জন্য সত্য– তার 'আর্টটি' এভাবেই দর্শককে নাড়া দেয় মুগ্ধ করে অথবা অস্থির করে তোলে। সেটি সঙ্গীত হতে পারে, নাটক হতে পারে, সাহিত্য হতে পারে– যে কোন আর্ট হতে পারে। যেমন সাহিত্য সুযোগ নেয় ভাষার ওপর কারুকার্য করার, যেই ভাষা আমাদের চিন্তার বাহন, আমাদের মস্তিষ্কের উচ্চতর কগ্‌নিটিভ ক্ষমতার বাহন– যেমন অন্যের মন বোঝার ক্ষমতা। আদিতে ছিল গল্প বলার অদ্ভুত আর্ট, এর মধ্যে লিপি এবং মুদ্রণ এসে একই হুবহু আর্টটিকে নিয়ে গেলো দ্রুত কোটি মানুষের হৃদয়ে। এটি রীতিমত সংক্রামক– সবাই তাই কবিতা লেখার চেষ্টা করে, গল্পও লেখে অন্তত তরুণ বয়সে, অথবা জীবনের কোন সময়, অনেকে সারা জীবন। গল্প-কবিতা লেখাও ছবি আঁকার মত প্রতিসাম্য সৃষ্টি করা, আবার প্রতিসাম্য ভেঙ্গে দেয়া। এসবের সৌকর্যে সাহিত্যিক চেষ্টা করেন পাঠকের মনকে নাড়া দিতে, নিজের বার্তাটিকে

পাঠকের মনে জায়গা করে দিতে। এর জন্য তাঁকেও সংকীর্ণ পথে হাঁটলে চলেনা বিশ্ব থেকে উপাদান আনতে হয়– ইতিহাসই হোক আর বিজ্ঞানই হোক। যেমন একটি কবিতায় জীবনান্দ দাসের উদ্দেশ্য ছিল সবাইকে বনলতা সেনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া, সেই সুবাদে ওই সাধারণ নারীর মধ্যে যে কী অসাধারণ অভিনবত্ব আছে তাও বলতে চেয়েছেন তিনি। 'এতদিন কোথায় ছিলেন'– কথাটি উচ্চারণ করেই যে অসংখ্য পাঠকের মনকে চিরতরে নাড়িয়ে দিতে সক্ষম তিনি। হয়তো ওই পাঠকদের জীবন আর কোনদিন গতানুগতিকতায় ভেসে যাবেনা। কিন্তু এটি করতে গিয়ে কবিকে বিশ্বের মধ্যে প্রচুর বিচরণ করতে হয়েছে আগে। 'বিম্বিসার আাশোকের ধূসর জগতটা' যে কী তার ছবিটি পাঠকের মনে জাগিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হয়েছে; অথবা 'দারুচিনি দ্বীপের ভেতর' জাহাজ চালিয়ে যেতে হয়েছে। এগুলো কিছু অর্থহীন শব্দাবলী মোটেই নয়, বরং এগুলো প্রত্যেকটি এক একটি আলাদা জগত– স্থানের আর কালে পরিসরে– যেগুলো কবি হৃদয় দিয়ে অনুভব করে এসেছেন জীবনের বহু কাল ধরে; আজ হঠাৎ করে বনলতা সেনের চিন্তায় শুধু নয়, বরং নিজের শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস চর্চার অংশ হিসেবেও। যদি শুধু কৌশলী শব্দ চয়নই হতো তা হলে বনলতা সেন কালজয়ী হতোনা।

এক সময় আমরা কিছু কিছু বিষয়কে মানবিক বিষয় অথবা আর্টস বিষয় বলে নিশ্চিন্ত থাকতে পারতাম– যেমন ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, এমনকি মনোবিদ্যাকেও। সেটি কিন্তু এখন আর চলেনা। এর প্রত্যেকটি এখন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এবং বিজ্ঞানের চর্চার সঙ্গে ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িত। ইতিহাসের সব কিছুকে এখন বৈজ্ঞানিক কৌশলেই অনুসন্ধান করতে হচ্ছে সেটি ডিএনএ বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে। স্পষ্ট তথ্যগুলো বিজ্ঞানের সহায়তায় মুক্তি পেলে তবেই তার ওপর আর্টস কাজ করতে পারছে। মানব মনে কোন্ প্রবণতাগুলো সেই তথ্যের পেছনে কাজ করেছিলো তার রঙীন ছবি আঁকায়? দর্শনের কথায় যদি আসি জ্ঞানের বৈধ উৎস ঠিক করার ব্যাপারে দর্শনের উদ্বেগ প্রায় হুবহু বিজ্ঞানের উদ্বেগের মতই এবং গণিত জিনিসটাই বিশুদ্ধ লজিকে বলে প্রমাণিত হবার মাধ্যমে দর্শন ও বিজ্ঞান প্রায় একই বৃন্তে দুই ফুলের মতই হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থনীতি যতই গণিত ও তথ্য প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করছে ততই তার চরিত্র বদলিয়েছে।

অবশ্য তার থিওরিগুলোর ভবিষ্যদ্বাণীর যে বাস্তবের সঙ্গে মেলানো যায়না, এবং বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিতরা তার থেকে যে অনেক দূরে থেকে যায় সেটি এখনো একে অমোঘ কোন নিয়মের অধীনে না দেখে বরং আর্টের মত প্রাসঙ্গিক সবার মননের ব্যাপার হিসেবে দেখার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। কাজেই ওটি আর্টস আর সায়েন্সের মধ্যে দোলা খেতেই থাকবে।

যে কোন আর্টিস্টকে তাঁর পছন্দ করা মাধ্যমটির অ আ ক খ নিয়ে প্রাথমিক কসরতগুলো করতেই হয়। এর ফলে তাঁদের প্রথম আঁকা রেখাগুলো, গানের সারেগামা'র সুর, কিংবা প্রথম কবিতার দুটি পংক্তির মিল সৃষ্টির যে আনন্দ সেটিই তাঁদেরকে এগিয়ে নেয়। আর্টের চালিকা শক্তিই তো সৃষ্টির আনন্দ, অথবা সৃষ্টিকে উপভোগ করতে পারার আনন্দ- হাঁটি হাঁটি পা পা করেই যে কোন আর্ট-অনুরাগীকে এই চমকপ্রদ সুদূরের পিয়াসী ভূবনের দিকে যেতে হয়।

জীবনের সঙ্গে মিশিয়েই শুরু:

জীবনকে গতানুগতিকতায় ভেসে যেতে না দেবার আটপৌরে উপায় হলো আর্টকে দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে নিয়ে আসা। আজকাল তা করার বহু সুবিধা, যদিও আগেও যে নানা কিছু সুবিধা ছিলনা তা বলা যাবেনা। স্কুল জীবনের পাঠ্যপুস্তকে পড়ার পর সাহিত্যের সঙ্গে যদি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, এ যোগাযোগ আবার শুরু করে দেয়া যায় নিয়ম করে কিছুক্ষণ পছন্দের সৃজনশীল সাহিত্যের বই পড়ে। আগের যুগে তা বই কিনে বা পাবলিক লাইব্রেরীতে গিয়ে অনেকে পড়তো। এখন নিজের স্মার্ট ফোনে কয়েকটি ডিজিটাল বই নামিয়ে পড়া শুরু করে দিলেই হলো। এরপর আরো আরাম করে পড়ার জন্য আগের মত বই কেনা, ডিজিটাল রীডার ব্যবহার করা, অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারলে অডিয়ো বই শোনা ইত্যাদি সব কিছুই করা যেতে পারে। হয়তো দেখা যাবে এভাবে যে কেউ নীরবে একজন সাহিত্যানুরাগী হয়ে ওঠেছেন, বুক ক্লাবের আলোচনা শুনছেন, হয়তো তাতে যোগও দিয়েছেন। আরো বড় কথা নিজে লেখালেখি করার অভ্যাস করছেন, তার প্রশংসা ফেইসবুক বন্ধুদের কাছ থেকে পেতে আরম্ভ করেছেন।

যেহেতু আপনার মোবাইল ফোনেই ভাল ক্যামেরা আছে তাই সেটি শুধু পারিবারিক উৎসবের ছবি তোলায় ব্যবহার করবেন কেন। ইউটিউবে বা গুগল সার্চে আর্ট ফটো তোলার বা যে কোন ফটো তোলার জন্য যে অসংখ্য পরামর্শ পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে নিজে নিজে সে রকম ছবিও তুলতে আরম্ভ করুন না কেন। শুরুতে সেটি করবেন আপনি খুব ভাল ছবি তুলছেন সেজন্য নয়, আপনার মধ্যে ভিশ্যুয়াল আর্টের উন্মেষ ঘটাবার জন্যই করবেন। দেখবেন দিনে দিনে ফোনের স্ক্রীনে দুনিয়ার বিখ্যাত ফটোগ্রাফারদের ছবি আপনি অনেক্ষণ ধরে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে দেখছেন, অনেক আনন্দ পাচ্ছেন।

আর্ট বলতে সচরাচর যা বুঝি তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকারও কোন প্রয়োজন নেই। শুধু সাহিত্যে, ভিশ্যুয়াল বা দৃশ্য সৃষ্টির আর্ট অর্থাৎ চিত্রশিল্প, ফটোগ্রাফি, ভিডিয়োতে, ভাস্কর্যে; অথবা পারফর্মিং বা করে দেখানো আর্ট অর্থাৎ সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক, সিনেমাতে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে কেন। ইতিহাসের উপাদান খুঁজতে বের হয়ে গেলে কেমন হয়, অথবা আমাদের আশপাশে নিজ দেশের বা বিদেশের নানা সংস্কৃতির যে মানুষদের বাস তাদের সংস্কৃতির নানা দিক পোষাক, ভাষা, উৎসব, রান্নার ইতিহাস ইত্যাদির মধ্যে আর্টের ওই অভিনবত্ব ওই নাড়া খাওয়া ঘটনাগুলো আবিষ্কারের চেষ্টা করিনা কেন? এর সবকিছুর এবং আরো অনেক কিছুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে চমৎকার সব আর্ট লুকিয়ে আছে যার মাধ্যমে নিজের জীবন এবং অন্যের জীবনে দুনিয়াকে দেখার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে পারি। শুধু মেশামেশির মাধ্যমেই এটি শুরু করতে পারি। এর ফলে প্রথমেই আমাদের যে চেতনাটি আসবে তা হলো যাকে আমরা নেহাত নিয়মবদ্ধ আটপৌরে কাজ মনে করতাম সেখানেই রয়েছে নানা সৃষ্টি নানা বৈচিত্র– সেটি রান্নাই হোক আর পোষাকেই হোক।

নিজের কাজের অবকাশেই এর অনেক কিছু করা যায়। আর্ট গ্যালারিতে বা মিউজিয়ামে সুযোগ পেলেই যাওয়ার অভ্যাস যে রকম অনেক দুয়ার খুলে দিতে পারে তেমনি গানের অনুষ্ঠানে, বইয়ের দোকানে, প্রতিবেশী ভিন্ন সংস্কৃতির বন্ধুর পারিবারিক আয়োজনে যাওয়ার এবং ঔৎসুক্য প্রকাশের অভ্যাসও অনেক দুয়ার খুলে দিতে পারে। রাস্তা দিয়ে চলার সময় একটি চমৎকার ভবন চোখে পড়লো– মনে হলো এর স্থাপত্যের মধ্যে নতুন কিছু

বৈশিষ্ট আছে যা আগে আমার চোখে পড়েনি। সময় থাকলে রাস্তা পার হয়ে কিছুক্ষণ ভবনটির এদিক-ওদিক থেকে দেখে কাটাতে পারি। ও ভাবে একটি নতুন দৃশ্য বা ছবি বা মূর্তি যদি চোখে পড়ে সেটিও দেখে উপভোগ করতে পারি। হয়তো তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সন্ধান মিলতে পারে নতুন কোন আর্টের। এ ধরনের আর্ট নিয়ে সম্প্রতি যা পড়ছি একে তার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারি। শুধু তাই নয় দোকানের ডিসপ্লেতে যদি নতুন কোন ডিজাইনের কোন পণ্য লক্ষ্য করি, সেটি যদি আমাকে আকর্ষণ করে তা হলে সেটি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দেখে উপভোগ করতে ক্ষতি কী? এমনি করেই প্রায় অলক্ষ্যে ছোট ছোট ধাপে আমি আর্ট বোদ্ধার সিঁড়িটি আরোহণ করতে পারি। এভাবে কখন যে কেউ নিজে নিজেই আর্টের একজন সমালোচক হয়ে ওঠেছেন তা তিনি বুঝতেও পারবেননা, তা নানা জিনিসের ডিজাইন দেখে, কিংবা নানা ভবনের বা পাবলিক ভাস্কর্যের সৌকর্য দেখে থেকে।

সেই সিঁড়ি আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মধ্যে আরো একটি পরিবর্তন লক্ষ্য করবো। আগে যে পছন্দ না হওয়া আর্টের মত কিছু দেখলে সঙ্গে সঙ্গে তার থেকে ঘুরে যেতাম, সেটি আর করছিনা। আগে সঙ্গে সঙ্গে যে বলতাম– দূর এটি আবার কিছু হলো নাকি, এটি তো একটি গ্রাম্যতা, এর মধ্যে আর্ট কোথায়, অথবা এটি অদ্ভুত আকৃতির ছ্যাবলামি, অথবা এই আবোল তাবোল থেকে কিচ্ছু বোঝা যায়না কিছু বোঝাবার চেষ্টাও এতে নেই– এমন আর বলছিনা। এসব ক্ষেত্রে একটু ধৈর্য ধরলে দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত অনেকগুলোতেই আমার পূর্ব সিদ্ধান্ত বদলাতে হয়েছে– তাই ওরকম দেখামাত্রই কোন জিনিসকে বাতিল করে দেবার অভ্যাস আর থাকছেনা। কোন একটা আর্ট বুঝবোনা এমন ভয় করারও কোন কারণ নেই– সেটিকে বার বার দেখে বোঝার চেষ্টাটুকুই শুধু দরকার। সেই সঙ্গে ভাল সমালোচকরা কী বলছেন তা লক্ষ্য করে। হ্যাঁ প্রত্যেক আর্টের কিছু ব্যাকরণ আছে বৈ কি যা ওই লেখাজোকা থেকেই সহজ ভাবে শেখা যেতে পারে। কিন্তু আর্টকে উপভোগ করার জন্য তার ওই খুঁটিনাটি ব্যকরণ বুঝতেই হবে এমন কোন কথা নেই– ভাল লাগলেই হলো। আরো সার্থক যদি সেটি আমার দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনে, মন-মানসিকতায় একটি ঝাঁকুনি দেয়। ওটিই আমার গতানুগতিক জীবনের অবসান– বিশ্বকে নতুন নতুন আঙ্গিকে দেখার শুরু, যেখানে আমি আরো অনেকের সাহচর্য অনুভব করতে পারি, যাদের কথা

কখনো ভাবিনি তাদেরও। অনেকের সমব্যাথী হয়ে তাদের পক্ষে দাঁড়াতেও পারি।

আর্টের আবহ

বিশ্বপট: এলিয়েন থাকলে তারা কী ভাবছে?

যেই অর্থে আর্ট মাত্রই বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে আমাদের যুক্ত হবার প্রয়াস তা এক রকম কাল্পনিক মানসিক সংযোগ। এখন পুরো মহাবিশ্বের যে ছবি সর্বশেষ স্পেস টেলিস্কোপ থেকে সরাসরি আসছে তা দুর্দান্ত সব আর্টের জন্ম দেবার সম্ভাবনা রাখে– এর কোন কোন ছবি মহাবিশ্বের একেবারে প্রান্ত অঞ্চল থেকে আসছে। আর্টের দ্যোতনায় যখন এই ছবিকে উপভোগ করবো তখন এই ছবি কিসের, কেমন করে সৃষ্টি হলো, কত বড় জায়গা কী দূরত্ব এতে দেখাচ্ছে সেই সব উপলব্ধি আর্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ হবে।

এই মহাবিশ্বের খুবই নগণ্য একটি জায়গা পৃথিবীতেই আমাদের বসবাস সীমাবদ্ধ– তা সত্ত্বেও আমরা পুরো মহাবিশ্বকে সায়েন্সে-আর্টে ধারণ করছি। কিন্তু এত বড় মহাবিশ্বে শুধু কি আমরাই তা করছি। বিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কারগুলো বলছে হুবহু আমাদের পৃথিবীর মতই প্রাণীর বাসযোগ্য গ্রহ এখানে অসংখ্য আছে এবং সমস্ত যুক্তি বল্‌ছে সেখানে মানুষের মত বা ভিন্ন রকমের উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণী ওসবের বেশ কিছু জায়গায় থাকাটাই স্বাভাবিক। এজন্য সার্চ ফর এক্সট্রাটেরেসট্রিয়াল ইন্টেলিজেন্স (সেটি) নামের একটি গবেষণা প্রকল্প বহুদিন ধরে চল্‌ছে। এতে আশা করা হচ্ছিলো যে পৃথিবীর বাইরে এমন বুদ্ধিমান প্রাণী থাকার উচ্চ সম্ভাবনা। তা হলে আমরা যদি শক্তিশালী রেডিয়ো গ্রাহক যন্ত্র আকাশব্যাপী তাক করি তবে ওই এলিয়েনদের নিজেদের ব্যবহৃত রেডিয়ো সিগ্‌ন্যাল আমাদের কাছে কোনটি না কোনটি ধরা পড়বে যাতে বোঝা যাবে যে এর পেছনে বুদ্ধিমান প্রাণী আছে। এতে এখনো সাফল্য না আসাতে এলিয়েনদের উপস্থিতিটি বাস্তবে নিশ্চিত করা যায়নি। কিন্তু একই সঙ্গে আমাদের গবেষণা এ কথা নিশ্চিত করেছে যে আমাদের নিজেদের অনেক রেডিয়ো টেলিভিশিন ও অন্যান্য সম্প্রচার পৃথিবীর বাইরে দূরে চলে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের নানা তথ্য এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের নমুনা। সেটি সম্ভাব্য এলিয়েনদের হাতে ইতোমধ্যে চলে যাওয়াটিও বিচিত্র নয়– অর্থাৎ আমরা এলিয়েনদের সম্পর্কে

কিছু না জানলেও তারা আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানে– হয়তো আমাদের সায়েন্স, আর্টস আর মনের খবরের।

এ নিয়ে প্রায় ৪০ বছর আগে সত্তরের দশকের শেষে একটি গবেষণা হয়েছিলো, আর এখন সম্প্রতি ২০২৩ সালে একই রকম আর একটি গবেষণা হয়েছে। উভয়ের তুলনামূলক ফলাফল বলে দিচ্ছে আমাদের কী খবর বাইরে কতখানি যাচ্ছে সেই বিষয়টি গত ৪০ বছরে অনেক বদলে গেছে। ৪০ বছর আগে আমাদের ব্যাপক ব্রডকাস্টিংগুলোর প্রায় সবই হতো রেডিয়ো ও টেলিভিশনকে কেন্দ্র করে; সবই পৃথিবীর দর্শক-শ্রোতাদের জন্য হলেও দেখা গেছে তার বেশ খানিক 'লীক' করে পৃথিবীর বাইরে চলে গেছে। এসব ব্রডকাস্টিং এর যে পাওয়ার তাতে এই লীক করা খবর বেশ দূরের সব গ্রহের এলিয়েনদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা। আমাদের সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, দৃশ্যাবলী সব মিলে যাবতীয় আর্টস ও কালচার নিয়ে মানুষ প্রজাতির সম্পর্কে যথেষ্ট একটি ধারণা এভাবে তারা পেয়ে গেছে। তাছাড়া পৃথিবীতে আমাদের কারা কোথায় থাকে সেটিও তারা বুঝতে পেরেছে। কোথায় এই সিগন্যাল ঘন হয়ে আছে অর্থাৎ অসংখ্য রেডিয়ো টিভি ষ্টেশন নিয়ে উন্নত মহানগরীগুলো কোথায় ঘন হয়ে আছে তা দেখে বুঝতে পেরেছে- সেগুলো উন্নত জায়গা; আর কোথায় তা খুব পাতলা একেবারে বিরান, সেগুলো অনুন্নত জায়গা।

বর্তমান ২০২৩ সনের গবেষণাটি কিন্তু ভিন্ন চিত্র দিচ্ছে। এখন রেডিয়ো-টিভির ওরকম 'লীক' করাটি অনেকখানি কমে গেছে কারণ সেগুলো এখন ক্যাবল টিভি এবং ইন্টারনেট নির্ভর হয়ে গেছে– অধিকাংশ ক্ষেত্রে। আগের মত শক্তিশালী রেডিয়ো-টিভি ব্রডকাস্ট এখন নেই, তাই এলিয়েনরা এদিক থেকে খবর পাচ্ছে কম। কিন্তু তাই বলে খবর পাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়নি, আমাদের সব আর্ট এখন মোবাইল ফোনে, স্মার্টফোনে এর দোর্দণ্ড প্রতাপ। দু'ভাবে এগুলো যোগাযোগে যায়– সরাসরি মোবাইল থেকে মোবাইলে টাওয়ারের মাধ্যমে, অথবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে। ওই টাওয়ার থেকে যে ব্রডকাস্ট সেটিই এখন বাইরে লীকের বড় জায়গা। তাছাড়া আমাদের পৃথিবীর ঠিক বাইরে আমাদের অনেকগুলো কৃত্রিম উপগ্রহ ঘুরছে এবং তাদের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে, এদের সঙ্গে যোগাযোগের সিগন্যালগুলো আরো সহজে মহাবিশ্বে লীক হচ্ছে। এই গবেষণায় অবশ্য গুরুত্ব দেয়া হয়েছে

মোবাইল ফোন টাওয়ারকে– এদের সম্পর্কে যতটুকু তথ্য আছে গাণিতিক মডেলে ফিট করিয়ে সব টাওয়ারের সার্বিক অবস্থা তার থেকে জানা সম্ভব হয়েছে। ৪০ বছরে আগের চিত্রটি একেবারে বদলে গেছে– টাওয়ারের সংখ্যা বা ঘনত্বে উন্নত ও অনুন্নত বিশ্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই কারণ মোবাইল ধনী গরীব সব দেশে সর্বত্র জনপ্রিয়। অতীতে পার্থক্যটি আসছিলো লীকেজের কারণ রেডিয়ো-টিভি হওয়াতে, এখন মোবাইল যখন লীকেজের বড় উৎস পার্থক্যটি আর নেই। তাছাড়া লীক করা সিগন্যাল মহাবিশ্বে ১০ আলোক বর্ষের থেকে বেশি দূরে পৌঁছেনা। এখানটায় যে ক'টি গ্রহ আছে তাতে এলিয়েন থাকলে তবে তারা আমাদের আর্টের খবর পাবে। কম দূরে যাওয়ার কারণটি হলো অধিকাংশ মোবাইল এখনো 4G তে আটকে আছে। কিন্তু যখন সবাই 5G তে চলে যাবো তখন পরিস্থিতি একেবারে বদলে যাবে; মোবাইলে আমাদের যে যাবতীয় আর্টের আকর তা খুব সম্ভব তখন আরো বহু দূরের এলিয়েনদের কাছে পৌঁছে যাবে– খুব উন্নত দেশেরগুলোর যেমন যাবে আমাদেরগুলোও একই ভাবে যাবে।

বেঁচে থাকার আর্ট:

আর্ট হলো জীবনের মানকে উঁচু করার প্রয়াস– বলতে পারি শুধু গতানুগতিক জীবনে বাঁচা নয়, বাঁচবার মত বাঁচতে চাওয়ার প্রয়াস। বাঁচাটাই যেখানে সংকটাপন্ন সেখানে গুণ বিচারের সুযোগ কোথায়? কিন্তু আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ, রোগের চিকিৎসা এগুলো তো আর্টের বিষয় নয়, সায়েন্সই পারে সেখানে কিছু করতে– তা হলে বেঁচে থাকাটি আর্ট হলো কী ভাবে? দেশে দেশে গড় আয়ু এবং গড় স্বাস্থ্যের তুলনা করে সাম্প্রতিক (২০২৩) কিছু গবেষণার ফলের মধ্যে এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

এ গবেষণায় ১৯৭০ থেকে ২০২২ এই দীর্ঘ সময়ে একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের এবং অন্যদিকে জাপান, কানাডা ও ইউরোপীয় কয়েকটি উন্নত দেশের গড় আয়ুর গ্রাফের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখিত সবগুলো দেশে গড় আয়ু ক্রমান্বয়ে বেড়ে গেছে এই সময়; কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সে বৃদ্ধি ঘটেছে অন্যদের থেকে কম হারে এবং সব সময় যুক্তরাষ্ট্রের গড় আয়ু অন্য দেশগুলোর থেকে খানিকটা নিচে থেকেছে; এর মধ্যে সব চেয়ে বেশি নিচে চলে গেছে ২০২০

সালের পর থেকে। এ সময় একটি নিম্নমুখিতা কোভিডের কারণে, বাকি সব দেশেই হয়েছে, কিন্তু সব চেয়ে বেশি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত– কোভিডের মৃত্যু অন্যান্য দেশে প্রধানত হয়েছে বয়োবৃদ্ধদের মধ্যে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে সেটি অনেকটা সমান ভাবে সব বয়সের মানুষের মধ্যে হয়েছে। ওখানে তরুণতরদের অধিক মৃত্যুর কারণ হিসেবে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে স্থূলকায়দের মধ্যে, যাদের হার্টে সমস্যা থাকে, তাছাড়া ড্রাগ আসক্তদের মধ্যে কোভিডে মৃত্যু-ঝুঁকি বেশি থাকে।

ওই গবেষণায় আরো যা দেখা গেলো যুক্তরাষ্ট্রে আয়ুষ্কাল নিচে থাকার একটি বড় কারণ হলো অপঘাতে মৃত্যু, যা তরুণদের মধ্যেই বেশি। উন্নত দেশের ভেতর যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেশি। এর মধ্যে রয়েছে অবোধ্যভাবে বন্দুক দিয়ে গণহারে মানুষ হত্যা এবং আত্মহত্যা– দুটির সঙ্গেই মাদকাসক্তি জড়িত থাকে অনেক সময়। অন্য উন্নত দেশের তুলনায় এখানে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যাও বেশি। জনপ্রতি বন্দুক ও গাড়ির সংখ্যাও এখানে খুবই বেশি। এর অনেক কিছু বেপরোয়া জীবনযাত্রা ও অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি নেবার অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত। স্থূলতার সঙ্গেও সেগুলো জড়িত– ইচ্ছেমত প্রচুর পরিমাণে লবন, চর্বি, মিষ্টি যুক্ত খাবার খেয়ে যাওয়া স্বাস্থ্য-ঝুঁকিকে পরোয়া না করে।

এসব থেকে একটি জিনিস খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে। উন্নত দেশগুলোর মধ্যে প্রায় সব দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে– বিজ্ঞানে, আর্টে, অর্থ সম্পদে, প্রযুক্তিতে, সবকিছুতে। কিন্তু এই একটি জায়গায়– স্বাস্থ্য আর গড় আয়ুতে– এটি পিছিয়ে। মনে হচ্ছে সব আর্টের সেরা সৃষ্টিকাররা এই জীবনরক্ষার মৌলিক আর্টটিতেই পিছিয়ে। তাদের চর্চার মধ্যে নেই বেঁচে থাকার আর্ট। অর্থ-বিত্ত-চিকিৎসার অভাব নেই, ঘাটতি যেখানে তা হলো বেঁচে থাকাটিও যে একটি আর্ট, এর প্রতি একটি সহজাত মায়া থাকার কথা সেটিকেই যেন ওরা অবহেলা করছে। যদি ওই আর্টের ঝিলিকটিও ওরা দেখতে পেতো তা হলে ওই বেপরোয়া জীবন তাদের কাম্য হতোনা।

এমন অদ্ভুত ফলাফল আমরা অন্যত্রও দেখতে পাচ্ছি এমনি সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় (২০২৩) দেখা যাচ্ছে একটি দেশ যার গড় আয়ু সার্বিক ভাবে খুব ভালই বলতে হবে। তার কোন কোন অংশে ওই একই বাঁচার আর্টের প্রতি অবহেলার কারণেই গড় আয়ু ও স্বাস্থ্য পরিস্থিতি অনেক কম

হয়ে রয়েছে। স্কটল্যান্ডের দুটি বড় ও বিখ্যাত নগরের একটি এডিনবরা থেকে মাত্র ৪৬ মাইল দূরে অন্যটি গ্লাসগোতে গেলেই মানুষের গড় আয়ু থেকে বেশ কয়েকটি বছর ঝরে যেতে দেখা গেছে গবেষণায় এমন কথা স্থানীয় গণ-মাধ্যমে দেখা যায়। আর এই গ্লাসগো থেকে এক ঘন্টার বিমান ভ্রমণ করে একই দেশের লন্ডনে গেলে সেই নগরের উচ্চ মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে গড় আয়ু বেড়ে গেছে ১২ বছর! স্পষ্টত সবাই বলবেন এর কারণ গ্লাসগোর আভ্যন্তরীণ নগরীর মানুষের দারিদ্র। কিন্তু এও স্পষ্ট যে যেই দেশে চিকিৎসা সহ সরকারী সুযোগ সুবিধা সবার জন্য সব জায়গায় রয়েছে সে জায়গায় শুধু তুলনামূলক দারিদ্র গড় আয়ু এতটা কমিয়ে দিতে পারেনা।

বিষয়টি যে রীতিমত বেঁচে থাকার আর্টের প্রতি অবহেলা সেটি এখানেও বোঝা গেছে– যে কারণে এর একটি নামই দেয়া হয়েছে 'গ্লাসগো এফেক্ট'। মৃত্যুর বড় কারণ এখানেও অন্য সব জায়গার মতই ক্যানসার, হার্টের রোগ, স্ট্রোক ইত্যাদি– কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আর একটি কারণ সেটি হলো 'হতাশার অবস্থা'। এটি আবার দুটি অভ্যাসের জন্ম দিয়েছে- একটি মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান, আর অন্যটি ধূমপান। মনে হয় এগুলো একটি ব্যক্তিগত পছন্দ হিসেবে এসেছে, কিন্তু তার সঙ্গে একটি সামাজিক নেটওয়ার্কও সৃষ্টি হয়ে যায়– যেখানে মদ খাওয়া, ধূমপান করা বৃহত্তর সামাজিক অঙ্গনের অংশ হয়ে যায়। অদ্ভুত ভাবে অনেকের কাছে ওটিই আর্ট, এমনকি ভুল করে মনে করে ওটিই জীবন যাপনের অভিনব আর্ট! জীবনের সত্যিকার আর্টগুলো এসে এই ভুল ভেঙ্গে না দিলে এর সমাধান হবেনা– দারিদ্র দূর করেও হবেনা, হয়নি।

নতুন আর্ট আবহ– ডিজিট্যাল আর্ট:

কোন আর্টের আবহে প্রায়শ নতুন কোন ধারা যোগ হয়। দৃশ্য সৃষ্টির আর্টে এমনি একটি যোগ হলো ডিজিট্যাল আর্ট। কোন প্রচলিত আর্ট শাখায় এতই অভিনব এরকম রীতি যখন আসে তখন প্রথম দিকে মনোযোগ পেতে কষ্ট হয়। কিন্তু এতে যদি সত্যিকারের ভিন্ন আমেজ থাকে, বক্তব্য প্রকাশের ভিন্ন ও বাড়তি সুযোগ থাকে তা হলে এটিও তার নিজের শক্তিতেই মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। ডিজিট্যাল প্রযুক্তির ব্যবহার করে ফুটিয়ে তোলা ডিজিট্যাল আর্ট ক্রমে অনেকের চর্চার ও উপভোগের বিষয় হয়ে উঠেছে। একটি প্রদর্শনীর

বর্ণনা থেকে ব্যাপারটি বোঝার চেষ্টা করা যাক্। প্রদর্শনীর নাম ‘বিশ্বময় জীব’। এতে যে আর্টগুলো পরিবেশিত হয়েছে তাতে নানা রকম এমন কিছু জিনিসের দিকে মনোযোগ কাড়া হয়েছে যাদেরকে বলা হচ্ছে জীব। কিন্তু সাধারণ জীবনে, এমনকি বৈজ্ঞানিক জগতে আমরা জীব আর জড়ের মধ্যে যে একটি সরল পার্থক্য স্থাপন করেছি শিল্পীর সৃষ্ট এই ডিজিট্যাল জীবে তাঁরা এটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি। বিজ্ঞানের সংজ্ঞায় জীব, সে বড় ছোট যাই হোক না কেন, তার বৃদ্ধি পাওয়ার, খাদ্য হজম করার নড়াচড়া করার, বংশবৃদ্ধি করার ইত্যাদি গুণ দেখেই তাকে আমরা জড়ের থেকে আলাদা করি। চিত্রশিল্পী যখন জীবের ছবি আঁকেন তখনো তিনি জীবের এই গুণগুলোই ক্যানভাসের ওপর নানা কৌশলে ফুটিয়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। ডিজিট্যাল শিল্পী কিন্তু আলোর প্রক্ষেপন, বিশেষ ধরনের আওয়াজ বিশেষ ভিডিয়ো দৃশ্য এসব ব্যবহার করে তাঁর মত করে জীবকে– উদ্ভিদ, ফাঙ্গাস, প্রাণীকে– দেখাতে চান সম্পূর্ণ অন্য রকম কিছু একটা ডিজিট্যাল জীব হিসেবে। একে জীব হিসেবে আমাদের মনোজগতে গ্রাহ্য করার জন্য যেন আমাদের অনুভূতিটিকেই বদলে দেবার চেষ্টা করেছেন– বাস্তবে দেখার সময় যে অনুভূতি, কিংবা ক্যানভাস, তুলি, রং দিয়ে চিত্রশিল্পী যে অনুভূতি সৃষ্টি করেন, তার থেকে ভিন্ন অন্য এক অনুভূতি; যাতে করে এই অদ্ভুত জিনিস গুলোরও এক রকম জৈব গুণ আমাদের কাছে অনুভূত হয়।

প্রদর্শনীতে ‘আদিতম’ নামের একটি আর্টে একটি খালি ক্যানভাস একটু উঁচু জায়গার ওপর থেকে নিচে ভূমিতে নেমে এসে যেন সেখানে একটি হাঁটার রাস্তায় পরিণত হয়েছে। ক্ষুদ্র এককোষী একটি জীবাণু অনুবীক্ষণে বড় করে দেখলে যে রকম দেখায় অনেকটা সে রকম দেখতে একটি জীব যেন নরম হয়ে গলে গিয়ে যেন ওই হাঁটা পথরূপী ক্যানভাসের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে ঘরের ভেতরের দিকে। এর অনেক কিছুই সৃষ্টি করা হয়েছে নানা দিক থেকে আলোর প্রক্ষেপনে। শেষেরটুকুতে যেভাবে ধীরে গড়িয়ে, ঠেকে ঠেকে এগিয়েছে সেই সঙ্গে যে রকম আওয়াজ শোনা গেছে তার সব কিছুতে প্রথম আসার, প্রথম অভিজ্ঞতা পাওয়ার একটি ভাব ওই প্রবাহিত জীবাণুর জন্য শিল্পী সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। এমন ভাব দিতে চেয়েছেন পাহাড়ী ঝর্ণার যেমন প্রথম নদী হয়ে গড়িয়ে আসা সে রকম এই প্রথম কোন কিছুর একটি আত্মা নিয়ে সন্তর্পনে দুনিয়াতে আবির্ভাব– সবই শিল্পীর মনের

মাধুরী মেশানো ব্যাপার, কিন্তু তিনি দর্শকের মনে জীবনের প্রথম আবির্ভাবে অনুভূতিটি সৃষ্টি করার আশা করেছেন ওই কাল্পনিক আদিতম জীবের মাধ্যমে। প্রদর্শনীর আরেকটি আর্টের নাম 'ইনফিনিটি' (অসীম)। এই কাজটির ব্যাপ্তি খুব বড়। এতে নানা রকম কাল্পনিক ডিজিট্যাল জীবের চলাচল দেখা যায় একটি বড় ইলেক্ট্রনিক পর্দার ওপর, যেটি পুরো প্রদর্শনী ঘর জুড়ে ঘুরে এসেছে। এটি যেন কখনো শেষ না হওয়া একটি পথ। এই পথে ছোট্ট জীবগুলো এমন ভাবে চল্‌ছে যেন একটি ব্যস্ত নগরীর রাজপথে অফিসগামীরা যে ভাবে হন্তদন্ত হয়ে চলেন কখনো হেঁটে, কখনো পাতাল রেলে, কখনো বাসে যেভাবে ছুটতে থাকেন অনেকটা সেই ভঙ্গিতে। কিন্তু ওরকম অদ্ভুত দর্শন জীবাণুগুলোতে হন্তদন্ত ছোটাটা বোঝা যায় কী ভাবে? এজন্য নানা কৌশল নেয়া হয়েছে– কোনটার লম্বা চুল পেছনে উড়তে দেখে বোঝা যায় জীবাণুটি ছুটছে, কোনটার হঠাৎ হঠাৎ খাড়া হয়ে যাওয়া আবার কুঁচকে দলা পাকানো হয়ে যাওয়া দেখে গতি বোঝা যায়, এমনি ভাবে বিভিন্নটার। ভিড়ের মধ্যে অনেকগুলো ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, উঠে আবার চল্‌ছে। ভিড় থেকে বের হয়ে অন্যদের পাশ কাটিয়ে ছুটতেই সবাই যেন বদ্ধপরিকর। শিল্পী বোধ হয় দেখাতে চেয়েছেন এটিই জীবের নিয়তি, একক ভাবে এর একটির কোন গুরুত্ব নেই, ওই ভিড়ের মধ্যেই তার পরিচয়, ওই ছোটাতেই তার সার্থকতা। এই আর্টটি প্রথম প্রদর্শিত হয়েছিলো দক্ষিণ কোরিয়ার একটি সত্যিকার সাবওয়ে ষ্টেশনে। ওখানে ষ্টেশনে ট্রেনের জন্য এবং ট্রেন থেকে নামা যাত্রীদের সার্বক্ষণিক ছোটা জীবনের নিয়তির প্রতি আর্টের মাধ্যমে মন্তব্য করাটাই হয়তো এই ইনফিনিটি প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য ছিল।

'ভবিষ্যতের তুমি' আর্টটিতে দর্শক নিজেকেও আর্টের অংশ করে তোলেন। তাঁর সামনে একান্ত তাঁর নিজস্ব একটি ডিজিট্যাল আয়না থাকে সেটি চালু করলে তিনি তাঁর নিজের প্রতিচ্ছবি আয়নায় দেখতে পান। তবে সেই প্রতিচ্ছবি তাঁর সত্যিকার রূপ নয়, তাঁর কোন অন্য রূপকল্প। একেবারেই রোবট জাতীয় কাউকে এনে আয়না যেন বলছে এটিই ভবিষ্যতের তুমি। আয়নাটি পুনর্চালু করলে এবার দর্শকের আরেকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপকল্প সৃষ্টি হয় আয়নায় প্রতিচ্ছবি হিসেবে। এভাবে বার বার একই দর্শকের বিভিন্ন ভবিষ্যৎ রূপকল্প, নানা রোবট বেশে আয়নায় আসতে থাকে। এক সময় তাঁর

জন্য বরাদ্দ সময় শেষ হয়ে গেলে আয়নাসহ প্রতিচ্ছবিটি উবে যায়। কিন্তু নতুন যতবার দেখা হয় তার প্রত্যেক প্রতিচ্ছবি কিন্তু প্রত্যেক দর্শকের জন্য অনন্য– কোন দুই দর্শকের জন্য একই রূপকল্প আসেনা। মানুষের সত্ত্বা ভবিষ্যতে বেশি বেশি করে রোবট-সদৃশ হবে, আর তা হবে বহুরূপী, যেন এমন একটি বক্তব্য আর্টের মাধ্যমে দিতে গিয়ে শিল্পী ডিজিটাল প্রযুক্তির পূর্ণ ব্যবহার করেছেন। প্রদর্শনীর দুটি আর্ট 'মেশিন লার্নিং' এবং 'স্বাধীনদের বাড়ি' যেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মানুষের সম্ভাব্য সম্পর্কের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য দিচ্ছে। প্রথমটিতে মানুষ নৃত্যশিল্পী একজন রোবট মেশিনের সঙ্গে দ্বৈত নাচ নাচছে। শুরুতে রোবট আড়ষ্ট, কিন্তু যতই নাচ এগিয়েছে ততই যেন ওই মেশিনের দেহে মানবিক আর্ট সঞ্চারিত হয়েছে– যেন মানুষের জীবন্ত কোরিওগ্রাফিই পারে মেশিনকে শিখিয়ে তার উপযুক্ত করে নিতে। 'স্বাধীনদের বাড়িতে' যথারীতি একটি ফ্যাশন শোতে ওয়াকওয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে মানুষ নয়, নানা ডিজিট্যাল জীবরা। তারা হাঁটছে ফ্যাশন শোতে ক্যাটওয়াকের মত করে খুব সগর্বে– অথচ তাদের গায়ে কোন পোষাকই নেই, পোষাক নয় তারা নিজে নিজেই একশ'। ওয়াকওয়ের পাশে দর্শকের চেয়ার সাজানো আছে, সেখানে কোন মানুষ নেই। মানুষ না দেখলেও তারা নিজেরাই নিজেদের ফ্যাশন শোতে– স্বাধীন। ওরা ডিজিট্যাল জীব তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তারই নানা রূপ। এই দুই আর্ট মিলে যেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দুই ভিন্ন সত্ত্বাকে দেখিয়ে দিচ্ছে এ মানুষেরই সৃষ্টি, কিন্তু এ মানুষের থেকে স্বাধীনও বটে। প্রথমটিতে স্বাধীন ভাবে প্রতিফলন দিচ্ছে, দ্বিতীয়টিতে স্বাধীন ভাবে ক্যাটওয়াক করছে।

মোটের ওপর প্রদর্শনীটি জীবের ও জীবনের উদযাপন– প্রকৃত জীবের বাইরে গিয়ে সেই জীবকে শিল্পী অভিনবত্ব দিয়েছেন। সেই অভিনবত্ব দর্শককে ওই উদযাপনকে ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গিতে করারা সুযোগ দেবে সেটিই তাঁর আকাঙ্খা। ডিজিট্যাল প্রযুক্তির নানা সুযোগের সদ্ব্যবহার করে সেই অভিনবত্বকে শিল্পীরা তুঙ্গে নিয়ে গেছেন।

নতুন আর্ট আবহ– পডকাস্ট:

'আই-পড' এবং 'ব্রডকাস্টিং' এই দুটি শব্দকে মিশিয়ে ২০০৪ সালের দিকে 'পডকাস্ট' নামক যে শব্দটি তৈরি করা হয়েছিলো একটি নতুন প্রযুক্তির নাম

হিসেবে। সেটিতে রেডিয়োর বক্তব্যকে ইচ্ছেমতো যে কোন সময় শোনার জন্য জমিয়ে রাখা যায় আই-পডের গানের মত। ক্রমে রেডিয়োকে ছাড়িয়ে এটি নিজেই নতুন এক আর্ট মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। গল্প বলার আর্ট থেকে শুরু করে এটি যে কোন বিষয়ে যাঁরা কথা বলতে চান আর যাঁরা সে কথা শুনতে চান তাঁদের জন্য চমৎকার সুযোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একবার এর স্বাদ পাওয়ার পর এবং এর বিচিত্র বিষয়-ব্যাপ্তির সঙ্গে পরিচিত হবার পর অনেকের পক্ষে এর মধ্যে রীতিমত ডুবে থাকা ছাড়া আর উপায় ছিলনা। আর্টের এমন ফুলঝুরি আর কোথায় এমন হাতের কাছে পাবো? এর পুরো ব্যাপ্তিটি আবিষ্কারের পর মনে হলো বিজ্ঞানের ও আর্টের যত রকম আলোচনায় আমার মন নেচে ওঠে তার সব রকম সবগুলোকেই যেন খুঁজে পাচ্ছি নানা পডকাস্টে। সেখানে এগুলোর বিশেষজ্ঞরা এবং বিষয়গুলো প্রাঞ্জল করে বলতে সক্ষম অনেকে তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার কথা বলে যাচ্ছেন। কখনো কখনো উপস্থাপনা হচ্ছে সত্যিকার ঘটনাস্থলে, পেছনের যাবতীয় শব্দের মধ্য দিয়েই তা শোনা যাচ্ছে। কখনো আসল মানুষটিই উপস্থাপন করছেন, ব্যাখ্যার প্রয়োজনে অন্যদের কাছেও যাচ্ছেন। আবার অন্যগুলোতে পডকাস্টটি একজন সাংবাদিক গোছের উপস্থাপকের। বিষয়বৈচিত্র এত বেশি যে কোন্‌টি ছেড়ে কোনটি শুনি এমন পরিস্থিতি– নিমিষেই অন্য জগতে নিয়ে যেতে পারে, যেখানে আমার প্রিয় বিষয়ের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষ্যকারের কাছ থেকেই সব শুনতে পারবো। স্বাভাবিক ভাবেই যত বেশি শুনতে চাই ও মুহূর্তে সে সময় নেই, তাই বইয়ের ক্ষেত্রে আমরা যা করি, পডকাস্টের একটি নিজস্ব লাইব্রেরী তৈরি করে রেখেছি– সময় করে এক সময় শুনবো বলে।

এখন দুনিয়াতে পডকাস্টের একটি সংস্কৃতিই গড়ে ওঠেছে– এ নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা বিভিন্ন আর্টের জন্য আলাদা আলাদা। গতানুগতিকতার রাজ্য থেকে সহজে ছুটি নেবার জন্যই যেন এই সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে, যে কেউ যোগ দিতে পারে। এ সংস্কৃতির একজন ধারক লরেল প্যাসেল সম্প্রতি বলেছেন যাঁরা এখনো পডকাস্টের স্বাদটি ঠিক মত পাননি তাঁদেরকে যদি নানা স্বাদের এক গুচ্ছ পডকাস্টের সন্ধান দেয়া হয় তাহলে এর মধ্যে কোন না কোনগুলোর প্রেমে পড়ে যাবার সম্ভাবনা প্রচুর। এরপর তিনি যে নিজেই নিজের অনুসন্ধানে হারিয়ে যাবেন তা বলাই বাহুল্য। এ জন্য পডকাস্টের ১২টি সিরিজের কথা তিনি পছন্দ করে দিয়েছেন। এর মধ্যেই

যত বিভিন্ন আর্টের বৈচিত্র এতে আছে তা লক্ষণীয় এবং তেমনি সায়েন্সের ও জনগুরুত্বপূর্ণ আরো বিষয়ের। এর মধ্যে আছে 'দিস আমেরিকান লাইফ'- সমসাময়িক আমেরিকার ঘটনাবলীর নিয়ে চমকপ্রদ আলোচনা। 'রিস্ক'– ঝুঁকি নিয়ে দুর্দান্ত সব কাজ। '৯৯% ইনভিজবল'– যে সব জিনিসে পরিবেষ্টিত হয়ে আছি তার ডিজাইন। 'উলজিস– নানা বিষয়ের বিজ্ঞান। 'ওয়েলকাম টু নাইট ভেইল'– অদ্ভুত ভৌতিক সব গল্প। 'ব্ল্যাঙ্ক চেক'– যে সব সিনেমার পরিচালকরা রীতিনীতির বাইরেই সৃজনশীল। 'সং-এক্সপ্লোডার'- গায়কের সঙ্গে বসে প্রতিটি গানের ব্যবচ্ছেদ। 'মিডনাইট বার্গার'- সায়েন্স ফিকশন আদলের গল্প। 'রেডিয়োল্যাব'– গল্পের ভঙ্গিতে বিজ্ঞান ও দর্শন। 'স্ন্যাপ জাজমেন্ট'– গোয়েন্দা গল্প। 'প্লানেট মানি'– অর্থনীতির জটিল বিষয় জমা করে। 'স্মাটনেস'- গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সাক্ষাৎকার। যেই চিন্তায় যাদের জন্য প্যাসেল এই ১২টি পডকাস্ট সিরিজকে বাছাই করেছেন সেই এখনো স্বাদ না পাওয়াদেরকে, আমি তাদের মধ্যে পড়িনা। তবুও একটু অবাক হয়েই দেখলাম অসংখ্য পডকাস্টের মধ্যে কিছুটা ব্যক্তিগত পছন্দের মত করে প্যাসেলের বাছাই করা ওই ১২টির মধ্যে ৪টি আমার ছোট লাইব্রেরীটাতেই আছে, আমার নিজের পছন্দের মধ্যে। ওই চারটি হলো দিস আমেরিকান লাইফ, ওলজিস, রেডিয়োল্যাব, এবং প্লানেট মানি। এর প্রত্যেকটির থেকে একটি পর্ব বা পর্বের অংশ নিলে অন্তত আমার পছন্দের পডকাস্টের কিছু নমুনা পাওয়া যাবে।

'অন্যদের জীবন'। দিস আমেরিকান লাইফের এই পর্বটিতে মানুষে মানুষ জীবনের অদ্ভুত কিছু সম্পর্কের সত্য ঘটনার গল্প বলে। উতাহ রাজ্যের একটি ছোট শহর থেকে একটি ইমেইল পেয়ে সেখানে একজন মহিলা সাংবাদিককে পাঠানো হয়েছে ওখানকার একটি অদ্ভুত ব্যাপার সম্পর্কে যথাসম্ভব খবর নিতে। সারা শহর জুড়ে খবরটি নীরবে সৃষ্টি হয়েছিল ওই শহরের তরুণ একজন পশু-ডাক্তার ড আর্টজ। অথচ যে ক'জন মানুষের পোষা পশুর চিকিৎসা করেছেন তাঁদের সঙ্গে ছাড়া শহরের পর কারো সঙ্গে তাঁর সামনা সামনি আলাপ কখনো হয়নি বল্‌লেই চলে। সাংবাদিক কিন্তু কিছু মানুষের সঙ্গে আলাপে বুঝলেন এখানকার অনেক মহিলা, গৃহিনী ও অন্যান্যরা তাঁর সম্পর্কে এমন একটি ফ্যানটাসী ধরনের আকর্ষণ পোষণ করেন যা একমাত্র টীন এইজার মেয়েদেরকেই মানায়। সবাই জানেন ভদ্রলোক খুবই সাধারণ

ভাবে চলেন একটি মোটর সাইকেলে খদ্দেরদের বাড়ির অসুস্থ পোষা কুকুর বেড়ালের চিকিৎসা করতে। কিন্তু তাঁদের কল্পনায় তিনি মাঝে মাঝে নিজের ঘোড়ায় চড়ে চলেন, খুব আর্টের সঙ্গে প্রতিদিন ভোরে কফি বানান এবং কফি হাতে তাঁর কুটিরের মত ঘরের পেছনের দাওয়ায় বসে সূর্যাস্ত দেখেন। এর মানে এই নয় যে তাঁদের কেউ তাঁকে দেখার চেষ্টা করেছেন বা তাঁকে নিয়ে বেশি কিছু জানেন– সবই কল্পনা। অথচ আকর্ষণগুলো অদ্ভুত– অনেক মহিলাই তাঁর নাম ইন্টারনেটের পাসওয়ার্ডে ব্যবহার করেছেন নানা ভাবে, অনেকে তাঁর নামে শুভেচ্ছা কার্ড বানাচ্ছেন নিজের হাতে সেটিতে তাঁর ছবি সাজিয়ে। আলাদা আলাদা ভাবে নানা মহিলা ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে সাংবাদিক এসব জানতে পেরেছেন। শুরুতে কেউ তেমন কিছু বলতে চাননি কিন্তু এক কথা দুই কথার পর, সাংবাদিক মহিলা কিছুটা অন্তরঙ্গ হলে আস্তে আস্তে মুখ খুলেছিল। দেখা গেল যাঁর কাছেই যান অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর মনে ড. আর্টজ সম্পর্কে ফ্যানটাসী আছে। যাঁরা এসব করছেন তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পরস্পরকে চেনেন না, যা করছেন একা নিজের কল্পনায় করছেন। সব শেষে সাংবাদিক গেলেন স্বয়ং ড আর্টজের সঙ্গে দেখা করতে। তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছে আসল কথাটি কী ভাবে পাড়বেন সেটি ভেবে, আদৌ ড. আর্টজ এর কতটুকু জানেন তাও কথা। তিনি এই অদ্ভুত ব্যাপারটি কিছু কিছু আঁচ করেছেন, তবে একে তেমন গুরুত্ব দেননা, শুধু নীরবে নিজের কাজ করে যান। পাড়ার চার্চে এবং মাঝে মাঝে পাড়ার লাইব্রেরীতে যাওয়া ছাড়া কোন পাবলিক জায়গায় তিনি কদাচিৎ গিয়েছেন– সেখানেও মনে হয়েছে কেউ কেউ তাঁকে নিয়ে কথাবার্তা বলছে, তবে কেউ যে শুধু তাঁকে দেখতে এসেছেন মনে হয়নি। সবই দূর থেকে, সবই ফ্যান্টাসীতে। নানা মহিলার কল্পনার কথা যা শুনেছিলেন মনে মনে যেন তার একটি চেক লিস্ট নিয়ে যেন ড আর্টজের কাছে এসেছিলেন সাংবাদিক।

হ্যাঁ, তাঁর ঘরটি কুটিরের মতই, হ্যাঁ তিনি মোটর সাইকেলেই চলেন, না ঘোড়া তাঁর নেই; তাঁর মায়ের আর তাঁর কফি খুব যত্ন করে তৈরির একটি প্রবণতা ছিলো, এখনো কখনো সময় পেলে মনোযোগ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পারকোলেট করেন কফি, না সূর্যোদয় দেখার সুযোগ হয়না ভোরে কাজ থাকাতে, তবে প্রায়ই কফির কাপ নিয়ে রোয়াকে বসে সূর্যাস্ত দেখার চেষ্টা করেন– সেই চৌবাচ্চা, সেই রোয়াক সব কতবার কত মহিলার মুখে শুনেছেন

সাংবাদিক। ড. আর্টজের জানা মতে কেউ এসব দেখার কোন সম্ভাবনা নেই। তাঁর সম্পর্কে অনেক স্পষ্ট জিনিস কেউ জানে বলে মনে হয়না। যেমন তিনি অত্যন্ত রসিক মানুষ সারাক্ষণ পেট ফাটা হাসি হাসেন। খদ্দেরদের থেকে পাওনা টাকা তুলতে সারাক্ষণ তাঁকে গলদঘর্ম থাকতে হয়। সব থেকে জরুরি খবরটাই তো কেউ জানে বলে মনে হয়না, তিনি শিগ্‌গির বহু দূরে পীট্‌সবার্গে চলে যাবেন, কারণ ওখানে তাঁর মা গুরুতর অসুস্থ, তাঁর স্ত্রী ও কুকুরটি ইতোমধ্যেই চলে গেছেন সেখানে।

ওলোজিস। পডকাস্টার পুরো নাম ওলোজিস উইথ অ্যালিস ওয়ার্ড। ওলোজি কথাটি জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক শাখার নামের শেষে থাকে যেমন বায়োলোজি, জিয়োলোজি, সোশিওলোজি ইত্যাদি। প্রত্যেক পর্বেই অ্যালিস ওয়ার্ড থাকেন উপস্থাপিকা– তাঁর কাজ হলো প্রত্যেক পর্বে যিনি বিশেষজ্ঞ অতিথি থাকেন তাঁর কাছ থেকে বিষয়টি খুবই শিল্পসম্মত ভাবে বুঝে নেয়া। যে পর্বের উদাহরণটি নিচ্ছি– তাতে স্টেম সেল সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ সামান্থা ইয়াস্মিন নিজে বিজ্ঞানকে সরল ভাবে পরিবেশনের জন্যও যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী। এই পরিবেশনটিও যে একটি আর্ট তা ওয়ার্ড আর ইয়াস্মিন এই দুই মহিলা তাঁদের কথোপকথনে চমৎকার ভাবে প্রমাণ করেছেন। প্রশ্ন উঠলো স্টেম সেল কী ধরনের কোষ? সন্তানের যখন সবে শুরু সেই প্রাথমিক কোষটি বিভক্ত হতে হতে এমন পরিস্থিতিতে শুরুতে থাকে যখন এর অংশ কোষগুলো তখনো ঠিক করেনি এর কোন্‌টি শিশুর কোন অঙ্গের কোষ হবে, এখনো যে কোন অঙ্গের শুরু এর থেকে হতে পারে। এরকম কোষ দিয়ে যে কোন অঙ্গের অসুস্থ কোষকে প্রতিস্থাপিত করা যায়। এখানেই স্টেম সেলের মূল্য। ইয়স্মিন এর একটি দুরূহ অংশ নিয়ে গবষণা করছেন– তা হলো মস্তিষ্কের অসুস্থ কোষকে প্রতিস্থাপিত করার কাজে। তাঁর মা মস্তিষ্কের রোগ পারকিনসন্সে আক্রান্ত হবার পর থেকে তিনি এই দিকে ঝুঁকেছেন। আগেকার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে সাম্প্রতিক কালে আবিষ্কৃত হয়েছে যে মস্তিষ্কেও নতুন কোষ তৈরি হতে পারে, অসুস্থ স্নায়ু কোষকে স্টেম সেল দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা যেতে পারে। মস্তিষ্কের সব কোষ অবশ্য অবধারিত ভাবে বিভক্ত ও নবায়িত হয়না, অন্য সব অঙ্গের ক্ষেত্রে যেমন চামড়ার কোষে যা হয়। কোন্‌গুলো নবায়িত হবে, কোন্‌গুলো হবেনা তা নিয়ে গবেষণাও এক্ষেত্রে কঠিন। আমি যদি লিভার বা কলজের কোষের নবায়ন দেখতে চাই

সেটি একটি কাচের পাত্রে পুষ্টিদ্রব্যে তা রেখেই করা সম্ভব। কিন্তু মস্তিষ্কের কোষে নবায়ন দেখতে হলে তা মস্তিষ্কের আবহেই রাখতে হবে। ইয়াস্মিন ইঁদুরের মস্তিষ্কেই এ কাজটি করছেন। এ নিয়ে তাঁর বলার অনেক কিছু আছে। অ্যালিস ওয়ার্ড আর সামান্থা ইয়াস্মিনের আলোচনা সাহিত্য-ইতিহাস ইত্যাদিতেও মণ্ডিত হয়ে যেন মস্তিষ্কের স্টেম সেলে মূল প্রশ্নগুলোতে স্বচ্ছন্দে চলে যাচ্ছে– কোন সময়েই শ্রোতাকে ফেলে যাচ্ছে না।

'ট্রাস্ট-ইঞ্জিনিয়ার্স'। রেডিয়োল্যাবের যে একটি পর্ব এখানে তুলে ধরতে চাই তার মাধ্যমে এই পডকাস্ট সিরিজের বৈশিষ্টটি কিছুটা বোঝা যাবে- এ যেন যুক্তি দিয়ে নানা দিক থেকে একটি বিষয়ের বিচার। যেমন ট্রাস্ট ইঞ্জিনিয়ারদের কথা ধরা যাক– ফেইসবুকের প্রথম দিকের জনপ্রিয়তার দিনে ফেইসবুক কর্তৃপক্ষের কাছে এর ব্যবহারকারীদের যাবতীয় আপত্তি, বিরোধ ইত্যাদি মেটাবার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো এই নামে কিছু উৎসাহী তরুণ কর্মীদের হাতে। তাঁরা ওই অসংখ্য ফেইসবুক প্রেমিকদের আস্থা অর্জন করবেন এমন আশা থেকেই তাঁদেরকে বলা হতো ট্রাস্ট-ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পরেই তাঁদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এলো তাঁরা মানুষের সামাজিকতার মধ্যে সম্পর্ক ও আবেগের মধ্যে অন্যায় ভাবে ঢুকে পড়ে, সেখান থেকে তথ্য চুরি করে, তার অপব্যবহারের সঙ্গে জড়িত হচ্ছেন। ওই ট্রাস্ট-ইঞ্জিনিয়ারদের একজন আর্তুর বেয়ার যে ভাবে ট্রাস্ট-ইঞ্জিনিয়ারদের দলে কাজ করছিলেন তা খুব সাদাসিদা ভাবে বর্ণনা করেছেন ২০২১ সালে। যেমন ক্রীস্টমাসের মৌসুমে অসংখ্য মানুষ অসংখ্য ছবি ফেইসবুকে পোস্ট করে। ফেইসবুকের সেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার প্রথম যুগে যে কোন ব্যবহারকারী ফেইসবুক কর্তৃপক্ষের কাছে নিজের বা অন্যের কোন পোস্টের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর মন্তব্য-অনুরোধ জানাতে পারতেন– একে বলা হতো 'রিপোর্ট'। ওই ক্রীস্টমাস মৌসুমে বিভিন্ন জনের পোস্ট করা ছবি নিয়ে এতো অসংখ্য রিপোর্ট আসতো যে বেয়ার ও ট্রাস্ট-ইঞ্জিনিয়ার সহকর্মীদেরকে ক্রীস্টমাসের দিনগুলোতেও অফিসে কাটিয়ে হিমসিম খেতে হতো ওই রিপোর্টগুলোর নিষ্পত্তি করতে। এক পর্যায়ে ফেইসবুক চাইলো নিজে জড়িত না হয়ে ব্যবহারকারীরা যাদের পরস্পরের ফটো, পোস্ট ইত্যাদি নিয়ে আপত্তি আছে এটি তাঁরা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করে মিটিয়ে ফেলুক। এই উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ম্যাসেজ করার জন্য একটি ম্যাসেজ বক্স দেয়া

হলো। কিন্তু সেগুলো বেশির ভাগ অব্যবহৃত রইলো। ব্যবহারকারীরা চাইলেন কাজটি ফেইসবুকের মাধ্যমেই হোক, সরাসরি নিজেদের মধ্যে নয়।

ট্রাস্ট-ইঞ্জিনিয়ারদের যখন সম্মেলন হতো তাতে দেখা যেতো তাঁদের কাজের সুবিধার্থে তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী, মনস্তত্ত্ববিদ, সংখ্যাতত্ত্ববিদরা রয়েছেন, বিজ্ঞানের বাইরের অন্য বিশেষজ্ঞরাও রয়েছেন। উদ্দেশ্য তাঁরা যেন সন্তোষজনক ভাবে ব্যবহারকারীদের আপত্তিগুলো, পরস্পরের বিরোধগুলো নিষ্পত্তি করতে পারেন। বেয়ার মনে করেন অন্তত সেই সময় সবাই খুবই নিবেদিত ছিল এই উদ্দেশ্যে। অথচ এখন ফেইসবুককে এত দোষে দোষী করা হচ্ছে। অবৈধ ভাবে ব্যবহারকারীদর তথ্য ব্যবহার করে, তাদের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে জাতীয় নির্বাচনের ফলাফলে পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করা হচ্ছে। বেয়ার বলতে চাচ্ছেন অন্তত তিনি যখন ট্রাস্ট-ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করেছেন তখন ঘূণাক্ষরেও এমন সম্ভাবনার কথা তাঁদের মনে আসেনি। তাঁরা মানুষের সামাজিকতাকে আরো সমৃদ্ধ করার কাজেই রাতদিন খেটেছেন।

লাভের লোভেই মূল্যস্ফীতি। প্লানেট মানি পডকাস্টের মূলনীতি হলো যে কোন একটি বিষয়কে যদি সামনে আনা হয়, দেখিয়ে দেয়া যাবে যে অর্থনীতির সঙ্গে তার কোন না কোন ভাবে গাটছড়া বাঁধা আছে। যে পর্বটির কথা বলতে চাই তাতে যুক্তরাষ্ট্রে ও সারা বিশ্বে সম্প্রতি দেখা দেয়া মূল্যস্ফীতি নিয়ে কথা বলা হয়েছে। ওখানে অর্থনীতির অধ্যাপক ইসাবেলা ভিভা এর কারণ সম্পর্কে নতুন কথা বলেছেন, এবং ক্রমে অন্যান্য অর্থনীতিবিদরাও তাঁর সঙ্গে একমত হচ্ছেন। ওই যে আমরা জানতাম মানুষের বেতন ও জিনিসপত্রের দাম ক্রমাগত একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়লে মুদ্রাস্ফীতি হয়, জিনিসপত্রের উপাদান ইত্যাদি দুর্মূল্য হলে সেটিও মুল্যস্ফীতি বাড়ায়– সে কথাগুলো এখন আর টিকছেনা। মূলত কোভিডের সময় লকডাউন ইত্যাদির কারণে মানুষ ধরেই নিয়েছিলো যে জিনিসপত্র দুষ্প্রাপ্য হবে, এগুলোর দাম বাড়বে। এই ধরে নেয়ার সুযোগে এবং নিজেদের কোভিডসৃষ্ট ক্ষতি বহুগুণে পুষিয়ে নেবার লোভে কোম্পানীগুলো সবার অলক্ষ্যে নিজেদের লাভের হারটি অনেক বাড়িয়ে নিয়েছিলো। সেই যে বাড়িয়ে মজা পেয়েছে তারপর থেকে ওরা ইচ্ছেমত লাভ বাড়িয়ে চলেছে ফলে মূল্যস্ফীতি হু হু করে

বেড়েছে এবং সেটি বেতন বাড়ে তো দাম বাড়ে আর দাম বাড়ে তো বেতন বাড়ে এই পাল্লা দেবার বদলে এখন দামের সঙ্গে দাম পাল্লা দিচ্ছে– লাভ বাড়ার মানে তো আবার দামই বাড়া, তাতে মানুষ কম কিনতে পারলে কোম্পানীর লাভ কমে যায়, তখন তাকে দাম আরো বাড়াতে হয়; অতএব এটি দামের সঙ্গে দামের পাল্লা।

এই পডকাস্ট যুক্তরাষ্ট্রের কানসাসের রিজার্ভ ব্যাংকের একটি গবেষণা বর্ণনা করেছে যার হাতে রাজ্যের সত্যিকার মূল্যস্ফীতি এবং কোম্পানীগুলোর লাভের অনেক উপাত্ত রয়েছে। এতে দেখা গেছে যে বিমানের টিকেট থেকে একটি আচারের বোতল পর্যন্ত সব কিছুর মূল্যবৃদ্ধি এক সঙ্গে নিলে তাতে ৬০% অবদান রেখেছে কোম্পানীগুলোর যথেচ্ছভাবে নিজেদের লাভ বাড়িয়ে দেওয়াটি। এখন দেখা যাচ্ছে যে কোম্পানীদের এই কৌশলটি দুনিয়ার দেশে দেশে অনুকৃত হচ্ছে, তারা অনেক জায়গায় জোট বেঁধে সব জিনিসে নিজেদের লাভকে ক্রমাগত বাড়িয়ে অসম্ভব মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি করছে। যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশগুলো এর মোকাবেলা করছে সুদের হার বাড়িয়ে– যাতে আশা করা হয় মুদ্রার সরবরাহ কমে গিয়ে জিনিসে চাহিদা এত কমানো যাবে যে কোম্পানীরা লাভের লোভে দাম বাড়ানো বন্ধ করবে। ইসাবেলা সেটিকে মোটেই সঙ্গত মনে করেন না– সবাইকে এভাবে শাস্তি দেয়াটি। তিনি বরং চান যারা বিশাল সব লাভ করছে তাদের লাভের ওপর কড়া হারে কর বসাতে। অর্থনীতিবিদরা এভাবে কোম্পানীর ওপর কর বসাতে সাধারণত রাজি হন্‌না কারণ তাতে ব্যবসা বাড়াবার প্রেরণাটি কমে যায়, অর্থনীতি সংকুচিত হয়ে বেকারত্ব বাড়ে। কিন্তু এখন তাঁরাও নড়েচড়ে বসেছেন, অন্তত নীতিগত ভাবে করবৃদ্ধি দরকার হতে পারে মনে করেছেন। ইসাবেলা ভিভা সেটিকেও একটি অর্জন মনে করছেন।

ঘরোয়া আপন ভূবনে:

পডকাস্টের জগতে কান পেতে দিলে বিশ্ব-চরাচরের আর্ট আবহটি বোঝা যায়। কিন্তু তার উল্‌টোটা করে বিশ্ব চরাচরে নয় একেবারে নিজের ঘরোয়া কাজে আপন ভূবনের আর্টেও ডুব দেয়া যায়– ঘরকন্নার মধ্যে বাড়ির আনাচে কানাচে যেখানেই মন ধরে। এটি করতে গিয়ে এমন সব জিনিসের কথা বলতে পারি যেগুলোকে মনে হতে পারে একেবারে আলোচনার যোগ্যই নয়-

এতই সাধারণ, এতই আটপৌরে সেই জিনিসগুলো, কারো চোখে সেভাবে পড়ারই হয়তো কথা নয়। কিন্তু এর থেকেও নিজে যখন আর্টের ছোট ছোট হিল্লোল অনুভব করতে পারি সেটি কম কথা নয়।

সব্জী কাটায় নান্দনিকতা। সব্জী সরল ও সুন্দর আকৃতিতে যদি কেটে তা নান্দনিক ভাবে পরিবেশন করি তাতে হয়তো বিরাট কোন আর্ট সৃষ্টি হয়না, কিন্তু নিজের শিল্পী মন নেচে ওঠে। একটি শশাকে সালাদ করার জন্য পাতলা সব চাকতিতে স্লাইজ করে সাধারণত কাটি। কিন্তু তা না করে একেবারে লম্বালম্বি ফালায় যদি স্লাইজ করি তাহলে কী হয়? তা হলে শশা কাটায়ও একটি নতুন ডিজাইন সৃষ্টি হয়– এর একটি নামও আছে প্ল্যাঙ্ক বা তক্তা! শুধু দু'পাশের বাঁকা ফালাগুলোকে এর থেকে বাদ দিতে হবে, আগেই কেটে রেখে। এরকম তক্তার মত ফলাগুলোকে পাতলা না করে বেশ পুরু করা যাক, খুব পুরু তক্তাই না হয় হলো। এবার তক্তাগুলোকে লম্বার দিকে এবং পাশের দিকে এমন ভাবে কাটা যায় যে বেশ ছোট ছোট শশার কিউব পাওয়া যায়- লুডু খেলার ছক্কার মত, তবে তার চেয়ে বড়। এমন ভাবে করি যেন সব কিউবের সাইজ সমান– প্রত্যেকটি কিউবের ঠিক সমান সমকোণী বাহুগুলো আর ছয়টি তল।

কিউবের ব্যাপারটাতে যদি একটু আর্টের ছোঁয়া পাই তা হলে শশায় থামবো কেন– চলুক না আলু, পেঁপে, বেগুন সব কিছুর কিউব। কিউব নানা সাইজের হতে পারে, তবে বেশি ছোট নয়। আর যদি খুব ছোট কিউব করতেই চাই একেবারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তা হলে সেটি অন্যদিকে চলে যায়- যেমন আলুতে করা যায়– একেবারে গুড়া মিহি কিউব-দানা, অনেকটা যেন সাইজ করা কিমা। স্যুপের ভেতর মন্দ লাগবেনা, কিন্তু ক্ষুদ্র হলেও সাইজ করা।

সব্জীর বড় টুকরায় আরো বেশ কিছু দারুণ বৈচিত্র সৃষ্টি করা যায়। এমনি একটি হলো রোল কাট্– অর্থাৎ গড়াতে দেবার মত কাটা গড়াতে পারে এমন সব্জীতে, যেমন আলু, গাজর, মূলা ইত্যাদিতে। কোণাকুণি কেটে টুকরা করলে প্রত্যেক টুকরার নানা তল হবে যার কোনটি অন্যটির সমান্তরাল হবেনা, চেষ্টা করতে হবে যেন মোটের ওপর টুকরাগুলো প্রায় সমান থাকে যদিও একটির সঙ্গে অন্যটি মোটেই মিলবেনা। ওই বিচিত্র আকৃতির মধ্যে এক রকম ঐক্য তাকে একটি নান্দনিকতা দেবে। শাক-পাতার মত সব্জীকে

ফিতার আকার করে নেয়া যায়। এগুলোকে একত্রে আঁটির মত ভাঁজ করে নিয়ে তারপর কিছু নির্দিষ্ট দৈর্ঘে আঁটি থেকে কেটে নেয়া, অর্থাৎ আঁটিটিকে লম্বায় কয়েক ভাগ করা। এবার আঁটি খুলে ফেললে প্রত্যেকটি অংশ ফিতার জন্ম দেবে। আলু ইত্যাদির যে কিউব করার বিষয় দেখেছি তার একদিকের দৈর্ঘ বাড়িয়ে দিয়ে আয়তাকার সলিড করা যায় পরিচিত ফ্রেঞ্চ ফ্রাই (চিপ) আলুর মত। এরকম গাজর ইত্যাদির লম্বা চিপ যদি অনেক লম্বা করি তখন এটি একটি সরু বেটনে (লাঠি) পরিণত করতে পারি যা প্রায়ই করা হয়– কিন্তু তাই বলে যার শিল্প-সৌন্দর্য অবহেলা করার মত নয়। তেমনি অর্ধ বৃত্তাকার স্লাইজে, চাকার মত স্লাইজে লেবু এগুলো সব সময় দেখছি, কিন্তু তাই বলে এর আর্টকে কি তুচ্ছ করার মত– এগুলো তৈরিতেও আনন্দ, দেখতেও আনন্দ, খেতেও আনন্দ।

পকেট বাগান। বাগানের কথা আগেই বলেছি, কিন্তু পকেট বাগান আলাদা ব্যাপার। যেখানেই থাকি কোথাও এক চিলতে মাটি ও তাতে রোদ-বৃষ্টি যদি পড়ে তাহলেই গড়া যায় সামান্য সবুজের খেলা। যেমন ঘরের দাওয়ায় পড়ে থাকা দুটি কংক্রীটের চাঁইয়ের মাঝখানটাতেই তা হতে পারে; অথবা রাস্তার কাছে গেইটের সঙ্গে, বেড়ার সঙ্গে– যুৎসই জায়গা খুঁজে নিতে হয়। বিস্তারিত বাগান রচনার কোন সুযোগ নেই, কিন্তু একটু ঘাসের মত সবুজে ছোট ফুলের জায়গাতো হতে পারে সেখানে! এ একরকম পকেট বাগান– পকেট চিরুণি, পকেট চাকুর মত সঙ্গে থাকার তৃপ্তি থাকে, বড় কাজের জন্য নয়, একটু মুহুর্তের আনন্দের জন্য। আরেকটু অন্য ভাবে করা যায় যে কোন রকম ছোটখাট পাত্র যেমন পেন্সিলদানী, অথবা কনডেন্সড মিল্কের কৌটা তাতেই একটু মাটি ভরে লাগানো সবুজ, সুবিধা মতো জায়গার পকেটে খোপে রেখে দিলাম আনাচে কানাচে।

আশপাশে কোন কারণে গাছ কেটে ফেলতে হয়েছে, ওর জায়গায় আপাতত সামান্য ফাঁকা পড়ে আছে, অথবা গাছের গোড়াটাই পড়ে আছে। ওভাবে বিষণ্ন পড়ে থাকবে কেন, আপাতত ওতেই চল্‌তে পারে পকেট বাগান। যেহেতু ছোট, সহজে বদলানো যাবে, বাড়ানো যাবে বা কমানো যাবে। কোন কোনটা ইচ্ছে মত নড়াচড়াও করা যাবে। উদ্ভিদের বৈচিত্র রয়েছে বলে পকেট বাগানে আর কিছু না হোক আকৃতির ও টেক্সচারের

বৈচিত্র সৃষ্টি করা যায়– কোনটা এতো বেঁটে যে মাটির সঙ্গে লেপটানো, কোনটি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, কোনটি নানা রঙের সজ্জী, কোনটি সাদামাটা নেহাৎ সবুজ, কোনটি টসটসে রসালো, কোনটি কাঁটাওয়ালা, কোনটি বড় পাতায় ছাওয়া। যেগুলোকে পাত্রের মধ্যে রেখেছি সেগুলোকে নানা ব্যাকগ্রাউণ্ডের বিপরীতে রেখে রেখে দেখা যায়– কখনো বড় বাগানের কিনারায়, সেখানে সবুজের বিপরীতে, কখনো ইটের ফাঁকে সেখানে লাল শক্ত ইটের বিপরীতে।

বড় শিল্পীরাও ঘরোয়া হন। বিশ্বজোড়া দৃশ্যমান আর্টের জগতে আজকের প্রথম সারিতে যে শিল্পীরা আছেন তাঁদের মধ্যে চীনের ওয়াই ওয়াই একজন। বহু দশক ধরে চীনা সভ্যতার ঐতিহ্যবাহী নানা শিল্পদ্রব্য থেকে তিনি অনবদ্য আর্ট সৃষ্টি করে আসছেন, অন্যদিকে খুব আধুনিক সব থীম নিয়ে অভিনব ভাস্কর্যও গড়ে তুলেছেন। অথচ এরকম আধুনিক কাজগুলোর মধ্যে তিনি যেন ডুবে গেছেন অত্যন্ত সাধারণ নানা গার্হস্থ্য জিনিসপত্রের মধ্যে। যেমন তাঁর একটি বড় ভাস্কর্য কাজে দেখছি মোটামুটি একই সাইজের ঘরের টালির মত পোড়ামাটির অনেক ফলক এক জায়গায় ঘেঁষাঘেঁষি করে রাখা, তারপর সেখান থেকে নেয়া ফলক সারি সারি পাশাপাশি রেখে বিন্যস্ত করা যেখানে ফলকের ঘনত্ব ক্রমে কমেছে। আরেকটি ভাস্কর্যে দেখা যায় চীনের প্রাচীন আর্টে প্রচলিত মটকার মত পটারির একটি সুন্দর মটকা, খুব সম্ভব কোন প্রাচীন প্রত্নস্থল থেকে সংগৃহীত। কিন্তু ওয়াই ওয়াই এর ওপর আধুনিক আর্টের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। ঢেউ খেলানো আকৃতির অতি পরিচিত কোকা কোলার কাচের বোতলে যেভাবে তার ট্রেড মার্ক কোকা কোলা কথাটি ইংরেজি, চীনা পেচানো হরফে লেখা তারই একটি বিবর্ধিত প্রিন্ট এঁকে তিনি তা ওই প্রাচীন মটকার গায়ে সেঁটে দিয়েছেন– যেন ওই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের ওপর একেবারেই সাধারণ আটপৌরে আধুনিক পানীয়ের বিজ্ঞাপন। এ যেন চীনের আজকের মানুষের প্রাচীন গম্ভীর ও চকচকে আধুনিকের মধ্যে টানাপোড়েনের ছবি।

তাঁর ভাস্কর্যে আর যে জিনিসের ছড়াছড়ি তা হলো লেগোর সব এলোমেলো টুকরা– বাচ্চারা ও বড়রা সেগুলো জুড়ে জুড়ে নানা কিছু গড়ে। তাঁর যুক্তি হলো লেগোর টুকরাগুলো খুব সাধারণ জিনিস, সর্বজনীন জিনিস।

তিনি যখন এগুলো দিয়েই একটি ভাস্কর্য গড়েন এখন অন্য যে কেউ সেটি দেখে হুবহু সেই ভাস্কর্যটি নিজেই বানিয়ে নিতে পারবে– তিনি এর মধ্যে সর্বজনীনতা খুঁজে পান। যে শিল্পী প্রাচীন চীনের অতি মূল্যবান ও বিরল নিদর্শন নিজের শিল্পকর্মের বাস্তব উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে পছন্দ করেন তিনিই আবার লেগোতেও আসক্ত। তিনি বিশাল আকারের টয়লেট পেপার রোলের ভাস্কর্য গড়েছেন একাধিক- কোনটি মার্বেল পাথর দিয়ে, কোনটি কাচ দিয়ে! এতো ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া জিনিসকে তিনি কেন পাবলিক আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গেলেন? এ নিয়ে তাঁর বক্তব্য হলো শিল্প নিয়ে মামুলি কথাবার্তাকে তিনি এভাবে ভেতর থেকে সাবোট্যাজ করছেন। তিনি তাঁর বিশাল মার্বেলে তৈরি টয়লেট পেপার রোলকে কোভিড-১৯ এর একটি মনুমেন্ট হিসেবে দেখাতে চেয়েছিলেন। একে বেছে নেবার কারণ কোভিডের বিপর্যয় কীভাবে মানুষের একেবারে নিজস্ব জীবনের ভেতরে ঢুকে সবকিছু তছনছ করে দিয়েছিলো সেই কথা স্মরণ করা।

এক আর্ট থেকে অন্য আর্টে

ছবি থেকে শিল্পী-মনস্তত্ব:

রোমের ভ্যাটিকানে সিস্টিন চ্যাপেলের ভেতরে ছাদে মাইকেল এঞ্জেলোর আঁকা বিখ্যাত জেনেনিস ছবির কথা কে না জানে। সিস্টিন চ্যাপেল হলো ধর্মগুরু পোপের ব্যক্তিগত প্রার্থনার চার্চ– পোপ নিজেই মাইকেল এঞ্জেলোকে ধর্মীয় কিছু চিত্র এঁকে চ্যাপেলের এই অংশটির সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্য বৃদ্ধি করতে বলেছিলেন। এই চিত্রায়নের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশটিতে শিল্পী এঁকেছেন ঈশ্বরের হাতের ছোঁয়ায় আদম প্রাণ পাচ্ছেন, তাছাড়া অন্য আরো দেবদূত গণও আছেন সঙ্গে। পুরো ছবিতে যাঁরা আছেন তাঁরা স্বর্গীয় হলেও তাঁদের অবয়ব মানুষের– নানা ভঙ্গিতে আকাশে ভাসার মত করে রয়েছেন। জেনেসিস এই নামের অর্থই হলো আদি সৃষ্টিকর্ম। একটি অনবদ্য শিল্প হিসেবে এই ছবির উচ্চ মান নিয়ে আলোচনা, গবেষণা যুগ যুগ ধরে কম হয়নি।

১৫০৮ থেকে ১৫১২ এই সময়ের মধ্যে আঁকা ছবিটি নিয়ে সম্প্রতি অন্য রকমের একটি গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে যাতে মনে হচ্ছে যে শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো এতে ঈশ্বরকে আঁকার মডেল হিসেবে নিজেকেই ব্যবহার

করেছিলেন! এর পক্ষে যে সাক্ষ্য-প্রমাণ দেয়া হয়েছে সেটি হয়তো সবার কাছে একেবারে নিশ্চিত হবার মত মনে নাও হতে পারে, তবে এই শিল্পীর জীবন ও তাঁর মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যাঁরা পড়াশোনা করেছেন তাঁদের অনেকেই মাইকেল এঞ্জেলোর আত্মগরিমা ও আত্মকেন্দ্রিকতার প্রখরতা সম্পর্কে জানেন এবং নিজের মধ্যে তাঁর এক রকম ঈশ্বরবোধ থাকার সম্ভাবনা নিয়েও অবহিত। সেই পূর্ব ধারণার সঙ্গে এই ঈশ্বরের মডেল হওয়ার ব্যাপারটি বেশ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। বর্তমান গবেষণায় মডেলের ব্যাপারে তাঁর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের যে নতুন আর্টের জন্ম হয়েছে ওই জেনেসিস ছবিটি থেকেই, অর্থাৎ মূল আর্ট থেকেই। সেটি কীভাবে তা দেখা যাক।

মাইকেল এঞ্জেলো নিজেকে মডেল করার ব্যাপারটি ঢাকঢোল পিটিয়ে কাউকে কখনো জানাননি, এটি সম্পূর্ণ তাঁর নিজের মধ্যেই ছিল– এতকাল কেউ সন্দেহও করেনি, এখন ৫০০ বছর পর আজকের গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে। যেই বিশেষ পুরানো দলিল থেকে গবেষকরা এই থিওরিটা দিচ্ছেন তা হলো ১৫০৯ থেকে ১৫১১ সালের মধ্যে তাঁর বন্ধু জিওভানি ডি পিস্টইয়ার কাছে লিখে পাঠানো মাইকেল এঞ্জেলো রচিত একটি সনেট অর্থাৎ চতুর্দশপদী কবিতা। এতে তিনি বন্ধুকে কবিতায় ছন্দে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ওপরের ছাদের দিকে তাকিয়ে থেকে ছবি আঁকার সময় তাঁর গায়ে-মুখে টপ টপ করে রং পড়েছে দিনের পর দিন, যেন তাঁর মুখটি ঘরের রং-পড়া মেঝেতে পরিণত হয়েছে। পুরো কবিতায় এই পরিশ্রমসাধ্য কাজটির বর্ণনা। নিজের হাতের লেখা এক পৃষ্ঠা কাগজে এই কবিতাটি লেখার সময় পাশে যথেষ্ট মার্জিন রাখা হয়েছে, এবং তাতে তিনি একটি স্কেচ এঁকেছেন। দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে একজন শিল্পী ছবি আঁকছেন ভৌতিক চেহারার একটি মুখকে। শিল্পীর হাত ওপরের দিকে অনেকখানি প্রসারিত; আর একটি পা অন্যটির ওপর কিছুটা ক্রস করা। স্কেচে যেই শিল্পী তাঁর মুখাবয়ব অনেকটাই মাইকেল এঞ্জেলোর স্ব-প্রতিকৃতির মতই মনে হয়। বোঝা যায় যে কবিতায় যা আছে সেই ঘটনাটিরই যেন স্কেচ।

এই স্বাভাবিক কবিতা ও স্কেচ ছবির মধ্যে বর্তমান গবেষকরা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি ব্যাপার লক্ষ্য করলেন। গবেষকদের প্রধান মারিনাৎসো ভাবলেন এভাবে পা ক্রস করে তো শিল্পীর দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে পারার কথা নয়, এটি

দাঁড়াবার ভঙ্গিই নয়। তাই তিনি একে কম্পিউটারে ডিজিটাল অবস্থায় এনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। ছবিটিকে যদি ঘুরিয়ে বসা-শোওয়া অবস্থায় নিয়ে আসা হয় তা হলে ছাদে আঁকা জেনেসিস ছবিতে ঈশ্বরের ওই হেলান দিয়ে বসার ভঙ্গির সঙ্গে এটি হুবহু মিলে যায়। মারিনাৎসো ধরে নিলেন ছবিতে ঈশ্বরকে আঁকার জন্য এই স্কেচটিকে মাইকেল এঞ্জেলো একটি প্রাথমিক ধারণা হিসেবে ব্যবহার করেছেন এবং ঈশ্বর হিসেবে মডেল বেছে নিয়েছেন তাঁর মুখাবয়ব নিয়ে নিজেকেই। যদিও ছবির ঈশ্বরের বয়স শিল্পীর তখনকার সদ্য ত্রিশ বয়সের থেকে অনেক বেশি, তাঁর থ্যাবড়া নাকের তুলনায় ঈশ্বরের নাক অনেক উঁচু তবুও অন্য মুখাবয়বে উভয়ের মিল স্পষ্ট। ওই বয়সেই মাইকেল এঞ্জেলো তাঁর বড় বড় ভাস্কর্য, চিত্র ইত্যাদি সম্পন্ন করে চারিদিকে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন, আত্মগরিমায় তিনি রীতিমত মগ্ন; তাঁর মনস্তত্ত্বে আর কাউকে ঈশ্বরের মডেল করার কথা ভাবতেই পারেননি তিনি– এটিই গবেষকদের সিদ্ধান্ত। গত ৫০০ বছর পর্যন্ত ধরে শিল্পীর যে মনস্তত্ত্ব এভাবে প্রকাশ পায়নি। এখন মনে হচ্ছে নিজের ছবি ও স্কেচ থেকে তার প্রকাশটাই যেন অন্য রকম একটি আর্ট। এখন দর্শকরা যখন জেনেসিস দেখবেন তাঁদের কারো কারো মধ্যে হয়তো মাইকেল এঞ্জেলোর মনের এই দিকটিও উঁকি ঝুঁকি দেবে।

পাবলিক আর্ট থেকে পাবলিক মতামত:

টালুস ডোম। কানাডার আলবার্টা প্রদেশের এ্যাডমন্টন নগরের একটি আকর্ষণ হলো তার টালুস ডোম– রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে একটি পাবলিক ভাস্কর্য, ২০১১ সালে স্থাপন করা হয়েছে। চকচকে স্টেনলেস স্টিলে তৈরি অনেকগুলো ছোট বড় বলকে সাজিয়ে বেশ আধুনিক ধারণার এই মনুমেন্ট; দেখলে মনে হয় অনেকগুলো বলকে ত্রিভুজাকৃতির বিন্যাস স্তুপের মত করে রাখা হয়েছে অনেক বড় ও উঁচু এই ভাস্কর্যে। স্তুপের মত ত্রিভুজাকৃতির হলেও এটি কিন্তু নিরেট পিরামিডের মত নয়, এর মাঝখানটায় ফাঁপা, আবার অনেক বলের মধ্যেও আছে অনিয়মিত ফাটল। এর সৃষ্টিকারদের মতে এই ফাঁপা জায়গা, বলের ফাটল দর্শকদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে নিজের নিজের মত করে সেগুলো ভর্তি করার কল্পনা করতে। কিন্তু এই টালুস ডোম নিয়ে নগরবাসীরা স্পষ্ট দুভাগে বিভক্ত। এক দল একে দৃষ্টিকটু, অপ্রয়োজনীয় অপব্যয় মনে

করেন; অন্য দল একে তাঁদের নগরের গর্বিত হবার মতো একটি ভাস্কর্য মনে করেন।

২০২৩ সালের এপ্রিলের ৯ তারিখে টালুস ডোম কিন্তু স্থানীয় সব পত্রিকায় খবর হয়েছে ভিন্ন এক কারণে। ২৬ বছর বয়সী এক যুবক এর ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে কেমন করে জানি ওই স্তুপের মাঝে ফাঁকা নানা কোঠরের অতলে পড়ে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো, দমকল বাহিনীর লোকজন এসে বহু সময় নিয়ে তাকে অক্ষত উদ্ধার করতে পেরেছেন বটে কিন্তু এতো সবে টালুস ডোমের বেশ খানিকটা ক্ষতি হয়ে গেছে। যুবকটিকে এখন ৫ হাজার ডলার জরিমানা করা হয়েছে। এ ঘটনার পর নতুন ভাবে আবার টালুস ডোম আলোচনায় এসেছে। যারা একে চক্ষুশূল মনে করেন তাঁদের শোক যেন আবার উতলিয়ে ওঠেছে। লোকটি এমন কাণ্ড করতে পারলো ওই হতচ্ছাড়া ডোমটি থাকার কারণেই তো। শুধু তাই নয় অনেকে এও বললেন যে লোকটি আসলে ওই শ্বেতহস্তীটির প্রতিবাদ করার জন্য ওটিতে উঠতে চেয়েছে, তাকে সবার অভিনন্দন জানানো উচিত। ওই যে বলের স্তুপ এর মধ্যে আর্ট কোথায়, কী তার সৌন্দর্য, কী তার বক্তব্য? এর পেছনে এতগুলো টাকা শুধু শুধু কেন খরচ করা হলো? কিন্তু যাঁরা টালুস ডোমের মত অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাস্কর্যকে ভালবাসেন তাঁরা বরং এ ঘটনাকে হালকা ভাবেই নিয়েছেন। তাঁরা ভাবছেন ওই যুবকও ওই ভাস্কর্যের আকর্ষণেই এর ওপরে উঠে আরো কাছে, একেবারে ভেতরে যেতে চেয়েছিলো। এই চকচকে বলগুলোর একটি গুণ হলো এতে আকাশেরও চারিদিকের প্রকৃতির প্রতিফলন এক মায়াময় আকর্ষণ সৃষ্টি করে। সে হয়তো ওই আকর্ষণে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলো। তাঁরা সবাই এই নগরকে যেমন ভালবাসেন, তেমনি নগরের প্রতীক হয়ে ওঠা এই মনুমেন্টটিকেও ভালবাসেন। আর এ নিয়ে সব সময় কথা বলতেও ভালবাসেন তাঁরা। ওই যুবকটা কথা বলার আরেকটি সুযোগ করে দিয়েছে।

নির্মাতা আর্টিস্টদেরও মনে হয়তো সেটি একটি উদ্দেশ্য ছিল। কেন এই ডোম এখানে, ব্যস্ত সড়কের মধ্যে কেন বলের ওপর বল রেখে এতো উঁচু একটি মনুমেন্টকে এত ঠুনকো মনে হবার মত করে তৈরি করা হলো? কেন এর মাঝখানটি এতো ফাঁপা– যাকে একটি রহস্যের মত মনে হয়? কেন কোন কিছুর স্মারক হওয়া ছাড়া, আপাত কোন অর্থ ছাড়া, এটি এভাবে দাঁড়িয়ে

আছে? শিল্পী চেয়েছেন মানুষ এসব ভাবুক, নিজে নিজে একটি উত্তর খুঁজে নিক। শিল্পী সব চেয়ে বেশি চেয়েছেন সবাই একে লক্ষ্য করুক, প্রশ্ন তোলাটাও এক ভাবে লক্ষ্য করা।

ল্যুভের কাচের পিরামিড। টালুস ডোমের প্রসঙ্গটি বহুদিন আগের আমার নিজের ছোট কিছু অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিলো। দুটিই প্যারিসের দুটি স্থাপত্য নিয়ে। আশির দশকে এই স্থাপত্য দুটির শুরুর দিনগুলোতেই তা আমার দেখার ও নগরবাসীদের এ নিয়ে বিতর্কের কথা শোনার সুযোগ হয়েছিলো। উভয়েই খুব বড় রকমের বিতর্ক যা পরেও যে একেবারে মিটে গেছে তা নয়, যদিও দুটিই এখন বিশ্বের সব চেয়ে পরিচিত ও আকৃষ্ট হবার মত স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত। লক্ষ্যণীয় যে যেই অভিনবত্ব এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আর্ট মাত্রেরই প্রাণ, স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তাকে এই দুইটি যেন চরমে নিয়ে গিয়েছিলো। তাই এত বিতর্ক। এগুলো হলো ল্যুভ মিউজিয়ামের সামনে কাচের পিরামিড এবং অন্যটি পম্পেদ্যু সেন্টার। প্রথমটির কথা দিয়ে শুরু করা যাক।

১৯৮৬ সালে প্যারিসে কয়েক দিন থাকার সুযোগে সেখানে ল্যুভ মিউজিয়ামের আগাগোড়া সংস্কারের পরিকল্পনার কথা শুনেছিলাম আমার ওখানকার সহকর্মীনী সাঁতাল লুকুকের মুখে। সাঁতাল একজন আর্টভক্ত হওয়াতে এ নিয়ে তাঁর উৎসাহের কোন সীমা ছিলনা। ফ্রান্সের তখনকার প্রেসিডেন্ট মিতোঁরো চাচ্ছিলেন ল্যুভকে তখনকার আধা মিউজিয়াম আধা অর্থ-মন্ত্রনালয় দফতর হিসেবে ব্যবহার না করে মধ্যযুগের স্থাপত্য কলার আদলের এই রাজ প্রাসাদটিকে পুরোপুরি মিউজিয়াম হিসেবে ব্যবহার করতে এবং এই কাজের জন্য এর কিছুটা সম্প্রসারণ এবং সংস্কার করতে। সিদ্ধান্তগুলোর পরিকল্পনা ও কার্যকর করার ভার দেয়া হয়েছিলো মিতেঁরার প্রিয় স্থপতি চীনা-আমেরিকান লিয়োহ মিং পেইয়ের ওপর। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচিত না করে একজন বিদেশীকে দেশের ঐতিহ্যের কাটছেরা করার এ দায়িত্ব দেয়াতে গোড়া থেকেই বিতর্ক উঠছিলো, বিশেষ করে পেইয়ের ডিজাইনের একটি দিক নিয়ে সমালোচনার ঢেউ উঠেছিলো। ল্যুভের সামনে যে বড় উঠানটি ক্যুর নেপোলিয়ন নামে পরিচিত সেখানে অভ্যর্থনা কেন্দ্র ও টিকেট ঘর হিসেবে পিরামিড আকৃতির একটি কাচের ঘর তৈরি

করার পরিকল্পনাটি দারুণ বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলো। এ হবে ইস্পাতের ফ্রেমে বড় বড় কাচের প্যানেলে তৈরি পুরোপুরি স্বচ্ছ এক অভিনব স্থাপত্য– হুবহু মিশরের পিরামিডের আকৃতির যার ভেতর দিয়ে চারিদিকের সব কিছু দেখা যায়, যদিও আকারে ছোট, ২১ মিটারের কিছু বেশি উঁচু। সমতলের নিচের স্থাপনায় আলো ঢুকাবার জন্য আরো ছোট ছোট তিনটি একই রকম পিরামিড এবং একটি উলটো পিরামিড ছিল যার নিচের দিকে যাওয়া শীর্ষ বিন্দুটিতে নামলে যেখান থেকে ল্যুভ মিউজিয়ামের বিভিন্ন অংশে যাবার এসকেলেটর পাওয়া যায়। পছন্দ অপছন্দের অনেক কিছু ছিল ডিজাইনের পর্যায়েই– সাঁতাল যখন আমাকে বিতর্কের কথা শোনাচ্ছে তখন পুরো ব্যাপারটি ডিজাইনের পর্যায়েই ছিল। এর সত্যি সত্যি নির্মাণ তখনো শুরু হয়নি। তবে মডেল ছিল সবার সামনে।

কাচের পিরামিড একেবারেই অভিনব এক স্থাপত্যের ব্যাপার। অনেকের মুখে শুনেই দারুণ কৌতুহল হলো– তা ছাড়া নগরবাসীদের জন্য বহুল ভাবে প্রচারিত নানা আগাম ছবি দেখে। তবে অপছন্দ করার দলই বেশি ভারী বলে মনে হলো। প্রধান আপত্তি ল্যুভের মধ্যযুগের স্থাপত্য, বলতে গেলে পুরো প্যারিস শহরের রেনেসাঁ স্থাপত্যের সঙ্গে এই দারুণ আধুনিক কাচের স্বচ্ছ জিনিসটি একেবারেই বেমানান মনে হচ্ছিলো। আরো বড় কথা এমন ছন্নছাড়া ডিজাইন এসেছে মিতেরার স্বেচ্ছাচারে কাজ পাওয়া এক বিদেশীর কাছ থেকে এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। ওই যে মিশরের প্রাচীন স্থাপত্যের আকৃতিতে হচ্ছে সেটিও একটি আপত্তি– কাচের ঘর যদি করতেই হয় অন্য আকৃতি নয় কেন; কিউব, বা গোলক বা অন্য কিছু, পিরামিডই হতে হবে কেন? অনেকের কাছে এই পিরামিডকে পছন্দ না করাটি মিতেঁরাকে পছন্দ না করার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল– মিতেঁরাকে ব্যঙ্গ করে বলা হতে লাগলো ফেরাও মিতেঁরা, মিশরেরর স্বেচ্ছাসেবী ফেরাউনের কথা মনে করিয়ে।

ল্যুভ মিউজিয়াম সাঁতালের সঙ্গে যখন দেখতে গেলাম তখন মিউজিয়ামের শিল্পকর্মগুলো দেখা ছাড়া নতুন কাচের পিরামিড সম্পর্কে মতামত গ্রহণের জায়গাটিও দেখলাম– একটি বড় বোর্ডে নানা কার্ডের ওপর লিখে দেয়া গত কয়েকদিনে আসা নানা জনের মতামত লাগিয়ে রাখা হয়েছে। সাঁতাল এক একটাতে একটু চোখ বুলান এবং চটপট আমাকে অনুবাদ করে দেন। কাছে

সব কাচের পিরামিড সহ জায়গাটির একটি মডেল রাখা আছে– সেটি দেখে মতামত দেওয়া সম্ভব। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আয়োজন শুরু হয়ে গেছে, তবুও নাগরিকদের মতামত নেয়া শেষ হয়নি। প্রশংসা করেও কম মতামত ছিলনা– স্বচ্ছ পিরামিডের আর্ট দিয়ে টিকেট ঘরের দর্শকদেরকে ল্যুভের আর্টের প্রতি একেবারে খোলামেলা আহবান জানিয়ে প্রদর্শনীর সঠিক জায়গায় নিয়ে যাবে এটিই ছিল প্রশংসার বড় জায়গা। ল্যুভের নিজের স্থাপত্যটি মধ্যযুগীয় দুর্গের ভাব, গলি-গুপচিতে ভরা– তার বিপরীতে এই স্বচ্ছতা খুবই তৃপ্তিদায়ক। এই বৈপরীত্যই অবশ্য বেশিরভাগ সমালোচকেরও বক্তব্য। যদিও মুখ ফুটে বল্‌ছেনা মনে হলো অনেকের আপত্তি এটি বিদেশী শিল্পীর সৃষ্টি হওয়া। হয়তো সেটি মনে করে অনেকেই একে 'ফ্রান্সের লজ্জা' বলে আখ্যাও দিয়েছেন। তবে একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম আর্ট নিয়ে বিতর্ক করাকেও ফরাসীরা রীতিমত আর্টেই পরিণত করেছে।

পরে প্যারিসে যতবার গিয়েছি ল্যুভের পিরামিড দেখেছি, এর ভেতর দিয়ে ল্যুভ মিউজিয়ামে প্রত্যেক বার গিয়েছি অসংখ্য মানুষের সঙ্গে। মনে হয়েছে সবাই কাচের পিরামিডকে পছন্দই করেন। স্বচ্ছ পিরামিডগুলো ছাড়া ল্যুভকে এখন কল্পনা করাই অসম্ভব।

পম্পেদ্যু সেন্টার। সেবার ১৯৮৬ সালে পম্পেদ্যু সেন্টারটিকেও প্রথম দেখি। এতদিনে ওটি প্যারিসের একটি অবশ্য-গন্তব্য হযে ওঠেছিলো। কিন্তু ১৯৭৭ সালে জনসাধারণের জন্য প্রথম খুলে দেয়ার পর থেকে এ নিয়ে বিতর্ক যেন কাটছিলোনা, তা ১৯৮৬ সালেও কাটেনি সাতাঁলের মুখে সে সব জেনেছি। এই সংস্কৃতি-কেন্দ্রটি দেখলেই বোঝা যায় যে এর স্থাপত্য নিয়ে কেন এতো বিতর্ক। পুরো প্যারিস শহরের স্থাপত্য যেখানে রেনেঁষা ও এর কিছু পরবর্তী যুগের, অন্তত আধুনিক স্থাপত্যের কোন বাড়াবাড়ি যেখানে কেউ কোনদিন করেনি সারা শহরে; সেই প্যারিসের কেন্দ্রস্থলের কাছেই একি স্থাপত্য! মনে হবে ভবনের ভেতরকে বাহিরে নিয়ে আসা এবং তাকে কটকটে রঙে একেবারে চোখে ঢুকিয়ে দেয়া– এ কেমন কারবার, কী করতে চায় এর দুই স্থপতি ইটালিয়ান রেনজো পিয়ানো এবং বৃটিশ রিচার্ড রোজার্স? কিংবদন্তীর প্রেসিডেন্ট দ্য গলের মৃত্যু হলে যিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তিনি আর এক প্রখর ব্যক্তিত্ব জর্জ পম্পেদ্যু। তাঁরই উদ্যোগে প্যারিসের কেন্দ্রের

কাছে ঘনবসতিপূর্ণ কাঁচা বাজার এলাকায় কিছুটা সুবিধা-বঞ্চিত মানুষদের জন্য আর্টের মিউজিয়াম ও আর্ট কেন্দ্র গড়ে তোলা এবং এই স্থানীয়দের লোকজ আর্টকেও উৎসাহ দেবার জন্যই পুরা আয়োজন। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ করে এর প্রাণপুরুষ পম্পেদ্যু মারা গেলে সবাই এটিকে তাঁর নামে পম্পেদ্যু সেন্টার নাম দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

কিন্তু প্রথম যখন কেন্দ্রটির পুরোটা সমাপ্ত অবস্থায় দেখা গেলো ওই নামটি যেন অনেকের মুখে এলোনা, বরং এলো সব বিরূপ সম্বোধনের মতো নাম– কেউ একে ডাকলেন 'নল-পাইপের দেবীর মন্দির', কেউ 'তেলের রিফাইনারি', কেউ 'গ্যাস ফ্যাক্টরি' ইত্যাদি নামে। কারণটি খুব স্পষ্ট। ভবনটির একদিকে রাস্তা ও আর একদিকে বড় একটি আর্ট চত্বর- যেখানে সব সময় আর্টের মেলা লেগেই থাকে; এতো ভালো কথা। কিন্তু ভবনটির এ কি ছিরি! রাস্তা বা চত্বর যেদিক থেকেই দেখি ভবনের বাহিরটি নানা রকম নল, ফানেল ইত্যাদি দিয়ে ঠাসা– পানির পাইপ, বর্জ্য নিষ্কাশন নল, বিদ্যুৎ তারের পাইপ, ভেতরে বাতাস ঢুকাবার জন্য জাহাজের মত ফানেল। সব ভবনেই এসব থাকে, কিন্তু ভেতরে সযত্নে লুকানো থাকে। কিন্তু এখানে এসবই দেখার জিনিস; সে সঙ্গে ভেতরের আরো জিনিস সিড়ি, লিফট, এসকেলেটর এইসবও বাইরে চলে এসেছে। স্থপতিদের উদ্দেশ্য বাজে প্রয়োজনে লাগা নল, সিড়ি ইত্যাদিকে যথাসম্ভব শিল্পসম্মত ভাবে বাইরে নিয়ে এসে ভেতরের একেবারে পুরো জায়গা মূল উদ্দেশ্য আর্টের জন্য ছেড়ে দেয়া। বাইরে যা আনা হয়েছে তাকে লুকোবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করা হয়নি। বরং মানুষ দেখছে কোন নল কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে কারণ বিভিন্ন নলের রয়েছে বিভিন্ন কটকটে চোখে পড়া রং। ওপরে ছাদের দর্শনকেন্দ্রে যেতে মানুষও এসকেলেটরে চড়ে যাচ্ছে তাও সবাই দেখছে। ইচ্ছে ছিল ভেতরটাকে আবদ্ধ করা কোন দেয়ালই থাকবেনা– চত্বর থেকে মানুষ ওই হাওয়া খেতে খেতেই কখন যে ভেতরে আর্টের প্রদর্শনীর মধ্যে চলে গেছে বুঝতেই পারবেনা। সেখানে পাতলা পার্টিশনে ঘেরা অসংখ্য কামরার প্রত্যেকটিতে চলছে এক এক রকম আর্টের আয়োজন, প্রদর্শন, আলোচনা ইত্যাদি। নিরাপত্তার খাতিরে অবশ্য সামান্য কাচের আবরণ দিতেই হয়েছে। এত অভিনব স্থাপত্য রীতিতে প্রথম দর্শনে মানুষ রীতিমত শক্ পাবে এতে আর আশ্চর্য কী? এই প্রথম মানুষ দেখলো ভবনের নাড়িভুড়িকেই যেন বাইরে

এনে তাকেও শিল্পসম্মত করা যায়, এবং শুধু তাই নয় তাকে সহজেই বুঝতে দেয়া যায় একটি আধুনিক পাবলিক ভবন কেমন করে কাজ করে, এবং সেই কাজের প্রকাশটিও দারুণ একটি আর্ট।

১৯৮৬ সনের পর আরো বেশ ক'বার গিয়ে দেখেছি পম্পেদ্যু সেন্টারের জনপ্রিয়তা আর জনসম্পৃক্ততা কী ভাবে দিন দিন বেড়েছে। এখন বরং নানা বাস্তব কারণে তাতে সীমাবদ্ধতা নিয়ে আসাকেই মানুষ সমালোচনা করছে– যেমন ঢুকতে টিকেট বসানো। কিন্তু ওই দুই স্থপতির আইডিয়া নিয়ে সবাই কি এখন একমত? মোটেইনা। পাবলিক আর্টে পাবলিক মতামতের বৈচিত্র সব সময়েই থাকবে। পম্পেদ্যু সেন্টার নিয়ে আলোচনা সমালোচনা কখনো শেষ হয়নি– সেটিই ভাল, কারণ তাওতো একটি আর্ট!

জাজ সঙ্গীত থেকে ভাবের ছবি:

অনেকেই মনে করেন বিংশ শতাব্দীর গোড়াতে আমেরিকা থেকে উঠে আসা, বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানদের হৃদয় মথিত করা যে জাজ সঙ্গীত দুনিয়াকে কাঁপিয়েছে তা অন্য আর্টেও অবদান রেখেছে। অদ্ভুত বিষয় হলো দৃশ্যমান আর্টের কিছু বিশেষ সৃষ্টিকার তাঁদের চিত্রশিল্পের প্রেরণা হিসেবেও জাজকে উল্লেখ করেছেন। জাজ সঙ্গীতের বিশেষ শিল্পী, যেখানে সাধারণত এই সঙ্গীত সৃষ্টি হয় তার চারপাশের পরিবেশ, তার বিশেষ বিশেষ বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির প্রত্যেকে এবং প্রত্যেকটি যে কোন আর্টিস্টের মনে আলাদা রকম ভাবের সৃষ্টি করতে বাধ্য– এমন বলিষ্ঠ ওই সঙ্গীত। চিত্রশিল্পীদের অনেকে এই বিষয়গুলোকে নিজেদের ছবিতে ফুটিয়ে তুলেছেন, তাঁদের ছবির থীম হিসেবে বেছে নিয়েছেন ওগুলোকে। কিন্তু ব্যাপারটা সেখানেই থেমে থাকেনি।

বিংশ শতাব্দীর একেবারেই বিমূর্ত ছবি আঁকার জন্য খুব সুপরিচিতদের কথা বলতে গেলে মনোযোগ কাড়ার দিক থেকে জ্যাকসন পলোকের নাম এসেই যাবে। তাঁর 'অ্যাকশন পেইন্টিং'গুলো মিউজিয়ামে বিশাল সব টাঙ্গানো নমুনায় দেখতে যেমন দর্শকরা ভালবাসেন তেমনি সিনেমায় সেই এ্যাকশন পেইন্টিং তিনি কেমন করে এঁকেছেন সারা শরীর দিয়ে, ক্যানভাসে রং ছিটিয়ে, এর ওপর শুয়ে পড়ে ইত্যাদি নানা ভাবে, তাও বেশ দর্শকনন্দিত

বিষয়। পলোক বলতেন তাঁর এই এ্যাকশন পেইন্টিংয়ে যে তাল-লয়, এর চকিত গতি, এর মুক্ত স্বাধীনতা এগুলো সব জাজ সঙ্গীতেরই অন্য প্রকাশ। আসলে আরো বৃহত্তর আঙ্গিনায় বিংশ শতাব্দীর আধুনিক এক্সপ্রেশনিস্ট চিত্রকলার ক্ষেত্রেই এ কথাটি বলা যায়। এক্সপ্রেশনিস্ট শিল্পী যা চোখে দেখছেন তা ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত নন্, তিনি বরং তাঁর অনুভূতি ও আকুতিটিকেই প্রকাশ করতে চান, জাজ সঙ্গীত-শিল্পীও যা করেন। উভয়ে তাঁদের বুক ফাটা আর্তনাদগুলোকে আর্টে রূপ দিতে চান। একই স্নায়ু অনুভূতি থেকে আসে বলে একজনের ক্ষেত্রে আওয়াজের মধ্যে, আরেকজনের ক্ষেত্রে ক্যানভাসের ওপর একই স্নায়ু অনুভূতির প্রকাশটিকে দেখা যায়।

সব সঙ্গীতেরই হয়তো ছবি হবার গুণ রয়েছে। অনেকে লোকজ সঙ্গীতের মধ্যেও খুবই সমৃদ্ধ একটি দৃশ্যময়তা খুঁজে পান– গ্রামের ধান ক্ষেতের দৃশ্য, কিংবা হাটখোলায় মেলার দৃশ্য। তাকে অন্য শিল্পী সহজেই চিত্রে রূপ দিতে পারেন। কিন্তু এক্ষেত্রে জাজের বিশেষ বলিষ্ঠতা রয়েছে বলে অধিকাংশ চিত্র-শিল্পীরা উল্লেখ করেছেন। তাঁরা জাজের প্রত্যেকটি বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজের মধ্যেই একটি পৃথক স্বাদের চিত্রকল্প অনুভব করেন। প্রত্যেকটিই বলিষ্ঠ, কিন্তু পৃথক রকমের বলিষ্ঠতা। এ যেন সবই জ্বলজল করা রং, কিন্তু প্রত্যেক রং আলাদা। যখন পুরো একটি জাজ এ্যানসেম্বল তাঁরা শোনেন তখন স্বাভাবিক ভাবে একটি নানা রঙের, নানা প্যাটার্নের সমন্বিত চিত্র তাঁদের তুলিতেও ধরা পড়ে।

এই যে জাজের থেকে প্রেরণা লাভ এজন্য বিখ্যাত চিত্রকর হবার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁদের বাইরেও বহু জনপ্রিয় আর্টিস্ট ও তাঁদের গুণগ্রাহীরা সঙ্গীতের সঙ্গে চিত্রে এই দ্বৈরতটি খুবই উপভোগ করেন। এমনি একজন আর্টিস্ট বেন প্যানজেলা ৬১ বছর বয়সে ২০২৩ সালের ৮ মে মারা গেলে তাঁর শিল্পী জীবনের এই দিকটি কিছুটা আলোচনায় এসেছে। এই মহিলা যুক্তরাষ্ট্রে নিউইয়র্ক স্টেটের আলবেনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে কাজ করেই তাঁর আর্ট সৃষ্টিগুলোর অধিকাংশই করতে পেরেছেন। মূলত তিনি চিত্রশিল্পী। তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল জাজ সঙ্গীত ও বেইস বল খেলার উন্মাদনাকে চিত্রে জীবন্ত করে তোলা। স্থানীয় কেউ কেউ এমনো মন্তব্য করতেন যে প্যানজেলার ছবিকে যেন নাচতে দেখা যায়। আর এক চিত্র

সমালোচকের মন্তব্য হলো একাধিক বিভিন্ন গায়ক গায়িকার মিলিত জাজ ব্যান্ডের সঙ্গীতকে প্যানজেলা এমন ভাবে তাঁর ছবিতে ধারণ করতে পারতেন যেন মনে হতো ব্যান্ডকে না দেখেই আমি ব্যান্ডের সামনে বসে তাদের সঙ্গীত শুনছি। এমন পুরো দস্তুর ব্যান্ডের সঙ্গীতের জন্য যেটি সত্য তেমনি সাধারণ মানুষের জন্যও। একজন তরুণের মুখের যে মুখবাঁশি মাউথ অর্গ্যান বা হারমোনিকায় সে যে জাজের সুর তুলছে তার মূর্ছনাকেও যেন প্যানজেলা তাঁর দ্রুত আঁকা ছবিতে তুলে আনতে পারতেন। একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ব্যান্ডের সামনে বসে তিনি মূর্ছনাকে স্কেচ করে নিতেন। পরে সেই স্কেচ আর স্মৃতি থেকে তৈরি হতো পূর্ণাঙ্গ ছবি!

বিজ্ঞানময় আর্টস

বিজ্ঞানেও প্রতিসাম্য, আর্টেও তাই

প্রতিসাম্যেই সৌন্দর্যঃ

আর্ট মানে যদি সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তা হলে সাধারণত তা আর্টের মধ্যে এক রকম ভারসাম্য থেকেই আসে। অবশ্য প্রত্যাশিত ভারসাম্যটি না খুঁজে পাওয়ার ব্যতিক্রমটাও অনেক সময় আর্ট হয়ে ওঠে, কারণ অভিনবত্ব আর্টের একটি বড় উপাদান। যেমন প্রযুক্তি কোম্পানী অ্যাপলের যে লোগো একটি আপেল, কিন্তু তার ডানে কামড় দিয়ে একটি অংশ খাওয়া অবস্থায় দেখা যায়। ওই কামড় দেয়া অংশটি যদি না থাকতো তা হলে আপেলটির পুরো প্রতিসাম্য রক্ষিত হতো; বলতে গেলে বোঁটাটি ছাড়া ডানে বামে এবং ওপরে নিচে প্রতিসাম্যের জন্য এটি দেখতেও বেশ সুন্দর হতো। শুধু এর মত দৃশ্য সৃষ্টির আর্ট নয় অন্য সব রকম আর্টেই সাধারণত এমনি ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করা হয়; সেটি সঙ্গীতে, সাহিত্যে, যেখানেই হোক। এমন ভারসাম্য মনে আনে একরকম সৌন্দর্য-ভাব, একটি আশ্বাসের আনন্দের ভাব। তা হলে অ্যাপলের লোগোতে ইচ্ছে করে ওই কামড়ের দাগ বসিয়ে ভারসাম্যটি নষ্ট করা হলো কেন? এখানে প্রত্যাশিত ভারসাম্যের অভাবটিকেই আর্ট হিসেবে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে নিখুঁত প্রতিসাম্যের থেকে। কারণ ওই অভাবটি একে তো অভিনবত্ব সৃষ্টি করছে, আবার এই ফলটি যে আপেল সে খবরটিও তার সনাতন ব্যবহারটির মাধ্যমে নিশ্চিত করছে- নইলে ওই একই রকম প্রতিসাম্যের ও অবয়বের অন্য ফলও মনে করা যেতো একে– চেরি, প্লাম বা ওরকম অন্য কিছু। কিন্তু তাতে কামড়ের দাগ এমন হতোনা। তা ছাড়া কামড় দিয়ে আপেলটিকে কেন ক্ষত করা হয়েছে এই অনুসন্ধানটির জন্ম দেয়ার মাধ্যমেও আপেলটি আর্টের জগতে আরো কিছুটা এগিয়ে গেছে। এখানে চিন্তাটি কিন্তু প্রধানত প্রতিসাম্য অথবা তার অভাবকে নিয়েই।

ওই প্রতিসাম্যকে সুন্দর মনে করার ভাবটি কিন্তু মানুষের সহজাত, এবং তা মূলত গাণিতিক একটি ধারণা, যা আর্টবোধকে উদ্দীপ্ত করে। এই একই গাণিতিক ধারণা আবার বিজ্ঞানবোধকেও উদ্দীপ্ত করে। সেখানেও একে

একটি বৈজ্ঞানিক সৌন্দর্য হিসেবেই দেখা হয়। সব ক্ষেত্রে একে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে বলি সিমেট্রি বা প্রতিসাম্য। ডানেরটি বামে বামেরটি ডানে নিলে, ঘোরালে, ফেরালে যদি আগে যেমন ছিল তেমনিটই অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে তা হলে আমরা জিনিসটির মধ্যে একটি প্রতিসাম্য দেখতে পাই। যেমন আয়নার প্রতিচ্ছবিতে ডানটি বাম হয়ে যায়, বামটি ডান হয়ে যায় অথচ তাতে চেহারার বা শরীরের অবয়বে কোন পরিবর্তন দেখায়না– তা হলে বলতে পারি আমাদের একটি বাম-ডান প্রতিসাম্য আছে, অথবা প্রতিফলন প্রতিসাম্য আছে। আরো সব কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে গণিতের মতো করে যদি বলি তা হলে কোন জিনিসের ওপর কোন গাণিতিক 'অপারেশনের' পর যদি হুবহু সেই রকম চেহারাতেই জিনিসটি থাকে তা হলে ওই অপারেশনের জন্য ওটি প্রতিসম। যেমন আয়নায় যা প্রতিফলন তা পজিটিভকে নেগেটিভ করার তুল্য একটি গাণিতিক অপারেশন– যেহেতু এতে আমার চেহারা একই রইলো, তাই এটি ওই অপারেশনের জন্য প্রতিসম। একটি বর্গক্ষেত্রকে যদি ৯০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিই তা হলে বোঝা যাবেনা যে আদৌ কিছু করেছি– তাই এটি ৯০ ডিগ্রি ঘূর্ণনে প্রতিসম। ওই প্রতিসাম্যের কারণেই এই উভয় ক্ষেত্রে একটি সৌন্দর্য আছে; আগে দেখা যাক এই সৌন্দর্যটি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কেন অপরিহার্য।

প্রতিসাম্যের ওই ব্যাপারটি আসলে গাণিতিক, সে জন্যই গাণিতিক অপারেশনের কথাটি এসেছে– বাম-ডান করা, ঘোরানো, উল্টানো এই সবই গাণিতিক অপারেশন। আমাদের মস্তিষ্ক নিত্যতা ভালবাসে, অর্থাৎ কোন জিনিসের এসব ঘোরানো-ফেরানো সত্ত্বেও একই থাকাটিকে ভালবাসে। সে জন্যই মস্তিষ্কের মধ্যে যে গণিতের জন্ম তা প্রতিসাম্য পছন্দ করে। ওপরে বর্গক্ষেত্রকে ৯০ ডিগ্রি ঘোরানোর কথা বলা হয়েছে। বর্গক্ষেত্র না হয়ে যদি আয়তক্ষেত্র হয়, চারটি বাহু পরস্পর সমান নয় তবে সমান্তরাল দুই বাহু পরস্পর সমান, সেক্ষেত্রে ৯০ ডিগ্রি ঘূর্ণনে এটি প্রতিসম হবেনা, তবে ১৮০ ডিগ্রি ঘূর্ণনে হবে। প্রতিসাম্য কিছুটা কমে গেল– বর্গক্ষেত্রকে দৈর্ঘ-প্রস্থ সমান পেয়ে মনে যতটা পুলক হয়, এক্ষেত্রে এতটা হবেনা, তবে একেবারে অনিয়মিত চতুর্ভূজের থেকে তো এটাও ভাল। এটিই হলো প্রতিসাম্যের একেবারে সহজ বর্ণনা। এখানে গণিতটাও একেবারে সহজ। কিন্তু আরো জটিলতর গাণিতিক অপারেশনে যদি নিয়ে যাই সেখানেও প্রতিসাম্য আমাদের

জন্য প্রত্যাশিত হয়– যা অবশ্য ওই গণিতে না ঢুকলে বোঝা যাবেনা। বিজ্ঞান যেহেতু গণিতকে ব্যবহার করে, এসব প্রতিসাম্য আশা করা বিজ্ঞানেরও মজ্জাগত হয়ে দাঁড়িয়েছে– সে প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে তা আশা করে; কখনো প্রতিসাম্য ভঙ্গ হতে দেখলে তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। কারণ প্রতিসাম্য হলো তার জন্য একটি দিগদর্শক দড়ির মত, দুর্গম পর্বতে ওঠার সময় পর্বতারোহী যেমন আগে থেকে শক্ত করে আটকানো একটি দড়ি ধরে ধরে উঠতে পারেন অনেকটা সেভাবে বিজ্ঞানকে উদ্ঘাটনের দিকে নেয়া যায় প্রতিসাম্যকে অনুসরণ করে। প্রতিমাস্য ভঙ্গ হওয়া মানে ওই দড়িটি হারিয়ে ফেলার মত।

বিজ্ঞানে প্রতিসাম্যের সৌন্দর্য:

খুব সহজ একটি উদাহরণ নিলে পদার্থবিদ্যায় যখন বৈদ্যুতিক চার্জের কথা বলি শেষ অবধি পজিটিভ চার্জ কতটা আছে, এবং নেগেটিভ চার্জ কতটা আছে তাতে কোন পরিবর্তন হতে পারবেনা প্রতিসাম্যের কারণে– আর এই ব্যাপারটির ওপর ভরসা রাখতে পারি বলে বাকি কাজ বিজ্ঞানের জন্য সহজ হয়। এতো বিচিত্র রকমের মৌলিক কণিকা রয়েছে ইলেকট্রন, প্রোটন ইত্যাদি তাদের সংখ্যা অনেক, আচরণও বহুতরো। অথচ তাদের মধ্যে সুন্দর একটি গাণিতিক শৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পেরেছে আধুনিক কণিকাবিদ্যা, যে শৃঙ্খলাকে বলা হয় স্ট্যান্ডার্ড মডেল। এটি সম্ভব হয়েছে এর ভেতরকার প্রতিসাম্যগুলো দেখে দেখে। প্রতিসাম্যগুলো প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে বিজ্ঞানকে এখন অনেক কণিকা নিয়ে নয়, বরং কয়েকটি কণিকা-শ্রেণী নিয়ে কাজ করতে হয়।

গত শতাব্দীতে পদার্থবিদ পল্ ডিরাক কোয়ান্টাম থিওরিতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছিলেন ইলেকট্রনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ কোয়ান্টাম সমীকরণ নির্ণয় করে। তাঁর নিজের ভাষ্যমত এটি তিনি করতে পেরেছিলেন সমীকরণটির প্রতিসাম্যের সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থার কারণে। শুধু তাই নয় এই আস্থার কারণে তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ একটি নতুন কণিকা জগতের ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়েছিলো। সমীকরণটি নিয়ে তিনি একটি বড় সমস্যায় পড়েছিলেন– এর সমাধান এলো চারটি, যেগুলো চমৎকার ভাবে প্রতিসম বটে, কিন্তু এর মধ্যে দুটি সমাধান এলো ঋণাত্মক, যা কিনা অদ্ভুত ভাবে কোন ঋণাত্মক শক্তির কথা বলে, যা অর্থহীন। এরকম ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা হয়

অর্থহীন সমাধানগুলো বাদ দেন, অথবা পুরো সমীকরণটাই বাতিল করে নতুন কিছুর চেষ্টা করেন। ডিরাক অসম্পূর্ণ কিছু চান্‌না আর তাঁর এত সুন্দর এত প্রতিসম সমীকরণকে বাদ দিয়ে সমস্যাহীন অথচ বিদঘুটে কোন সমীকরণে যেতেও তিনি রাজি নন। অন্য অনেক বিজ্ঞানীর মত তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এমন সৌকর্যময় গাণিতিক সৌন্দর্য যেখানে রয়েছে তা কাকতালীয় ভাবে আসতে পারেনা, মিথ্যা হতে পারেনা। তিনি বরং বললেন তাঁর অতি সুন্দর প্রতিসম ঋণাত্মক সমাধান দুটির মাধ্যমে প্রকৃতি তাঁকে কিছু বলার চেষ্টা করছে। ঋণাত্মক শক্তি যেটি আমরা বলছি সেটি আসলে ইঙ্গিত দিচ্ছে ইলেকট্রনের বিপরীত চার্জ সম্পন্ন অজানা আর একটি কণিকার, যা হবে ইলেকট্রনের প্রতি-কণিকা এন্টি-ইলেকট্রন; পরে যাকে বলা হয়েছে পজিট্রন। ইলেকট্রনের চার্জ নেগেটিভ, ঠিক সেই টুকু পজিটিভ চার্জ পজিট্রনের। কিন্তু এমন কোন পজিটিভ কণিকার কথা তো জানা নেই, কেউ কোনদিন তার কোন আলামতও পায়নি! ডিরাক বল্‌লেন আমার সমীকরণ বলছে আছে, খুঁজলেই পাওয়া যাবে।। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সত্যিই পাওয়া গেলো পজিট্রন। শুধু তাই নয় সব কণিকার একটি প্রতি-কণিকা– একটি নতুন জগতই সৃষ্টি হলো প্রতি-কণিকার জগত।

প্রতিসাম্য যেমন এরকম দারুণ উৎসাহব্যঞ্জক ইতিহাস সৃষ্টি করেছে, তেমনি প্রত্যাশিত প্রতিসাম্য হঠাৎ অনুপস্থিত দেখে বিজ্ঞানীদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার মত ঘটনাও ঘটেছে। ১৯৫৬ সালে ইয়াং এবং লী নামের দু'জন চীনা-আমেরিকান পদার্থবিদ এমনি এক প্রতিসাম্য ভঙ্গের বিষয় আবিষ্কার করে বিজ্ঞান জগতকে হকচকিয়ে দেন, সেই থেকে এমন প্রতিসাম্য ভঙ্গ পদার্থবিদ্যার নিয়মিত গবেষণায় চলে আসতে বাধ্য হয়েছে। আয়নার প্রতিফলনে আমরা যে রকম নিজেদের ডান বাম প্রতিসাম্য দেখি– শুধু ডান হাতটি আয়নায় বাম হাত হয়ে যায় এবং বাম হাতটি ডান, তাকে বলা হয় প্যারিটি। কণিকাবিদ্যায় কণিকাগুলোর বিক্রিয়া যদি গাণিতিক ভাবে আয়না প্রতিফলনের মত করে দেখি সেখানেও এই প্যারিটি বজায় থাকে সব প্রাকৃতিক নিয়মের মত– প্রতিফলনে যে বিক্রিয়া দেখি তাতে বাম-ঘূর্ণনের কণিকা ডান-ঘূর্ণনের কণিকায় পরিণত হয়। কিন্তু ইয়াং আর লী তাত্ত্বিক ভাবে দেখালেন যে নতুন কিছু কণিকা বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটি ঘট্‌ছেনা, কোন একদিকের ঘূর্ণনের দিকে যেন পক্ষপাতিত্ব দেখা যাচ্ছে– এরকম প্যারিটি ভঙ্গ

হওয়া অর্থাৎ বাম-ডান প্রতিসাম্যের অভাব প্রকৃতির কাছ থেকে আশা করা যায়না। শুধু তাই নয় শিগ্‌গির আর একজন চীনা-আমেরিকান মহিলা বিজ্ঞানী চিয়েন-শি উং উ একেবারে ল্যাবোরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে এই প্যারিটি ভঙ্গটি প্রমাণ করে দিলেন। আকাশ ভেঙ্গে না পড়ে উপায় কী?

স্থান ও কালের প্রতিসাম্য গুণ:

আমরা বৈদ্যুতিক পজিটিভ যত চার্জ তার পরিমাণ একটি সিস্টেমের মধ্যে সব সময় সমান থাকাটিকে একটি প্রতিসাম্য হিসেবে দেখেছি; তেমনি নেগেটিভ চার্জের পরিমাণও। এভাবে যে কোন অবস্থা সব সময় সমান থাকাটিকে বলা হয় নিত্যতার নিয়ম– ওটি নিত্য একই থাকে বলে। আসলে সব নিত্যতার নিয়মই কোন একটি জিনিসের মধ্যে কোন না কোন প্রতিসাম্যেরই ফলশ্রুতি। এটি পদার্থবিদ্যার নিত্য থাকা বেশ কিছু বিষয়ের জন্য সত্য। কিন্তু একেবারে খুব মৌলিক পর্যায়ে তিনটি অবস্থা নিত্য একই থাকাটি আমাদেরকে বেশ নাড়া দিতে পারে। এর মধ্যে একটি হলো মোমেন্টাম বা ভরবেগ। গতিতে গিয়ে কোন কিছু যখন অন্য জিনিসকে ধাক্কা দেয় তখন ধাক্কার পরিমাণটি এটিই দিয়েই বোঝা যায়– এর ভর যত বেশি হয়, এবং এর সোজা যাওয়ার বেগ যত বেশি হয় সোজা ধাক্কাটিও তত বেশি হয়। একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমে নানা বস্তুর মধ্যে ধাক্কাধাক্কি যতই হোক না কেন, শুরুতে সব ক'টার ভরবেগ যোগ করলে যত ছিল, এত ধাক্কাধাক্কির পরের যে কোন মুহূর্তেও ওই যোগফল ঠিক তাই থাকে। ভরবেগের এই নিত্যতা জানার ফলে বিজ্ঞানীর পক্ষে ওই সব গতি নিয়ে কাজ করাটি সহজ হয়। সোজা গিয়ে ধাক্কা না দিয়ে বাঁকা গতিতে গিয়ে ধাক্কা দিলে আরেক রকমের ভরবেগ মাপা যায় যাকে বলে কৌণিক ভরবেগ। এটিও সব সময় নিত্য থাকে। তেমনি আরো একটি খুব মৌলিক জিনিস নিত্য থাকে, তা হলো শক্তি। একটি সিস্টেমের মোট শক্তি কখনো বাড়তেও পারেনা, কমতেও পারেনা।

গত শতাব্দীর শুরুর দিকে জার্মান মহিলা গণিতবিদ এ্যামি নোয়েথার একটি চমৎকার গাণিতিক সম্পর্ক আবিষ্কার করেছিলেন- এই যে তিনটি মৌলিক গতীয় গুণ সব সময় নিত্য বা সমান থাকে তার প্রত্যেকটি খুবই পরম পর্যায়ের এক একটি প্রতিসাম্যের কারণেই– সেই প্রতিসাম্যগুলো সবকিছুর অস্তিত্বের সঙ্গে এতই জড়িয়ে যে আমরা তার অন্যথা চিন্তাও

করিনা। যেমন নোয়েথারের গণিত থেকে দেখা যায় যে ভরবেগের নিত্যতা সম্ভব শুধু যে রকম স্থানে (স্পেস) কোন এক বিন্দুর সঙ্গে অন্য কোন বিন্দুর কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ সেই স্থান নিয়ে মহাবিশ্ব তার এক বিন্দুতে বিজ্ঞানের কোন নীতি যে রকম হবে, অন্য সব বিন্দুতেই তাই হবে যে কারণে বিজ্ঞানের কোন নিয়ম এই জায়গায় এক রকম, অন্য জায়গায় অন্য রকম হতে পারেনা, আমরা কখনো হতে দেখিনি। এর থেকে বলতে পারি স্থানের সব অবস্থান একই, তাই এদিক থেকে তার পূর্ণ প্রতিসাম্য রয়েছে। একটু কল্পনা করলেই বুঝতে পারবো এই প্রতিসাম্য না থাকলে প্রকৃতিটি কী রকম হতো; শুধু বিজ্ঞানের নয়, আমাদের বহু রকম চিন্তাই এলোমেলো হয়ে যেতো, বহু রকম আর্টও।

একই ভাবে নোয়েথারের গণিত দেখিয়ে দেয় যে মোট কৌণিক মোমেন্টাম সব সময় নিত্য থাকার অর্থ হলো স্থান তার দিকের দিক থেকেও প্রতিসম। গতির নিয়ম স্থানের বিভিন্ন দিকের গতির ক্ষেত্রে কোন বাছবিচার করেনা, একই থাকে। বিজ্ঞান এটি ধরে নিয়ে কাজ করতে পারে বলেই প্রকৃতির নিয়মগুলো এতো সুসমঞ্জস হতে পেরেছে। আরো চমকপ্রদ হলো ওই গণিতই দেখিয়ে দিয়েছে শক্তির নিত্যতা থাকতে গেলে সময়কে প্রতিসম হতে হয়; অতীতের দিকে বা ভবিষ্যতের দিকে যে ভাবেই সময়কে বদলাইনা কেন এর মধ্যে কোন সময় অন্য কোন সময়ের থেকে আচরণের দিক থেকে আলাদা কিছু নয়। বিজ্ঞানের একটি এক্সপেরিমেন্ট আজ করেছি বলেই তার ফলাফল কাল করার থেকে আলাদা হতে পারেনা। স্থান আর কালের এই প্রতিসাম্যগুলো না থাকলে বিজ্ঞান, আর্ট, আমাদের চিন্তা সবই কি ভীষণ গোলেমালে পড়ে যেতোনা? অথচ এই স্পষ্ট দেখা যাওয়া প্রতিসাম্যগুলোই জন্ম দিয়েছে বিজ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও গূঢ় অর্থ বহনকারী নানা ফলাফল। সেদিক থেকে এগুলো বিজ্ঞানের সব কিছুকে ধারণ করা বড় বড় স্তম্ভ।

আর্টিস্ট যখন তাঁর আর্টের চর্চা করেন সেটি সাহিত্যই হোক, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত যাই হোক তাঁর কাজও স্থাপিত হয় স্থানে ও কালে। এগুলোর প্রতিসাম্য তাঁদের সব কাজের পশ্চাদভূমি হিসেবে থাকে। এই প্রতিসাম্যের একটি বিস্তৃতিও হয়তো তাঁদের কাজে ঘটে। নানা জায়গার এমনকি নানা দেশের বা সংস্কৃতির মানুষের কথা যখন তাঁরা ভাবেন তাঁদের মধ্যে ওই সব

মানুষের প্রতি একই অনুভূতি কাজ করতে পারে। নানা কালের কথাতেও অনুভূতি কালের সঙ্গেও পরিবর্তিত না হবারই কথা।

নানা আর্টে প্রতিসাম্য:

প্রতিসাম্য যে আর্টের পেছনেও কাম্য সেটি বেশ ভাল বোঝা যায় সব রকমের আর্টে। তাঁর সমীকরণের উচ্চ প্রতিসাম্য বিজ্ঞানী ডিরাককে যেমন উদ্বুদ্ধ করেছিলো সে রকম যে কোন আর্টিস্ট নিজের সৃজনের মধ্যে যত উচ্চ প্রতিসাম্য আনতে পারেন তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন। দৃশ্য-নির্ভর আর্টগুলোতে এই বিষয়টি একেবারে স্পষ্ট দেখা যায়। অবশ্য এর মধ্যে মাথায় তুলে রাখা ক্ল্যাসিকাল আর্টগুলোতে যে রকম মৌলিক প্রতিসাম্য আনাকে গুরুত্ব দেয়া হতো– যেমন ডান-বাম বা প্রতিফলন প্রতিসাম্য, পরবর্তী কালে তা করা হয়নি। গ্রীক ও রোমান ভাস্কর্যে যে দেবদেবী ও মানব-মানবীর মূর্তি গড়া হয়েছে তার মুখমণ্ডলের ও দেহের একেবারে নিখুঁত বাম-ডান প্রতিসাম্যগুলো লক্ষ্য করার মত; মনে হবে যেন একেবারে গাণিতিক ভাবে প্রতিসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। এপাশ ওপাশ একেবারেই একই। গ্রীক গণিতবিদরা সব থেকে সরল এবং নিখুঁত প্রতিসাম্য মনে করেছেন বৃত্ত আকৃতিকে, যে কারণে প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা মহাকাশের গ্রহ তারা ইত্যাদির গতিপথকে নিখুঁত বৃত্তাকার বলে ধরেই নিয়েছেন, স্বর্গীয় মহাজাগতিক জ্যোতিষ্কগুলোর গতিপথ ওরকম নিখুঁত ও সরলতম প্রতিসাম্য মানবে এটাইতো স্বাভাবিক। প্রাচীন শিল্পীর কাজও এই বৃত্তাকার প্রতিসাম্যটি গুরুত্ব পেয়েছে। এর কেন্দ্রই হলো সব কিছুর ঘনীভূত ফোকাস, তারপর যতই কিনারার দিকে যাবে অনেকটা রশ্মির মত সবদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সব সময় একটি বৃত্তীয় ভারসাম্য বজায় রেখে।

ক্যানভাসের ছবিতে এই প্রতিসাম্য দর্শকের স্নায়ুতে একটি সরল অনুরণন সৃষ্টি করে, সেটি রয়েছে এমন নান্দনিকতার মূলে। কিন্তু যতই সময় এগিয়েছে দৃশ্য-নির্ভর শিল্পে প্রতিসাম্যগুলো এতো সরল প্রকৃতির থাকেনি। যেমন রেনেষাঁর ও তার পরবর্তী চিত্রশিল্পে বহু পাত্র-পাত্রী নিয়ে জটিল চিত্রের মধ্যেই সেই টানাপোড়েন ও ড্রামা লক্ষ্য করা যায় তার ভেতরেই একটি প্রতিসাম্য গড়ে তোলা হয়, যেন এক পাশের চিত্রকে অন্য পাশের সঙ্গে সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করেই আঁকা হয়েছে। যখন এক পাশে মানুষের ভিড়ে ভারী হয় তখন অন্য পাশে অন্তত অন্য কিছু যেমন দালান কোঠা দিয়ে তাকে

ব্যালেন্স করা হয়েছে। দর্শক মনোযোগী হলে ওই প্রতিসাম্য ঠিকই ধরতে পারবেন, এবং এটিও তাঁর মনে অনুরণন জাগাবে।

আর্টিস্টের আরেকটি প্রকাশভঙ্গি হলো প্রতিসাম্য ভঙ্গ করে অন্য রকম অভিনবত্বের সৃষ্টি করা, দর্শককে যেন শক্ দিয়েই আসে সেই অভিনবত্ব। এখানেও বিজ্ঞানের সঙ্গে তার সাযুজ্য রয়েছে। দৃশ্য-নির্ভর আর্টে এরকম যখন প্রতিসাম্য ভঙ্গ হয় তখন মসৃণ আর্টের ভেতর এখানে এসে দর্শক যেন একটি ধাক্কা খান। প্রতিসাম্য ভঙ্গ হবার মানে হলো ওই জায়গায় গিয়ে ভারসাম্য নষ্ট হওয়া– যেমন যেখানে বাম ডানে প্রতিসাম্য ছিল তখন কেমন যেন চোখে লাগার মত বামে বা ডানে বেশি ঝুঁকে পড়া, অনেক ঘন জটিলতা ক্যানভাসের কোন এক কোণায় জমে ওঠা যা অন্য কোণায় অনুরূপ জটিলতা দিয়ে কৌণিক প্রতিসাম্যে আসেনি। এমন বিষয় সাধারণত বিস্ময়ের সৃষ্টি করে; বিষাদ, জেদ, রাগ, সংকল্প ইত্যাদি চরম আবেগের সৃষ্টি করতে পারে। এও দর্শককে নাড়া দেবার একটি উপায়– কাজেই ওটিও উচ্চতর একটি আর্ট। অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্টিস্টরা অনেক সময় একেবারেই নৈর্ব্যাক্তিক কিছু প্রতীক ইত্যাদির বিন্যাস শুধু বড় ধরনের প্রতিসাম্য ভঙ্গের মাধ্যমে দুঃখ, রাগ ইত্যাদি আবেগ সৃষ্টি করতে বা বাড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। যেমন একটি বড় ঝড়ের মূল শক্তিটিকে চিত্রে ধারণ করার জন্য এতে গাছপালার আন্দোলিত হওয়া, উপড়ে যাওয়া, বাড়ির উড়ে যাওয়া টিনের ছাদ ইত্যাদি আঁকার দরকার হয়না তাঁদের। শুধু রঙের ও নানা আকৃতি চিহ্নের রেখার বিন্যাসের ও তাদের ওপর রঙের বলিষ্ঠ প্রয়োগ বাড়িয়ে কমিয়ে প্রবল শক্তিকে অনুভব করানো যায়– প্রতিসাম্যের খেলা দিয়ে।

সঙ্গীতে প্রতিসাম্য। সঙ্গীতে প্রতিসাম্যের উপস্থিতি বা প্রতিসাম্য ভঙ্গ অনেকটা দৃশ্য-নির্ভর আর্টের মতই স্পষ্ট। গানের সরল সুরগুলো এই প্রতিসাম্যের ওপর খুবই নির্ভর করে, যেখানে একটি কথা ও সুর বার বার ঘুরে ঘুরে আসে- ওই পুনরাবর্তনটির জন্যই এটি শ্রুতিমধুর হয়। পরিচিত নজরুল গীতিতে দেখি: 'মোমের পুতুল মমির দেশের মেয়ে নেচে যায়, বিহবল চঞ্চল পায়; বিহবল চঞ্চল পায় ...' পুনরাবৃত্তি গানের এই অংশের প্রতিসাম্যটি স্থাপন করে দেয়। এর পরের অংশ একটু দীর্ঘ ভিন্ন দৈর্ঘে একই ছন্দে তাও পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে প্রতিসাম্য আনা। কিন্তু মাঝখানে আগের

ছন্দটি কেটে গিয়ে বেশ দীর্ঘ ছন্দে 'বাজায় ঘুমুর ঝুমুর ঝুমুর মধুর ঝঙ্কারে। উড়িয়ে ওড়না লু হাওয়ায়, পরী নটিনী নেচে যায়'। এখানে উচ্চতর খাদে চলে যায় সুর প্রতিসাম্য ভঙ্গ হয়ে একটু বিস্ময় সৃষ্টি হয়। পরেই কিন্তু পরের মুহূর্তে বিস্ময় কেটে গিয়ে আবার পুরানো প্রতিসাম্য ফিরে যাওয়া– মোমের পুতুল ...। আধুনিক সঙ্গীতে এই প্রতিসাম্য ভঙ্গের ঘটনাগুলো আরো ঘন ঘন আসে, অনেক জটিল হয়ে আসে; তাই সেখানে সঙ্গীতে প্রতিসাম্য ভঙ্গের টেনশন অনেক তীব্র হয়ে আসতে পারে আর এর নিরসণের ব্যবস্থাও অনেক কঠিন হতে পারে। এর তরুণ-তরুণী সুরকার-গায়কদের ওপর শারীরিক ও মানসিক চাপ অনেক বেশি হতে পারে। প্রতিসাম্যের সরল মাধুর্যের থেকে অপ্রতিসাম্যের ভাঙ্গা-গড়াটাই এখানে বেশি গুরুত্ব পায়।

কিন্তু আধুনিক পপ সঙ্গীতে শুধু নয় কালজয়ী ক্ল্যাসিকাল মিউজিকেও প্রতিসাম্যের এমন ভাঙ্গা গড়াকে বরাবরই খুব চমৎকার ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিটোফেনের বিখ্যাত পঞ্চম সিম্ফোনিটি সবারই কানে প্রায়শ বাজে। এই সিম্ফোনির স্পষ্ট চারটি নোটের যে অংশটি বার বার ঘুরে ফিরে এসেছে পুনরাবৃত্তির কারণে তা একটি সার্বিক প্রতিসাম্য এনে দিয়েছে আগাগেড়া সিম্ফোনিতে। কিন্তু একেবারে শুরুতেই সিম্ফোনিটি যখন তার মূল মেজাজে প্রতিষ্ঠিত হবার চেষ্টা করেছে তখনই এই চারটি নোটই যেন প্রতিসাম্য ভেঙ্গে দারুণ একটি টানাপোড়েন সৃষ্টি করছে এবং একই সঙ্গে ওখান থেকে বের হবার জন্য একটি প্রত্যাশা সৃষ্টি করছে। সত্যিই পরে ওই প্রত্যাশা পূরণ হয়, চার নোট সহ তাতে সুরের ভারসাম্য ফিরে আসে, যে প্রতিসাম্যের মেজাজটি এরপর বরাবর বজায় থাকবে সেটি ফিরে আসে। তবে আধুনিক পপে গড়াটি কম, প্রতিসাম্য ভাঙ্গাটিই বেশি।

সাহিত্যে প্রতিসাম্য। সাহিত্যেও আমরা এই একই জিনিস প্রায়ই দেখি। এটি দেখা যায় গদ্য পদ্য নির্বিশেষে যখন সাহিত্যে একটি ছন্দোময়তা সৃষ্টির চেষ্টা থাকে। পদ্যে সে জন্য পুনরাবৃত্তির ও অনুপ্রাসের চেষ্টা প্রায় সময়েই থাকে– যা প্রতিসাম্য সৃষ্টি বৈ নয়। গদ্যেও যে এটি হয়না তা নয়, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৈমন্তী গল্পের শুরুতে দেখি 'আমার কাজ আমি করিয়াছি, এফ এ পাশ করিয়া বৃত্তি পাইয়াছি– এতে একই দৈর্ঘ বাক্যাংশের পর পর করিয়াছি, পাইয়াছি এগুলোতে অনুপ্রাসের প্রয়াস এক ধরনের প্রতিসাম্য এনে

দিচ্ছে। একই ঘটনা ঘটে যখন একই কম দৈর্ঘের বাক্যাংশ বা বাক্য পর পর অনেকবার ব্যবহৃত হয়। একই লেখকের 'পায়ে চলার পথ' লেখাটি দেখা যাক। একই দৈর্ঘের কিছু বাক্যাংশ, তারপর ভিন্ন দৈর্ঘের পর পর আরো কয়েকবার, উভয় ক্ষেত্রে প্রতিসাম্য সৃষ্টি করে যায়। একই তালে যেন একটি ছন্দ সৃষ্টি করে।

'এইতো পায়ে চলার পথ। এসেছে বনের মধ্য দিয়ে মাঠে, মাঠের মধ্য দিয়ে নদীর ধারে; খেয়াঘাটের পাশে বটগাছ তলায়। .. তার পরে তিসির খেতের ধার দিয়ে, আমবাগানের ছায়া দিয়ে, রথতলার পাশ দিয়ে কোন্ গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছেছে জানিনে'। একেবারে প্রথম বাক্যটিকে ছন্দের বাইরে রাখা হয়েছে, তাতে মনে হয় একটি প্রতিসাম্য-ভঙ্গের থেকে উঠে এসেই তার পরই বোনা হয়েছে প্রতিসাম্যের বুনোট, সেই সঙ্গে সুন্দর কিছু মসৃণ দৃশ্যের বুনোট। এই উদাহরণে বাক্যের গঠনে যে রকম প্রতিসাম্য, তেমনি তার বক্তব্যেও প্রতিসাম্য। কিন্তু গঠনে একই ভাবে প্রতিসাম্য রেখেও বক্তব্যকে একেবারে বিপরীত প্রতিসাম্য বা অপ্রতিসাম্যতে আনা যায়। তাতে একের প্রতিসাম্য ও অন্যের বিপরীত প্রতিসাম্যটির সংঘাতটিও একটি আলাদা আর্ট সৃষ্টি করে। এর একটি বিখ্যাত উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি চার্লস ডিকেন্সের 'অ্যা টেইল অফ টু সিটিজ' উপন্যাসটি একেবারে প্রথম কয়েক বাক্যে:
'ইট ওয়াজ দি বেস্ট অফ টাইম, ইট ওয়াজ দি ওয়ার্স্ট অফ টাইম। ইট ওয়াজ দি এইজ অফ উইজডম, ইট ওয়াজ দি এইজ অফ ফুলিশনেস। ইট ওয়াজ দি ইপোক অফ বিলিফ, ইট ওয়াজ দি ইপোক অফ ইনক্রেড্যুলিটি'। .. বাংলা অনুবাদে: ওটি ছিলো সব চেয়ে ভাল সময়, ওটি ছিল সব চেয়ে খারাপ সময়। ওটি ছিল জ্ঞানের কাল, ওটি ছিল নির্বুদ্ধিতার কাল। ওটি ছিল বিশ্বাসের যুগ, ওটি ছিল অবিশ্বাসের যুগ। ...

কবিতায় প্রতিসাম্য সৃষ্টি এবং প্রতিসাম্য ভঙ্গ আরো নিয়মিত ভাবে হয় যেমন সনেট বা ১৪ লাইনের কবিতার একটি নিয়মই হলো একে ৮ ও ৬ লাইনে দুটি অংশে বিভক্ত করা, প্রত্যেকটি অংশের মধ্যে ছন্দে ও বক্তব্যে একটি প্রতিসাম্য বজায় রাখা, কিন্তু প্রথম অংশে পর সেই প্রতিসাম্য স্পষ্ট ভঙ্গ করে দ্বিতীয় অংশে যাওয়া। বক্তব্যটিও দ্বিতীয়াংশে কিছুটা ভিন্ন ভাবে একই মূল সুরের কথা বলে। উদাহরণ দেয়া যায় মাইকেল মধুসুদন দত্তের

কপোতাক্ষ নদ নামের সনেটটির। এর প্রথম ৮ লাইনে কবি এই নদীটির সঙ্গে তাঁর স্মৃতি স্মরণ করেছেন:

সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে

. . .

পরের ৬ লাইনের অংশে কবি নদীর প্রতি কিছু অনুরোধ রেখেছেন যার ভূমিকাটি করেছেন এভাবে, পরে অনুরোধটাও একই লয়ে ও প্রতিসাম্যে।

আর কি হে হবে দেখা? যত দিন যাবে
প্রজারূপে রাজরূপে সাগরেরে দিতে
বারি রূপে কর তুমি, এ মিনতি গাবে

দ্বিতীয় অংশের শুরুতে ভঙ্গি পরিবর্তন করে প্রতিসাম্যে একটি ক্ষণস্থায়ী ছেদ আনা হয়েছে। তারপর প্রতিসাম্য ফেরৎ এসেছে, যদিও বক্তব্যের এই অন্য অংশটি ভিন্ন– স্মৃতি চারণের বদলে অনুরোধ। প্রতিসাম্যই সনেটের গুণ, এর ভঙ্গটি ক্ষণিকের জন্য।

কিন্তু আধুনিক কবিরা প্রতিসাম্য ভাঙ্গার ওপরে অনেক বেশি জোর দিতে পারেন তাঁদের বক্তব্যের প্রকাশকে আরো জোরালো করার জন্য– সেটি যেন পাঠকের মনে আরো বড় ধাক্কা দিতে পারে। যেমন টিএস ইলিয়টের ‘দি ওয়্যাস্টল্যান্ড’ (বর্জ্যের জমি) কবিতার শুরু নির্মম ভাবে প্রতিসাম্য ভাঙ্গার মাধ্যমে। তিনি পাঠকের মনে টানোপোড়েনের আবেগ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যেটি কবিতাটির বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সে বক্তব্য ছিল প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী ভগ্ন সমাজের নৈরাজ্য ও নৈরাশ্য। সে আবেগ সৃষ্টি যে কতটা তীব্র হয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো সেটি প্রমাণ করে মসৃণ হিল্লোলিত না হয়েও, প্রতিসাম্য ভঙ্গের মত নান্দনিকতা বিরোধী হয়েও, এবং যথেষ্ট জটিল ভাষার হয়েও, কবিতার মর্ম পাঠককে স্পর্শ করতে পারে– সেটিই একটি অনন্য আর্ট।

এপ্রিল ইজ দি ক্রুয়েলেস্ট মান্থ, ব্রিডিং
লিলিয়াক্স আউট অফ দি ডেড ল্যান্ড
মেমোরি এ্যান্ড ডিজায়ার স্ট্যারিং
ডাল রুট্স উইদ স্প্রিং রেইন।

অনুবাদে: এপ্রিল হলো নিষ্ঠুরতম মাস যেটি মরা জমির থেকেও লিলিয়াক ফুল ফলায়। স্মৃতি ও কামনাগুলো অথর্ব শেকড়কে বসন্ত-বৃষ্টিতে নাড়িয়ে তোলে (এই মরা জমিতেও হতাশার চক্র থেকে রেহাই নেই, স্মৃতি আর কামনা দুষ্টচক্রের মত বছর বছর একে বাঁচিয়ে রাখছে)। কথাগুলো বিষাদের, আর প্রতিসাম্যের অভাব সেই বিষাদের ভাবটি তীব্রতর করতে সাহায্য করে।

নৃত্যশিল্পে প্রতিসাম্য। প্রতিসাম্যটি খুব সুন্দর ভাবে দর্শকের সামনে একটি বিকাশমান জীবন্ত দৃশ্য হয়ে গড়ে আর ভাঙ্গে যেই আর্টের মধ্যে তা হলো নৃত্যশিল্প। পুরো একটি নাচ যিনি পরিকল্পনা করেন, সুরের সঙ্গে এর সঙ্গত যিনি করেন, সেই কোরিওগ্রাফারকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হয় এই প্রতিসাম্য সৃষ্টি আর প্রতিসাম্য-ভঙ্গের ওপর। সমবেত নাচের যে সাধারণ আবেদন তাতে নৃত্যশিল্পীরা যেভাবে একই সঙ্গে একই গতিময়তা প্রকাশ করেন, পরস্পরের নৃত্য মুদ্রাগুলোকে নিজে পুনরাবৃত্তি করে দলের মধ্যে তার ঢেউ খেলিয়ে যান তাতে পুরো নৃত্য মঞ্চ একটি গতিময় প্রতিসাম্যের অনুরণিত হয়। যুগল নৃত্যেও প্রায় একই রকম ঘটনা ঘটে। ক্লাসিক্যাল ব্যালে নৃত্যে যেমন দেখা যায় একজন নৃত্যশিল্পী পরক্ষণই অন্য জনের নৃত্যাংশটি পুনরাবৃত্তি ও প্রতিফলিত করেন সঙ্গীতের একই তালে তালে।

আধুনিক নৃত্যশিল্প কিন্তু আবার বেশ সাহসিকতার সঙ্গে অপ্রতিসম নাচকে ব্যবহার করেন নাচের ওই ক্ল্যাসিকাল সুষমাকে প্রায় অগ্রাহ্য করে, এবং তারপরও অদ্ভুত শিল্প-দ্যোতনা সৃষ্টি করেন। সেই দ্যোতনাটি আসে মসৃণতাকে চ্যালেঞ্জ করে কোন আপাত বিসদৃশতাকে সামনে নিয়ে আসার মাধ্যমে; যার পেছনে উদ্দেশ্য থাকে নাচের ভেতর দিয়েই দর্শকের মনে তীব্র আবেগ সৃষ্টি, সুরের ও নাচের মূর্ছনায় মোহিত হয়ে থাকা নয়। সাধারণত সমাজ, মানসিক সম্পর্ক ইত্যাদির জটিল দিকগুলোকে প্রতিভাত করাটাই অনেক ক্ষেত্রে এখন নৃত্যশিল্পের বড় কাজ। তবে প্রতিসাম্য ভঙ্গের স্থানটি যে বহুকাল ধরে জননন্দিত ক্ল্যাসিকাল নৃত্যকলায়ও একেবারে স্থান পায়নি তাও কিন্তু নয়। যেমন এর একজন বিখ্যাত সৃষ্টিকার রাশিয়ান কম্পোজার চাইকোভস্কির ব্যালে 'সোয়ান লেইকের' কথা ধরা যাক্। এতে সমবেত নৃত্যগুলো অপূর্ব সুরের মূর্ছনার সঙ্গে খুবই প্রতিসম নৃত্যকলা অদ্ভুত মাধুর্যের সৃষ্টি করে রাখে। কিন্তু এর কাহিনীতে নায়িকাকে যখন অভিশাপ দিয়ে একটি

রাজহাঁসে (সোয়ান) পরিণত করা হলো তখন সে যেন এক রকম মুক্তিই পেলো। সেটি হলো ওই যে দলের সঙ্গে প্রতিসম ভাবে নাচার যে বন্ধন, তার থেকেই মুক্তি। তখনই সুযোগ হলো তার প্রকৃত নিজেকে প্রকাশের। সে যে অনন্য, সে যে বাকিদের সঙ্গে অমিলের মধ্যে নেচে নেচে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে, এখন সেটিই মুখ্য হয়ে দাঁড়ালো। এখানে প্রতিসাম্য ভঙ্গের সৌন্দর্যটি হলো মুক্তির সৌন্দর্য, মুক্তির আনন্দের সৌন্দর্য।

বিজ্ঞান-সৃষ্ট ভার্চুয়াল জগতে আর্ট

আর্টের ভেতর ডুব দেয়ার সাম্প্রতিক প্রযুক্তি:

পরাবাস্তব বা ভিন্ন রকম বাস্তবতা নিয়ে কাজ করা আর্টের জগতে নতুন কিছু নয়– শিল্পীরা সেখানে এমন অভিনব অপরিচিত একটি বাস্তবতা সৃষ্টি করেছেন যা সে রকম হওয়া সত্ত্বেও আমাদেরকে আকর্ষণ করে ওই অভিনবত্বের জন্যই। উদাহরণ স্বরূপ সাহিত্যে অ্যালিস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড বইটির যে কাহিনী তার যে নানা চরিত্র এরা কিন্তু আমাদের পরিচিত জগতের বাসিন্দা, সেখান থেকেই তুলে নিয়ে চরিত্রগুলো সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তারাই আবার সৃষ্টি করেছে সম্পূর্ণ এক অচেনা জগত– সেখানকার কথাবার্তা, আচরণ, যুক্তি, ঘটনাবলী, সেগুলো মোটেই আমাদের স্বাভাবিক জগতের সঙ্গে মেলেনা। সাহিত্যরূপী আর্ট এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যা অচেনা হলেও বরং বলা যায় অচেনা বলেই আমরা উপভোগ করি। এরকম ক্ষেত্রে উপভোগের মাত্রাটি বাড়াবার উপায় হলো কিছুক্ষণের জন্য ওই অভিনব জগতটার মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখা– সম্পূর্ণ নিমজ্জন।

কম্পিউটার আসার পর পরাবাস্তব সৃষ্টি করার কাজটি সহজতর হয়েছে, যেমন ডিজিট্যাল আর্টে তা করা যায়। কম্পিউটার প্রযুক্তির একটি খুবই চমৎকার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় হলো ভার্চুয়াল রিয়ালিটি, যেই বাস্তবতাটি আসলে কম্পিউটার-সৃষ্ট বাস্তবতা কিন্তু আমরা এর মধ্যে এমন ভাব নিমজ্জিত হতে পারি যেন মনে হয় যে ওই বাস্তবতার মধ্যে আমরা সত্যি সত্যি আছি। এতে নিজের চোখ-কান পরিপূর্ণভাবে ঢেকে একটি হেলমেট যদি পরে নিই তাহলে একেবারে চারিদিকে তিন মাত্রায় যা দেখবো তার সবকিছু সত্যিকারের জিনিস মনে হয়; মাথা ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখলে বা হেঁটে গেলে মনে হয় যেন সেই অভিনব স্থানের মধ্যে আমি আছি এবং ঘুরে

ফিরে দেখছি সেখানকার সব কিছু। আনুসঙ্গিক শব্দও পেতে থাকবো হেডফোনে। উদাহরণ স্বরূপ সেই ভার্চুয়াল রিয়ালিটি আমাকে নিয়ে যেতে পারে মঙ্গল গ্রহে– যা দেখছি, শুনছি তা মঙ্গল গ্রহে দাঁড়ালে-ঘুরলে-ফিরলে যেমন হবে তেমন। এ অনেকটা দেহ-মনে মঙ্গল গ্রহে চলে গিয়ে সেখানকার বাস্তবতায় নিমজ্জনের মত।

ওভাবে চক্ষু-কর্ণকে সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলে ভারচ্যুয়াল রিয়ালিটি যখন আমাদেরকে মঙ্গল গ্রহের বা মহাশূন্যের বা এমনি এক অন্য জগতের ভেতর পূর্ণ মনোসংযোগের ব্যবস্থা করে, তখন ওখানকার প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনা বা দৃশ্যের দিকে পরপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারপর পরক্ষণই ঝাঁকুনি দিয়ে অন্য বিন্দুতে সেই দৃষ্টি নিয়ে যায়। এমনি ভাবে সরতে সরতে পুরো ইমেজটিতে এটি স্থির হলে, ওটি ও আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে একটি বোধ জন্মে মস্তিষ্কের মধ্যে। ভার্চুয়্যাল রিয়ালিটিতে ডুব দেয়া এক একজন মানুষের চোখের মণির গতিবিধি ডিজিট্যাল পদ্ধতিতে অনুসরণ করে সম্প্রতি এই বোধ জন্মানো নিয়ে এমন একটি মডেলে উপনীত হওয়া গেছে যা হাজার হাজার মানুষের ক্ষেত্রে এক্সপেরিমেন্টে প্রমাণিত হয়েছে। এই মডেলেই প্রমাণ করে দিয়েছে কী ভাবে দর্শকের সম্পূর্ণ নতুন একটি বাস্তবতার সঙ্গে একীভূত হয়ে সেখান থেকেই সকল অনুভূতি লাভ করে। ভার্চুয়্যাল রিয়ালিটির সৃষ্টি এবং এই সব গবেষণা একেবারেই অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের ব্যাপার।

ওর মধ্যে যে আর্ট ও সায়েন্স তা আমাদের মস্তিষ্ককে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করে ও ভিন্ন জগতে নিয়ে যায় যে তারপর থেকে আমরা সেটিই ভাবি ওখানেই হাঁটি, ওখানেই দেখি, ওখানেই হোঁচট খাই, স্পর্শ করি সব কিছু। এমন একটি জিনিসের সুযোগ আর্টের সৃষ্টিকাররা নেবেনা তা কি হতে পারে? মানুষকে ভিন্ন ভাবে চিন্তা করানোইতো আর্টের কাজ। ভার্চুয়াল রিয়ালিটি যে রকম অন্য বাস্তবতা দেয়, তেমনি তার আর একটি রূপ সেই নতুন বাস্তবতাকেও একটি অতিরঞ্জিত রূপ দেয়, যাকে বলা হয় অগ্‌মেন্টেড রিয়ালিটি। ওভাবে বর্ধিত করা, অতিরঞ্জিত করা বাস্তবতাই তো হতে পারে আর্টের সত্যিকার লীলাক্ষেত্র! বলতে গেলে এই সাম্প্রতিক ব্যবস্থাগুলো কম্পিউটার বিজ্ঞানের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কল্যাণে অসম্ভব সব আর্টের মধ্যে নিমজ্জিত করার সহজ উপায়। কিন্তু ওভাবে

নিমজ্জিত করার চেষ্টাটি একেবারে সাম্প্রতিক নয়, এটি এতো উচ্চতর বিজ্ঞানের জন্য অপেক্ষা করে বসেছিলোনা। তার আগেও এটি চলেছে, তখন যতটুকু প্রযুক্তি ছিলো তার ওপর নির্ভর করে।

একই উদ্দেশ্য আগের প্রযুক্তি:

কিছু পেছনের দিকে তাকালে দেখবো অপেক্ষাকৃত বেশিদিন ধরে পরিচিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফটোমন্টাজ, একাধিক ক্যামেরায় এক সঙ্গে তোলা ভিডিয়ো কম্পিউটার আর্ট, ইত্যাদিতেও শিল্পমনা মানুষকে কিছুটা নতুন রকম জগতের মধ্যে নিমজ্জনের একটি চেষ্টা ছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে নানা ফটোগ্রাফের নানা অংশ একের সঙ্গে এক এমন ভাবে সাজানো হতো যে ফটোমন্টাজ নামক এক শিল্পরীতিতে তাতে দর্শকের মনে একটি ভিন্ন চিন্তা, সাধারণত একটি প্রতিবাদী চিন্তার সৃষ্টি হতো– যেমন বুর্জোয়া সংস্কৃতিতে আর্ট, কালচার, সংবাদপত্র ইত্যাদি কিছু প্রভাবশালীর কুক্ষিগত করে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চিন্তা। একই রকম ভিন্ জাগতিক আবহ সৃষ্টির আরেকটি পথ তখন শুরু হয়েছিলো প্রথমে চলচ্চিত্রে এবং পরে টেলিভিশনে; বিভিন্ন ক্যামেরার বিভিন্ন দৃশ্য ধারণ করে তার এক রকম শৈল্পিক উপরিপাতন ঘটিয়ে। এসবেরও অবশ্য জনপ্রিয়তা ছিল, এখন কিছু ম্লান হয়ে গেছে। তবে এতেও চেষ্টা ছিল দর্শককে আরো বেশি এতে নিমজ্জিত করতে।

বড় আকারে চিত্র। কিন্তু একেবারে আজকের দিনে (২০২৩ সাল) এসে আজকের জনপ্রিয় চিত্রশিল্পী ডেভিড হকনিকে দেখি ছবির আকার ও জায়গা বদলিয়ে ভিন্ন দ্যোতনা সৃষ্টি করতে। তিনি লন্ডনের লাইট হাউজ নামক বিরাট প্রদর্শনী-হলে তিন তলার সমান দেয়ালে প্রক্ষেপন করেছেন তাঁর আঁকা এক একটি ছবি; প্রদর্শনীর নামও দিয়েছেন ‘আরো বড় আরো কাছে’। এই বড় হওয়ার সুযোগ নিয়ে এখানেও তিনি দর্শককে এর মধ্যে এক রকম নিমজ্জনের ব্যবস্থা করেছেন এত কাছে থেকে এত বড় ছবি দেখতে গেলে এতে ডুব দেবার মতোই তো একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়। এখানেও প্রযুক্তির ব্যবহার হয়েছে– কিন্তু ভার্চুয়াল রিয়ালিটির তুলনায় কতই না সরল এই প্রযুক্তি। মিউজিয়ামে টাঙ্গানো ছবি যখন আমরা দেখি প্রায়ই আমাদেরকে ছবির থেকে বেশ দূরে দাঁড়িয়ে ফ্রেমে বাঁধাই করা খুবই ছোট সীমিত ছবি দেখতে হয়, যার

আরো ছোট নানা অংশে আমাদের ডুব দেয়ার প্রশ্ন ওঠেই না। হকনির এই প্রদর্শনী যেন তারই প্রতিবাদ।

হকনির ছবিগুলোতে ব্যাপ্তি আছে, কিন্তু তার সীমা নেই– এর বিষয়গুলো একেবারে সাধারণ– কোনটি বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ; কোনটিতে শহরের নানা পাড়া; কোনটিতে রাস্তা চলে গেছে দূরে, আরো দূরে। বড় ছবিতে নানা অংশে ডুব দেবার কথা রয়েছে বটে, কিন্তু সেটি করার জন্য বেশি সময় দেয়া হচ্ছেনা, দেয়ালের ওপর ছবি বদলে যাচ্ছে। শিল্পী তাই যেই নিমজ্জন চাইছেন তা একটি বিশেষ ছবিতে নয়, বিভিন্ন ছবিতে একটি সাধারণ নিমজ্জন, ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের মূর্ছনার সঙ্গে সঙ্গে– যেন একের পর এক ছবির ব্যাপ্তি ও বিশালত্বের মধ্য অভিভূত হয়ে থাকা; কোনটিকে খুঁটিয়ে দেখা নয়।

হক্‌নি কিন্তু একই সময়ে লন্ডনের অন্যান্য আরো কিছু প্রদর্শনী হলে ঠিক একই রকম বড় আকারের ছবি প্রক্ষেপনের আয়োজন করেছেন। সেগুলোর অধিকাংশের ক্ষেত্রে তিনি নিজের আঁকা ছবি নয়, বরং গত কয়েক শতাব্দীর বিখ্যাত শিল্পীদের বিখ্যাত ছবিগুলোকেই ওই তিন তলা সমান উঁচু দেয়ালের ওপর প্রক্ষেপন করেছেন। প্রদর্শনীর একটি উপযুক্ত নামও দেয়া হয়েছে 'ফ্রেইমলেস'– যেন মিউজিয়ামে ছোট আকারে সংরক্ষিত ওই ক্লাসিক ছবির ফ্রেইম খুলে ফেলে তাকে একটি বিশাল নিরবিচ্ছিন্ন জগতে নিয়ে আসা হয়েছে। এটি এখন ফ্রেইমহীন, সীমাহীন, অন্তহীন। এমনি একটি প্রদর্শনীতে শুধু ভ্যানগগের ছবিকেই প্রক্ষেপন করা হয়েছে বিরাট আকারে। উজ্জ্বল আলো, মানানসই মিউজিক এসবের ভিন্ন একটি পরিবেশে দর্শক যেন ভ্যানগগ দিয়ে পরিবেষ্টিত থাকেন– ভ্যানগগের সেই বিখ্যাত সূর্য, বিখ্যাত সূর্যমুখীগুলো, বিখ্যাত ফসলের ক্ষেত ইত্যাদি দিয়ে। আরেকটি প্রদর্শনী বেছে নিয়েছে স্যালভেদর দালির ছবিতে নিমজ্জনের জন্য। এবার কিন্তু দালির মূল পরবাস্তববাদী ছবিতে সাইবারনেটিক্সের ডিজিট্যাল কৌশলও ব্যবহার করা হয়েছে যেখানে তা ত্রিমাত্রিক প্রাণীর রূপ ধরে লাফিয়ে ওঠে, একাধিক বড় বড় ঘড়ি যেন গরমে বিকৃত আকৃতি নিয়ে গলে পড়ার আগের অবস্থার মত লটরপটর হয়ে যাচ্ছে। এরকম বিকৃত হয়ে নেতিয়ে পড়া ঘড়ি নিয়ে দালির মূল ছবি দুই মাত্রায় ক্যানভাসের ওপর ছোট আকারে আঁকা; দর্শক এগুলো একদিন মিউজিয়ামে দূর থেকে দেখতে ও মনে মনে বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়ে

বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত ছিলেন। এখন তাঁরা এর মধ্যে যেন নিমজ্জিত হচ্ছেন আর ছবি যেন সরাসরি তাঁদের মস্তিষ্ককে অভিভূত করছে। বিখ্যাত পরিচিত আর্টকে এভাবে নতুন বেশে দেখার ইচ্ছেটাকে বলা যায় এখন একটি নতুন ফ্যাশন। এটি লন্ডনকে ছাপিয়ে এখন অন্যান্য নানা পাশ্চাত্য নগরীতে ছড়িয়ে পড়েছে– যদিও অনেক ক্ষেত্রে ভার্চুয়্যাল রিয়ালিটি ও অগমেন্টেড রিয়ালিটির মত অনেক উচ্চতর প্রযুক্তির ব্যবহার করে।

আর্টে কম্পিউটার ব্যবহারের আদি ইতিহাস:

এই নতুন পরাবাস্তবের গোড়া কিন্তু আর্টে কম্পিউটারের ব্যবহার থেকে। আর্ট সৃষ্টিতে কম্পিউটারের ব্যবহারের ইতিহাসটি তুলে আনার জন্য লস এঞ্জেলসে একটি চমৎকার আর্ট প্রদর্শনী সম্প্রতি আয়োজন করা হয়েছিলো যার নাম 'কোডেড'। কম্পিউটারকে ব্যবহার করতে গেলে তাকে প্রোগ্রাম করতে হয় অর্থাৎ প্রতীক বা কোডের ভাষার তাকে নির্দেশ দিতে হয়– সেজন্যই এই নাম। এতে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরুর প্রথম দিকটায় ১৯৫২ থেকে ১৯৮২ এই সময়ের মধ্যে কীভাবে ধাপে ধাপে আর্টের মধ্যে কম্পিউটারের অবদান ঢুকেছে তা আজকের কিছু আর্ট সৃষ্টির মাধ্যমে উপলব্ধি করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। পল হেনরির একটি ছবিতে একেবারে প্রথম কম্পিউটারগুলোর আঁকা রেখাকে ব্যবহার করা হয়েছে, তাও আবার ডিজিট্যাল নয় এনালগ্ কম্পিউটার (ইলেকট্রনিক পদ্ধতির বদলে স্থূল যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কাজ করে)। আসলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিমান থেকে বোমা ফেল্‌লে সেটি ঠিক কোন্ পথে গিয়ে কেথায় পড়বে সেটি রেখার আকারে দেখিয়ে দেয়ার জন্য ওই এনালগ কম্পিউটারকে প্রোগ্রাম করা হতো। হেনরি তাঁর আর্ট সৃষ্টির জন্য তা করেছেন, তাঁর এভাবে সৃষ্ট বক্ররেখাগুলোই একে আর্টে উন্নীত করেছে। তবে এটি আরো বেশি আর্ট হয়ে উঠেছে রেখাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে তিনি নিজের হাতে কালো-কমলা রঙের কড়া কন্ট্রাস্টে প্রাণী-সদৃশ যে আঁকগুলো যোগ করেছেন তাতে। মনে হবে কম্পিউটারের রেখাগুলো না থাকলে যেমন আর্টটি অসম্পূর্ণ হতো তাঁর কালো-কমলার রেখাগুলো না থাকলেও সেরকম অসম্পূর্ণ থাকতো– এতে বোঝা যায় মানুষে-কম্পিউটারের যৌথ অবদানকে। হ্যারল্ড কোহেনের একটি ছবিতে প্রায় একই ব্যাপার ঘটেছে– কম্পিউটার সাধারণ কিছু প্রোগ্রাম থেকে বিভিন্ন আকৃতির কিছু বদ্ধ ক্ষেত্র এঁকেছে এক ধরনের

গাণিতিক বৈচিত্রের সৌন্দর্য তাতে সৃষ্টি করে। সেটিতে কোহেন নিজে কিছু যোগ করেছেন– ওই কোন কোন ক্ষেত্রকে রঙে ভরাট করেছেন, বাচ্চাদের মত।

কম্পিউটারের এমন বিমূর্ত কাজকে যে চলচ্চিত্র রূপ দেয়া যায় তার একটি উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন জন হুইটনী। একজন অ্যানিমেটর হিসেবে নানা বাস্তব জিনিসের কার্টুন চলচ্চিত্র আঁকার কাজে আগেই দক্ষ, তার জন্য কম্পিউটার প্রোগ্রাম করারও। কিন্তু এইখানে তিনি একটি অ্যানিমেশন প্রোগ্রাম করেছেন যেটি শুধু একের পর এক বিচিত্র অ্যাবস্ট্রাক্ট প্যাটার্ন সৃষ্টি করে চলে; সেগুলো তিনি ১৬ মিলিমিটার স্বল্পদৈর্ঘ চলচ্চিত্রে ধারণ করেছেন। তারপর চলচ্চিত্র সম্পাদনার জন্য যেই এডিটিং টুল্‌স রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করেই এক একটি আর্ট- ফিল্মে রূপ দিয়েছেন। এতে এক এক বার ঝিলিক মেরে আকৃতি পরিবর্তন হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেছে তবলার তাগদুম তাগদুম বাজনা। মূল অ্যানিমেশন অংশটি কম্পিউটারের– যদিও তাঁরই প্রোগ্রামে; কিন্তু তিনি যে সম্পাদনা করেছেন সেটি পুরো তাঁর অবদান।

পঞ্চাশ থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত যন্ত্রের অবদানের এই যে একটি আলেখ্য শিল্পীরা তৈরি করছেন তার সবটুকু যে কম্পিউটার যন্ত্রের তা কিন্তু নয়। গুরুত্বটি এখানে সার্বিক ভাবে প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর- যার মূলে রয়েছে গাণিতিক সৌন্দর্যের ওপর। যেমন ওসিলোস্কোপ যন্ত্রটি সে সময় খুবই কোতুহলোদ্দীপক ছিল, যাতে কোন কম্পনের ইলেকট্রনিক ছবিটি পর্দায় দৃশ্যমান করা যায়– ওই কম্পন বা তরঙ্গের মাপজোকও পাওয়া যায়। এই একই নীতিতে সে আমলের টেলিভিশনও কাজ করে। প্রদর্শনীর কিছু কিছু ছবিতে মনে হয়েছে শিল্পী ওসিলোস্কোপের পর্দার তরঙ্গের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ওতে তরঙ্গ চিত্রকে মুহুর্তে যে নানা ফ্রিকোয়েন্সির নানা রকমে বদলে দেয়া যায়, অদ্ভুত অদ্ভুত সুন্দর ও জটিল রেখাচিত্র সৃষ্টি করা যায় তা শিল্পীকে আকর্ষণ না করে পারেনা।

ওই আশির দশক থেকে ইতিহাস কিন্তু বদলে গেছে– কম্পিউটার ব্যক্তিগত হয়ে গেছে। সেটি একেবারেই গৃহপালিত আটপৌরে জিনিসে পরিণত হয়েছে, আবার অন্যদের জন্য বাণিজ্যিক জিনিসেও। সেখানে আর্টের স্থান কমে গেছে, ব্যক্তিগত বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে তার প্রয়োজন কমে

গেছে। কিন্তু সেটিই শেষ পর্যন্ত দেখা দিয়েছে আরো অনেক উচ্চতর স্তরে সরাসরি মস্তিষ্কে গিয়ে ঢোকার জন্য নিমজ্জনকে সম্পূর্ণতা দেয়ার জন্য ভার্চুয়্যাল রিয়ালিটি হিসেবে এবং তারপর অগমেন্টেড রিয়ালিটি হিসেবে।

কয়েকটি ভার্চুয়্যাল রিয়ালিটি আর্ট:

অভিবাসীর সংগ্রাম। বিখ্যাত সিনেমা নির্মাতা আলেজান্দ্রো ইনারিটু একটি ভার্চুয়্যাল রিয়ালিটি (ভি আর) ফিল্ম তৈরি করেছেন মেক্সিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে প্রত্যাশী অভিবাসীদের ওপর, যাতে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন সীমান্তের কেমন সব দুর্গম বাধা দূর করে চলছে তাদের সেই প্রচেষ্টা। ফিল্মের নাম দিয়েছেন 'মাংস আর বালি'। এর বৈশিষ্ট হলো পুলিশ ও অন্যান্য বাধাগুলোর সঙ্গে লুকোচুরি করে, অসম্ভব ঝুঁকি নিয়ে ওই সংগ্রামী মানুষগুলো যেখানে তাদের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে, ফিল্মের দর্শক নিজেরাও ঠিক ওই জায়গাটিতেই তাদের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারেন। অভিবাসীদের কষ্টটি অন্য মানুষের পক্ষে বোঝা হয়তো কোনদিন সম্ভব হবেনা, কিন্তু এই 'ভি আর' ফিল্মে যারা নিমজ্জিত তাঁরা অনেকটাই পারবেন, কারণ ওই ভিন্ন একটি বাস্তবতায়, অভিবাসীদের বাস্তবতায় তাঁর চলে যেতে পারেন। এটি এমন একটি অনুভূতি যেন দর্শকদেরও পা ওই দুর্গম উঁচু নিচু পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়েছে, তাদের নিজের পায়ের চামড়াই যেন ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত অভিবাসীদের চরম উদ্বেগ যেন দর্শকদের দ্রুত হৃৎকম্পনে সংক্রমিত হয়েছে।

আমাজোনের গাছ। মেলিকো জেক ও উইন্সলো পোর্টারের তৈরি 'গাছ' নামক ভি আর ফিল্মটি দর্শককে নিয়ে যায় আমাজোনের বাদল-বনে একটি গাছের নিজস্ব ভূবনে। একটি ছোট অংকুর ও চারাগাছ থেকে বড় হতে হতে যে পরিবেশ, যে সবুজ-সান্নিধ্য, সূর্যালোক এই গাছটি অনুভব করেছে তার সব অনুভূতি ভিআরটির নির্মাতারা এর দর্শকদেরকেও অনুভব করাতে চেয়েছেন। এর দৃশ্য ও শব্দ তো বটেই এমনকি স্পর্শ ও গন্ধও। গাছের বা কোন উদ্ভিদের বৃদ্ধিটি এতো দ্রুত হয়না যে তা ভিআর এর মাধ্যমে অনুভূত হতে পারে। তবে এই গাছের চারাটি একটি সময়ে এসে এত দ্রুত তর তর করে বাড়ে যে দর্শক এর উজ্জীবনটি রিয়্যাল টাইমেই অনুভব করতে পারেন স্পর্শের চেতনায়। তবে গন্ধের ব্যাপারটি আলাদা– সেটি প্রেক্ষাগৃহে সৃষ্টি

করতে হয়েছে। এগুলো সব গাছটির আকাশচুম্বি হবার আকাঙ্খার সঙ্গে দর্শককে সরাসরি সংযুক্ত করে। কিন্তু গাছটির বিয়োগান্ত পরিণতির সঙ্গেও দর্শকদেরকে এমনিভাবে শরিক করতে নির্মাতারা ভোলেননি। লগিং কোম্পানীর বনদস্যুরা এসে এ গাছকে কেটে যে তাকে জ্বালিয়ে দিয়েছে সেই যন্ত্রণারও ভাগী হতে হয়েছে দর্শকদের, যার ফলে তাঁদের মধ্যে গাছের প্রতি এক অদ্ভুত সমবেদনার জন্ম হবার একটি সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। ভিআরটি নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে এর সঙ্গে সাজুয্য রেখে কৃত্রিম ভাবে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে মাটির সোঁদা গন্ধ, আকাশচুম্বি হবার সময় বন-শামিয়ানার কচি পাতার গন্ধ, পুড়ে ফেলার সময় আগুন-ধোঁয়ার গন্ধ ইত্যাদি সৃষ্টি করা শুধু আর্টের নয় প্রযুক্তিরও একটি জয়ধ্বনি। নির্মাতাদের কথা হলো গাছের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগটি এমন হবে যে তাঁদেরকে নিজের দেহকে গাছ হিসেবে আর নিজের প্রসারিত হাতকে তার শাখা হিসেবে অনুভব করতে হবে। এটি করতে কোন চেষ্টা তাঁরা বাদ দেননি যাতে গাছের স্বার্থটি মানুষের স্বার্থ হয়ে ওঠে।

অন্ধত্বের কথা। লেখক জন হাল হঠাৎ করে এক সময় অন্ধ হয়ে যান। এর পর তিন বছর ধরে বিভিন্ন সময় তিনি তাঁর এই অন্ধত্বের জীবন নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে কথা রেকর্ড করে একটি অডিয়ো ডায়রী তৈরি করেন। অন্ধ অবস্থায় পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে কী ভাবে তিনি চলেছেন সেই অভিজ্ঞতার খুঁটিনাটি অনুভূতি তিনি তাৎক্ষণিক এভাবে প্রকাশ করে গেছেন। পরে এই অডিয়ো ডায়রীর ওপর ভিত্তি করেই 'অন্ধত্বের কথা' ভিআরটি অন্যদের সহায়তায় তৈরি হয়েছে। হালের ওই মৌখিক বর্ণনায় খুব জ্বলজলে হয়ে এসেছিলো অন্ধ হবার পরে যতই দিন গিয়েছে শব্দের প্রতি তাঁর সংবেদনশীলতার কথা। শব্দ ও স্পর্শ থেকে কীভাবে দুনিয়াকে বুঝে নিতে হয় সেই কথা। তাছাড়া তাঁর স্মৃতিতে থাকা দৃষ্টির অনুভূতিগুলো প্রায়ই তাঁর মনে উঁকিঝুকি দিয়েছে– একদিন সব কিছু তিনি যে দেখতে পেতেন সেই দেখা ব্যাপারটি কী রকম– এখন এটি শুধুই স্মৃতি। তাদেরকে এই ভিআর এর বিকল্প বাস্তবতায় নিয়ে গিয়ে জন হালের এই অনুভূতিগুলো দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত করার একটি চেষ্টা আছে। এই বিকল্পটির বাস্তবতায় তাঁরা যেতে থাকেন অ্যানিমেশনের মাধ্যমে গড়া একটি পারিপার্শ্বিকতায় সৃষ্টির জগত থেকে অন্ধত্বের জগতে চলে গিয়ে। যেমন পারিপার্শ্বিকতাটি হতে থাকে ক্রমে একটি আবছা দৃষ্টির পারিপার্শ্বিকতা, ওখানে শব্দ জগতটি ক্রমে

গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফোটা ফোটা পানি পড়ার শব্দ কিংবা মৃদু বয়ে যাওয়া বাতাসের শব্দও সেখানে যেন অনেক গুরুত্ব বহন করে।

ভুলে গেলে চলবেনা যে 'অন্ধত্বের কথা' নামের ভিআরটি জন হালের মতো একজন আর্ট-সৃজনকারীর অনুভূতিতে দর্শক-শ্রোতাকে নিয়ে যাচ্ছে; তিনি সেখানে শুধু একটি বৈজ্ঞানিক ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছেননা– যেই অর্থে আর্ট হলো বিকল্প জীবন, বিকল্প অনুভূতি সেই অর্থে তিনি অপূর্ব এক আর্টও সৃষ্টি করছেন। নিজের অনুভূতির আলোকে তিনি অন্যদেরকে সেই আর্টে শামিল হতে দিচ্ছেন। আর্ট সৃষ্টিকারী সব ভিআর এর দিক থেকে কথাটি সত্য। কিছুক্ষণের জন্য অন্য একটি বাস্তবতায় ডুব দিয়ে যে গভীর অনুভূতির ভেতর দিয়ে দর্শক যান তাতে যে কোন ভাল আর্টের মত তাঁর জীবনবোধে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়। 'মাংস আর বালি', 'গাছ', 'অন্ধত্বের কথা'র মত ভিআর সেজন্য আর্টের জগতেরই একটি আধুনিক সংস্করণ যা উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর।

ভাস্কর্য যখন গতিময়

ভাস্কর্যের বস্তু-নির্বাচনের মধ্যেও গতির বীজ:

ভাস্কর্য স্থির কিছু মূর্তির বা ত্রিমাত্রিক কঠিন গড়নের আকারে আসে; কিন্তু তা সত্ত্বেও তার অনেকগুলোর মধ্যে গতিময় হওয়ার চেষ্টাটি আর্ট হিসেবে থাকে। গ্রীক-রোমান ভাস্কর্যে এরকম গতিময়তাটি একেবারে স্পষ্ট ভাবে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়াই থাকে এবং সে ভাবে এগুলো বিশ্বনন্দিতও হয়েছে। যুদ্ধরত, নৃত্যরত, অলিম্পিকে বর্শা কিংবা ভারি চাকতি ছোঁড়া রত তাঁদের সেই ভাস্কর্যগুলো অমর হয়ে আছে। কিন্তু আধুনিক ভাস্কর্য ওভাবে স্পষ্ট গতি প্রকাশ করার চেয়ে বরং ইশারায় তা প্রকাশ করাকেই অধিকতর ভাল আর্ট মনে করে। আর এই কাজে বিজ্ঞানকে সে তার কাছে পায়।

বিছানো পাথর। ওই ইশারায় গতি বোঝানোর ব্যাপারটিতে অনেক সময় নির্মাণ বস্তুটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই নির্মাণ বস্তুটি খুব সাধারণ কিছু হতে পারে, বা সাধারণ হয়ে বা না হয়ে খুব অভিনবও হতে পারে। উভয় রকম কিছু উদাহরণ নেয়া যাক। হার্ভে ফিটে নামের এক ভাস্কর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক রাজ্যের এক এলাকায় সাড়ে ছয় একর জমিতে শুধু সাধারণ

পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে 'অপুস ৪০' নামের এক বিস্তীর্ণ ভাস্কর্য ক্ষেত্র সৃষ্টি করেছেন। জায়গাটির কাছেই শিলাস্তরে এমন পাতলা পাতলা ব্লুস্টোন পাথরের চাঁই স্তরে স্তরে পাওয়া যায়– ভেঙ্গে নিয়ে তাঁর ওই ভাস্কর্য-ক্ষেত্রে আনলেই হয়। এর দ্বারা ভাস্কর যা সৃষ্টি করেছেন তা একটি সৌকর্যময় বিশাল উঠানের মত। কোথাও পাথরকে শুধু স্তুপে জমা করা হয়েছে, কোথাও তা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে, কোথাও দেয়ালের মত খাড়া দাঁড় করানো হয়েছে। এই ভাস্করের কিছু বৈশিষ্ট আছে যা তাঁর এই ভাস্কর্যের সঙ্গে এক করে না দেখলে চলেনা। তিনি ৩৭ বছর ধরে শুধু নিজের হাতের পরিশ্রমে এই কাজ করেছেন, তাঁর মৃত্যুতেই শুধু কাজটি থেমেছে। ১৯৩৮ সালে মধ্য আমেরিকার হন্ডুরাসে প্রাচীন মায়া সভ্যতার প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে তিনি নির্মাণ বস্তু হিসেবে পাথরের ম্যাজিক দেখেছিলেন। ওটি ছিল একটি মৃত নগরী– কিন্তু তাঁর কাছে সে রকম মনে হয়নি; এর মধ্যে তিনি হাজার বছরের গতির স্বাক্ষর দেখেছিলেন। সেই থেকে তিনি ঠিক করেছিলেন তাঁর নিজ ভূমিতে পাথরের এই গতিময়তার আর্ট সৃষ্টি করবেন। চল্লিশ বছরে এটি করবেন স্থির করাতেই এটি 'অপুস ৪০'; ১৯৭৬ সালে এখানেই কাজের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হওয়াতে ৩৭ বছরেই সেটি থেমে গেছে।

হার্ভের আর্টটি শুধু ছিল মাটি খুঁড়ে সঠিক ব্লুস্টোন পাথরগুলো বেছে নেয়া আর সেইগুলোর শৈল্পিক বিন্যাসের মধ্যে। এতে যে আর্ট সৃষ্টি হয়েছে, গতিময়তা সৃষ্টি হয়েছে তা স্রেফ এই পাথরের বস্তু-গুণের কারণে; ওই পারিপার্শ্বিকতার অন্য কোন কিছুতে এটি হতে পারতোনা, পাথর যেভাবে বাছাই হয়ে আনা হয়েছে, সন্নিবেশিত হয়েছে, গতির ইশারা সেখানেই। পাথরের ওপর কোন কাটাচেরা নেই, কোন খোদাই কাজ নেই– শুধু আনা আর স্থাপন। কোন ট্রাক্টর, কোন অটোমেটিক কাটাচেরার হাতিয়ার এখানে প্রয়োজন হয়নি। তবুও বিজ্ঞানে উপস্থিতিটি বেশ স্পষ্ট– ওই ব্লুস্টোন পাথরের ভূতাত্ত্বিক বস্তুগুণই একে অনবদ্য আর্ট করেছে, এতে গতিময়তার ইশারা রেখেছে। তার পরিচয় সাড়ে ছয় একরের এই বিস্তীর্ণ ভাস্কর্য-ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন ভাবে, শিল্প সম্মত ভাবে স্পষ্ট।

কাঠকয়লা। নিউইয়র্ক নগরের রকফেলার সেন্টারে ২০২৩ সালে গ্রীষ্ম মৌসুমে একটি অস্থায়ী ভাস্কর্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভাস্কর্যগুলোর মূল

অবস্থান দক্ষিণ কোরিয়ার ভূষানে যেখানে, শিল্পীরা এগুলো সৃষ্টি করেছেন। প্রদর্শনীটির নাম 'উৎস, অভ্যুদয়, প্রত্যাবর্তন'। নামের মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে যে গতিময়তা এ ভাস্কর্যগুলোর প্রাণ। শুধু নামে নয় ভাস্কর্যের দিকে তাকালে তার ইশারা পাওয়া যায়, কারণ এরও অনেকখানি ঘট্‌ছে এর ব্যতিক্রমী নির্মাণ বস্তুতে– সেটি কাঠকয়লা। সরু বিশেষ মাপের গাছের গুড়িকে আংশিক পোড়ানোর মাধ্যমে কাঠকয়লার রূপান্তরিত করে তার অনেকগুলোকে আঁটি বেঁধে এক একটি বান্ডিল তৈরি করা হয়েছে। এই বান্ডিলগুলো নানা কোণে স্থাপন করেই এর এক একটি ভাস্কর্য গড়ে তোলা হয়েছে। বান্ডিলগুলো ছোট কিন্তু এদের সব মিলে ভাস্কর্য বেশ বড়, ২১ ফুটের মত উঁচু। কাঠ কয়লার কুচ-কুচে কালো রং আর বান্ডিলগুলোর নানা সরল বিন্যাস এমন ভাবে ভাস্কর্যে এদিক ওদিক হয়ে আছে মনে হয় একটি আঁধার স্থানের মাঝখানে এরা চলা ফেরা করছে। নির্মাণ-বস্তু হিসেবে কাঠ কয়লার কিছু অদ্ভুত বৈশিষ্ট আছে– রং তার একটি। কয়লা হয়ে যাওয়ার পর কাঠের নমনীয়তা আর থাকেনা তার মধ্যে পাথরের ছড় বলিষ্ঠতা আসে, অথচ ওজন তার খুবই কম। বান্ডিলগুলোকে নানা বিন্যাসে স্থাপন করে ওখানে স্থায়ী বেঁধে রাখা খুব সহজ হয় ওই কম ওজনের কারণে। এখানেও শিল্পী ভাস্কর্যের সৌকর্য এবং গতিময়তা আনতে নির্মাণ-বস্তুর বিশেষ বস্তু-গুণের যথেষ্ট সহায়তা পেয়েছেন। অতি সাধারণ জিনিস কাঠ বিজ্ঞানের ম্যাজিক স্পর্শে যেন ভাস্কর্যের একটি যথাযথ মাধ্যম হয়ে ওঠেছে।

মাটির ছাঁচে ধাতব কেঁচো। বৃটেনের দু'জন সৃষ্টিশীল মহিলা– একজন এ্যামি স্টুয়ার্ট, কীট বিজ্ঞানী; অন্যজন অ্যালিস চ্যানার, ভাস্কর। ভাস্কর উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন কীট বিজ্ঞানীর কেঁচো সম্পর্কে লেখা বইয়ের দ্বারা; বইয়ের নাম 'মাটিকে যা গতিময় করেছে'। স্টুয়ার্ট তাঁর বইয়ে মাটির মধ্যে কেঁচোর অদ্ভুত জগতটিকে চমৎকার ভাবে তুলে এনেছেন, তার গতিময়তাকেও। কেঁচো নিজে গতিময় সেটি যেমন সত্য, তেমনি মাটির মত স্থবির একটি জিনিসকেই সে যেন গতির ধারক বাহকে পরিণত করেছে। বলতে গেলে কেঁচোর রেখে যাওয়া সব সুড়ঙ্গ পথ মাটি নিজেকেই যেন একটি জটিল গতিময়তা দিয়েছে। ভাস্কর চ্যানার এই বক্তব্যটাকেই যেন তাঁর ভাস্কর্যের উপজীব্য করেছেন। তাঁর অদ্ভুত কিছু ভাস্কর্যে তিনি মাটিকে, ভূতাত্ত্বিক গঠনকে, কেঁচোকে এবং সাধারণ ভাবে কীটকে অনবদ্য আর্ট সৃষ্টিতে ব্যবহার করেছেন। এগুলোকে নিয়ে

ইতালীর তুরিন শহরে তিনি একটি প্রদর্শনী সম্প্রতি আয়োজন করেছেন যার নাম 'কীট'। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি সত্যিকার কীটের ওপর নির্ভর না করে বরং কীটের বিশেষ কিলবিলে আকৃতি ও নড়াচড়াটিকেই শুধু আর্টে এনেছেন, সেটি যেভাবেই তৈরি হোক না কেন। সমুদ্রের ডুবে থাকা গ্রানাইট পাথরে প্রতি জোয়ারের সময় ঢেউয়ের আঘাতে লম্বা লম্বা তেরচা কীটের মত নানা আঁকি-বুকি সৃষ্টি হয়। এর ফটো তোলা ইমেজের থেকে কাপড়ের ওপর প্রিন্ট নিয়ে তিনি ১৩ ফুট দীর্ঘ কীটদষ্ট কাপড়ের প্যানেল সৃষ্টি করেছেন, নমনীয় একটি ভাস্কর্যের মত– যাও গতিময়তার প্রতীক।

তাঁর আরেকটি ভাস্কর্যে অবশ্য সত্যিকার কেঁচোর অবদান রয়েছে। যে মাটির ভেতর রয়েছে কেঁচোর করা অনেক সুড়ঙ্গ, কেঁচোর গতিময়তার সব ছাপ; এমনি মাটিকে ওভাবে তিনি অ্যালুমিনিয়াম ধাতু ঢালাইয়ের চাঁছ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। ঢালাই করলে ওই সুড়ঙ্গ পথে গলিত ধাতু ঢুকে ঢুকে কেঁচোর আকৃতি নেবে। এখন ঠান্ডা ও শক্ত হবার পর চাঁছটি ভেঙ্গে ফেল্‌লে ধাতব কেঁচোর সাক্ষাত পাওয়া যাবে। ছাঁচটি পুরো না ভেঙ্গে তৈরি হয়েছে তাঁর ভাস্কর্য– মাটি, ছাঁচ এবং তাতে দেখা দেয়া ধাতব কেঁচো। নরোম কেঁচো এখানে নেই, আছে ধাতব শক্ত কেঁচো; কিন্তু মনে করিয়ে দিচ্ছে কেঁচোর আর্ট, তার গতিময়তা, যা সে মাটিকে দিয়েছে, আর এখন মাটি দিয়েছে ধাতব কেঁচোকে।

প্রকৃতির গতিকে নিয়ে ভাস্কর্য:

বাতাসের ভাস্কর্য। বলা হয় ভাস্কর এন্থনি হাউই যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন স্টেটের একটি দ্বীপে বাতাসের ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছেন। আসলে তিনি ওখানে স্থাপন করেছেন ঘূর্ণায়মান কিছু চাকা যা গড়া হয়েছে সাইকেলের চাকার স্পোকের মত অসংখ্য সরু লম্বা স্পোক দিয়ে। একটি ফুরফুরির আকৃতির এসব চাকা বাতাসে বায়ুকলের মত ঘোরে– কিন্তু কল হবার জন্য নয়, বরং আর্ট হবার জন্য। যখন এরা ঘোরে তখন স্পোকে গড়া প্যাটার্নগুলো বিভিন্ন রূপ নিয়ে কিছুটা সামনে পেছনে নড়েচড়ে দৃশ্যপটে পরিবর্তন আনে। হাউই মনে করেন এতে দর্শকদের মনে স্থান-কাল সম্পর্কে ধারণাটাই এগুলো যেন বদলে দিয়ে যায়। এখানে গতিময় বাতাসকে আমরা দেখতে পাচ্ছিনা বটে,

কিন্তু বাতাসের হয়ে ওই স্পোকের চাকাই যেন গতিময়তার ধারণাটি বজায় রাখছে। নির্মাণ-বস্তু এবং নির্মাণ কৌশলটি এমন যে ঘন্টায় এক মাইল বেগের সামান্যতম গতির বাতাসও একে ঘোরাতে পারে, আবার ঘন্টায় ৯০ মাইল বেগের ঝড়ো বাতাসেও জিনিসটি অক্ষত থাকে। একটি খাড়া অক্ষের ওপর ঘোরা চাকাটি ওই অদ্ভুত প্যাটার্নগুলোতে ওরকম গতিময়তা কেন সৃষ্টি করতে পারে? এজন্য অবশ্য হাউইকে সরাসরি কম্পিউটার বিজ্ঞানের সহায়তা নিতে হয়েছে। কম্পিউটার সফ্‌টওয়্যারে স্পোকের নানা বিন্যাসের চাকার ডিজিটাল ইনপুট দিয়ে তিনি কম্পিউটারেই সেগুলোর আবর্তনের ব্যবস্থা করে তার ফলাফল বিশ্লেষণ করেছেন। সেখান থেকে কম্পিউটার স্ক্রীনে দেখা যাওয়া প্যাটার্নের যে গতিময়তা তাঁর আর্ট-বোধকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে তাই তিনি নির্মাণের জন্য বাছাই করে নিয়েছেন। কম্পিউটারে সেই ডিজাইনকে অনুসরণ করেই তিনি তাঁর স্পোকরূপী সেই সরু লম্বা ফিতাগুলো স্টেইনলেস স্টিলের বড় খণ্ড থেকে কেটে কেটে নেবার ব্যবস্থা করেছেন।

বৃষ্টির ফোটার গতিময় ভাস্কর্য। সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর চাঙ্গি এয়ারপোর্টে সৃষ্টি করা হয়েছে বৃষ্টির আবহ, কিন্তু আসলে বৃষ্টি নয় এমন একটি ভাস্কর্য। বৃষ্টির বা পানির ফোয়ারার জলবিন্দুগুলো যে একযোগে অনেক আর্টের সৃষ্টি করতে পারে সেটি লক্ষ্য করেই যেন এর সৃষ্টিকাররা তার একটি বিকল্প সৃষ্টি করেছেন বিমান বন্দরে মানুষের যাতায়াত পথে। এখানে ফোটাগুলো পানির নয় বরং তার আদলে তৈরি ছোট ছোট ধাতব বিন্দুর। খুব সূক্ষ্ম তার দিয়ে ঝোলানো হলেও সেই তার দেখা যায়না বলে মাথার ওপরে ওই ধাতব বিন্দুগুলোকে ভাসমান বৃষ্টির ফোটা বলেই মনে হয়। তারের নিয়ন্ত্রণে নড়াচড়া করে এই অসংখ্য ফোটা একযোগে কখনো ঝরে পড়ার গতি, কখনো এদিক ওদিক দুমড়ানো-মোচড়ানোর, এমনিতরো কোন বিমূর্ত আকৃতি নেয়। কিন্তু অন্য সময় পরিচিত জিনিসের নানা আকৃতি আর্টের রূপে যেমন হট এয়ার বেলুন, রূপকথার ড্রাগন, বা আরো অদ্ভুত কোন কিছুর আকৃতি নিয়ে বাতাসে ভাসতে থাকে দর্শকের জন্য অদ্ভুত দৃশ্য সৃষ্টি করে। বৃষ্টির ফোটার মত দেখতে বিন্দুগুলো যখন সামগ্রিক ভাবে একের পর এক এই সব দৃশ্য সৃষ্টি করে তখন তার গতিময়তাটি বৃষ্টির গতিময়তা বলেই দর্শকের কাছে অনুভূত হয়। সে জন্য এ ভাস্কর্যের নাম দেয়া হয়েছে ‘গতিময় বৃষ্টি’। অথচ এখানে গতিময়তা প্রাকৃতিক বৃষ্টি থেকে আসেনি, এসেছে

ভাস্করের সৃজনশীলতার ইশারায় কম্পিউটার প্রোগ্রাম থেকে। এটি বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে এক একটি ধাতব ফোটার গতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। অসংখ্য ফোটার এরকম নিয়ন্ত্রণে কাম্য দৃশ্য ও গতিকে সৃষ্টি করতে হলে কম্পিউটার ছাড়া গতি নেই; যদিও মূল সৃজনশীলতাটি আর্টিস্টের। আসলে চাঙ্গি এয়ারপোর্টের টার্মিনাল ওয়ানের এই পরিচিত ভাস্কর্যটি কয়েকজনের একটি যৌথ প্রয়াস যার পেছনে আছেন ভাস্কর, অন্যান্য শিল্পী, কম্পিউটার প্রোগ্রামার, প্রযুক্তিবিদ। ব্যস্ত এয়ারপোর্টের এদিক ওদিকে যাত্রীর প্রবাহের মধ্যে এই বৃষ্টির গতিময়তা যেন এখানকার বহু গতিময়তার সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার একটি কোরিওগ্রাফি।

কামরায় বৃষ্টি। বৃষ্টির বিষয়েই আরেকটি বেশ চোখে পড়ার মত ভাস্কর্য দুনিয়ার বিভিন্ন নগরে প্রদর্শিত হচ্ছে গত কিছু বছর ধরে। দর্শকদের নিয়ে হলঘরের মধ্যে বেশ বড় সড় একটি ভাস্কর্য এলাকাতে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে- এরকম পানির বর্ষণ সৃষ্টি করা হয়। এটি ছাদে খুব ছোট ছোট ছিদ্র পথ দিয়ে যান্ত্রিক ভাবে পানি পড়ার ব্যবস্থা করে করা হয়। মেঝেতে পড়ার পর অদৃশ্য ছোট ছোট নল দিয়ে এ পানি আবার ফিরে যাচ্ছে। এভাবে একই পানি 'বৃষ্টি' রূপে বার বার পড়ে। এর সঙ্গে ঘনঘোর বর্ষার আবহ আলো এবং শব্দের নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়। কালো হয়ে আসা চারিদিক, ঝম ঝম বৃষ্টির আওয়াজ, বজ্রের গর্জন সব কিছুই এই আবহ সৃষ্টির সুযোগ ঘটায়। ভাস্কর্যটির সব থেকে উল্লেখযোগ্য আর্টটি হলো ঘরের বড় এলাকা জুড়ে সর্বত্র এ বৃষ্টির মধ্যে যে কেউ কিন্তু গা শুকনা রেখেই এর মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে পারেন। কারণ যিনি এভাবে বৃষ্টিতে হাঁটবেন ঠিক সেই জায়গায় ও তার চারিদিকে সামান্য জায়গায় বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়, স্থানীয় ভাবে ওখানকার ওপরে পানি পড়ার ছিদ্র বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে। এরপর তিনি যেখানে যান সেখানেই ওটি বন্ধ হয়– এলোমেলো ভাবে হেঁটে বা দৌড়ে গেলেও তাই হয়। অনেকে যা করেন এ মুষল ধারার বৃষ্টিতে নাচনের ভঙ্গিতে ঘোরাফেরা করেন, এবং তারপরও সম্পূর্ণ শুষ্ক থাকেন। এতে দর্শকের কাছে যে অনুভূতি হয় তা হলো প্রকৃতি মানুষকে চিনছে এবং তাকে সমীহ করছে। মানুষ এখানে যখন যা করতে চাচ্ছে তাকে প্রকৃতি তা করতে দিচ্ছে; মানুষ ওখান থেকে সরে গেলেই সে আবার সক্রিয় হচ্ছে। এ যেন প্রকৃতি আর মানুষে এক চেনা জানার খেলা। আর্ট যে আর্টের উপভোগকারীর চিন্তাকে নাড়িয়ে দেয়

অভিনবত্বের মাধ্যমে এখানে সেটিকেই বড় করা হয়েছে। সত্যিকার জীবনে প্রকৃতি মানুষকে সমীহ করেনা, বৃষ্টি তাকে ভিজিয়ে দেয়। এই আর্টের জীবনে যা হচ্ছে ওটিই দর্শককে পুলকিত করে, আবার ভাবিয়েও তোলে।

আসলে বলতে পারি বিজ্ঞানই প্রকৃতিকে সংযত করছে। আসল জীবনেও বিজ্ঞান তা করে, আর এই আর্টের মধ্যেও সংযত হবার ধারণাটি বিজ্ঞানই সৃষ্টি করেছে। ওই সৃষ্টির আবহের ভেতরেই নানা জায়গায় লুকানো রয়েছে ক্যামেরা যা মানুষকে চিনতে পারে– কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে কারো চেহারা যে চেনার ক্ষমতা সেটি দ্বারাই এখানে মানুষকে চিনতে পারে। সে অনুযায়ী মানুষটির অবস্থান সঠিক ভাবে নির্ণয় করে ঠিক সেখানকার ছাদের ছিদ্রপথ গুলোতে সিগন্যাল পাঠিয়ে পানি ঝরে পড়া বন্ধ করে দেয়। যতক্ষণ মানুষটি ওখানে থাকে ততক্ষণ তার কাছে থাকা ছিদ্রগুলো বন্ধ থাকে, মানুষের গতিকে দ্রুত অনুসরণ করতে পারে এই সিগন্যাল এবং এই পানি বন্ধের কাজ। ওসব বিজ্ঞান অবশ্য এখানে দর্শকের লক্ষ্য করার জিনিস নয়। তাঁর লক্ষ্য করার জিনিস অদ্ভুত ভাবে ঘটনা ঘটার এবং প্রকৃতিকে পরাজিত করার আর্ট।

অতীত দিনের গতিময়তা:

ডাইনোসর আর্ট। উনবিংশ শতাব্দীতে ভিক্টোরিয়ান বৃটেনের বিজ্ঞান ও আর্টের উভয় জগতের একটি বড় উদযাপন ছিল দি গ্রেট একজিবিশন। লন্ডনে কৃস্টাল প্যালেস পার্কে আগাগোড়া কাচের দেয়ালের বড় বড় প্যাভিলিয়নের মধ্যে এই প্রদর্শনী ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এত ব্যাপক সব কৃতিত্বের ও কীর্তির এই প্রদর্শনীর মধ্যেও আকর্ষণের একটি মধ্যমণি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ভাস্কর বেঞ্জামিন হকিন্সের গড়া বিশালদেহী কিছু ডাইনোসর– ইগুয়ানাডন, মেগালোসোরাস, হাইলেকোসোরাস ইত্যাদি নামে প্রত্যেকটি ৯-১০ ফুট উচু, ৩২ ফুট পর্যন্ত লম্বা। এর মধ্যে কয়েকটি বড় ভয়ানক দেখতে, মনে হচ্ছে তেড়ে যাচ্ছে হুড়মুড় করে। ডাইনোসর বিষয়ক বিজ্ঞান তখন তার প্রথম পর্যায়ে বলা যায়, সদ্য এর সঠিক শ্রেণীভুক্ত করণ শুরু হয়েছে মাত্র, নামকরণ তখনো ঠিক হয়নি। ডাইনোসরের প্রকৃত ছবি বিজ্ঞান তখনো নির্ধারণ না করে থাকলেও আর্টের জগতের হকিন্স কিন্তু সে জন্য অপেক্ষা করলেননা। বিজ্ঞানী বন্ধুদের থেকে তিনি এ সম্পর্কে যতটা পারেন সর্বশেষ তথ্য নিলেন, কিন্তু একই সঙ্গে মাথায় খেলালেন আর্টের সব আইডিয়া যা দিয়ে পূরণ করলেন

ডাইনোসর দেহাবয়বের সম্পর্কে বিজ্ঞানের জানায় ফাঁকগুলো। একদিকে বিজ্ঞানের খবরদারী, অন্য দিকে নিজের আর্ট-সম্মত স্বাধীনতা– এর মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিলো সর্বসাধারণের কাছে ব্যাপক ভাবে ডাইনোসরের প্রতিকৃতির প্রথম প্রদর্শন হকিন্সের উদ্যোগে। এই সাহসী কাজটি করে হকিন্স বিজ্ঞানী মহল থেকে সমালোচিত হয়েছিলেন বিজ্ঞান যা প্রমাণ করেনি এমন আন্দাজ ব্যবহার করার জন্য, তা ছাড়া সরাসরি ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য। এটি বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পেয়েছে কারণ ওই গ্রেট এক্সিবিশিনকে ঘিরে যে লক্ষ মানুষের উৎসাহ তাদের মধ্যে ডাইনোসরের প্রতি কৌতুহল প্রবল ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো। বিজ্ঞানীদের ও সমালোচকদের অনেকে মনে করছিলেন এটি ইতিবাচক, কিন্তু অন্যরা মনে করছিলেন এতে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে।

ইতিবাচক দিক থেকে হকিন্সকে আমরা আজকের বিখ্যাত সিনেমা নির্মাতা স্টিভেন স্পীলবার্গের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। স্পীলবার্গের দুনিয়া কাঁপানো সিনেমা 'জুরাসিক পার্কে' কম্পিউটার সিম্যুলেশনের মাধ্যমে সৃষ্ট ডাইনোসরদেরকে দেখে উৎসাহিত না হলে যেমন আজকের অনেক তরুণ-তরুণী এই প্রাণীগুলো সম্পর্কে অনেক কম জানতো, তেমনি হকিন্সের ডাইনোসর ভিক্টোরিয়ান যুগে সাধারণ মানুষের মধ্যে ডাইনোসর সচেতনতা সৃষ্টি করেছিলো। লক্ষ্যণীয় যে এই দুটি উদাহরণই এসেছে আর্টের পক্ষ থেকে, যদিও যার যার যুগের বিজ্ঞান হকিন্সেরটি এবং স্পীলবার্গেরটি উভয়টিকেই অনুপ্রাণিত ও সাহায্য করেছে।

রঙীন গ্রীক ভাস্কর্য। গ্রীক ভাস্কর্য আমরা রঙীন রূপে বড় একটা দেখিনা– প্রায় সবই সাদা মার্বেলে। তবে রঙীন গ্রীক ভাস্কর্য কোন কোন সময় খননে পাওয়া গিয়েছে, যদিও বিরল ভাবে। নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামে গ্রীক ভাস্কর্যের নতুন সংযোজন হয়েছে– আগের সাদাগুলোর ওপর রঙ ও চিত্রণ যোগ করে। বহুকাল যাবত গ্রীক ভাস্কর্যের যে ওই সাদা রূপটি দর্শকের মাথায় একেবারে গাঁথা হয়ে গেছে হঠাৎ ওই ভাস্কর্যেরই বর্ণিল মূর্তি, কখনো বেশ চোখ-ধাঁধানো রঙে আর নানা চিত্রণে, ভিরমি খাইয়ে দিতে পারে। ক্রোমা (রং) নামের এই সংযোজিত প্রদর্শনীটি অতীতের একটি সত্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছে মাত্র। সেটি হলো গ্রীক ও রোমানরা

আসলে তাদের মূর্তিগুলোকে রঙের সাজ পরিয়েই সৃষ্টি করেছিলো, সেই রঙের ছিটেফোটা এখনো টিকেও গেছে নানা জায়গায়, যেমন ১৯৮৮ সালে এথেন্সের প্রাচীন গ্রীক মন্দির এলাকা অ্যাক্রোপলিসে খনন করে যখন অনেক মূর্তি ও স্থাপত্য উন্মুক্ত করা হয় তখন এর বেশ কিছুর ওপর রঙের আভাস স্পষ্ট ছিল। ঠিক ওই খননের সময়ের দৃশ্য যে সব সমসাময়িক চিত্রশিল্পীরা ধারণ করেছেন তাঁদের ছবিতেও সেই রঙীন ভাব এসেছে। কিন্তু সাদা ভাস্কর্যের তুলনায় তা ছিল সামান্য।

এমন হবার কারণ হলো গ্রীকরা তাদের মার্বেল মূর্তিগুলোকে রং করার যে প্রযুক্তি ব্যবহার করতো সেটি দীর্ঘ দিনের আলো আর আবহাওয়ার প্রভাবে টেকসই হয়নি। সোজা কথায় রং জ্বলে গিয়ে সাদা হয়ে গিয়েছে এবং সেই সাদাই আমরা দেখেছি। কোন কোন আর্ট বিশেষজ্ঞ দীর্ঘকাল প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের ওপর গবেষণা করে আসল সত্যটা উদ্ঘাটন করেছেন। বিজ্ঞান গবেষণাও ব্যাপারটির প্রক্রিয়াটি দেখাতে পেরেছে। তারপরও শিল্পামোদীরা গ্রীক ভাস্কর্যকে তার আসল রূপে দেখা থেকে বঞ্চিত ছিলেন; মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম সেই অভাব কিছুটা পূরণ করেছে। এখানে মূল সাদা গ্রীক মূর্তির পাশে তার হুবহু অনুকৃতিকে আগের মত রঙ করে ও চিত্রিত করে রাখা হয়েছে। এতে দর্শক বুঝতে পারছেন উভয়ের মধ্যে দ্যোতনার পার্থক্য কতখানি। আর তা শুধু দ্যোতনারই ব্যাপার নয়; রং হারিয়ে যাওয়ার মানে হলো অনেক সূক্ষ্ম তথ্যও হারিয়ে যাওয়া। যেমন একটি সুপরিচিত গ্রীক মূর্তি হলো সাদা মার্বেলে গড়া গ্রীক ধনুর্বিদ হাঁটু গেড়ে বসে ধনুকে তীর সংযোজন করছে। কিন্তু এখন পাশে রাখা তার অনুকৃতিতে সংযোজিত রং ও চিত্রণ তাকে পোষাক দিয়েছে, তার কোমরে বাঁধা তীর রাখার তূণটিকে তার স্বকীয়তা দিয়েছে। পোষাকের ধরন এবং তার ওপর আঁকা প্যাটার্নগুলো নিশ্চিতভাবে বলে দিচ্ছে এই ধনুর্বিদ গ্রীক নয়, সে একজন পারসিক সৈনিক–গ্রীকদের শত্রু। সাদা মার্বেল মূর্তিতে এই তথ্যগুলো হারিয়ে গিয়েছিলো।

যাঁরা আজ গ্রীক ভাস্কর্যকে এভাবে রঙের সাজ পরালেন তাঁরা কী করে জানতে পারলেন যে আদিতে সাজটি এরকমই ছিল? এটি এসেছে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে। যেই রঙ-বস্তুগুলো দিয়ে আদিতে মার্বেলকে রং করা হয়েছিলো তার কিছু কিছু অণু মার্বেলের গা ভেদ করে একটু ভেতরে ঢুকে

থাকায় তা নষ্ট হয়ে যেতে পারেনি– যদিও বাইরে থেকে চোখে দেখে বোঝা যেতোনা। এখন শক্তিশালী আলট্রা-ভায়োলেট আলো মার্বেলের গায়ে সামান্য ভেতরে ঢুকে এগুলো দেখিয়ে দিতে পারছে। পুরোটা রঙীন ও চিত্রায়িত অবয়ব পুনরুদ্ধার করতে মার্বেল ভাস্কর্যগুলোর ওপর এক্সরে ফ্লুরোসেন্স, ইনফ্রা-রেড স্পেকট্রোস্কোপি এবং আলট্রা-ভায়োলেট এ্যানালাইসিস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন এক্সরে ফ্লুরোসেন্স পদ্ধতিতে এক্সরে ওই রঙ-বস্তুর অণুতে ঢুকে তার ইলেকট্রনগুলোকে এমন ভাবে শক্তিমাত্রায় উন্নীত করে যে তার থেকে ভিন্ন ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সির নতুন এক্সরে বিকীর্ণ হয়– যেগুলো কিনা ওই অণুর এক ধরনের ফিঙ্গার প্রিন্ট হিসেবে কাজ করে তাকে সনাক্ত করতে পারে। এখন মূর্তির গায়ের এক্সরে ইমেজ নিয়ে সেখান থেকেই কোথায় কোন্ রঙ, কী চিত্রণে ছিলো তা উদ্ঘাটন করা গিয়েছে।

এতটা বৈজ্ঞানিকভাবে না হলেও আগেও বহুদিন ধরে নানা ভাবে এই রঙের কথা বোঝা যাচ্ছিলো। কিন্তু মিউজিয়ামগুলো একে আর্ট-প্রেমিক মানুষের কাছে আনতে উদাসীন ছিলো– মানুষকে ওই সাদা মার্বেলের ধারণাতেই বুঁদ করে রেখেছিলো। আর্ট মহলের কর্তা ব্যক্তিরা বরং ওই শুভ্র মার্বেল মূর্তির ওপর এমন একটি কৃত্রিম মূল্য আরোপ করেছেন যেন এটিই ধ্রুপদী গ্রীক ভাস্কর্যের অবিচ্ছেদ্য রূপ। তাঁদের মতে রঙের কথা যাঁরা বলেন তাঁরা যেন একে কিছুটা খেলো করে ফেলেন। এভাবে আধুনিক কালের বিমূর্ত হবার আকাঙ্খাটি কিছুটা অতীতের ওপরও আরোপ করা হয়েছে। এতে বাস্তবের মত হবার চেয়ে বরং ভাব প্রকাশটিকেই বেশি গুরুত্ব দয়া হচ্ছে। গ্রীকরা বাস্তবের মত যেখানে হতে চেয়েছে, তাকে নতুন করে এখন আর্ট জগতে আনতে অনীহা এরই লক্ষণ। ইতিহাসের প্রতি অবিচার হলেও এখনো এটিই হয়ে চলেছে, বৈজ্ঞানিক উদ্ঘাটন সত্ত্বেও। মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামের কাজটি তার ব্যতিক্রম। আরো তথ্য দিয়ে আরো গতিময়তা এনেছে এই নতুন করে রঙের সাজে প্রাচীন ভাস্কর্যগুলো।

নতুন আলোতে ডেভিড। আর একটি বিখ্যাত প্রাচীন ভাস্কর্যের নতুন ভঙ্গিতে প্রদর্শন দর্শকদেরকে এখন খুব আলোড়িত করছে– এটি হলো মাইকেল এঞ্জেলোর মার্বেলে গড়া মূর্তি ‘ডেভিড’। ভাস্কর্যটি তার যথাস্থানে আছে– ইতালীর ফ্লোরেন্সের একাডেমিয়া গ্যালারিতে। রেনেষাঁ শিল্পীদের বড়

বড় সব আর্টের আকর এই নগরীর সব চেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্য হলো এই গ্যালারি, বিশেষ করে ডেভিডের কারণে। কিন্তু অতি সম্প্রতি যাঁরা ডেভিডকে দেখছেন, এবং আগেও দেখেছেন তাঁরা রীতিমত চমকে উঠছেন এর মধ্যে এক সম্পূর্ণ নতুন গরিমা দেখতে পেয়ে। অথচ বাস্তব মানুষের থেকে কিছু বড় আকারের সাদা মার্বেলে খোদাই ডেভিডের এই বলিষ্ঠ সুন্দর, সুঠামদেহী কমনীয় মুখ, এই নগ্ন মূর্তিটি তেমনিই আছে– কোন জায়গায় কোন হাত দেয়া হয়নি। পরিবর্তন যেটুকু আনা হয়েছে তা হলো মূর্তির ওপর প্রক্ষেপিত আলোর ক্ষেত্রে, আর তাতেই বদলে গেছে ডেভিডকে দেখার পুরো দৃষ্টিভঙ্গি। এখন নতুন আলো এমন অন্তরঙ্গ ভাবে ডেভিডের চারিদিকে ফেলা হয়েছে এবং এই আলোর গঠনে এমন একটি অন্তর্ভেদী গুণ রয়েছে যা মূর্তিটিকে পারিপার্শ্বিক বাকি সব আবহের মধ্যে অনেক বেশি সজীব করে তুলেছে। মূর্তির মার্বেলের গায়ের রেখাগুলোর, এবং পেশিগুলোর সৌকর্য আগের তুলনায় অনেক গভীর দেখাচ্ছে। আগেও দর্শক এর ব্যতিক্রমী আর্ট-গুণ দেখতেন, কিন্তু এখন মনে হয় মার্বেলের ওপর ছেনি-হাতুড়ির আঘাতে কী ভাবে সেই আর্ট-গুণগুলো সৃষ্টি হয়েছে সেই প্রক্রিয়াটিও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। আঘাতগুলো কীভাবে মার্বেলকে খোদাই করেছে তার স্থূল বা কাঁচা প্রকাশ এগুলো মোটিই নয়, বরং এগুলো যেন দৃষ্টিতে আসে ছোট ছোট সৃজন-অভিঘাত হিসেবে। ফলে দেখার গভীরতা অনেক বেড়ে গেছে।

এটি সম্ভব হয়েছে যেই ছোট ছোট এল ই ডি বাতির সমন্বয়ে এই নতুন আলোক প্রক্ষেপন তা এমন সব ফ্রিকোয়েন্সির আলোর সংমিশ্রণ যে মার্বেলের ওপর ছেনির অভিঘাতগুলোকে ওরকম মসৃণ স্বাভাবিকতার মধ্যে দৃশ্যমান করতে পারে। ডেভিডের মধ্যে দেখার জিনিস, মুগ্ধ হবার জিনিস বেড়ে গেছে– এ শুধু তার অপূর্ব সৌকর্যময় অবয়বটিতে নয়, বরং তার মার্বেল গায়ের ওপর আর্টের কাজগুলোতেও। এর ফল যা হয়েছে, আগে দর্শকরা গ্যালারির বিশাল হলঘরে ডেভিডের কাছে এসে মুগ্ধ হয়ে কিছুক্ষণ দেখতেন, তারপর অন্য আরেক কোণ থেকে ডেভিডের মূর্তির অবয়বটি আবার লক্ষ্য করতেন। তারপর সময়াভাবে তাঁরা ওখানকার অন্য আকর্ষণগুলোর দিকে চলে যেতেন। কিন্তু এখন তাঁদের পক্ষে সেটি সম্ভব হচ্ছেনা, ডেভিডেই তাঁরা আটকে যাচ্ছেন। কারণ এখন তাঁরা মাইকেল এঞ্জেলোর আর্টের কাজ দেখছেন– যে দেখা যেন কিছুতেই ফুরোতে চায়না। শুধু আলো পরিবর্তনের

কারণে শিল্পীর আর্ট চিন্তা তার ছেনিতে-মার্বেলে সংঘর্ষগুলোই যেন এখন ডেভিডের মধ্যে অনেক বেশি অনুধাবনের সুযোগ ঘটে গেছে, সে জন্য তাঁকে অনেক বেশি সময় দিতে হচ্ছে; খুব স্বাভাবিক ভাবেই আর্টপিপাসু দর্শকরা সেটি দিচ্ছেন। আর্টিস্ট বহু আগে তাঁর কাজ করে গেছেন, সেটি ওরকমই আছে। এখন আলোর বিজ্ঞান আরো কিছু কাজ করে সেই মূল অবদানকে দর্শকদের কাছে বেশি অনুধাবনযোগ্য করে তুলেছে। চোখে ধরা না পড়ার কারণে যার মধ্যে স্থবিরতাটি বেশি ছিল, আলোর কল্যাণে আর্টিস্টের কাজের গতিময়তাগুলো এখন সেখানে প্রাধান্য বিস্তার করছে।

ভাস্কর্যে থাকা গভীর ক্ষতের চলমানতা:

গৌরবের মোটর গাড়ির ভেতরে। আধুনিক স্টাইলিশ গাড়ি– চক্চকে পালিশ করা, বার বার হয়েছে পাবলিক প্রদর্শনের লোভনীয় জিনিস। মোটর গাড়ির নতুন নতুন ডিজাইনের ওপর অনেক সৃজনশীল মানুষ কাজ করছেন, এবং তার কোন কোনটির ফলশ্রুতি অসম্ভব জনপ্রিয়ও হয়েছে। এমন গাড়ির প্রদর্শনী কম হয়না, কিন্তু তাকে এক ভাবে আর্টের প্রদর্শনী বলা গেলেও ঠিক ভাস্কর্যের প্রদর্শনী বলা যাবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এমন সুন্দর ফ্যাশন-দুরস্ত কিছু গাড়ি, যেগুলো চালাবার উপযুক্ত নয়, কিন্তু দেখে অবশ্যই চালাবার ইচ্ছে জাগবে সেগুলোকে ভাস্কর্য হিসেবে পরিবেশন করা হয়েছে একটি প্রদর্শনীতে। তার ভাস্কর্য হবার দাবি কিন্তু ওতে থাকা নানা খুবই মন খারাপ করা ক্ষত চিহ্নের কারণে! যেমন এর কোন গাড়ি দেখলে মনে হবে গাড়িটি বহুকাল মাটিতে কবর দেয়া অবস্থায় ছিল। ফলে তার বাইরের চাকচিক্য সত্ত্বেও ওখানে ভেতরের দগদগে বহু ক্ষয়ের চিহ্ন যেন বেরিয়ে এসেছে। কাজেই বাইরের সুন্দর পেইন্টিং ভেদ করে দেখা যাচ্ছে গাড়ি নির্মাণের আদি সব উপাদান যেগুলো মোটেই দৃষ্টি নন্দন নয়। রাসায়নিক ক্ষয় ক্রিয়ার ফলে সেগুলোরও মূল খনিজদ্রব্য, যার অনেকগুলো তখন মরিচার রূপে বা দৃষ্টিকটু স্ফটিকের রূপে, ঝরে পড়া গুড়ার রূপে বেরিয়ে এসেছে। এগুলো যে খুব রাখঢাক জায়গায় তাও নয়; বরং রয়েছে চকচকে দরজার হ্যান্ডেলের আশেপাশেই, কিংবা স্টিয়ারিং হুইলের এক পাশটাই হয়তো এভাবে অবক্ষয়িত হয়েছে– জানালা দিয়ে তাকালেই দেখা যাচ্ছে।

এই সব আর্টিস্টের কষ্ট-কল্পিত নয়, সব গাড়ির জন্যই এগুলো বৈজ্ঞানিক ভাবে সত্য। সব গাড়িই পরিকল্পিত হয়ছে একটি নির্দিষ্ট কাল কাজ করার জন্য, ওই সময় দৃষ্টি-নন্দন থাকার জন্য। এরপর সেটি অবক্ষয়ের পথে যাবেই। গাড়িটির নির্মাণের পেছনের ধাতুবিদ্যাটিকে রাখা হয়েছে স্থূল পর্যায়ে, যাতে ওই নির্দিষ্ট কাল ব্যবহারের পর এটি আর তেমন পরিপাটি না থাকে। যে সময় একে প্রাণ-প্রিয় নান্দনিক একটি জিনিস হিসেবে দেখছি সে সময়েও অবক্ষয়ের কাজটি শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু তা আমরা উপেক্ষা করি। এই ভাস্কর্য যেন দর্শককে সেটি উপেক্ষা করতে দিতে চান্‌না। ভাস্কর্যটি বরং তাঁর মনে একটি চমকে ওঠা আর্তনাদ সৃষ্টি করতে চায়, যখন গাড়িটি এখনো মোটের ওপর দৃষ্টি-নন্দন ডিজাইনের দ্যোতনা ছড়াচ্ছে। গাড়ি এখন নিশ্চল, সে কথা মেনে নিয়েও এটি যথেষ্ট লোভনীয়, ডিজাইনের ও তার চাকচিক্যের কারণে। কিন্তু তার মধ্যে যে ক্ষত রয়েছে, অবক্ষয়টি যে চলমান রয়েছে সেটিও এক মর্মান্তিক সত্য। ভাস্কর এই ট্র্যাজিক দিকটিকে সামনে এনে দর্শকের মোহময়তাকে ধাক্কা দিতে চেয়েছেন।

এইড্‌সের ক্ষত। ওপরে যে গাড়ির প্রদর্শনীর কথা বলা হলো তাতে ক্ষতকে দরজার হ্যান্ডেলের আড়ালে কিংবা জানালা দিয়ে ঝুঁকে দেখতে হয়েছে। কিন্তু সব ক্ষতকে এভাবে কষ্ট করে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়না। যেমন শতগুণে বেশি মর্মভেদী স্বজন হারানোর ক্ষত। এই ২০২৩ সালেই নিউয়র্ক নগরীর গ্রীনিচ ভিলেজ অঞ্চলের এইড্‌স মেমোরিয়াল পার্কে একটি নতুন ভাস্কর্য স্থাপন করা হয়েছে, গত শতাব্দীর শেষের দিক থেকে এইড্‌স মহামারীটি যখন দুনিয়ার অনেক মানুষকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে তারই স্মরণে এই পার্ক আর এই ভাস্কর্য। এই গ্রিনিচ ভিলেজের আশ পাশের নগরীর পাড়াগুলো এক দিকে যেমন আধুনিক তারুণ্যের প্রতিবাদী নতুন চিন্তার ধারক সাহিত্য-সংস্কৃতি-সঙ্গীতের আন্দোলনে দুনিয়ার দৃষ্টি কেড়েছিলো, তেমনি এইড্‌সের সংক্রমণ এখানকার পুরুষ জনসংখ্যার মধ্যে অপেক্ষাকৃত অনেক বেশি ছিল– যাদের অনেকের পরিণতি হয়েছে মৃত্যু। সে কারণেই এখানেই এইড্‌স মহামারীর এই স্মারকগুলো।

নতুন ভাস্কর্যটি গড়া হয়েছে ২০১৬ সালে। এতে এখানকার একজন সঙ্গীত শিল্পী ক্র্যাইগ ডুকেট যিনি এইডসে মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁর স্মৃতিকে ব্যবহার করা হয়েছে। ভাস্কর জিম হোজেস ক্র্যাইগের বন্ধু, শেষের দিনগুলোতে বন্ধুর মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁরা এক সঙ্গে এক বাসায় থেকেছেন সকল সুখ দুঃখের ভাগীদার হয়েছেন। ওই বাসায় একটি আলমারি (ক্লোজেট) ক্র্যাইগ ব্যবহার করতেন দৈনন্দিন আটপৌরে এটি সেটি রাখার জন্য। মৃত্যুর পর সেই আলমারিটিকেই হোজস ভাস্কর্য নির্মাণের মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছেন– হুবহু ওই জিনিসটিই। ব্যবহার্য নানা জিনিস যেমন করে কাজের পর অযত্নে এর মধ্যে রাখা হতো ঠিক সে ভাবে আছে, যা আর কোন দিন ওখান থেকে সরেনি। ভাস্কর্যটির নামও দেয়া হয়েছে 'ক্র্যাইগের ক্লোজেট'।

এই ভাস্করের কি লক্ষ্য ছিল শুধু মৃত বন্ধুর একটি স্মৃতি চিহ্নতে তাঁর কাজ ধারণ করে তাঁকে স্মরণ করা? না, সেটি তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিলনা। এইড্স মহামারী যে এই সমৃদ্ধ জনপদে কত বড় একটি শূন্যস্থান সৃষ্টি করে গেছে, কত বড় হাহাকার রেখে গেছে সবাইকে সেটি মনে করাতেই মূলত এই ভাস্কর্য। একটি একটি করে সম্মিলিত ক্ষতের প্রতীক– মানুষের অন্তরের ক্ষত। ক্ষতটা বোঝা যায় যখন দেখি আলমারিটির মধ্যে দৈনন্দিন অনেক দায়দায়িত্বের ও কাজের পরিচয় রয়েছে। এর সঙ্গে যে আলনা তাতে হ্যাঙ্গারগুলোতে শার্ট, কোট ঝুলানো, সঙ্গে আরো কিছু কাপড় চোপড় এলোমেলো রাখা। আর আলমারির তাকে তাকে জীবনের নানা টুকিটাকি, কিছু কিছু করে জমে গেছে, ড্রয়ারে, বাক্সে; কাঁধে ঝোলাবার ব্যাগ– বোঝা যায় সেই ব্যাগের ভেতরে অনেক কিছু। মোট কথা দৈনন্দিন ঘরোয়া সব জিনিস যা ব্যবহার করতেন এক সময়ের ব্যস্ত মানুষ সম্প্রতি যিনি অসুস্থ ছিলেন। সবই ভাস্কর্যে আনা হয়েছে কালো রঙে; এখন উদ্দেশ্যহীন স্থবির– ওটিই ক্ষত। কিন্তু অতীত গতিময়তার সব চিহ্ন স্পষ্ট।

ক্র্যাইগ মারা যাবার পর পরই তাঁর ভাস্কর বন্ধু আলমারিটি তেমনি ভাবে কিছু দিন রেখে দেবার চেষ্টা করেছেন; তারপর বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুরো জিনিসটির থ্রি-ডি স্ক্যান তার ইমেজ ডিজিট্যাল রূপে সংরক্ষণ করেছেন। ভাস্কর্যটির পরিকল্পনা ইতোমধ্যে তাঁর মাথায়। তখন প্রশ্ন উঠেছে কোন্ নির্মাণ বস্তু ব্যবহার করে তিনি ওই ডিজিট্যাল ইমেজকে সত্যিকার সলিড ভাস্কর্যে

নিয়ে যাবেন– সব কিছু হিসেবে এটি নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেছেন তিনি, বহুদিন ধরে। ভাস্কর্যের ভিত্তি হিসেবে মূল পাটাতনের জন্য কালো গ্রানাইট পাথর এবং বাকি অংশের জন্য ঢালাই করা ব্রোঞ্জের ব্যবহার করতে সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ ঢালাই কোম্পানীকে কাজটির ভার দিয়েছেন। ডিজিট্যাল ইমেজ থেকে ঢালাইয়ের ছাঁচটি তৈরি হয়ে গেছে। ওতেই গলিত ব্রোঞ্জ ঢালাই হয়ে তৈরি 'ক্র্যাইগের ক্লোজেট' ভাস্কর্যটি। হোজেস চেয়েছেন এই এলাকার ওপর দিয়ে এইডসের যে ঝড় বয়ে গেছে, এখানে কত বড় ক্ষত এটি রেখে গেছে তার ভাস্কর্য এখানকার সাধারণ মানুষের চোখের সামনেই থাকুক। তাই ব্যস্ত রাস্তার দ্বারা বেষ্টিত পার্কটিতেই স্থাপন করেছেন এটি। এখানে এক পাশে পার্কের একটি সাদা স্মারক মনুমেন্ট এবং অন্য পাশে এইডস রুগীদের নিরাময়ে স্থাপিত একটি হাসপাতালের সাদা সম্মুখ ভাগের মাঝখানে এই কালো ভাস্কর্যের বৈপরীত্যটি যেন পথচারীদেরকে একটি ধাক্কা দিয়ে যায়। জীবন-মৃত্যুর ওই অনুভূতি দিয়ে যেই ধাক্কার অভিজ্ঞতা তার অসুস্থ দিনগুলোতে বন্ধু সঙ্গীতশিল্পী ক্র্যাইগের মাধ্যমে ভাস্কর হোজেস পুরাদমেই পেয়েছেন; তারই খানিকটা যেন তিনি পথচারীদেরকে দিচ্ছেন। হাসপাতালটি আজকের ওষুধ নিয়ে এইডস রুগীদের এখন বাঁচিয়ে রাখতে পারছে। তাঁরা হাসপাতাল ছেড়ে যাচ্ছেন। দিনগুলো বদলে গেছে, কিন্তু ক্ষতের অনুভূতিটি বদলিয়েছে কি? ক্র্যাইগের ক্লোজেটে অযত্নে ঝুলিয়ে রাখা কাপড় চোপড় দেখিয়ে দিচ্ছে জগদ্দল কালো গ্রানাইট আর ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যও কেমন গতিময়তা দিতে পারে।

তথ্যকেও আর্টে রূপ দেয়া যায়

তথ্য-উপাত্ত সাধারণত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমেই সংগ্রহ করা হয়, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা বিজ্ঞানের কাজেই ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বিরল ক্ষেত্রে তাকে আর্টের মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে, যা চমৎকার আর্ট-অনুভূতি সৃষ্টি করছে। তথ্যকে যে সাধারণত সংখ্যার সারণি, গ্রাফ, ম্যাপ, নানা নক্‌শা ইত্যাদি রূপে পরিবেশন করা হয় আর্টের কাজে আসবার সুযোগটি ওখানেই সৃষ্টি হয়ে যায়। পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে প্রায়শ একটি নান্দনিকতা থাকে; কিন্তু সেই নান্দনিকতাটাই শুধু একে আর্ট হয়ে ওঠতে দেয়না। ওই তথ্য-সম্ভারের মধ্যে যে বক্তব্যটি থাকে আর্টিস্ট বা আর্টের ভোক্তার কাছে সেই

বিষয়টিই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় যদিও তাঁর সামনে হয়তো কিছু সংখ্যা, রেখা, নকশা ছাড়া অন্য কিছু থাকেনা। ওই সুন্দর নান্দনিক তথ্য-ছবিটিকে দেখে তিনি চলে যেতে পারেন সেই ঘটনার কারণের মধ্যে এবং যেই প্রক্রিয়ায় এ তথ্য সম্ভারের জন্ম হয়েছে সেখানে– অনেক সময় অবচেতন মনে, অনেক সময় একেবারেই দেহমনে তার সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়ে।

আর্টের মত ঘরে ঝুলিয়ে রাখা ম্যাপঃ

তথ্যের আর্ট-রূপের খুবই সহজ সরল একটি উদাহরণ হলো কোন ম্যাপকে ঘরের সজ্জায় চিত্রশিল্প হিসেবে ঝুলিয়ে রাখা। শত শত বছর ধরে এই রেওয়াজটি চালু ছিল, এখনো তাতে একটুও কমতি হয়নি। কারণটি হলো ম্যাপ জিনিসটির সঙ্গে যুগে যুগে বরাবরই একটি রোমান্টিক সম্পর্ক ছিল আর্ট এবং বিজ্ঞানের অনুরাগী মানুষের। সাধারণ নান্দনিকতা এর অবশ্যই রয়েছে। রাজনৈতিক ম্যাপে নানা রঙে রঙীন বিভাজনে দেশ, রাজ্য, প্রদেশ ইত্যাদিকে বিভক্ত করে, আবার প্রাকৃতিক ম্যাপে নদী, হ্রদ, পর্বত, বন ইত্যাদিতে সুসজ্জিত এবং ভূমির উচ্চতা দেখানো রিলিফ ম্যাপে আরো বেশি দৃষ্টি-নন্দন একটি ছবি এটি হয়ে উঠতে পারে বৈ কি। কিন্তু খুবই স্পষ্ট ভাবে বিশাল জায়গার এত সব খুঁটিনাটি তথ্য যে সরাসরি দর্শকের অনুধাবনে যাচ্ছে সেই ব্যাপারটিও এক এক দর্শকের কাছে এক এক রকম ভাবের উদয় হবার সম্ভাবনাটিও একটি আর্ট। আধুনিক কালে উপগ্রহ থেকে সৃষ্ট ম্যাপগুলো এখানে বিশেষ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এটি একটি বিশেষ সময়ে ওপর থেকে তোলা বিশাল এলাকার ফটো বৈ নয়। এ জন্য এতে ওপর থেকে ফটোগ্রাফি আর্টের বৈশিষ্টগুলোও অন্যান্য আর্টগুণের সঙ্গে যুক্ত হয়। সময়টিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ– বিভিন্ন সময়ে তোলা এমন ছবিতে নদী, বন, নগর ইত্যাদিতে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলোও সহজে স্পষ্ট হয়ে সরাসরি দর্শককে নাড়া দেয়। স্কেলের যে বিশাল বৈচিত্র বিভিন্ন ম্যাপে সম্ভব হয় সেটিও আর্টে ভিন্ন অনুভূতি আনে– পুরো পৃথিবীর ম্যাপে এক রকম, আবার নিজের গ্রামের বা নগর বা পাড়ার ম্যাপে সম্পূর্ণ অন্য রকম।

আজকাল জিওগ্রাফিক্যাল ইনফরমেশন সিস্টেমের (জিআইএস) কল্যাণে একই জায়গার ওপর বিভিন্ন রকমের তথ্যসমৃদ্ধ ম্যাপের উপরিপাতন ঘটানো হয়। সেখান থেকে নানা বিশেষায়িত ম্যাপকে আর্টে ব্যবহারের অন্য রকম

সুযোগও রয়েছে। কামরার সজ্জায় ব্যবহার করার ম্যাপের কিনারাকে নানা আকৃতি দিয়ে তার সার্বিক বিন্যাসে আরো বৈচিত্র ও আরো নান্দনিকতা আনা যায়– আয়তাকারের সঙ্গে এক বা একাধিক বৃত্তাকার, ডিম্বাকার ইত্যাদি নানা আকৃতি। আর্ট-চিন্তায় আরো একটি মাত্রা আনা যায় বর্তমান ম্যাপের বদলে বা তার সঙ্গে ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ের একই জায়গার ম্যাপ ব্যবহার করে। তখন ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের মাত্রাটির যোগ হয়। হয়তো অতীতের ম্যাপ বর্তমানে মত এতো নিখুঁত নয়, কিন্তু তবুও সেটি কাজ করে। কিন্তু ম্যাপের এমনি আর্টকে যে আগে থেকেই খুব আর্টে ভারী বা বক্তব্যে ভারী হিসেবে বিবেচনা করে পরিকল্পনা করতে হবে তা নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে তেমনি বক্তব্যে ভারী যে হবেনা তাও নয়– যখন বাড়ির বা অফিসের কোন একটি ঘরকে আমরা ম্যাপ-রুম হিসেবে ব্যবহার করতে চাই তখন। কিন্তু অন্য সময় এই আর্টকে অনেকটা হালকা মেজাজেও নেয়া যায়– বাচ্চাদের ঘর, বসার ঘর, গল্প করার ঘর ইত্যাদি সাজাবার জন্য। এমনকি সব সময় দেয়ালই সাজাতে হবে তা কেন– টেবিল, চেয়ারের হেলান দেয়ার অংশ এসব আটপৌরে আসবাবের সঙ্গে প্রিন্ট করা ম্যাপও ম্যাপ-আর্টের সব শর্তই পূরণ করতে পারে কিছুটা হালকা মেজাজে। শুধু পরিপূর্ণ আর্ট হবার জন্য মনে রাখতে হবে যে ম্যাপের প্রত্যেক চিত্রণের রেখার ভেতরে তথ্যের অন্য রেখা আছে, আছে অন্য বাস্তবতার রোমান্টিকতা; সেখান থেকে কিছু নিতে পারি, বার বার নিতে পারি।

একজন তথ্য-আর্টিস্টের কিছু কাজঃ

কম্পিউটার সফট্ওয়্যার বিশেষজ্ঞ আরন কোবলিন যখন তথ্য-আর্টের দিকে ঝুঁকেছেন ইতোমধ্যে তিনি ক্যানভাসে-তুলিতে একজন রীতিমত চিত্রশিল্পী। একই সঙ্গে কম্পিউটারেও চিত্রশিল্পী এবং অ্যানিমেশন ফিল্মেও হাত পাকিয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি চেয়েছেন পেশাগত ভাবে তিনি যে তথ্য-প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত তার মধ্য থেকেই তিনি আর্ট সৃষ্টি করবেন। সম্প্রতি তাঁর এরকম কিছু আর্ট 'প্রজেক্ট' নাম নিয়ে ইন্টারনেটে জনপ্রিয় হয়েছে। এখানে অনেক ক্ষেত্রে একটি ব্যাপার লক্ষ্যণীয়– আর্ট সৃষ্টি করতে তিনি যে বিশাল তথ্য ভাণ্ডার বিজ্ঞানের কাছে আছে তা ব্যবহার করেননি। তাঁর নিজের ওই আর্ট সৃষ্টি উপলক্ষেই অন্যদের মধ্য থেকে নতুন কিছু তথ্য সংগ্রহ করে

তাকেই আর্টের উপজীব্য করেছেন। এই অন্যরা হাজার হাজার মানুষ হতে পারেন। সেখানে একত্রে এই তথ্য সম্ভারের গুরুত্ব যেমন থাকে, তেমনি একজনের থেকে পাওয়া এক একটি তথ্যেরও গুরুত্ব থাকে।

ভেড়ার বাজার। এই আর্টে তিনি আমাজোন কোম্পানীর দশ হাজার কর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে কম্পিউটারে যার যার মত করে একটি ভেড়ার ছবি আঁকতে দিয়েছেন। এরা বিভিন্ন জায়গায় আমাজোনের বিপনন ব্যবস্থার সঙ্গে কাজ করেন। প্রত্যেকটি ছবির কিছু বিশ্লেষণ করে সেই সবের সামগ্রিকতাকে এক করে তিনি এই আর্ট তৈরি করেছেন– যার নাম দিয়েছেন 'ভেড়ার বাজার'। এতে দশ হাজার পৃথক ডিজিটাল ছবিকে উপরিপাতিত ও বিন্যস্ত করে যা সৃষ্টি হয়েছে তা দশ হাজার বিভিন্ন মানুষের কাজ– একে জনতার আর্ট বল্‌লে অত্যুক্তি হয়না। এর মধ্যে প্রত্যেক তথ্যের যেমন গুরুত্ব আছে তেমনি সামগ্রিকতারও গুরুত্ব আছে, যেন পুরো ভেড়ার বাজারটির একটি সামগ্রিকতা। ওই যে বলা হয় হাজার কণ্ঠ এক কণ্ঠ হয়ে গেলো তেমনি এখানে হাজার জনের আঁকা ভেড়া এক ভেড়া হয়ে গেলো এটিই এই তথ্য-আর্টসের মর্মকথা।

আবহাওয়া-টালিতে তৈরি প্যাটার্ন। কোবলিনের এ আর্টটি রীতিমত একটি স্থাপত্যের আকার নিয়েছে। কালিফোর্নিয়ায় সান হোসে বিমান বন্দরের একটি আচ্ছাদনই সেই স্থাপত্য, যেটি তৈরি হয়েছে অনেকগুলো ছোট ছোট টালির সমন্বয়ে। বড় অনন্য এই টালি– এর প্রত্যেকটি দূরের এক এক জায়গার আবহাওয়া তথ্য ধারণ করছে। টালিগুলো নিজে এমন বস্তু দিয়ে তৈরি যে তা ওই দূরের জায়গার আবহাওয়ার উত্তাপ এবং আলোর তথ্য গ্রহণ করে এবং সেই অনুযায়ী একেবারে স্বচ্ছ থেকে একেবারে অস্বচ্ছ এবং মধ্যবর্তী যে কোন রকম অনচ্ছ কাচের মত রূপ ধারণ করতে পারে। মোটের ওপর মূল জায়গায় মেঘের ছায়া কেমন, ওটি সূর্য কিরণ কতখানি পাচ্ছে তার ওপরেই বহু দূরের এই টালির স্বচ্ছতা নির্ভর করে। প্রত্যেক টালি দুনিয়ার নানা জায়গার ওই আবহাওয়া তথ্যগুলো ইন্টারনেটে প্রতিমুহূর্তে যার যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জায়গা থেকে পাচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী স্বচ্ছতায় বা অনচ্ছতায় থাকছে। এভাবে বিভিন্ন স্বচ্ছতার টালির এই আচ্ছাদনটি ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন রকম প্যাটার্ন সৃষ্টি করছে এবং তার তলায় আলো-ছায়ার অবস্থারও পরিবর্তন

ঘটছে। আসলে অচ্ছাদনটিকে মেঘের প্যাটার্নের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাই আর্টটির নামও দেয়া হয়েছে 'মেঘ'। তবে এই যে মেঘ এটি শুধু সান হোসে এয়াপোর্টের মেঘের তথ্য থেকে আসছেনা, অনেকগুলো জায়গার অনেক রকম মেঘ-তথ্য থেকে সামগ্রিক ভাবে তৈরি হচ্ছে। কাজেই এর প্রত্যেকটি তথ্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ– একটি বিশেষ জায়গার আবহাওয়ার, তেমনি ওই সব জায়গা মিলে যে তথ্য সম্ভারটিই আসলে প্রতি মুহূর্তে এই সম্মিলিত মেঘের চেহারা দিচ্ছে। এই মেঘের যখন এই তথ্য-আর্টটি উপভোগ করেন তখন ওই সব জায়গা, ওই সব আবহাওয়ার তাৎক্ষণিক পরিস্থিতিটি তাঁর অনুভূতিতে কাজ করবে বৈ কি। একেবারে সচল, জীবন্ত, বিস্তৃত বিশ্বের এক করা একটি আর্ট– প্রতি মুহূর্তেই যে নতুন রূপে চেহারা দেখাচ্ছে।

বায়ু প্রবাহের তথ্য-আর্ট:

বাতাসের প্রবাহের সঙ্গে মানুষের জীবনের নানা দৈনন্দিন ভাবনা জড়িত। গরম আর্দ্র আবহাওয়ার মানুষ যখন ঘামে হাঁসফাঁস করে তখন একটু মৃদু হাওয়ার স্পর্শ পেলে বাঁচে। সেই বাতাসটি কোন্‌দিক থেকে প্রবাহিত হচ্ছে সেটি ওই আরামকে প্রভাবিত করে বৈ কি! অন্যদিকে শীতের দেশে কনকনে হিমেল হাওয়া এসে শীত আরো বাড়িয়ে দেয় কিনা তা নিয়ে শংকিত থাকে সবাই। সেখানেও কোন্ দিক থেকে বাতাস বইছে তা গুরুত্বপূর্ণ। তবে বায়ুপ্রবাহের খবর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন ঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসে বাতাসের গতির হ্রাসবৃদ্ধি ও এর দিকের তথ্য ক্ষণে ক্ষণে জানাটি অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। আরো অন্য ধরনের নির্ভরশীলতা আমাদের আছে বায়ুপ্রবাহের ওপর। এক সময় পালতোলা জাহাজের যুগে বিশ্ব সমুদ্রের সব যাত্রাই তো বাতাসের দিকে তাকিয়ে থাকতো, আর প্রায় একই সময়ে বায়ুকলের যুগে শস্য ভাঙ্গানো, পানি পাম্প করা এসব কাজও। এ জাতীয় নির্ভরতার এলাকা কিছু দিকে কমে গেলেও তা কিন্তু একটি দিকে দারুণ বেড়েছে; দুনিয়ার দেশে দেশে এখন যেই সব বায়ুবিদ্যুৎ উইন্ড জেনারেটর বিদ্যুৎ শক্তির বড় একটি অংশ উৎপাদন করছে সেখানে বায়ু প্রবাহের দিক ও তীব্রতার ওপর শক্তির পরিমাণ ওঠানামা করছে।

বায়ু প্রবাহের প্রতি আমাদের মনের এই যে দুর্বলতা, আর আজকাল পৃথিবীর সর্বত্র থেকে প্রতি মুহুর্তের বায়ু প্রবাহের তথ্যের যে সহজ প্রাপ্যতা তাতে তথ্য-আর্টের মর্যাদায় উত্তীর্ণ হবার সুযোগ তার হতেই পারে এবং তা হয়েছেও। তার একটি উদাহরণ হলো ২০১২ সালে সের্নানডো ভিয়েগার্স এবং মার্টিন ওয়াটেনবার্গ এই দুই শিল্পী যুক্তরাষ্ট্রের একটি মানচিত্রকে পশ্চাদপটে রেখে প্রতি মুহুর্তে দেশের কোন জায়গায় বায়ুপ্রবাহ কোনদিকে যেই তাৎক্ষণিক তথ্যের চিত্রটি স্থাপন করেছেন। ফলে প্রতিটি মুহুর্তে দেশে কোথায় বায়ু প্রবাহ কী ভাবে চলছে, সেটি সময়ের সঙ্গে কী ভাবে বদলাচ্ছে তা দর্শক এই আর্টে দেখতে পাচ্ছেন। আসলে চিত্রটি একটি চলচ্চিত্র, যা বাতাসের তথ্য সার্বক্ষণিক ভাবে আমাদেরকে দিয়ে চলেছে? ইন্টারনেটের মাধ্যমে তা সংগ্রহ করে এবং ওভাবে চলচ্চিত্রে পরিণত করে।

এই বর্ণনা শুনে আর্টটিকে নেহাৎ মামুলি মনে হতে পারে, পরিবর্তনশীল একটি বায়ুপ্রবাহ ম্যাপ ছাড়া এ তো আর কিছু নয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো আর্ট অনুরাগী মানুষ বিপুল সংখ্যায় এটিকে গ্রহণ করেছেন। এটি এতই জনপ্রিয় হয়েছে যে দলে দলে গিয়ে সেটি উপভোগ তো করছেনই, এর থেকে কাগজে মুদ্রিত যে প্রিন্ট প্রায়ই নেয়া হচ্ছে সেই মুহুর্তে আর্টটির প্রতিকৃতিটি ছাপিয়ে, সেটি বিপুল সংখ্যায় বিক্রয় হচ্ছে। মানুষ এটিকেই বাঁধিয়ে বাসায় বা কর্মস্থল টাঙ্গিয়ে রাখছেন একটি শিল্পকর্ম হিসেবে। অথচ মূল আর্টের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনের সম্ভাবনাগুলোর যে অনিশ্চয়তা এই একটি ক্ষণের ছবিতে তার পরিচয় থাকেনা। ‘উইন্ডম্যাপ আর্ট’ বলে পরিচিত এই শিল্পকর্ম বায়ু প্রবাহের সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গতার বিষয়টিকে শিল্প অনুরাগীদেরকে নাড়া দিতে পেরেছে সময়ের সঙ্গে তার গতিময়তার অভিনবত্বের কারণে।

নদীর বা সমুদ্রের দিকে এক মনে তাকিয়ে থাকলে সেখানে যে রকম জলস্রোতের খেলা দেখা যায় এই উইন্ড ম্যাপ আর্টেও যেন বাতাসকে সেরকম প্রবাহিত হতে চোখে দেখা যায় এবং তা পরিবর্তিত হতেও। এটি দেখা যায় দেশের মানচিত্রের ওপর পাশাপাশি বিভিন্ন স্রোত-রেখায় এক একটি এক এক রঙে। যেখানে বায়ুবেগ প্রবল সেখানে রেখা মোটা, রঙ উজ্জ্বল। অন্যত্র সরু রেখা, কম উজ্জ্বল রং। কোথাও দীর্ঘ পথ জুড়ে মোটামুটি স্থায়ী প্রবাহ, কোথাও আবার স্থানীয় ঘুর্ণি। এসব বায়ুপ্রবাহ বা তার পরিবর্তন খুঁটিয়ে

দেখার মত উৎসাহ মানুষের কেন হবে? স্বাভাবিক কৌতুহলের কথা যদি বাদও দিই, কত মানুষ যে কত ভাবে দৈনন্দিন বায়ুপ্রবাহের তথ্যকে প্রয়োজনীয় মনে করেন তারও ব্যাপ্তি বেশ বড়। শীতের বাতাস বইবার কারণে শীত বাড়ার সম্ভাবনা দেখতে চান অনেক মানুষ, প্রচুর পাখি পর্যবেক্ষণকারী পাখির আনাগোনা জানার জন্য বায়ুপ্রবাহের বিষয় জানতে চান। সৌখিন ঘুড়ি ওড়াবার মানুষেরও কমতি নেই যাদের এটি জানা দরকার। তবে এসব মোটা দাগের তথ্যের জন্য আর্টের সঙ্গে প্রয়োজনীয়তাটি মেশানো যায়। কারণ এই তথ্য-আর্টে তথ্য যেই সূক্ষ্মতায় পাওয়া যায় তা ঘুড়ি ওড়াবার বা দূর পাল্লার সাইকেল চালাবার ক্ষেত্রে কাজে আসলেও, যিনি বিমান বা গ্লাইডার ওড়াতে চান তাঁকে আবহাওয়া অফিসের আরো নিখুঁতভাবে দেয়া তথ্য ব্যবহার করতে হবে। আসলে আর্টের অভিনবত্ব কিছুটা কৌতুহলের সঙ্গে এবং কিছুটা কাজে আসার সঙ্গে মিলিত ভাবেই উইন্ড ম্যাপ আর্টটিকে এত জনপ্রিয় করেছে।

'আশু-দুর্যোগের ঘন্টাধ্বনি':

আর্টিস্ট-বিজ্ঞানী কানাডার জের থর্প তাঁর ব্যতিক্রমী একটি ভাস্কর্যে তথ্য আর্টের এমন একটি আয়োজন করেছেন যা একই সঙ্গে চমকপ্রদ ও ভাবনা উদ্রেককারী। এর দ্বারা তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতি মুহূর্তের বৈজ্ঞানিক তথ্যকে ঠিক যে ভাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যাচ্ছে সেভাবেই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে আনার চেষ্টা করেছেন। ফলে মানুষ এক দিকে প্রকৃতির এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তার দৈনন্দিন কাজের মধ্যে হাতের কাছেই দেখার অভিনবত্বে চমৎকৃত হচ্ছেন, একই সঙ্গে ওই মারাত্মক দুর্যোগের সাবধান বাণী এর মধ্যেই পেয়ে যাচ্ছেন। এজন্য ভাস্কর্যটির নাম তিনি দিয়েছেন 'আশু-দুর্যোগের ঘন্টা ধ্বনি' (হারবিন্‌জার)।

ভাস্কর্যটি স্থাপিত হয়েছে ২০১৯ সালে কানাডার আলবার্টা রাজ্যের বড় নগর ক্যালগারির একেবারে কেন্দ্রস্থলে। এখানে ব্যস্ত রাস্তার ফাঁকে বড় চত্বরে যেখানটিতে ওটি আছে তার পাশ দিয়েই নগরীর সাধারণ মানুষজন তাঁদের নিত্যকর্মে যাতায়াত করেন, এবং প্রত্যেকবারই এই বড়সড় ভাস্কর্যটি তাঁদের নজরে না পড়ার উপায় নেই। আর রাস্তার কিছুটা কোলাহল সত্ত্বেও এ ভাস্কর্যের মধ্যে ইতস্তত সৃষ্টি হওয়া শব্দগুলোও না শোনার কথা নয়। কাজেই

যাঁরা বিশেষ করে ভাস্কর্যটি দেখার জন্য এর একেবারে কাছে যান তাঁরা ছাঁড়াও আরো অসংখ্য মানুষ একে দেখেন, শোনেন এবং বার বার হয়তো এর মর্মটি তাঁদেরকে স্পর্শ করে। এ ভাস্কর্য মোটামুটি হাজার সাতেক নানা আকার আকৃতির গ্রানাইট পাথরকে কিছুটা স্তুপের মত করেই তৈরি। অতীতে বরফের নদী হিমবাহ খুব ধীরে অথচ প্রচণ্ড চাপে শিলার ওপর দিয়ে যাবার ফলে এরকম ভাঙ্গা গ্রানাইট পাথর সৃষ্টি হয়েছিলো। ভাস্কর্যটির এই স্তুপের ভেতর থেকে মাঝে মাঝেই একটি লাউড স্পীকার পট্ পট্ ইতস্তত শব্দ আসছে, কখনো একটু জোরে কখনো একটু চাপা। এগুলো বড় বড় বরফের চাঁই ফাটার আর ভাঙ্গার শব্দ, বরফ গলে গড়িয়ে পড়ার শব্দ, কখনো পুরো চাঁইটাই ধসে পড়ার শব্দ শক্ত শিলার ওপর। আসলে ওই বরফ, তার ফেটে যাওয়া, ভেঙ্গে যাওয়া, বা পানি গড়িয়ে পড়া কিছুই ওই ভাস্কর্যের জায়গায় ঘটছেনা। এগুলো সবই ঠিক ওই সময়েই ঘটছে দূরে আরেক জায়গায়, শব্দও ওসব কারণে সত্যিই ওখানে সৃষ্টি হচ্ছে। শব্দকে বৈদ্যুতিক উপায়ে এই ভাস্কর্যের কাছে নিয়ে আসা হচ্ছে সব সময়। কাজেই ভাস্কর্যের দর্শকরা রিয়্যাল টাইমেই দূরে সৃষ্টি হওয়া শব্দগুলো শুনছেন।

আসল যে জায়গায় ঘটনাগুলো ঘটছে তা গাড়িতে গেলে ভাস্কর্য থেকে আড়াই ঘন্টার পথ– বান্‌ফ ন্যাশনাল পার্কের পার্বত্য এলাকায় বো হিমবাহে। হিমবাহ হলো চিরবরফের জগদ্দল নদী প্রাচীন কাল থেকে সৃষ্টি হয়ে জমে আছে। ভু-পৃষ্ঠ উষ্ণতার কারণে এর প্রান্তটি অর্থাৎ মুখটি ক্রমে বরফ ফেটে, ভেঙ্গে, গলে, অবক্ষয়িত হয়ে যাচ্ছে; অর্থাৎ কিনা হিমবাহটি এখন ক্রম বর্দ্ধমান গতিতে একটু একটু করে গলে গলে পিছিয়ে যাচ্ছে, যেখানে এখনো বেশি ঠান্ডা আছে সেদিকে। এক সময় ক্যালগারি নগরের কাছে পর্যন্তই ছিল, গলতে গলতে এখন বহু দূরে। জলবায়ু পরিবর্তন যে ঘটছে, হিমবাহের এই গলে যাওয়াটি তার জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী। নগরবাসীরা হয়তো সবাই বান্‌ফ ন্যাশনাল পার্কে গিয়ে ওই সাক্ষীকে দেখে আসবেননা। তাই আর্টিস্ট ভাস্কর্যটিকে নগরকেন্দ্রে স্থাপন করে সেখানে অন্তত আসল শব্দগুলোকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন দূর থেকে ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে। শব্দগুলো এতই স্পষ্ট যে বরফ ভাঙ্গার ও বরফ গলার পানি প্রবাহের শব্দ যে ইতস্তত এলোমেলো ভাবে ঘটলেও এটি নিত্য শোনা যাচ্ছে। আশু দুর্যোগের সাবধানবাণী হিসেবে এটিও

পথচারীরাও শুনছেন। এই শব্দ একেবারেই ঘটমান বাস্তব তথ্য; একে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই।

ক্যালগারি নগর ও আলবার্টা রাজ্যের মানুষের জন্য এটি বিশেষ ভাবে প্রাসঙ্গিক এজন্য যে এ রাজ্যের বড় বড় তেল কোম্পানীগুলো চায় এখানকার প্রচুর তেল সম্পদের পেছনে আরো বেশি ব্যয় করা হোক, এবং একে কানাডার জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক গুরুত্ব দেয়া হোক। কিন্তু সেটি হবে কানাডার জন্য এবং পৃথিবীর জন্য আত্মঘাতী– ফসিল জ্বালানী থেকে সরে যাওয়াটাই যখন সবার লক্ষ্য। নইলে জলবায়ু পরিবর্তনের মহাদুর্যোগ সবার ওপরে আসতে বাধ্য। মানুষের মনে শিল্পবোধের ভেতর দিয়েই এই চিন্তা জাগানোই লক্ষ্য। এও তথ্য-আর্ট। এখানে তথ্যটি সংখ্যার বা গ্রাফের আকারে আসছেনা, শব্দের আকারে এসে মনে আঘাত করছে। ভাস্কর্যটিতে একটানা একঘেঁয়ে ভাবে কিছু ঘট্‌ছেনা, এর কিছুই ঘড়ি ধরা কোন ব্যাপার নয়। গলতে গলতে কোন সময় বরফের বড় চাঁই বা কোন পাথর হিমবাহের মুখে ধসে পড়লে খুব বড় শব্দ হয়, ভাস্কর্যেও বড় শব্দ হয়, অন্য সময় তেমন নয়। বিকেলের দিকে সূর্য তাপ কমে গেলে এমন বড় শব্দ কমে যায়, রাতে আরো কমে যায়। শীতে ওদিকে হিমবাহের মুখ আর এদিকে ভাস্কর্যটি নিজেই যখন বরফে ঢেকে যায় তখন আর কোন শব্দই শোনা যায়না, এ যেন হিংস্র-ভয়ানক ভালুকের শীতকালে দীর্ঘ নিদ্রায় যাওয়ার মত। তবে স্পষ্ট এটি ভালুকের গুটি গুটি এগিয়ে আসা, এই অবক্ষয় চল্‌বে। বছর পঞ্চাশেকের মধ্যে অবক্ষয় আজকের হিমবাহ-মুখের অনেক পেছনে থাকা সিগন্যাল স্টেশনটি পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যে সিগন্যাল স্টেশনের ওপর গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি এবং ওই ভাস্কর্যের কাজ নির্ভর করে। ফলে ওখানে হিমবাহ না থাকাতে স্টেশনটি বিলুপ্ত হবে; আশু দুর্যোগের ঘন্টাধ্বনি আর শোনা যাবেনা– দুর্যোগ তখন পুরোপুরি এসেই যাবে।

জৈব স্ফুরণকে নিয়ে আর্ট

জীব আর জড়কে যখন আমরা আলাদা করি তখন জীবের মধ্যে অদ্ভুত একটি জৈব স্ফুরণ আমরা আশা করি– যা মানুষ বা যে কোন পূর্ণ জীবের কাছে তো করিই এমনকি একটি জীবকোষের মধ্যেও সেই স্ফুরন অনুভব করি। সেই সব কিছুকে আর্টের উপজীব্য করতে পারলে আমরা তাকে বলি বায়ো-আর্ট।

এই বায়ো-আর্টে'র চর্চা নানা সময় হয়েছে বিভিন্ন ভাবে; তা ছবি আঁকার অদ্ভুত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই হোক কিংবা আধুনিক জীববিজ্ঞানের বিস্ময়কর সব অগ্রগতির সহায়তা নিয়েই হোক।

টিশ্যু কালচার থেকে আর্ট:

উদ্ভিদ হোক বা প্রাণী হোক জীবের শরীরের বাইরেই তার কোষকে পুষ্টি-দ্রব্যের মধ্যে রেখে তাকে বাঁচিয়ে রাখা যায় এবং তার থেকে বহু কোষ সৃষ্টি সম্ভব। এভাবে দেহের বাইরেই কোষ-সমগ্র বা টিশ্যু গড়ে তোলা যায়– জীববিজ্ঞানে যা টিশ্যু কালচার। এর সুযোগ নিয়ে একাধারে আর্টিস্ট ও বিজ্ঞানী ওরোন ক্যাট্‌স এবং ইয়োনাট জুর 'টিশ্যু কালচার এবং আর্টস' শিরোনামে কিছু আর্ট সৃষ্টি করেছেন। তাঁদের আর্টের উপজীব্য জীবন্ত কোষ হওয়াতে সেই আর্টের মধ্যে এক রকম জৈব স্ফুরণ আরোপ তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সেখান থেকে দুটি উদাহরণ নেয়া যাক।

উদ্বেগ বিনাশী আর্ট। মধ্য আমেরিকার গুয়াতেমালার আদিবাসীদের মধ্যে একটি মজার রীতি চালু আছে; ওখানে শিশুদেরকে বোঝানো হয় সারাদিন তাদের কাছে যে ক'টি মন খারাপের কথা, ভয়ের কথা, উদ্বেগের কথা মনে হয়েছে রাতে শোয়ার সময় তার প্রত্যেকটি তার একটি পুতুলকে যেন বলে দেয়। তা হলে সকালে উঠে মনের মধ্যে ওই ভয়-উদ্বেগ আর থাকবেনা। কিন্তু পুতুলের বাক্সে থাকে মোট ছয়টি মাত্র পুতুল। তাই কারো ছয়টির বেশি উদ্বেগ থাকতে পারবেনা একই দিনে। বায়ো-আর্টের ওই দুই আর্টিস্ট ভাবলেন তাঁরা গুয়াতেমালার মানুষের ওই আইডিয়াটিকে কাজে লাগিয়ে ওই উদ্বেগ-বিনাশী পুতুলকেই একটি বায়ো-আর্টের রূপ দেবেন। তাঁদের হাতে পড়ে ওই পুতুল হয়ে গেলো টিশ্যু কালচারে গড়া পুতুল, ফলে তাতে আসলো এক রকম জৈব স্ফুরণ। যে পুতুলকে মনের কথা বলে দিচ্ছি তার মধ্যে ওই জৈব গুণ থাকলে তাতে ওই বলাটি, তার ওপর ওই নির্ভর করাটি কি অনেক বেশি জীবন্ত হয় উঠবেনা? সেটিই তাকে রীতিমত একটি বায়ো-আর্ট করে তুলবে– আদিবাসীদের ওই রীতির মধ্যে ইতোমধ্যেই তো তাতে সুন্দর একটি ঐতিহ্যবাহী আর্ট ছিল।

তাঁরা শুরুতে পুতুলকে বায়ো-ডিগ্রেডেবল পলিমার দিয়ে এমন ভাবে তৈরি করেছেন যে সেটিকে টিশ্যুকালচারের একটি ছাঁচ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। পুষ্টিদ্রব্য দিয়ে কোন জীবকোষকে ওখানেই বিভক্ত হতে দেয়া হয় এবং যখন টিশ্যু তৈরি হয় তখন ওই চাঁছের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে তা ওই পুতুলের রূপ ধারণ করে। বায়ো-ডিগ্রেডেবল হওয়াতে সময়ের সঙ্গে মূল পলিমারটি জৈব পরিবেশে বিলীন হয়ে যায়। আসলে মূল পলিমারের জায়গাটি টিশ্যু এসে দখল করে পলিমারকে প্রতিস্থাপন করে, ফলে পলিমারের পুতুল এখন টিশ্যুর পুতুলে পরিণত হয়েছে–প্রাণীর হাড়ের, পেশির বা চামড়ার টিশ্যুর। গুয়াতেমালার পুতুলের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো এখন একে ঠিক পুতুল বলা যায়না– এ যেন জড় ও জীবের মাঝামাঝি কিছু। গুয়াতেমালার ঐতিহ্যবাহী পুতুলটি একটি আর্ট ছিল যা পুরোটাই আর্টিস্টের সৃষ্টি। কিন্তু টিশ্যু কালচার অন্য সব জীবাণু কালচারের মত জৈব প্রকৃতির কাজ, আর্টিস্টের পুরো নিয়ন্ত্রণ তার ওপর থাকেনা, যদিও পলিমারের ছাঁচ তৈরির মাধ্যমে আর্টিস্টও অংশত নিয়ন্ত্রণ রেখেছেন– প্রকৃতি তার খেয়ালে পুরোটা নিজে কাজ করতে পারেনি। এটি তাই প্রকৃতি ও আর্টিস্টের যৌথ সৃষ্টি; আগে থেকে পুরোপুরি ভবিষ্যদ্বাণী করা এতে সম্ভব ছিলনা– জৈব স্ফুরনের কিছুতেই পুরোটা ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়না। বায়ো-আর্ট অবশ্যই গুয়াতেমালারটির মত শিশুদের জন্য নয়, বরং এটি আর্ট বোদ্ধাদের জন্য; জীবন-জগত সম্পর্কে তাঁদের নানা উদ্বেগ নিরসণের জন্য, যেই উদ্বেগ ছয়টির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখারও প্রয়োজন নেই। আর্টের মধ্যে ডুব দেয়ার মাধ্যমেই, সেটির জৈব-স্ফুরণ অনুভব করার মাধ্যমেই সব উদ্বেগের নিরসন হতে পারে।

প্রাণীর পশুর সঙ্গে সম্পর্ক পরিবর্তন। অধিক শীতে চামড়ার জ্যাকেট পরার প্রবণতা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু জ্যাকেটের সেই চামড়াটি পাওয়ার জন্য একটি প্রাণীকে হত্যা করতে হয়েছে। এই অতি বিতর্কিত বিষয়টি আর্টিস্টদেরকে খুব ভাবিয়েছে। প্রাণীর সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এরকম হতে হবে কেন? এই সম্পর্কটি একেবারে বদলে দেবার জন্যই যেন এই বায়ো-আর্টটি সৃষ্টি করেছেন তাঁরা। প্রাণী-চামড়ার অল্প কিছু কোষকে দিয়ে শুরু করে টিশ্যু কালচার করে। এর জন্য ছাঁচ হিসেবে এক্ষেত্রেও রয়েছে বায়ো-ডিগ্রেডেবল প্লাস্টিকে তৈরি জ্যাকেট। ফলে শেষ পর্যন্ত জ্যাকেটটি পুরোপুরি টিশ্যু কালচার সৃষ্ট চামড়ায় তৈরি। এও চামড়ার জ্যাকেট, পার্থক্য হলো এটির জন্য

কোন প্রাণীকে হত্যা করতে হয়নি। তবে এটি বেশ জটিল একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া, প্রত্যেক জ্যাকেট তৈরিতে শিল্পী ও কর্মীদেরকে এই সব প্রক্রিয়ায় দক্ষ করতে হয়েছে। তবে এর মানে কি এই যে বায়ো-আর্টিস্ট এবার ব্যবহার্য পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের কোম্পানীর ভূমিকা পালন করতে চান। তাঁরা বল্লেন সেটি মোটেই নয়, তাঁরা বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে আর্টের ভেতর আনতে চান। তা হলো মানুষের সঙ্গে প্রাণীকূলের সম্পর্ক কী হওয়া উচিত; এখনকার সম্পর্কটি সম্পূর্ণরূপে বদলে দেয়া যায় কিনা। এই বদলে দেয়া সম্পর্কের উদাহরণ করতে চেয়েছেন তাঁরা তাঁদের এই আর্টকে।

আর্টিস্টের চিন্তায় মানুষ সাধারণত যে কাপড় পরে সেটি সম্পর্কে তার অন্তর্নিহিত অনুভূতিটি হলো এটিও একটি চামড়া, নিজের চামড়ার ওপর আর একটি বাড়তি চামড়া হিসেবেই এটি আমাদের গায়ে আছে, যদিও আসল চামড়ার মত এত ভাল নয়। কিন্তু চামড়ার জ্যাকেট যখন পরি তখন এটি আরেকটি আসল চামড়ার মতই। তাই চামড়ার জ্যাকেটের এত কদর। আর্টিস্টরা বলছেন তাঁরা পোষাক বা জ্যাকেট সম্পর্কে মানুষে এই অনুভূতিই বদলে দিতে চান আর্টের মাধ্যমে। আর্টিস্ট দু'জন মনে করেন গায়ের কাপড় সম্পর্কে মানুষের মনের অনুভূতিটি আরেকটি চামড়ার অনুভূতি হওয়া উচিত নয়। নতুন আর্টের মাধ্যমে গায়ের ওপর যা পরবো সবগুলোরই একটি জৈব স্ফুরণ থাকতে হবে। শীতের জ্যাকেট চামড়া না হয়েও যদি সেই জৈব স্ফুরণ তার মধ্যে অনুভব করা যায় তা হলে মানুষের অগ্রাধিকার সেদিকেই থাকবে। অনুভূতিটা আসবে জীবের চামড়া হবার জন্য নয়, তার মধ্যে নিজের মত একটি জৈব স্ফুরণ অনুভবের জন্য। টিশ্যু কালচারের জ্যাকেট যেই বায়ো-আর্ট সৃষ্টি করেছে সেটি ওই অনুভূতি বদলে দেবার কাজে অবদান রাখবে।

রোগ জীবাণু কীভাবে আর্ট হয়:

বায়ো আর্টিস্ট আনা ডুমিট্রিউ ২০১৭ সালে অক্সফোর্ডে বিজ্ঞানের ইতিহাস মিউজিয়্যামে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে খুবই খ্যাতি লাভ করেছেন। এর নাম 'বায়ো-আর্ট' এবং ব্যাকটেরিয়া। এই নাম এবং বিজ্ঞান ইতিহাসের সঙ্গে তার প্রাসঙ্গিকতা প্রদর্শনীটি সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়কে সামনে আনছে। এর সঙ্গে জীবাণুর একটি সম্পর্কে আছে, আর সম্পর্কটি কিছুটা ইতিহাসের ধারাতেই উপস্থাপন করা হয়েছে। জীবাণু বলতে তিনি ব্যবহার করেছেন

রোগ জীবাণুগুলোকেই– এমন মারাত্মক জিনিস কি আর্ট হতে পারে? আসলে জীবাণুকে শিল্পসম্মত জিনিসে পরিণত করা এর উদ্দেশ্য নয়, বরং জীবাণুর রোগ সৃষ্টিকারী ক্ষমতাকে ভোতা করার জন্য যুগে যুগে যে চেষ্টা করা হয়েছে তারই জীব-বৈজ্ঞানিক কৌশলকে আর্টে পরিণত করেছেন এই বায়ো-আর্টিস্ট। তাঁর প্রদর্শনী থেকে দুটি বায়ো-আর্টকে তুলে ধরা যায়।

এন্টিবডির মালা। প্রদর্শনীতে একটি বায়ো-আর্টে কাচের বাক্সে মখমলের ওপর সাজানো আছে একটি পুঁতির নেকলেস, যাতে ৪৫২টি নানা আকৃতির পুঁতিতে গাঁথা হয়েছে একটি সুন্দর নেকলেস, গলায় পরার মত। হলুদ থেকে কমলা রঙের আভা ছড়াচ্ছে এই পুঁতিগুলো, কিন্তু এগুলো সাধারণ পুঁতি নয়, এগুলো গড়া হয়েছে এইচ আই ভি পজিটিভ রুগীর রক্ত থেকে নেয়া এই ভাইরাসের এন্টিবডি দিয়ে। এন্টিবডি হলো ভাইরাসকে বাধা দেবার জন্য রুগীর দেহে সৃষ্টি হওয়া বিশেষ প্রোটিন অণু। এই প্রোটিন গঠিত হয় নানা এমাইনো এসিড একের পর এক সাজানো দীর্ঘ শেকল থেকে। সম্ভাব্য মোট ২১টি ভিন্ন এমাইনো এসিড নামের অণু রয়েছে যার থেকে নিয়ে এই শেকলের অন্তর্ভুক্ত হয়। শেকলের মধ্যের একটি এমাইনো এসিড দিয়ে তৈরি হয়েছে এক একটি পুঁতি– পুরো নেকলেসটি হলো এইড্‌স ভাইরাসের এন্টিবডির একটি বড় আর্ট রূপ। এটিকে এত স্পষ্ট করে, দর্শক-উপযোগী করে বেশ নান্দনিকতার সঙ্গে এভাবে পরিবেশনের কারণ কী? এর আর্টিস্ট চেয়েছেন দর্শকরা এর মৌলিক বিজ্ঞানটি অনুধাবন করুক এবং একই সঙ্গে মনের মধ্যে অনুভব করুক যা তাঁরা দেখছেন তা সত্যিকারের এন্টিবডি (পুরো নেকলেসটি)। এটি সত্যি সত্যি রুগীর দেহ থেকে নেয়া হয়েছে, আর এটিই সেখানে ভাইরাসের সঙ্গে যুদ্ধ করে রুগীকে বাঁচিয়ে রাখে। আজকাল নিয়মিত ওষুধ দিয়ে এই এন্টিবডি বাড়াবার ব্যবস্থা রয়েছে– তাই এইড্‌সের ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আমরা যে জেতার পথে আছি তার একই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও শিল্পময় উপস্থাপনটি এই আর্ট চমৎকার ভাবে করছে।

যক্ষ্মার নির্দোষ জীবাণু। খুব বেশীদিন আগে নয়, গত শতাব্দীর প্রথম দিকেও সারা দুনিয়ায় এমন একটি সময় গিয়েছে যে যক্ষ্মা রোগটি সবাইকে আতঙ্ক গ্রস্ত করে রাখতো, এবং এর সংক্রমণকে মৃত্যুসনদ মনে করা হতো। এর জীবাণুটির বিরুদ্ধে মানুষকে দীর্ঘদিন যুদ্ধ করতে হয়েছে। উপরোক্ত

প্রদর্শনীতে বায়ো-আর্টিস্ট ডিমোট্রিউ জীবাণুকে আর্টরূপে দর্শকের কাছে উপস্থাপন করতে চেয়েছেন বটে কিন্তু সেটি এতই নির্দোষ অবস্থায় যে নানা রকম আর্দৃত আর্ট সামগ্রীর মধ্যেই তা প্রচুর পরিমাণে দিয়ে দিতে তিনি দ্বিধা করেননি। যক্ষ্মা যখন হয় তখন রুগীর ডিএনএ'র বিশেষ জায়গায় সামান্য কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। ওই পরিবর্তনকে সংশোধন করে এবং তা জীবাণুটির ওপর প্রয়োগ করে জিন-কারিগরির মাধ্যমে আজকাল ওই জীবাণুকে নির্দোষ করে নেয়া যায়। ওই নির্দোষ জীবাণুকে বিপুল পরিমাণে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসে, সুন্দর সব নান্দনিক সাজসজ্জার সঙ্গে দিব্যি মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এই বায়ো-আর্টে; সবাইকে নির্ভয় করতে যে এতে এই সুন্দর জিনিসগুলোর নিরাপদ ব্যবহারে কোন সমস্যা ঘটবেনা। আর্টিস্ট আরো একটি কাজ করছেন– যক্ষ্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধের কাহিনীটিকেও তিনি এর সঙ্গে আরেকটি আর্টে পরিণত করেছেন। সর্বশেষ তাতে যার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো এন্টিবায়োটিক আবিষ্কার। কিছু ফাঙ্গাসের (ছত্রাক) সৃষ্ট বিক্রিয়া যে একটি কাচপাত্রে জীবাণুকে নষ্ট করে দৈবক্রমে দেখিয়ে দিয়েছিলো যে ওখানে উৎপন্ন এন্টিবায়োটিকই সেটি করেছেন। ফাঙ্গাস থেকে পাওয়া এরকম এন্টিবায়োটিকই আজ যক্ষ্মাকে সহজে চিকিৎসাযোগ্য একটি সাধারণ অসুখের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। শিল্পীর ছোঁয়ায় এর আর্টস ও সায়েন্স সবার কাছে মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছে। আর জীবাণু জিনিসটিও যে সব সময় আঁৎকে ওঠার ব্যাপার নয়, জিন-কারিগরি তার আতঙ্কের দিকটিকে দূর করে তাকে আর্ট-সামগ্রীতে নিয়ে আসতে পারে সেই অনুভূতিও শিল্পী সৃষ্টি করেছেন।

আসলে পুরো প্রদর্শনীর একটি সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল দেখানো যে জীবাণুর সঙ্গে মানুষের চিরন্তন সহ-অবস্থান। এটি জ্ঞানগর্ভ কথা দিয়ে নয় বরং তাকে আমাদের সুকুমার কলায় অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমেই এর বায়ো-আর্টগুলো একথা বোঝাতে চেয়েছে।

বিখ্যাত চিত্র শিল্পীদের কাজ নিয়ে উদ্ঘাটন

চিত্রশিল্পের জগতে অতীতের মাস্টার শিল্পীদের শুধু আর্টটি নিয়ে নয়, সেই আর্টের পেছনের মানুষটি ও কাহিনীটিকেও যথেষ্ট মূল্য দেয়া হয়। আজকের শিল্পানুরাগীরা যখন তাঁদের ছবিগুলো উপভোগ করেন, এখন ওই সব কিছু মিলিয়েই করেন। অনেক প্রশ্ন ওঠে– কী পরিস্থিতিতে ছবিটি আঁকা হয়েছে,

একবারেই আঁকা হয়েছে না আগে এই ছবি অন্যভাবে আঁকা হয়েছিলো, আদৌ এটি তিনিই এঁকেছেন কিনা। সেই তথ্যগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়, এবং তাদের উদ্ঘাটন অনুযায়ী ছবির মূল্যায়নেও হেরফের হয়। সে জন্য ছবির বিশ্লেণ ও সমালোচনার পাশাপাশি ওই পেছনের কাহিনীগুলোর উদ্ভাবনের বিষয়েও ক্রমেই অগ্রগতি হচ্ছে, এবং তাতে একটি বড় ভূমিকা পালন করছে বিজ্ঞানের আধুনিকতম আবিষ্কারগুলো।

ছবির তলার ছবিঃ

অতীতের বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে অনেক সময় কিংবদন্তীর মত কাহিনী চলে এসেছে। এটি ক্রমান্বয়ে মধ্যযুগ, রেনেষাঁ, এবং রেনেষাঁ-পরবর্তী সময়ের জন্য যেমন প্রযোজ্য তেমনি নিকট অতীতের জন্যও। বহু ছবি হারিয়ে গছে, নষ্ট হয়ে গেছে, আগের ছবির ওপরে বর্তমান ছবিটি আঁকা হয়েছে- আগেরটি চাপা পড়ে গেছে, এমনি ধরনের কথা প্রচলিত আছে। এখন এই আর্ট জগতের প্রবণতা হলো এসবকে কথায় না রেখে বৈজ্ঞানিক ভাবে নিষ্পত্তি করে ফেলা।

ছবি আঁকার ভাল ক্যানভাস এক সময় সহজে পাওয়া যেতোনা বলে অনেক সময় মাস্টার শিল্পীরাও একই ক্যানভাসে ছবি এঁকে সেটি ঢেকে দিয়ে তার ওপর আবার ছবি এঁকেছেন– বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সেটি হতো আগের স্কেচের ওপর বা নানা স্কেচের মক্শো করা আগের ছবির ওপর সম্পূর্ণ ভিন্ন ছবি। বেশ কিছু দিন ধরে এক্সরে করার মাধ্যমে তলার ছবিগুলোর অস্থিত্ব ধরা পড়ছিলো বটে কিন্তু সেগুলোর পুরো দ্যোতনা উদ্ধার করা যাচ্ছিলোনা– যেমন তার রং, স্পর্শগুণ, বলিষ্ঠতা ইত্যাদি। এক্সরে থেকে আবছা যা উদ্ধার করা সম্ভব হয় তার থেকে এই বিস্তারিত দ্যোতনাগুলো আসবে কী ভাবে? এটি এখন করা হয় 'বুদ্ধির' প্রয়োগে– অর্থাৎ কিনা এই শিল্পী তাঁর অন্যান্য সব ছবিতে রেখার কী রকম টান দিয়ে কী রকম দ্যোতনাগুলো সাধারণত সৃষ্টি করে থাকেন সেই জ্ঞান ও তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে। এমন বুদ্ধি সেইই প্রয়োগ করতে পারে যার কাছে ওই আর্টিস্টের বাকি সব কাজ হাতের তালুর মতই মুখস্ত। আজকের দিনে এই বুদ্ধি সব থেকে বেশি আছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে ওই আর্টিস্টের বাকি সব তথ্যের

মহাসম্ভার থেকে আহরণ করার কাজটিতে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে যার ফলে আবছা এক্সরে ছবি থেকেও এটি প্রায় মূল ছবিটাই আন্দাজ করে নিতে পারে।

এভাবে হারিয়ে যাওয়া মূল ছবি উদ্ধারের বহু রকমের উদাহরণ আছে। ২০১৯ সালে জর্জ ক্যান এবং এ্যানথনি বুরাগেভ নামে দুই ছাত্র পিএইচডি গবেষণা করতে গিয়ে শিল্পী মডিলিয়ানির নিজে নষ্ট করে দেয়া একটি ছবিকে ওই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে উদ্ধার করতে পেরেছেন। এক সময় মডিলিয়ানি তাঁর প্রেমিকা ইংরেজ লেখিকা বিয়াট্রিস হোস্টিংসের প্রচুর ছবি এঁকেছেন। কিন্তু ১৯১৬ সালে দু'জনের বিচ্ছেদ ঘটলে মডিয়ালিয়ানি এই ছবিগুলোর অধিকাংশই নষ্ট করে ফেলেন– এ ছবির ওপর অন্য ছবি আঁকেন। ক্যান ও বুরাগেভ এরকম একটি নষ্ট করে ফেলা ছবি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে হুবহু পুনরুদ্ধার করেছেন।

এভাবে নষ্ট করা ছবি শুধু কেন, কালের প্রভাবে বিবর্ণ, পরিবর্তিত ছবিকে তার মূল গরিমায় পুনপ্রতিষ্ঠিত করার কাজটিও বা কম কী? সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন আসে ক্যানভাসের বুনোটে, রঙ-বস্তুতে। পেইন্টিংগুলো যখন উত্তাপ-আর্দ্রতার টানাপোড়েনে ফেটে ফেটে যায় তা অন্যরূপ নেয়; রং বদলে যায়, রং ফিকে হয়ে যায়, পুরো ছবির ওপর একটি হলুদ গোছের প্রলেপ পড়ে যায়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে উন্নততর এক্সরে যেই ক্যাট-স্ক্যান রয়েছে ঠিক সে রকম স্ক্যান করে মূল ছবির এই দিকগুলো সম্পর্কে অনেক বেশি তথ্য পুনরুদ্ধার হচ্ছে– বাইরের প্রভাবে ওপরে পাতলা স্তরে প্রলেপ পড়া, রং ফেটে যাওয়া- ফিকে হওয়া ইত্যাদি যা যা ঘটেছে তাকে ভেদ করে বিস্তারিত অভ্যন্তরীন অবস্থাটি পেয়ে যায় বলেই এই পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। এমনি আরো কিছু স্ক্যানিং ব্যবস্থা এটি আরো ভাল করতে পারছে। এরা ছবিকে স্পর্শ না করেই অপরিবর্তিত ও পরিবর্তিত স্তর নিয়ে যে বিপুল পরিমাণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে তা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিবেচনায় এনে পরিবর্তনের আগের রূপটি ফেরৎ আনা যাচ্ছে। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একা করছেনা, বরং তার ট্রেনিঙের সময় আর্ট বিশেষজ্ঞরা ওই কাল, ওই পারিপার্শ্বিকতা, ওই সময় ব্যবহৃত রঙ-বস্তু উপকরণ ইত্যাদির বিবেচনা দিয়ে তাকে পথ প্রদর্শনও করছেন। সব কিছুর পেছনে উদ্দেশ্য হলো শিল্পীর নিজের কালে গিয়ে শিল্পকে উপভোগ করা– ঠিক তখন মানুষ যেভাবে করতো।

শিল্পীর কাল বলতে এর প্রাচীনত্বকে যদি সত্যিকার প্রাচীন কালেই নিয়ে যেতে চাই তখন ব্যাপারটি আরো দুর্দান্ত হয়ে পড়ে। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় অনেক ছবি ও লেখা, প্যাপিরাসের গোল করে মোড়ানো স্ক্রোলের মধ্যে সংরক্ষিত আছে। এমনি কিছু স্ক্রোল রেমান ধনীদের কাছে তাদের বিলাসী বাড়িগুলোতে রাখা ছিল। ৭৯ খৃষ্টাব্দে ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে হারকুইলিনিয়ম নগরটি ধ্বংস হলে বেশ কিছু স্ক্রোল পুড়ে অঙ্গার হয়ে গিয়েছিলো। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালেটেক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এই অঙ্গার হওয়া স্ক্রোল 'ভার্চুয়ালি' খুলে তার ছবি ও লেখা পুনরুদ্ধারের মত প্রায় অসম্ভব কাজ করেছেন। কাজটিতে মূল ভূমিকা হলো রোগ নির্ণয়ের আধুনিক এক্সরে পদ্ধতি ক্যাট-স্ক্যানের। প্যাপিরাসের ওপর লেখার প্রাচীন কালিতে যে ধাতব অংশ ছিল তা কিন্তু পোড়েনি– ওটিই ক্যাট স্ক্যানে মোড়ানো প্যাপিরাসের স্তরের পর স্তরের লেখা ও ছবি হিসেবে ধরা পড়েছে। ক্যাট-স্ক্যান তো গোল করে মোড়ানো পরত করা রোল কেকের স্লাইজের মত করে সবকিছু উদ্ঘাটন করে সব ক্ষেত্রে। কেকের স্লাইজে যেমন দেখা যায় কোন স্তরে কী আছে তেমনি লেখার স্ক্রোলের স্লাইজের মত দেখা ছবিতে কোন স্তরে কার পাশে কী আছে তা উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

সন্দেহভাজনকে যেভাবে চেনে, শিল্পীর ছবিকেও সেভাবেঃ

আজকাল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে একটি কাজ বেশ চমৎকার ভাবে করা যায়– তা হলো কোন মানুষ সত্যিকার সেই মানুষ কিনা তা মুখাবয়ব থেকে নিশ্চিত করা। যেমন ভিসার জন্য যে ছবি কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয় এই মানুষটির মুখাবয়বের ছবিই যে সেটি তা সনাক্ত করা। 'ফেইস রিকগনিশন' ব্যবস্থা হিসেবে এটি পরিচিত। অনেকটা এই ব্যবস্থাতে এখন কোন একটি বিশেষ ছবি যে শিল্পী এঁকেছেন বলে দাবি করা হচ্ছে আদৌ তিনি সেটি এঁকেছেন কিনা তা নির্ণয় করা যাচ্ছে। আবার এমনো হচ্ছে যে সেই ছবিটিকে সচরাচর কোন মামুলি শিল্পীর আঁকা বলে মনে করা হয়েছে এই রকম গবেষণায় হঠাৎ দেখা গেলো যে এটি আসলে পুরানো কোন মাস্টারের আঁকা। সঙ্গে সঙ্গে এই ছবির ভাগ্য বদলে যায়– এর প্রতি আগ্রহ এবং এর দাম আকাশচুম্বি হয়।

একটি উদাহরণ নেয়া যাক। সম্প্রতি রেনেসাঁ কালের বিখ্যাত শিল্পী রাফায়েলের একটি নতুন ম্যাডোনা ছবি (শিশু যীশুকে নিয়ে মা মেরী) সনাক্ত

হয়েছে যেটিকে এতদিন পরবর্তী কালের কোন অজ্ঞাত শিল্পীর কাজ মনে করা হতো। এই আবিষ্কার কী ভাবে সম্ভব হলো, এর ওপর এতো আস্থাই বা কেন? বৃটেনের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্র্যাডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা ওই ফেইস রিকগনিশনের মত পদ্ধতিতেই দেখিয়েছেন যে রোমের সিস্টিন চ্যাপেলে রাফায়েলের আঁকা বিখ্যাত ম্যাডোনার সঙ্গে এই অখ্যাত ম্যাডোনার অনেক সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে হুবহু মিল রযেছে। একই ব্যক্তির আঁকা না হলে এই মিল কিছুতেই সম্ভব হতোনা। এই মিলের মধ্যে বেশ একটি সংখ্যাতাত্ত্বিক ব্যাপার রয়েছে– যেমন এটি বলে দিচ্ছে উভয় ছবির মা মেরীর ক্ষেত্রে মিলের পরিমাণ ৯৭%, আর শিশুর যীশুর ক্ষেত্রে তা ৮৬%, কোনটাই শতভাগ নয়, শত ভাগ মিল সম্ভব নয়। কিন্তু এত বেশি শতাংশ মিলই নিশ্চিত করে বলতে পারে যে এটি একই শিল্পীর হতে বাধ্য– শিল্পীর হাতের ছোঁয়ার মধ্যেই এমন কিছু আছে শিল্পের ওপর যা খচিত হয়ে যেতে বাধ্য। সেটি যে এতো বেশি শতাংশ হয় সেই ব্যাপারটাই তো আশ্চর্যজনক।

এখন মূল শিল্পীর ছবিটি সামনে রেখে ভাল নকলবিদ উচ্চ মানের শিল্পী যদি তা ওটি হুবহু নকল করেন, তা হলে সাধারণ দর্শক তার দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারেন, কিন্তু কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ফেইস রিকগনিশন ব্যবস্থার মত আয়োজনকে ফাঁকি দেয়া কিছুতেই সম্ভব নয়, ওটি নকল বলে ধরা পড়বেই। ওই নকলে এরকম শতাংশের থেকে মিল অনেক কম হবে। অবশ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তা নেবার আগেই অন্য ভাবেও নকল ধরা যেতে পারে– যেমন আসলের থেকে তার কাল যদি অনেক আগের বা পরের হয় তা হলে রঙ-বস্তুর পার্থক্য থেকেই তা বোঝা যাবে। যেমন যেই ছবিটি রেনেসাঁ কালের রাফায়েলের বলে প্রমাণিত হয়েছে তাকে এতদিন ভুল করে উনবিংশ শতাব্দীর কোন অজ্ঞাত শিল্পীর আঁকা মনে করা হয়ে আসছিলো। রঙ-বস্তুর ওপর আনবিক বিশ্লেষণ করেই ভুল বোঝা গিয়েছিল– এর রঙ-বস্তু মোটেই ১৮০০ শতকের নয় বরং ১৪০০ শতকের, রেনেসাঁ সময়ের।

ইমপ্রেশনিস্ট ছবিতে কি বায়ু দূষণের ইঙ্গিত আছে:

ইমপ্রেশনিস্ট (মনের ওপর ছাপ-বাদী) নামের যে আর্ট আন্দোলন ১৮০০ শতকে গড়ে ওঠছিলো তাতে শিল্পী দৃশ্যকে হুবহু বাস্তবে যা আছে সে ভাবে আঁকার চেষ্টা না করে ওটি দেখে তাঁর মনের ওপর সার্বিক যে ছাপ পড়ে

সেটিকেই ছবিতে ধরার চেষ্টা করেন– যেন তিনি তাঁর ইমপ্রেশন বা অনুভূতিকেই আঁকছেন। কাজেই এমনিতেই ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের ছবিতে একটি আবছা ভাব এসে যায়, কারণ বাস্তবের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি সূক্ষ্ম অবয়ব, প্রতিটি রং ফুটিয়ে তোলার কোন চেষ্টা সেখানে থাকেনা অনেক কিছু একাকার হয়ে ওই ইমপ্রেশনটিই প্রকাশ করে। এদিক থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় ১৮০০ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে এই আন্দোলনের দু'জন বিখ্যাত শিল্পী ফ্রান্সের ক্লোদ মোনে এবং বৃটেনের জে এম ডব্লু্য টার্নারের ছবি যেন আগেরগুলোর তুলনায় পরেরগুলো বেশি ইম্প্রেশনিস্ট হয়েছে। সব ইমপ্রেশনিস্ট ছবিতে যা হয় তেমনি এঁদের ছবিগুলোতেও আলো, কুয়াশা, ঘনত্বের কনট্রাস্ট, ধোঁয়া, ধূলো, ছিটকানো পানির বিন্দু এই সব কমবেশি হওয়াটি মুখ্য হয়ে এসে ছবিকে আবছা করেছে, যেমনটি ঘোলাটে ছাপ তাঁদের মনের ওপর পড়ছিলো। কিন্তু যেটি লক্ষ্যণীয় যেন তাঁদের পরের ছবিগুলোতে আবছা ভাব অপেক্ষাকৃত বেশি বেশি করে এসেছে। ১৮০০ শতকে পশ্চিম ইউরোপে বিশেষ করে লন্ডন, প্যারিস ইত্যাদি জনবহুল নগরে বাড়িতে, ট্রেনে, জাহাজে, ফ্যাক্টরিতে কয়লা পোড়ার মাধ্যমে যে ভূষাকালি, ক্ষতিকর গ্যাস ও অন্যান্য কুয়াশা ও ধূলি বাহিত দূষণে বাইরের দৃশ্য সাধারণভাবে ধোঁয়াটে আবছা হয়ে উঠছিলো এবং মধ্য শতাব্দীতে তা তুঙ্গে ওঠেছিলো। আবহাওয়া তাই প্রায়ই ভারী হয়ে থাকতো এই দূষণে।

অনেকে মনে করেন শিল্পী মোনে এবং টার্নারের এই ক্রমবর্দ্ধমান আবছা ছবিগুলোতে তাঁদের আঁকা দৃশ্যাবলীর আবহের মধ্যে দূষণ বৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে; কারণ ইমপ্রেশনিস্ট হিসেবে তাঁদের চোখের দৃষ্টি মনের ওপর যে ছাপ রেখেছে সেটিই তাঁরা এঁকেছেন– ওই ধোঁয়াটে আবহের অন্তরালে আসলে কী আছে সেটি চিন্তা না করে। মোনে অনেক ছবি এঁকেছেন প্যারিসে সীন নদীর তীরের আর লন্ডনে টেম্‌স নদীর ওয়েস্ট মিনিস্টার ব্রিজের দৃশ্যগুলোর। ওগুলো ১৮০০ শতকের মাঝামাঝি থেকে ১৯০০ শতকের শুরু পর্যন্ত ক্রমে বেশি ঘোলাটে হয়ে ওঠেছে। অন্যদিকে টার্নারের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সমুদ্রে ঝড়, বৃষ্টির মধ্য দিয়ে ঝড়ো বেগে চলা বাষ্পীয় ট্রেনের ফলে বৃষ্টি-বাষ্প-গতির কিছু অপূর্ব সমন্বয়। তাঁর ছবিগুলো ১৮০০ শতকের শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত– শেষের দিকের এক একটি ছবির মধ্যে এক

জিনিস থেকে অন্য জিনিস আলাদা করাই দুরূহ; এতই আবছা হয়ে একের সঙ্গে আরেক মিশেছে সেগুলো। তাই ধারাবাহিক ভাবে ছবিগুলো দেখেই অনেকে ধরে নিয়েছেন যে সময়ের সঙ্গে দূষণ বৃদ্ধিরই ফলে দৃশ্যগুলো শিল্পী মনের ছাপে এমন ভাবে এসেছে।

কিন্তু এখন ব্যাপারটি আর আন্দাজের ওপর ছেড়ে দেয়া হচ্ছেনা। ২০২৩ সালেই যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্সের বিখ্যাত জার্নালে এ নিয়ে বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণাটি মোনে ও টার্নারের ছবির নানা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও মাপজোক করেছে। এতে অন্তর্ভুক্ত টার্নারের ৬০টি ছবি ১৭৯৬ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে আঁকা, আর মোনের ৩৪টি ছবি ১৮৫৪ থেকে ১৯০১ এর মধ্যে আঁকা। এতে দুটি জিনিস প্রধানত মাপা হয়েছে কনট্রাস্ট আর হেইজ। কনট্রাস্ট হলো ছবির নানা জিনিসের কিনারা রেখাগুলো কতটা স্পষ্ট ও তীক্ষ্ম ভাবে দেখা যাচ্ছে, আর কতটা আশপাশের সঙ্গে মিশে গেছে তার পরিমাণ; মিশে যাওয়া বাড়লে ছবির আবছা হওয়া বাড়ে, কনট্রাস্ট কমে, যা দূষণের ফলে ঘটতে পারে। হেইজ হলো ছবির সাদা ভাব কুয়াশার জলবিন্দু অথবা দূষণের কণা থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে আলো এই সাদা ভাব সৃষ্টি করে। কনট্রাস্ট কমা আর হেইজ বাড়ার সঙ্গে দূষণের সম্পর্ক কীরকম তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক নিয়মের সমীকরণগুলো থেকে একটি গাণিতিক মডেল তৈরি করা হয়েছে। ছবিগুলোতে প্রকৃত কনট্রাস্টের ও হেইজের পরিমাপকে মডেলে ইনপুট হিসেবে ঢুকিয়ে ছবি থেকেই সময় এগুবার সঙ্গে দূষণ বৃদ্ধির হার নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। দেখা গেছে তাঁদের ছবিতে কনট্রাস্ট ও হেইজ যেভাবে বদলিয়েছে তার ৬১% এর জন্য দূষণকে সরাসরি দায়ী করা যায়।

তা হলে পরিবর্তনের বাকি অংশের জন্য কোন বিষয় দায়ী? অন্যান্য কিছু কারণেও পরিবর্তন কিছু ঘটেছে যেমন রঙ-বস্তুগুলো সময়ের সঙ্গে একটু একটু ফিকা হয়েছে– হেইজ বা সাদা ভাবটি বাড়ার জন্য সেটিও কিছুটা দায়ী, এমনিতরো অন্যান্য কিছু জিনিসও। বিজ্ঞানীরা ছবি থেকে এমনকি এও নির্ণয় করতে পেরেছেন যে ওই আবহে কোন কেউ তাঁর থেকে কতদূর পর্যন্ত জিনিস দেখতে পারছিলেন। দেখা গেছে একই রকম অবহাওয়ার মধ্যে পূর্বের আঁকা ছবি থেকে পরের আঁকা ছবিতে এই দূরত্ব সাংঘাতিক ভাবে কমে গেছে।

দূষণের প্রভাবটি এতই স্পষ্ট। একেবারে পরে তো অল্প দূরত্বের জিনিসও দেখা যাচ্ছেনা। ছবি ক্রমে আবছা হবার জন্য প্রধানত দূষণকে দায়ী করা এমন সিদ্ধান্তের উল্টা নানা কথা যে ওঠেনি তা নয়। যেমন প্রশ্ন উঠেছে শিল্পী কি বছরের বছর একই মন নিয়ে ছবি এঁকেছেন? এমনো তো হতে পারে যে শিল্পীর মেজাজই হয়তো ছবি আবছা হতে সাহায্য করেছে, দূষণ নয়। অথবা এও বলা হয়েছে যে শিল্পীর বয়সও তো ক্রমে বেড়েছে। তিনি ক্রমে চোখে ঝাপসা দেখেছেন বলে ছবি আবছা হয়েছে। কিন্তু চুলচেরা যুক্তিতে এর কোনটাই টেকেনি। ইম্‌প্রেশনিস্ট শিল্পীদের ছবি যে বায়ু দূষণের ইতিহাস নির্ণয়ে সহায়ক হয়েছে তা এখন আর আন্দাজ নয়, তা বৈজ্ঞানিক সত্য।

সম্রাট জাহাঙ্গীরকে নিয়ে আঁকা ছবিতে রোবট

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটউট ফ্রিয়ার গ্যালারিতে মোগল-পারসিক স্টাইলে আঁকা একটি চিত্র সংরক্ষিত আছে, সম্রাট জাহাঙ্গীরকে সেখানে দেখা যাচ্ছে। ছবিটি ১৬২০ সালে আঁকা, নাম দেয়া হয়েছে 'বাদশাহ জাহাঙ্গীর শাহ আব্বাসের মেহমানদারী করছেন'। শাহ আব্বাস হলেন পারস্য-সম্রাট, ওসময় তিনি মোগল রাজদরবারে অতিথি হিসেবে গিয়েছিলেন। এ ছবিটির একটু বর্ণনা দিলে তখনকার উচ্চ মহলের সমাদৃত কিছু আর্ট যেমন দেখবো তেমনি তার সঙ্গে এমন একটি জিনিসও দেখবো যাতে আজকের দিনের প্রযুক্তি রোবটের আইডিয়া রয়েছে– এক যান্ত্রিক সেবক যেন মানুষের ভাব-ভঙ্গি করে মানুষের সেবা করছে।

ছবিতে দেখা যাচ্ছে পারস্য সম্রাট একই সিংহাসনে বসে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে আলাপরত। কাছে দাঁড়িয়ে আছেন জাহাঙ্গীরের শ্যালক আসফ খান এবং পারস্য দরবারে মোগল দূত খান আলম। আশপাশে ছোট বড় নানা রকম ব্যবহার্য সামগ্রী কিন্তু প্রত্যেকটির মধ্যে উঁচু দরের শিল্পবোধ ফুটে উঠছে, আর সেগুলো যে দুনিয়ার নানা দেশ থেকে এসেছে তা বিভিন্ন আর্ট স্টাইল থেকেই বোঝা যাচ্ছে– টেবিলে মেঝেতে এগুলো রাখা আছে, হয়তো মেহমানদারীর উপকরণ হিসেবে, কোন কোনটা হয়তো উপহার সামগ্রী হিসেবে। এর মধ্যে আছে ভেনিশিয়ান ধর্মীয় বেদী, চীনা কাপ, সিন্ধু ঘোটকের দাঁতের তৈরি ছুরির বাট, ছোট ইটালিয়ান টেবিল ইত্যাদি। তবে বিশেষ ভাবে দৃষ্টি দিতে হয় ছোট একটি অদ্ভুত পান-পাত্রের দিকে।

পান-পাত্রটি রাষ্ট্রদূত খান আলমের হাতে ধরা রয়েছে; এটি রোমান দেবী ডায়ানার ছোট মূর্তির আদলে তৈরি– মূর্তির ভেতরটাই পানীয় রাখার জায়গা ডায়ানা নিজে অবশ্য ডিম্বাকার ভিত্তির ওপর থাকা একটি হরিণের পিঠে আসীনা। ওই বসা অবস্থায় সামনের দিক থেকে ৩০ ডিগ্রি কোণে শরীরকে মোচড় খাইয়ে কিছুটা পেছনের দিকে মাথা ঘুরানো ডায়ানার। বিশেষজ্ঞরা ছবিতে একে আরো খুঁটিয়ে দেখে এবং ওই সময় ইউরোপে প্রচলিত ঠিক এরকম পান-পাত্রের ইতিহাস-গবেষণা করে বুঝতে পেরেছেন যে এটি সাধারণ একটি পান-পাত্র মোটেই নয়। এর তলায় প্রায় লুকানো অবস্থায় রয়েছে চাকা, তাতে স্প্রিং দম দেয়ার ব্যবস্থা আছে, টেবিলে রাখলে এটি চলতে পারবে নিজে নিজেই। তাছাড়া ডায়ানার বাহন হরিণের মাথাটি খুলে ফেলা যায়, এবং তাতে মদ ভরে পরে মাথা আবার লাগিয়ে দেয়া যায়। ওভাবে মদ ভরে, দম দিয়ে টেবিলে রেখে মেহমানের দিকে যেতে দিলে ওটি ঠিক মেহমানের সামনে গিয়ে শরীর ও মাথা নেড়ে যেন মদ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানায়। তখন মেহমান তাকে খুশি করার জন্যই যেন তার থেকেই মদ পান করেন।

ইউরোপে অভিজাত শ্রেণীর আসরে সে সময় এই রোবট বেশ পরিচিতই ছিল- যদিও হয়তো জাহাঙ্গীর আর শাহ আব্বাসের জন্য এ ছিল অভিনব কৌতুহলের। এতে রোবটটিকে মানুষের চেহারা ও হাবভাব দেবার খুবই চেষ্টা করা হয়েছে। ইউরোপে ওই সময় এমন যান্ত্রিক মানুষের রোবট নানা আঙ্গিকে ব্যবহার হচ্ছিলো। বিশেষ করে জার্মান সংস্কৃতির দেশগুলোতে এর একটি খুব পরিচিত রূপ ওখানকার নগরে শহরে এখনো রয়ে গেছে তা হলো টাউন ক্লক হিসেবে বড় ঘড়িতে। প্রতি ঘন্টায় ঘড়ির ঘন্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই রোবটদের রীতিমত একটি নাটক অভিনীত হয়ে যায় সেখানে, রাস্তার সব মানুষ খুব উপভোগ করে, অনেকে দেখতেও আসে এবং ঘন্টা পড়ার ও রোবটদের নাটক শুরু হওয়ার জন্য জটলা করে অপেক্ষা করে। সবই চলে ঘড়িতে যে দম দেয়ার ব্যবস্থা আছে তার শক্তিতে, ঠিক ঘন্টায় ঘন্টায় নানা চাকা ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। বিশেষ করে সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে থাকার সময় আমি মধ্যযুগের তৈরি এমন খুঁটিনাটি বহুদিন মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছি। এখনো চমৎকার কাজ করছে।

কিন্তু মোগল রাজদরবারে এই রোবট পান-পাত্র আসলো কোথা থেকে– ওই ছবিতো ওখানেই রোবটটিকে দেখাচ্ছে। খুব সম্ভব ও সময় ভারতে আসা পর্তুগীজ ব্যবসায়ী ও জেসুইট পাদরীরা সম্রাটের মত বড় বড় মানুষকে উপহার দেবার জন্যই নিয়ে এসেছিলেন, এবং এখন তা রাজদরবারে মেহমানদারীতে কাজে লাগছিলো। ওই পর্তুগীজরাই হয়তো মোগল শিল্পীদেরকে দিয়ে ছবিটি আঁকিয়ে নিয়েছিলো। সেটা আঁকা হয়েছিলো বলেই তো সেদিনও আর্টের জগতে সায়েন্সের ব্যবহারের নমুনার বিশ্বময় বিস্তৃতিটির কথা আমরা জানতে পারলাম।

বৈরাগ্যের মধ্যেও চমৎকার স্থাপত্য

একেবারে গোড়া থেকেই স্থাপত্যের আর্টটি জনমনে যে ছবি জাগায় তা খুবই ভারী, বড়, উঁচু, জবরদস্ত; তার নির্মাণের বস্তুগুলোই যে ছিল এমন– পাথর, কংক্রীট, গাছের গুড়ি। একেবারে প্রস্তর যুগের ইংল্যান্ডের স্টোন হেন্‌জই বলি, মিশরের পিরামিড বলি, কি গ্রীক-রোমান স্থাপত্য বলি, বা তারপর মধ্যযুগের ক্যাথিড্রাল বলি, এরও পরের তাজমহল বলি– সবই তো এমন জবরদস্ত। স্থাপত্য আর্টে'র বড় ভোক্তা নগরবাসীর দালান কোঠার ক্ষেত্রেও তাই। নির্মাণ বস্তু যেমন, তেমন নির্মাণ কৌশলও বড় আকারেই বিকশিত হয়েছে। এই জবরদস্ত ভঙ্গির খুব যে কোন মৌলিক পরিবর্তন এই হাজার হাজার বছর ধরে হয়েছে তা বলা যাবেনা। একেবারে উনবিংশ শতাব্দীতে এসে অবশ্য ইস্পাতের ফ্রেম ও কাচের দেয়াল ব্যবহারের সুযোগে স্থাপত্যের ভার কমেছে কিন্তু আকাশচুম্বি উচ্চতা এসে তা পুষিয়ে দিয়েছে– কাজেই একেবারে আধুনিক হালকা স্থাপত্যও আকারে বহরে ওই প্রকাণ্ডই রয়ে গেছে।

তবে সেই স্থাপত্যে কোন পর্যায়েই যে আর্টের চমৎকারিত্বের ও অভিনবত্বের অভাব হয়নি তা যুগে যুগের যে উদাহরণগুলো দেয়া হলো তার থেকেই তো বোঝা যাচ্ছে। মনে হতে পারে এই বড় জবরদস্ত হওয়ার কারণেই স্থাপত্য গুরুত্ব পায়। স্থাপত্যের আর্টটি এমন যে একটি সাধারণ সুন্দর শিল্পময় ভবনও মানুষের মনোযোগ যত সরাসরি যত সহজে নিয়ে নিতে পারে অন্য অনেক কিছু তা পারেনা। মানুষ চলতে গেলে, হাঁটতে গেলে স্থাপত্য তার সামনে এসে দাঁড়ায়। যেহেতু এর অনেকগুলোতে আমাদের থাকতে হয়, বিচরণ করতে হয়, কাজ করতে হয়, এবং আসা যাওয়ার পথে

এরা নিত্য চোখে পড়ে তাই এর আর্টগুণের সঙ্গে একটি স্বয়ংক্রিয় সাহচর্য গড়ে ওঠা স্বাভাবিক। অবশ্য পূর্ণ উপভোগ করতে গেলে অন্য আর্টের মত এরও সূক্ষ্ম সমজদার হয়ে উঠতে হয় বৈকি।

কিন্তু আজ স্থাপত্যের আর একটি দিক বিকশিত হচ্ছে যা প্রকাণ্ড হওয়া, জবরদস্ত হবার একেবারে বিপরীত। স্থাপত্য যখন এই পর্যায়ে আসে তার আর্ট তখন মানুষের পথ আগলে দাঁড়ায়না, বরং কিছুটা ব্যক্তিগত, কিছুটা নির্ভৃত জায়গায় থাকে। সেখানে সে শিল্পীমন নিয়ে সরল জীবনে তার আস্বাদন নিতে চায়। স্থাপত্য বিজ্ঞানের কিছু কিছু কৌশলের মধ্যেও এই প্রবণতাই দেখা যাচ্ছে। এ যেন স্থাপত্যের এক রকম বৈরাগ্যের দিকে যাত্রা।

বাড়ি দরকার? সেটি প্রিন্ট করে নাও:

বসবাসের বাড়ি এখন কম্পিউটারের ডিজাইন থেকে প্রিন্ট করে নেয়া হচ্ছে! অবশ্য থ্রি-ডি প্রিন্টারের কথা বলছি। টেবিলের ওপর রাখা থ্রি-ডি প্রিন্টারে কম্পিউটারের ডিজাইন সত্যিকার তিন মাত্রার সলিড জিনিস হিসেবে আমরা পেতে পারি, সাধারণত নরম প্লাস্টিককে ওই রূপ দিয়ে যা সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে যায়। এটি এখন দ্বিমাত্রিক লেখা বা ইমেজকে কাগজের ওপর প্রিন্ট করে নেয়ার থেকে বেশি কিছু নয়। কালি-কাগজেরটি টু-ডি প্রিন্ট; আর প্লাস্টিক দিয়ে সলিড জিনিস থ্রি-ডি প্রিন্ট। ওভাবে চেয়ার টেবিলের মত সাধারণ জিনিস থেকে জটিল যন্ত্রাংশ পর্যন্ত সব কিছু থ্রি-ডি প্রিন্টারে প্রিন্ট করে নেয়া যাচ্ছে। একই ভাবে অংশে অংশে নিয়ে একটি বাসযোগ্য বাড়িও প্রিন্ট না করতে পারার কোন কারণ নেই। অংশগুলো আলাদা ডিজাইন করতে হয়, এবং প্রিন্ট করার পর সেগুলো জুড়ে নিতে হয়; কখনো বা স্তরে স্তরে প্রিন্ট করে বাড়ি গড়ে তুলতে হয়। প্লাস্টিকের মধ্যে অনেক বৈচিত্র আছে, বাড়ির নির্মাণ বস্তু হবার উপযুক্ত প্লাস্টিক বেছে নিলেই হয়। এমন বাড়ি ছোট হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু বড় বাড়িও তৈরি সম্ভব প্রিন্টিঙের মাধ্যমে। আর নির্মাণ বস্তুকেও প্লাস্টিকে সীমাবদ্ধ রাখার কোন প্রয়োজন নেই যদিও আর দশটা জিনিস তৈরিতে প্লাস্টিকই ব্যবহৃত হয়। এর একটি চরম উদাহরণ হলো ইতালির একটি ছোট শহর মাসা ল্যাম্বার্ডাতে বেশ বড়সড় একটি বাড়ি তৈরি করা হয়েছে স্থানীয় নদী থেকে নেয়া কাদাকে প্রিন্টারে ব্যবহার করে। বাড়িটি সব

দিকে ৪২ মিটারের মত। এটির এক রকম বৃত্তাকার কেন্দ্রের অংশগুলো আগে জোড়া হয়েছে তারপর ধীরে ধীরে পরিধির দিকে অংশ এর বাইরে জোড়া হয়েছে– এমন ভাবে যেন ভেতরেও রোদ ঢুকে বাইরের দেয়ালে আটকে না গিয়ে। প্রকৃতি-বান্ধব নির্মাণ বস্তু ব্যবহার এবং সূর্যের আলোকে এনার্জি হিসেবে ব্যবহারে এ বাড়ি অনন্য। নির্মাণ বস্তু হিসেবে একেবারে যথারীতি সিমেন্ট-কংক্রীটও যে ব্যবহার করা যায় না তা নয়; এবং সেটি দিয়ে যে কোন প্রচলিত ভবনের মত বড় ভবন সুন্দর শৈল্পিক ডিজাইন করা স্থাপত্যে প্রিন্ট করেই নির্মাণ সম্ভব। তবে প্রিন্ট করা বাড়ির বৈশিষ্ট ও অনন্যতা সেখানে নয়, বরং সরল ছিমছাম হবার মধ্যে।

একদিকে কাদা, অন্য দিকে কংক্রীট এই দুইয়ের মাঝখানে বিচিত্র রকম প্লাস্টিকই প্রিন্ট করা বাড়ির জন্য সব থেকে উপযোগী, কারণ তাতে বাড়ি নির্মাণে স্থপতির বহু রকম চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। আর বড় বাড়ি করতে অসুবিধা না থাকলেও প্রিন্ট করা বাড়ির মজাটাই হলো ছোট বাড়ি নিজের মত করে কম সময়ে প্রিন্ট করে নেয়া। বড়ই হোক বা ছোটই হোক এমন প্লাস্টিকে গড়া বাড়ির জন্য ওই জটিল ফ্রেম, ঢালাই করার বাক্স, কারখানায় নানা উৎপাদন এসবের কোন প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু প্রিন্টারের। কারখানায় তৈরি একেবারে স্ট্যান্ডার্ড সব উপাদানের ওপর নির্ভরশীলতার কোন প্রয়োজন নেই। পুরো বাড়ি ও প্রত্যেকটি জিনিস একই জায়গায় একই ভাবে প্রিন্ট করে নেয়া যায়– একেবারেই স্থপতির বা বসবাসকারীর ইচ্ছে অনুযায়ী। এর প্রতি আঙ্গিকে বিভিন্ন সুবিধাজনক ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন আর্ট সৃষ্টির সুযোগটিও অনায়াসে নেয়া যায়।

আর্টের একটি দিক হলো নিজের সৃষ্টিতে প্রকৃতিকে অনুসরণ করা। যেমন প্রাণীর শরীরে রক্ত নালী, লসিকা নালী ইত্যাদি নানা নল থাকে বিভিন্ন তরলের চলাচলের জন্য। বাড়িতেও সে রকম নানা নল দরকার হয়। শরীরে যেমন নালীগুলো পেশি ও বিভিন্ন অঙ্গের সঙ্গে একীভূত হয়ে গড়ে ওঠে, বাড়ির দেয়াল প্রিন্ট করার সময় বাড়ির নলগুলো দেয়ালের সঙ্গেই প্রিন্ট করে নেয়া সম্ভব– যার কোনটি পানির জন্য, কোনটি ইলেকট্রিক তার যাওয়ার জন্য ইত্যাদি রকম হবে। পাখির হাড় যে রকম ঝাঁঝরা থাকে একই নীতি অনুসরণ করে দেয়ালের শক্ততা বজায় রেখেও একে হালকা করে ফেলা যায়। বাড়ির

সামনের দিকটাকে যদি সাধারণ দেয়ালের মত সাদামাটা না রেখে গাছের পাতার মত ঝাঁকড়া রূপ দিতে চাই তাই বা নয় কেন? প্রিন্ট করা বহু বাড়িতে নানা ভাবে সেটি করা হয়েছেও। এখানে পাতার মত অংশগুলো নানা দিকে নানা ভঙ্গিতে মেলে ধরার সুযোগ থাকে– যেমন এমন ভাবে মেলে ধরা যায় যাতে সূর্যের আলো ও তাপ বাসাকে গরম না করে ফেলতে পারে, এটি ছায়ায় থাকে; অন্যদিকে ওখানে আগাগোড়া সোলার প্যানেল লাগিয়ে প্রচুর শক্তি উৎপাদন করা যায়।

ওই সরল রূপে ও সঠিক ক্ষেত্রে সঠিক বাড়িটি এক সঙ্গে প্রিন্ট করে ফেলার সুযোগ যেমন একটি একক প্রয়োজনে হতে পারে সেভাবে একটি বই ছাপানোর মত করে ঠিক একই ডিজাইনের বহু সংখ্যক প্রিন্টিঙের মাধ্যমে বহু সংখ্যক হুবহু একই রকম বাড়ি বানানো সম্ভব। এর সুযোগ নিয়ে বেশি বড় ব্যাপ্তির কিছু অভিনব নির্মাণ প্রজেক্ট তৈরি সম্ভব হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম টেক্সাসের মরু অঞ্চলের রোমান্টিক আকর্ষণে পর্যটকরা গিয়ে অল্প কয়েকদিন থাকতে চান, অনেকে দীর্ঘ সময়ের জন্য বসতও করতে চান। কিন্তু জায়গাটি এতো প্রত্যন্ত ও বিরান জায়গা যে সেখানে গতানুগতিক ব্যয়বহুল হোটেল যথাযথ বা লাভজনক হওয়া কঠিন। তাই প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থপতি বিয়াকে ইনগেলেস ও হোটেল ব্যবসায়ী লিজ ল্যাম্বার্ট এক রকম যাযাবর মরু- তাঁবুর মত প্রিন্ট করা ৬০টি বাসা তৈরি করেছেন। এতে সরল ভাবে আরামে থাকার সব ব্যবস্থা রয়েছে, অথচ মরুতে পাড়ি দেবার মত পরিবেশটিও ষোল আনা রয়েছে, মনে হবে যে কোন মুহূর্তে টেক্সান কাউবয় বাসার একেবারে সামনে ঘোড়ায় চড়ে এসে আপনাকে আহবান জানাতে পারে। এখানে মারফা নামে একটি বসত আগে থেকে রয়েছে, কাছেই যোগ হলো বেশ অল্প ব্যয় তৈরি করা এই অভিনব আর্ট-হোটেল। প্রিন্টিঙের মাধ্যমে হওয়াতে খুব অল্প সময়ে পুরো প্রজেক্টটি খাড়া হয়ে গেছে; কেউ কেউ দীর্ঘকালীন ছুটিও একটানা এখানে কাটিয়ে যাচ্ছেন।

এভাবে সামনের দিনগুলোতে প্রকৃতির কোলে কিছুদিন কাটাবার জন্যই হোক, কিংবা সাধারণ বাসাবাড়ি শিল্প সম্মত ভাবে কিন্তু সারল্যের মধ্যে দ্রুত তৈরি করে নেবার জন্য মানুষ বেশি বেশি থ্রি-ডি প্রিন্টিং ব্যবহার করবে। এভাবে জরুরি একটি প্রয়োজনে সব রকম মানুষের কাজে লেগে যাবার

ব্যাপারটি হয়তো থ্রি-ডি প্রিন্টিং জিনিসটিকেই সর্ব সাধারণের কাছে নিয়ে যাবে; যেভাবে এক কালের উচ্চ মহলের ব্যবহৃত কম্পিউটার মামুলি ওয়ার্ড প্রসেসর ও প্রিন্টারের সুযোগে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিলো একদিন, যাবতীয় লেখাজোকার কাজে লেগে। স্থাপত্য যেন এভাবে জবরদস্ত হবার থেকে বৈরাগ্যের সারল্যের দিকেও যাবার সুযোগ আরো বেশি পাবে।

বাহির যখন ঘরে ঢোকে:

'লানাই' জিনিসটি যুক্তরাষ্ট্রের দূরবর্তী অঙ্গরাজ্য হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের লোকজ বসত নির্মাণ পদ্ধতিতে বহুদিন ধরে প্রচলিত। তবে অনুরূপ আবহাওয়ার অন্যান্য জায়গায় বসত নির্মাণের কাজে আধুনিক স্থপতিরা একে গ্রহণ করায় এর পরিচিতি এখন দ্রুত বেড়েছে। হাওয়াইতে এটি হলো বাড়ির একেবারে সামনে বা একেবারে পেছনের দেয়ালের লাগোয়া একটি বহির্ঘর, হাওয়াইয়ের স্থানীয় ভাষায় লানাই। এখানে বসা যায়, আলাপে সময় কাটানো যায়, কিছু ঘরোয়া কাজও করা যায়– সেই অর্থে এটি বাড়ির অবিচ্ছেদ্য অংশে, কিন্তু এর আবহের দিক থেকে এটি উঠোনের একটি বিকল্প কারণ ওপরে ছাদ ও আংশিক দেয়াল থাকলেও বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে এর একেবারে মাখামাখি, দেখাদেখি। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে হাওয়াইয়ের অবস্থানের কারণে উষ্ণমণ্ডলীয় এই জায়গায় সারা বছরই এরকম প্রকৃতির ছোঁয়ার মধ্যেই ঘরোয়া ভাবে থাকা সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে ইচ্ছে করলে কাচ দেয়া জানালায় ঘিরে ওই দৃশ্যাবলী বজায় রেখে পোকা-মাকড়, বৃষ্টি, উত্তাপ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব লানাইয়ের মধ্যেও, বাড়ির ভেতরের অংশের মতো।

ঘরে থেকেও বাহিরকে উপভোগ করার সুযোগটিই লানাইকে স্থাপত্যের মধ্যে আর্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন মনে করা হচ্ছে। বহু দেশে যেখানে এর কাছাকাছি আবহাওয়া আছে সেখানে বাড়ির স্থাপত্যের সঙ্গে এটি যোগ করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে– খুব কঠিন কাজ নয়। খুব সাধারণ বাড়ির সঙ্গেও লানাই যোগ করলে একদিকে জীবনের সারল্য বাড়ে ওই হাওয়াইয়ের আদিবাসীদের জীবনের মত, অন্যদিকে প্রকৃতিকে ঘরের মধ্যে ডেকে এনে বসবাসটি শিল্পসমৃদ্ধ হয়। লানাই ছাড়া এ কাজ যে দেশে দেশে অন্যভাবেও করা হয়না তা নয়, বারান্দা, পোর্চ ইত্যাদিতো অনেক জায়গায় এভাবে ঘরকে বাইরের প্রকৃতির ছোঁয়া দেবার জন্যই স্থাপত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান

হয়ে ওঠেছে। বারান্দা বেশ ছোট সরু হতে পারে, তবুও উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়ায় এটি বেশ প্রিয় জায়গা হতে পারে; কোথাও কোথাও বারান্দা যে বেশ প্রশস্ত হয়ে নানা কাজের একটি সর্বক্ষণিক জায়গা হয়ে পড়ে তা তো আমাদের দেশের খুব সাধারণ একটি ব্যাপার। এমন বারান্দা যদি সামনের প্রকৃতিকে বরণ করতে পারে লানাইয়ের সঙ্গে তার পার্থক্য কমে যায়। তবে বারান্দা বাড়ির সব দিকে থাকলেও লানাই শুধু সামনে বা পেছনেই থাকে, এবং প্রায়শ এর পর বাড়ির একটি উঠানও থাকে।

থাকার জায়গার স্থাপত্যকে আরো সরল করতে, কিছুটা বৈরাগ্যমুখী ও প্রকৃতিমুখী করতে স্থপতিরা লানাইয়ের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন। সুযোগ থাকলেও মানুষ এখন আর থাকার জায়গাকে জবড়জঙ্গ কিছু করতে চাচ্ছেন না, যেনো ওই আদিবাসীদের বাড়ি অথবা আমাদের গ্রামের বাড়ির দিকেই তাঁদের চোখ।

বন্য প্রকৃতির সঙ্গে মিশে যাওয়া স্থাপত্যঃ

আয়না বাড়ি। বৃটেনের মত জনবহুল দেশেও প্রচুর বন্য জায়গা আছে যেখানে উঁচুনিচু ভূমিতে শুধুই প্রকৃতির রাজত্ব- কোথাও একটানা শুধু বন্য বৃক্ষ, কোথাও ঝোপঝাড় আর খোলা তৃণভূমি। দক্ষিণ ইংল্যাণ্ডের সাসেক্সে হেস্টিংস নামের জায়গাটিতে এমনি বন্য প্রকৃতির মধ্যে স্থপতি মাইকেল কেলড্রিক গড়ে তুলেছেন ওই প্রকৃতির সঙ্গে মেশানো একটি সুন্দর ছিমছাম বাড়ি, নাম দিয়েছেন ‘লুকিং গ্লাস লজ’ অর্থাৎ আয়না বাড়ি। ইটের ও কাচের সমন্বয়ে একেবারে প্রায় নিখুঁত বাক্সের মত আয়তাকার একটি বাড়ি। প্রকৃতির সঙ্গে ওভাবে মিশে থাকতে হলে স্থাপত্যে কোন জটিলতার সুযোগ নেই, সারল্যই তাকে সেভাবে মিশতে দেবে। স্থাপত্য এখানে প্রকৃতিকে ছড়িয়ে যাবেনা বরং প্রকৃতির প্রতিফলনেই স্থাপত্যটি তার আর্টটি খুঁজে পাবে– এটিই হলো আয়না বাড়ির নীতি। বাড়িটি যে রকম প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে তেমনি ওখানে যারা থাকছেন তাঁরাও প্রকৃতির সঙ্গে নিজেদেরকে মিশিয়ে রেখেই আনন্দে থাকতে পারছেন। উঁচু নিচু ভূমিতে বৃক্ষমেলার সঙ্গে এক হয়ে আছে আবাস আর তার বাসিন্দারা। এটি যেন স্থাপত্যেরও এক ধরনের বন-যাত্রা, এক রকম সরল বৈরাগ্য।

কিন্তু বৈরাগ্যটি অন্য জবড়জঙ্গ স্থাপত্যের তুলনায় দেখলে, এবং প্রকৃতির দিক থেকে দেখলে আয়না বাড়ি এসেছে এখানকার প্রকৃতিকে আরো সমৃদ্ধ ও উপভোগ্য করতে– বিশেষ করে জীববৈচিত্রকে। এই অঞ্চলের গাছ অথচ ঠিক বাড়িটির আশপাশে বেশি নেই এমন বেশ কিছু গাছ লাগাবার ব্যবস্থা রয়েছে স্থাপত্যের সঙ্গেই। পাখির আনাগোনা যেন বাড়ে সে জন্য নানা গাছে বার্ড হাউজ বানিয়ে দেয়া হয়েছে। স্থপতি লক্ষ্য করেছেন কী ধরনের বন্য প্রাণীর যাতায়ত এখানে, সেগুলো কী পছন্দ করে; সেই অনুযায়ী তাদেরকে অভ্যর্থনা করার ও তাদের চলাচল নির্বিঘ্ন করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। নীতিটি হচ্ছে এই আয়না বাড়িতে যে সব মানুষ মাঝে মাঝে এসে থাকবে তারা নিজেদেরকে গুটিয়ে রাখবে বন্য সব প্রাণী ও উদ্ভিদের সামনে। তারা এখানে অতিথি মাত্র; তাদের একমাত্র কাজ দেখে দেখে উপভোগ করা এবং এখানকার আসল বাসিন্দাদের জীবন নির্বিঘ্ন রাখা। তারা হাঁটবে, কাজ করবে, অনুসন্ধান করবে কোন রকম তোলপাড় না তুলে। এই সব নীতি স্থপতির শিল্পবোধের ও সারল্যের প্রেরণা থেকে যেমন এসেছে, তেমনি তাঁর বিজ্ঞান-বোধের থেকেও এসেছে।

বনের কুটির। প্রায় একই রকম নতুন স্থাপত্য নীতিতে উদ্বুদ্ধ বনের ভেতর কুটিরের আর একটি উদাহরণ আটলান্টিকের অন্য পারে যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট রাজ্যের বনাঞ্চলে। বনটি কিছুটা ছাড়া ছাড়া ভাবের প্রাচীন সব গাছের। ওখানে একটুখানি পাহাড়ি ঢালের ওপরেই থাকা বড় পাথরকে ফাউন্ডেশন হিসেবে নিয়ে স্থপতি গড়েছেন কাঠের একটি বড় কুটির; কাঠের তক্তায় গড়া খুবই সরল একটি কেবিনও বলা যায়। অবশ্য ওখানকার চরম আবহাওয়াগুলোর থেকে বাসিন্দাদের রক্ষার জন্য তাপ নিরোধী অন্য আবরণও দিয়ে দেয়া হয়েছে– কাজেই সেকালের লগ কেবিন একে আর বলা যাবেনা। বাইরের দিকটা কালচে সবুজ রং করাতে বনের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে। তবে চারিদিকে প্রচুর কাচের প্যানেল, জানালা ইত্যাদির ফলে বাসিন্দাদের মনে হবে বাইরে প্রকৃতির মধ্যেই তাঁরা আছেন। বাইরে থেকে কেউ যখন আসেন প্রকৃতি থেকে চট্ করে যে ভেতরের আসবাব ইত্যাদির মধ্যে ভিন্ন পরিবেশে চলে আসবেন তার জো নেই। প্রথমে তাঁকে আসতে হয় একটি কাচ দেয়া পোর্চের মধ্যে– সেটি অংশত ঘরের, আবার অংশত বাইরের। এর পরেই শুধু মূল গৃহ প্রবেশ।

বাইরের শুধু কমনীয় সৌন্দর্যকে নয়, এর কঠিন চরম প্রকৃতিকেও বরণ করে নিচ্ছেন কুটিরবাসীরা– ওর মধ্যেই বাইরের সঙ্গে সংযোগ রেখে, সেখানে বেড়ানো, অনুসন্ধান করা, সব চালু রেখে। গরমের কড়া রোদ, শীতের বৃষ্টি, তুষার পাত এসবকে শুধু বরণই করছেননা, বরং এগুলোকে দিব্যি কাজে লাগিয়ে দিচ্ছেন কুটিরের সরল জীবন যাপনের সুবিধার্থে। যেমন কুটিরের স্বচ্ছ ছাদটিকে স্থপতি তৈরি করেছেন একটি লেন্সের আকৃতি দিয়ে যা যেন নিচের দিকে গর্ত করে ঝুলে আছে– অনেকটা একটি উল্‌টো গুম্বজের মতো। তার ওপর তুষার ও বৃষ্টির পানি জমলে সত্যিই এটি একটি বড় কনভেক্স লেন্‌স হয়ে ওঠে– বাইরের প্রসারিত জায়গার আলোকে কুটিরের মধ্যে নিবদ্ধ করে, পুরো কুটিরকে আলোকিত করে রাখে, সরাসরি রোদ যখন বাইরে থেকে ঢোকেনা তখনও।

ভেতরে কাজের জায়গা, বেডরুম, খাওয়ার জায়গা, চারিদিকে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের জায়গা সবই আছে; কিন্তু বাইরের থেকে দেখতে মনে হবে একটি কাঠের কুটির যেন পাহাড় থেকে বনের ওপরে ঢালু হয়ে ঝুলে আছে; এও যেন বনেরই খুব স্বাভাবিক একটি অংশ। এখানে মানুষগুলো নীরব অতিথি, বন চিরকাল যাদের হাতে থাকার কথা তাদের হাতেই আছে। এ যেন দুনিয়ার সব কোলাহল থেকে অনেক দূরে; আসলেও বনের মধ্যে একটি ছোট রাস্তা দিয়ে অনেক্ষণ ভ্রমণ করে তবেই ওখানে পৌঁছতে হয়। স্থাপত্যের বৈরাগ্য-যাত্রাই বটে!

মুভিতে মনের বিজ্ঞান

ক্যামেরা সরে যাবার পর মানুষগুলোর কী হয়?

মুভি এমন একটি আর্ট যার পরিবেশনে প্রযুক্তির কারুকার্য ছাড়া উপায় নেই। তৈরির কৌশলের দিকে তাকালে অনেক নামকরা মুভি যা আর্ট হিসেবেও অনন্য তার সাফল্যের পেছনে প্রযুক্তিই যে প্রধান কাজ করেছে তা মানতে বাধ্য হবো। হয়তো এ কারণেই সাধারণ ভাবে মুভির নির্মাতারা আর্ট সৃষ্টিকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মুভিতে সামনে আন্‌তে চাননা, অন্তরালেই রেখে দেন। তাঁরা বরং দর্শকের মনের ওপর আর্টের খেলাগুলোকেই মুভিতে বড় করে দেখাতে চান। কিন্তু এটি করতে গিয়ে মুভি নির্মাণের কুশীলবদের

মনের ওপরও যেই ঝড়গুলো বয়ে যায় সেটির দিকে প্রায়শ কেউই খেয়াল রাখেননা, না নির্মাতারা, না দর্শকরা। কেউ ফিরে তাকাননা। তার মধ্যে এমন মানুষও থাকেন মুভির ক্যামেরা সরে যাওয়ার পর যাদের জন্য মূল মুভির ঘটনাবলীর মানসিক ধকলগুলো কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানসিক রোগে পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছতে পারে। সে সম্পর্কে এখন সচেতনতা বাড়ছে। এর কিছু নমুনা দেখা যাক।

হত্যা না দুর্ঘটনা– ডকুমেন্টারিতে বিচার। ২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা অঙ্গরাজ্যের একটি ঘটনা, এবং একটি বিচারের ডকুমেন্টারি মুভির জের আজ ২০২৩ সালেও শেষ হতে পারেনি- মনস্তাত্ত্বিক সব কারণে। ওখানে ক্যাথিলিন নামের একজন মহিলা নিজের বাড়িতে সিড়ি থেকে পড়ে তাৎক্ষণিক মারা গিয়েছিলেন, সে জন্য তাঁর স্বামী প্যাটারসনকে হত্যা দায়ে বিচার করা হয়েছিলো। ক্যাথিলিনের আগের বিয়ের দুই বড় মেয়ে মার্শি ও মার্থা এবং দুটি পালক ভাই নিয়ে ওই পরিবারের চার সন্তান এবং প্যাটারসনের ওপর সেটি ছিল এক বড় ঝড়; ছেলেমেয়েরা বরাবর বাবাকে নির্দোষ মনে করেছেন, অথচ দীর্ঘ বিচারের পর বাবা জেলে গিয়েছিলেন। প্যাটারসন একজন ঔপন্যাসিক হিসেবে পরিচিত মানুষ হওয়াতে বিচারটি সেসময় বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলো। আরো বড় কথা নিজের আইনজীবীর সঙ্গে একমত হয়ে প্যাটারসন রাজি হয়েছিলেন যে বিচারের প্রস্তুতি, বিচার প্রক্রিয়া, এমনকি রায়ের পরের ঘটনা সব কিছু নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ডকুমেন্টারি মুভি তৈরি করা হবে। সেই থেকে ডকুমেন্টারিটি তৈরিতে অঙ্গাঙ্গিক ভাবে জড়িত হয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিগত জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর কাজ ও প্রভাব ঢুকে গেলো– লেখাপড়া, অবসর, সকালে নাশতার টেবিল থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগের আলাপ পর্যন্ত সব কিছুকে ডকুমেন্টারি সংক্রান্ত কাজ ও আলাপ দৈনন্দিন দখল করলো। ওরা বিচলিত না হয়ে আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শে, কোর্টরুমে, আবেগময় মুহূর্তে মুভিতে শরিক থাকলো, ক্যামেরার সামনে– বাবাকে সাহায্য করাই একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান।

বিচারের দীর্ঘ প্রক্রিয়া চল্‌ছিলো আর এদিকে তৈরি হয়ে গেলো ৮ পর্বের এক অবিস্মরণীয় ডকুমেন্টারি ফিল্ম, নাম ‘সিড়ি’। ডকুমেন্টারি এতটাই আর্ট-

ফিল্ম হিসেবে স্বীকৃতি পেলো যে এর পর্বের পর পর্ব আর্ট-হাউস গুলোতে এবং শিল্প সমালোচনার জন্য বিখ্যাত দুনিয়ার বিশিষ্ট টেলিভিশন চ্যানেলগুলোতে দেখানো হচ্ছিলো– আমেরিকার সানড্যান্স চ্যানেল, ফ্রান্সের ক্যানাল প্লাস, বৃটেনের বিবিসি ফোর ইত্যাদিতে। প্যাটারসনের বিচারের সময় এভাবে লক্ষ লক্ষ মানুষ ডকুমেন্টারিটি দেখেছেন এবং নিজেদেরকে জুরির আসলে মনে মনে চিন্তা করেছেন, এ নিয়ে লেখালেখি করেছেন। মায়ের করুণ মৃত্যু এবং বাবার বিচার ও কারাদণ্ডের করুণ অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্যাটারসন সন্তানদের জীবনে এসেছে লক্ষ লক্ষ ডকুমেন্টারি দর্শকের কাছে নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের গোপনীয়তা হারানোর ক্ষত। দীর্ঘদিন ধরে চলার পর একদিন বিচার আর মূল ডকুমেন্টারি তোলা শেষ হয়েছে, কিন্তু না শেষ হয়েছে এর মুভির ক্ষেত্রে কী ঘটলো সেই কাহিনী, এবং না শেষ হয়েছে ওই সন্তান তরুণ-তরুণীদের মর্মবেদনা ও ক্ষত। ইন্টারনেটে মুভি প্রদর্শক নেটফ্লিক্স 'সিড়ি' ডকুমেন্টারি সিরিজটি কিনে নিয়ে দুনিয়াময় ২০০ দেশে ছড়িয়ে দিলেন এবং শিগ্‌গির এটি বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ ডকুমেন্টারি বলে বিবেচিত হলো। নেটফ্লিক্সের প্রতিদ্বন্দ্বী এইচ বি ও ম্যাক্স বসে রইলোনা, তারা অন্যভাবে এগিয়ে গেলো, এ কাহিনীকে নিয়ে পেশাদার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে একটি ফিকশন ড্রামা সিরিজই বানিয়ে ফেল্‌লো– নিটোল কাহিনী চিত্রে। সেখানে আসল ঘটনার অনেক অতিরঞ্জনও ঘটলো। এর মধ্যে বাবা প্যাটারসন রায় পুনর্বিবেচনায় মুক্তি পেলেন– কিন্তু পরিবারের মেয়েরা বিশেষ করে বড় মেয়ে মার্শি মানসিক ভাবে একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েন সব কিছুর ধকলে।

যেন ভাগ্যের পরিহাসে আরো একটি ডকুমেন্টারি হলো সিড়ি এবং এরকম কিছু ডকুমেন্টারি নির্মাণের গল্প ও এর ভাল মন্দ নিয়ে– অর্থাৎ কিনা ডকুমেন্টারির ওপর ডকুমেন্টারি! এই নতুন ডকুমেন্টারির নাম 'যাদের নিয়ে'। এটি প্রশ্ন তুল্‌লো ডকুমেন্টারির যে কুশীলবরা তাঁদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তাকে ও মানসিক ধৈর্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে অসংখ্য দর্শককে আনন্দ দেন, তাঁদের জন্য আর্টের উপজীব্য হন, পরে তাঁদের ভাগ্যে কী ঘটে? তাঁদের সামনে থেকে ক্যামেরা সরে যাওয়ার পর তাঁদের এই অবস্থা নিয়ে কে আর ভাবেন? পুরো বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত ভাবনায় পড়া ভুক্তভোগী মার্শি 'যাদের নিয়ে' ডকুমেন্টারিতে অংশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, কারণ ইতোমধ্যে

তাঁর মানসিক অস্থিরতা চরমে গিয়ে পৌঁছেছিল- বিশেষ করে কাহিনী চিত্রটি মুক্তি পাওয়ার পর থেকে।

তাছাড়া বাবা প্যাটারসন তখন আমেরিকান টেলিভিশনের একটি জনপ্রিয় টকশোতে অংশ নিচ্ছিলেন এবং মূল ডকুমেন্টারির কাহিনীগুলোকে আবার দগদগে করে বর্ণনা করছিলেন। ইতোমধ্যে এই বিষয়ে তিনি 'সিড়ির পেছনে' নামে একটি বইও লিখেছিলেন। এসবই মার্শিকে তাঁর নিজের দিকটি ও অবস্থাটি নিজে বল্‌তে উদ্বুদ্ধ করেছিরো 'যাদের নিয়ে' ডকুমেন্টারিতে। নিজের সঙ্গে মানসিক ভাবে জড়ানো স্মৃতিতে অংশ নেয়া, বিশেষ করে ডকুমেন্টারিতে অংশ নেয়া মানুষদের পরবর্তী সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য তিনি একটি সংগঠনও গড়ে তুলেছেন। সংগঠনটি এই লক্ষ্যে কাজ করতে চায় আইনগত সংস্কার ও তাঁদের জন্য মনোবিদ্যা সম্মত পরামর্শের ব্যবস্থা দেবার আন্দোলন গড়ে তুলে।

'হাতির সঙ্গে ফিসফিসানি'। এই নামের ভারতীয় স্বল্প-দৈর্ঘ ডকুমেন্টারি ছবিটি এই ২০২৩ সালে ওই বিভাগে অস্কার পুরস্কার পেয়েছে। মুভিটি একটি শিশু এতিম হাতির সঙ্গে বোমান ও বেলী এই দু'জন আদিবাসী স্বামী-স্ত্রী মাহুত দম্পতির একাত্ম হয়ে যাওয়ার কাহিনী। এর অনেকখানি তাঁদের ও হাতির মনের খবর নিয়ে– এটিই মুভিটির বৈশিষ্ট। অসহায় হাতি-শিশুর প্রতি সরল মানুষের সরল ভালবাসা, মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে মনের জানাজানি, এমনকি কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসানি পর্যায়ে যাওয়ার সবই ঘটেছে ৪০ মিনিটের এই ডকুমেন্টারিতে। দুই রকম জীবের এমন যে আত্মার মিল তা দর্শকদের মনে যে তীব্র আবেগের সৃষ্টি করতে পেরেছে ওখানেই রয়েছে অস্কারের রহস্য।

ভারতের তামিল নাড়ু ও কর্নাটক প্রদেশের সীমান্তবর্তী নীলগিরি পাহাড়ের বনাঞ্চলে হাতির পালে একটি সদ্যজাত হাতি কোন ভাবে তার মাকে ও পুরো দলকে হারিয়ে ফেলেছিলো। ভাগ্যক্রমে তাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী মধুমালাই ন্যাশনাল পার্কে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা হয় রঘু নাম দিয়ে। সেখানেই বোমান আর বেবী তার দায়িত্ব পান। যে আদিবাসী গোষ্ঠির সদস্য তাঁরা সে গোষ্ঠির অনেকে হাতির মাহুতের কাজ করেন এবং এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় লোকজ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ ছিলেন– বোমান ও বেলীও তার

ব্যতিক্রম নন। আজকাল বন বিনষ্টির কারণে হাতির বসত নষ্ট হয়ে তাদের চরম বিনাশের কারণ হয়েছে। কিন্তু এই মুভির নির্মাতা কার্তিকী গনজালভেস গুরুত্ব দিয়েছেন জীববৈচিত্রের সংরক্ষণের দিকে, আর তার জন্য সব থেকে প্রয়োজন 'জীবপ্রেম'। হাতি শিশু রঘুকে কী ভাবে জীবপ্রেম দিয়ে বড় করে তুলবেন তার বিদ্যা বোমান ও বেলী আধুনিক বিজ্ঞান থেকে না পেলেও লোকজ বিজ্ঞান থেকে ঠিকই পেয়েছেন। ওটি দিয়ে তাঁরা রঘুকে বাবা-মা'র স্নেহ দিয়েই বড় করতে পেরেছেন। হাতির সঙ্গে ফিশফিশানি বোমান ও বেলী এই দু'জন মানুষকেই শুধু সম্মানের আসনে বসায়নি, তাঁদের সঙ্গে সম্মানের আসনে বসিয়েছেন পুরো আদিবাসী গোষ্ঠিটিকে এবং তার লোকজ বিজ্ঞানকে। স্বল্পদৈর্ঘ একটি মুভি যে দর্শকের মনেও এই সম্মানবোধ এবং শিশু প্রাণীর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারে এটি তার চমৎকার উদাহরণ।

যদি এমন হতো:

টাইটানিক মুভিতে ভুল। ১৯৯৭ সালে মুক্তি পাওয়া 'টাইটানিক' মুভিটি দর্শক জনপ্রিয়তা, ১১টি অস্কার, এবং বিপুল আলোচনার জন্ম দিয়ে তোলপাড় তুলেছিলো; কিন্তু মুভিটির নায়ক জ্যাকের ক্ষেত্রে এর শেষ পরিণতিটি দর্শকদের মনে একটি বড় হাহাকার রেখে গেছে। যাঁরা বিশেষজ্ঞ দর্শক তাঁরা শুধু মন খারাপই করেননি টাইটানিকে যেভাবে দেখানো হয়েছে সেখান থেকেই পাওয়া তথ্যগুলোর ভিত্তিতে প্রশ্ন তুলেছেন জ্যাকের এভাবে মরণের কোলে ঢলে পড়াটি খুব স্বাভাবিক ছিল কিনা– এর কোন বিকল্প পরিণতি আদৌ সম্ভব ছিল কিনা, বিশেষ করে নায়িকা রোজ যেখানে নিরাপদে ছিলেন সেখানে তার জায়গা হতে পারতো কিনা। তাঁদের কেউ কেউ তো এর জবাব পাওয়ার জন্য রীতিমত বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের আয়োজন করেছেন, এবং সেখান থেকে প্রমাণ করেছেন যে মুভির কাহিনী যদি বাস্তবতা মেনে নিয়ে রচিত হতো তা হলে রোজ যে সব জিনিসকে আশ্রয় করে শীতল পানিতে আত্মরক্ষা করেছিলেন, তার আংশিক আশ্রয়ে জ্যাকেরও বাঁচার সুযোগ ছিল। অবশ্য তিনি সব সময় চেষ্টা করছিলেন রোজের জীবন যেন কিছুতেই বিপন্ন না হয়।

এই এক্সপেরিমেন্টগুলো বেশ কিছুদিন ধরে করে এসেছে কয়েকটি আলাদা আলাদা প্রতিষ্ঠান এবং তাদের প্রায় সবাই ওই একই সিদ্ধান্তে এসেছে।

মুভিটি যে কখনোই দর্শকদের মন থেকে মুছে যায়নি, ওই প্রশ্নগুলো যে তাঁদের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলো, এটি বুঝতে পেরেই এতগুলো প্রতিষ্ঠান এতো আয়োজন করে এক্সপেরিমেন্টগুলো করছিলো এবং সবাইকে ফলাফল জানাচ্ছিলো। এ ছবির নির্মাতা জেমস্ ক্যামেরোন নিজেও একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানমুখী আর্টিস্ট, মুভি নির্মাতা। টাইটানিকের তিনি একাধারে লেখক, পরিচালক ও প্রযোজক। এরকম ক্ষেত্রে এই প্রশ্নে তাঁর নিজেরও উৎসাহ থাকার কথা ছিল, কিন্তু তিনি শুরুতে এই সমালোচনায় কিছুটা নির্লিপ্তই ছিলেন বলা যায়। অবশেষে ২০২৩ সালে মুভিটির ২৫তম বার্ষিকী পালন উপলক্ষে ন্যাশনাল জিওগ্রাফি ম্যাগাজিনের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশের জন্য তিনি নিজেই এই প্রশ্নটির নিষ্পত্তিতে কাজে নামেন এবং এর ওপর একটি পূর্ণাঙ্গ ল্যাবোরেটরি-পরীক্ষার আয়োজন করেছেন।

এই এক্সপেরিমেন্টে বিজ্ঞানের নানা শাখার বিশেষজ্ঞরা জড়িত ছিলেন। মূলত এই ল্যাবে একই রকম হিমশীতল পানির একটি বড় চৌবাচ্চা ছিল যেখানে মানুষের ভাসমানতা, হিমশীতল পানিতে 'হাইপোথারমিয়া' নামক মারাত্মক প্রতিক্রিয়ায় মানুষের নিস্তেজ হয়ে পড়া, কী রকম ভঙ্গিতে কতক্ষণ কত অংশে ডুবে থাকলে সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে পড়াটি এড়ানো যায়, ইত্যাদি বিষয়ের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে। পদার্থবিদ্যা এবং জীববিদ্যার অনেকগুলো মৌলিক নিয়মের প্রয়োগ সেখানে করতে হয়েছে। এতেও দেখা গেছে একটু চেষ্টা করলে ওই অবস্থায় জ্যাকের বাঁচা সম্ভব ছিল– যদি তিনি ভাসমান যে ভাঙ্গা দরজার ওপর রোজ ছিলেন তার ওপর শুধু প্রয়োজনীয় ভর রেখে, সঠিক ভাবে ভঙ্গি বদলিয়ে পানিতে থাকতেন যা তাঁর সহজাত ভাবেই বোঝার কথা। অর্থাৎ ক্যামেরোন নিজে স্বীকার করে নিলেন যে কাহিনীতে তিনি ভুল করেছেন। এই সিদ্ধান্তটি যে বড় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছিলো তাও নয়– টেলিভিশনে বিজ্ঞান বিষয়ক ডিসকভারি চ্যানেলে 'মিথ বাস্টার' (প্রচলিত ভুল ধারণা ভেঙ্গে দেয়া) নামে যে হালকা মেজাজের অনুষ্ঠান নিত্য হয় সেখানেই সহজ কথায় ভুলটি উদ্ঘাটিত হয়েছিলো শুধু ২০০০ বছর আগের আর্কিমিডিসের আবিষ্কৃত সেই প্লবতার নিয়ম বা ভেসে থাকার নিয়ম থেকেই।

অবশ্য জ্যাকের মনের বা শরীরের অবস্থা কি এখন এতসব কিছু ভেবে চিন্তা করার মত ছিল? স্থির মাথায় পদার্থবিদ্যার নিয়ম খাটানো কি টাইটানিকের এমন দুর্যোগ থেকে হিমশীতল পানিতে এসে সম্ভব ছিল? কিন্তু এ নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির মস্তিষ্কবিদ ডীন মরস বল্‌ছেন অন্য কথা। তিনি বলেন আমাদের মস্তিষ্কে বিপদে আত্মরক্ষা করার কৌশলগুলো প্রয়োগের একটি টুলবক্স আছে। এই 'হাতিয়ারের বাক্স' থেকে কোন্‌ হাতিয়ারটি আমরা এক্ষুণি ব্যবহার করবো তা নির্ভর করে কত সময় আমার জন্য আছে তার ওপর। যেমন ধরা যাক বাঘ আমার গায়ের ওপর প্রায় লাফিয়েই পড়েছে তখন কিন্তু আমি চিন্তা করিনা, তখন শুধু প্রতিক্রিয়া করি। কাজেই যাঁরা বলেন যে পদার্থবিদ্যার নিয়ম চিন্তা করার মত অবস্থা বা সুযোগ জ্যাকের তখন ছিলনা তাঁরা জানেননা যে ওই চিন্তা তাঁর করার দরকার তখন ছিলনা, তাঁর দরকার ছিল একেবারে এসে পড়া বিপদের মুখে সঠিক কাজটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে করে ফেলার- এবং ওটি করাই তাঁর জন্য স্বাভাবিক ছিল। কাজেই ক্যামেরোন কাহিনী ভুল লিখেছেন। তিনি চাইলে জ্যাককে বাঁচাতে পারতেন- টাইটানিকের অনেক বিয়োগান্ত কাহিনীর মধ্যে আমরা অন্তত জ্যাক আর রোজকে তাদের ভালবাসা নিয়ে বাঁচতে দেখতাম। মানুষের মন সব সময় বলে 'যদি এমন হতো'!

একই ছবিতে একই জনের নানা বয়সের অভিনয়। আজকের অতি প্রিয় ও সম্মানিত অভিনেতা টম হ্যাঙ্কস প্রথম মুভি-দর্শকদের কাছে নন্দিত হয়ে উঠেছিলেন ১৯৯৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'ফরেস্ট গাম্প' ছবিটির জনপ্রিয়তার পর থেকে। সে ছবিতে নায়িকা ছিলেন রবিন রাইট। তারপর থেকে সম্প্রতি পর্যন্ত এই দু'জন আর কখনো এক সঙ্গে অভিনয় করেননি। কিন্তু এখন তাঁরা দু'জন একত্রে আবার অভিনয় করবেন এবং সেই ছবিটি মুক্তি পাবে ২০২৪ সালে। 'হেয়ার' (এখানে) নামের এই নতুন মুভিটি নানা কারণে অনন্যতা লাভ করতে যাচ্ছে। সব চেয়ে বড় অনন্যতা হলো এতে হ্যাঙ্কস ও রাইটকে তাঁদের একত্র জীবন কাটাতে দেখা যাবে একই বাড়িতে, বলতে গেলে একই ঘরে দীর্ঘ সময় ধরে, যার মধ্যে তাঁদের বয়স তারুণ্য থেকে ক্রমে বার্ধক্যে গিয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা এখন বয়োবৃদ্ধ, তাই এই বয়সের অংশে এসে তাঁরা আজকের চেহারাতেই সম্পূর্ণ বাস্তবানুগ অভিনয় করতে পারবেন। কিন্তু সমস্যা হলো আগের বয়সগুলোর অভিনয়ও তাঁরাই করবেন। তবে কি

রূপসজ্জার কারিগরিতে তাঁরা আজকের বয়স থেকে মাঝ বয়সে এবং তরুণ বয়সে রূপান্তরিত হবেন? সেটি সম্ভব যদিও খুব সহজ কাজ হবেনা। তা ছাড়া আগের বয়সগুলোতে থাকাকালীন তাঁদের চলাফেরা, অভিনয়-ভঙ্গি তো আর রূপসজ্জা দিয়ে ফেরৎ আনা যাবেনা। তাঁদের আগের বয়সের মুভিগুলোর মাধ্যমে শুধু চেহারা নয় তখনকার অভিনয়-ভঙ্গিও তো সবার কাছে পরিচিত। তাই 'হেয়ার' মুভিটিতে ওই কাজটি করা হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে!

এই কাজ করার জন্য বিভিন্ন সময়ে উভয়ের বিভিন্ন বয়সে অভিনীত মুভিগুলোর থেকে যার যার সে সময়ে চেহারা, ব্যক্তিত্ব, অভিনয়-ভঙ্গি, কথাবার্তার ধরন ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য নিয়ে নতুন সফ্টওয়্যার গড়ে তোলা হয়েছে। তাঁরা আজকে যে ভাবে করছেন সেভাবেই অভিনয় করে যাবেন, কিন্তু একেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ওই আগের বয়সে করলে যেভাবে করতেন যেই চেহারায় সেই ভাবে করার চলচ্চিত্রে রূপান্তরিত করবে। কিন্তু এটি করার উদ্দেশ্য কী– শুধুই কি বিভিন্ন বয়সের অভিনয়কে বয়সের সঙ্গে মানানসই করার জন্য, তাঁদের ওই তরুণতর বিভিন্ন বয়সের অভিনয়ের সঙ্গে, দর্শকরা যার সঙ্গে খুব ভালই পরিচিত? না, 'হেয়ার' মুভির বিষয়টি অবশ্য আর একটু ভিন্ন। ছবির কাহিনী ও বক্তব্যের বৈশিষ্ট এমন যে তাতে নায়ক নায়িকার বয়সকে দ্রুত এগিয়ে নিতে হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে। বয়সে পিছাতেও হয়েছে। বয়সের এই এগুনো এবং পিছানোটি এই মুভির মূল সুরের জন্য কেন্দ্রীয় বিষয়। একত্র জীবনের প্রায় পুরোটা এক ঘরে একই আবহে কাটানো জীবনকে দু'এক ঘন্টায় দেখাতে দেখাতে এই ছবি দুর্দান্ত কিছু অভিনব আর্টস সৃষ্টির আশ্বাস দিচ্ছে। ওই সময়ে এগিয়ে পিছিয়ে নানা বয়সের অভিনয় মসৃণ ভাবে পরিবর্তন না করা গেলে সেটি কী ভাবে সম্ভব হবে? তাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ডাক পড়েছে।

মনোসংযোগটিই বড় কথা:

২০০৯ সালে সিনেমা নির্মাতা জেম্স ক্যামেরোন 'অবতার' ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন। এটি বিশেষ করে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ছবির পাত্রপাত্রী ও আবহ সৃষ্টিতে অদ্ভুত অভিনবত্ব দেখিয়েছে। আর ২০২৩ সালে তারই ধারাবাহিকতায় অবতার সিরিজের দ্বিতীয় ছবিটিও নির্মাণ করেছেন একই রকম অভিনবত্ব নিয়ে যার নাম 'অবতার: দি ওয়ে অফ ওয়াটার্স'। প্রথমটিতে

দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিলো উপনিবেশবাদের অন্যায়ের প্রতি, দ্বিতীয়টিতেও তাই; কিন্তু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আক্রান্ত পরিবেশ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করার বিষয়। উভয়টিতেই সায়েন্স ফিকশনের মত কাহিনীর ভেতর দিয়েই বক্তব্যগুলো সামনে আনা হয়েছে।

এই নতুন মুভিটি মুক্তি পাওয়ার পর ক্যামেরোন একটি সাক্ষাৎকারে ব্যাখ্যা করেছেন প্রযুক্তি কী ভাবে আর্ট সৃষ্টির পেছনে দারুণ অবদান রাখতে পারে। তাঁর ছবিগুলোর খুঁটিনাটি দেখলে বোঝা যায় কী ভাবে প্রযুক্তি এখানে রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে কেমন করে আর্টের অদ্ভুত দ্যোতনা সৃষ্টি করতে পারে। যিনি নির্মাণ করেন তিনি এই খুঁটিনাটি দেখেন এবং এও দেখেন যে প্রযুক্তি কী ভাবে তাঁর আর্টকে সাহায্য করেছে। কিন্তু দর্শক যিনি কয়েক ঘন্টার মুভিতে ওসব কাজের ফলাফলটি এক সঙ্গে দেখবেন, প্রযুক্তিগুলো তাঁদের সামনে থাকেনা– পেছনে চলে যায়। তাঁদের সামনে থাকে অন্য কিছু। যেমন অবতার: দি ওয়ে অফ ওয়াটার্সে তাঁদের সামনে থাকে প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা একটি শিল্পময় অথচ সহজ সরল জীবন ব্যবস্থা।

এমন ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ হলো দর্শকের কাছে প্রযুক্তির কথা মনে করিয়ে দেয়া নয়, বরং চরিত্রগুলোর কথাকেই দর্শককে ভাবতে দেয়া। তাঁরা ছবিতে প্রশংসা করবেন সার্থক চরিত্র সৃষ্টির আর্টগুলোকে। অবতারের চরিত্রে যা দেখা যায় প্রযুক্তি ছাড়া তা কখনো দেখানো যেতোনা। রূপসজ্জা বা প্রসাধন দিয়ে অবতারের এমন টানা চোখ, এমন সহানুভূতির অভিব্যক্তি কি সৃষ্টি করা যেতো? কিন্তু চরিত্রের এই সব কিছুই দর্শক দেখেন, প্রযুক্তিকে দেখেন না। নির্মাতার কাজ হলো দর্শক যেন চরিত্রের এই সুন্দর আর্টগুলোতে, তার ওই অভিব্যক্তিগুলোতে, অখণ্ড মনোসংযোগ করতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দেয়া। মনোসংযোগটিই এখানে বড় কথা। নির্মাণে যতই জরুরি হোক প্রযুক্তিকে সামনে আনলে ওই মনোসংযোগ ব্যাহত হয়, এটিই ক্যামেরোনের মত।

অবতারের মত মুভির ওই অবাক করা অভিব্যক্তিগুলো সব থেকে হৃদয়স্পর্শী হয় যখন দর্শকের প্রায় চারিদিকে ঘিরে থাকা বড় পর্দার ও আধুনিকতম সাউন্ড সিস্টেমের মুভি থিয়েটারে এটি দেখার সুযোগ হয়। ক্যামেরোনও তাই মনে করেন; কিন্তু তাঁর মতে ওখানে দেখা সব থেকে ভাল

শুধু তার বড় পর্দা বা সাউন্ড সিস্টেমের জন্য নয়, বরং যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সেখানে নিশ্ছিদ্র মনোসংযোগ সম্ভব হয়, সে জন্যই দর্শক সেখানে যান, সবকিছু পেছনে ফেলে গিয়ে ছবিটির মধ্যে ডুবে যাবার জন্য। তাই বলে ক্যামেরোন তাঁর ছবি ওখানে গিয়ে না দেখলেই চলবেনা এমনটিও মনে করেন না। বাড়িতেও যদি একটি বড় ফ্ল্যাট টিভি পর্দায় যথেষ্ট কাছে বসে দেখেন তাতেই তিনি খুশি। মুভি থিয়েটারেই হোক আর বাড়িতেই ওভাবে কিছুক্ষণের ছুটি নিয়ে বসে দেখা হোক, দর্শক আর্টের নির্মাতার সঙ্গে যতক্ষণ মনে মনে একটি চুক্তি করে ফেলেন যে নির্মাণটি উপভোগের চেষ্টা করবেন, ওইটুকুই তিনি আশা করবেন। তাঁর আপত্তি স্মার্টফোনের ওপর তাঁর মুভিগুলো দেখাকে নিয়ে। অবতার ফোনে দেখবে এটি যেন তিনি কল্পনাই করতে পারেন না, কিন্তু মানুষ তা করে। না, ফোনের স্ক্রীন ছোট বলেই ক্যামেরোনের আপত্তি নয়; ফোন জিনিসটিই এমন যে তাতে মনোসংযোগ অসম্ভব। দেখার ফাঁকে ফাঁকে অন্য কাজ করার সম্ভাবনা এখানে অনেক বেশি এতেই তাঁর ঘোরতর আপত্তি, অবতারের পুরো আর্টটির প্রতিই সেটি হবে চরম অবহেলা; ছবির আসল মর্ম কিছুই বোঝা যাবেনা।

ক্যামেরোন চাননা যে তাঁর ছবির মধ্যে প্রযুক্তি আর্টকে ছাড়িয়ে আসুক, কিন্তু প্রযুক্তির ছোঁয়ায় আর্টে যে নতুন নতুন বিপ্লব আনা যায় সেই বিশ্বাসেও তিনি অটল। এটি তিনি তাঁর ছবিগুলোতে প্রমাণ করেছেন। অবতার, এলিয়েন, টারমিনেটর, এ্যাবিস, পিরানহা, টাইটানিক ইত্যাদি মুভি এবং এগুলোর কোন কোনটির পরবর্তী সিরিজ অনুসরণ– এসবে কত ভাবেই না তিনি সেই বিপ্লবগুলো ঘটিয়েছেন। এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তি অভাবনীয় আর্ট সৃষ্টি করেছে। ক্যামেরোনের কথা হলো এটি যদি তিনি না করতে পারতেন তা হলে একঘেঁয়েমী তাঁকে পেয়ে বসতো। হ্যাঁ প্রযুক্তি ছাড়াও অসামান্য আর্ট হতে পারে, তিনি নিজেও সেদিকে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু প্রযুক্তি আর্টের অসামান্য হবার সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। প্রযুক্তিবিহীন ছবি যে এই সাম্প্রতিক কালেও নির্মিত হয়ে দারুণ আর্টের জন্ম দিয়েছে তার উদাহরণ স্বরূপ তিনি ১৯৯৭ সালের ‘টুয়েলভ অ্যাঙ্গরি মেন’ (বারোজন রাগী মানুষ) মুভিটির কথা বলেছেন। এটি ১৯৫৭ সালের একই নামের মূল ছবির পুনর্নির্মাণ। নতুন মুভিটিতেও কোর্টের একটি বিচার কাজে ১২ জন জুরি একই ঘরের মধ্যে নিজেদের কথাবার্তাই শুধু চালিয়ে গেছেন– ব্যাস পুরো

মুভি এ নিয়েই। অথচ কী চমৎকার আর্ট, শুধুমাত্র চরিত্রগুলো দিয়েই তো। তবে মনোসংযোগ ছাড়া এখানেও আর্ট ব্যর্থ হতে বাধ্য।

আর্ট-ফটোগ্রাফিতে বিজ্ঞানের লেন্স

আর্টিস্টের ভূমিকায় আলোঃ

ফটোগ্রাফিই বোধ হয় একমাত্র আর্ট যেটিকে কেউ নিখাদ বিজ্ঞান বলেও দাবী করতে পারেন। কারণ এখানে আর্টিস্টের কাজ অনেকটাই সম্পন্ন করে আলো, বিজ্ঞানের লেন্স দিয়ে। পেছনে মানুষ-আর্টিস্ট এর পরিকল্পনা যদি করেন, তাও তাঁকে করতে হয় আলোক-বিজ্ঞানকে মাথায় রেখে, তার বাইরে নয়। সেই মানুষ-আর্টিস্ট অনেক কৃতিত্ব নিতে পারলেও তাঁকে সে কৃতিত্ব প্রকৃতির আলো-ছায়ার সঙ্গে ভাগ করে নিতে হয়। একজন চিত্রশিল্পী, ভাস্কর বা সঙ্গীত কম্পোজারের সহজাত সৃজনশীলতা প্রয়োগের সুযোগ তাঁর কম।

নীরব আর্টিস্ট হিসেবে আলোর ভূমিকাটি খুব বেশি বলে মানুষ ফটোগ্রাফারকে সেখানে অবদান রাখতে হলে তাঁর অনেকটা ভাবনা আলোকে ঘিরেই থাকতে হয়– সেই আলো প্রকৃতি থেকে আসুক কিংবা বাতি থেকে আসুক। তারপরও মনের মত আলো যদি না পাওয়া যায় তাহলে তিনি প্রতিফলক ব্যবহার করে ছবি-বস্তুর ওপর আলো বাড়াতে পারেন, আবছা ভাব সৃষ্টির জন্য সামান্য-স্বচ্ছ ছাতার ভেতর দিয়ে নিয়ে আলোকে ছড়িয়ে দিতে পারেন, আলো কমানোর জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারেন।

ধরা যাক সূর্যের ভাল আলোতে একটি দৃশ্যের ছবি নিচ্ছি যাতে ঝোপ-ঝাড় ঘাস ইত্যাদির কাছে একটি গিরগিটি কড়া রোদের নিচে আছে। প্রাণীটি থেকে এতো আলো প্রতিফলিত হবে যে এমন আবহে তার ছবি ভালো আসবেনা– অথচ এটিকেই যে দেখাতে চাই। তা হলে গিরগিটির ওপর আলো কমাবার জন্য সামান্য-স্বচ্ছ ছাতার ভেতর দিয়ে তার ওপর রোদ ফেল্‌লাম। কিন্তু এখন আবার রোদে পূর্ণ আলোকিত পশ্চাদপটের তুলনায় একে ছবিতে কালো দেখাবে– সেক্ষেত্রে ছবিটি ওঠার মুহুর্তে ওই ছাতার ভেতর দিয়েই এর ওপর ফ্ল্যাশের আলো ফেলা যায়। এভাবে মৃদু করে নেয়া ফ্ল্যাশের আলো শুধু গিরগিটিকে প্রয়োজনীয় আলো দিলো। ফ্ল্যাশ কেন, একটানা আলোও বা নয় কেন? সেটি যে করা যায়না তা নয়, কিন্তু যেই

এনার্জি খরচ করতে হয় তাতে একটানা আলো ব্যবহার বোকামি হবে, তা ছাড়া ফ্ল্যাশ যে ক্ষুদ্র সময়ে জ্বললো সে মুহুর্তের ছবিটি উঠলো বলে ছবি-বস্তুটি (এখানে গিরগিটি) এর আগেপরে যে নড়াচড়া করেছে তার প্রভাব ছবিতে আসবেনা– এটি সব সময় ফ্ল্যাশ আলোর একটি মস্ত সুবিধা।

খারাপ আবহাওয়ার ছবি। 'বাহ্, এখন ফটো তোলার জন্য ভাল আলো!' এ কথা আমরা সাধারণত বলি সুন্দর ঝকমকে কিন্তু কমনীয় রোদের আলো যখন থাকে, অথবা রাতের ছবিতে সুন্দর পরিস্কার মৃদু আলোর রাতকে। কিন্তু অনেক ফটোশিল্পীকে দেখা যায় তাঁর কাজের জন্য খারাপ আবহাওয়াকে খুঁজতে। এর কারণ হলো ওই খারাপ আবহাওয়ায় প্রকৃতিই যেন আমাদের জন্য ওই আলোক-নিয়ন্ত্রণটি নিজেই করে দেয়– তখন প্রতিফলক, আলো নিক্ষেপনের জন্য সামান্য-স্বচ্ছ ছাতার ব্যবহার, ফ্ল্যাশ ইত্যাদির প্রয়োজনীয়তা কমে যায়। যেমন রীতিমত ঝড়-বৃষ্টির মেঘলা আকাশেও দেখা যায় হঠাৎ হঠাৎ মেঘে ফাঁক দেখা দিয়েছে এবং সেই ফাঁক দিয়ে শান্ত মৃদু আলো এসে পড়ছে অনেকটা নাটকের স্টেজের একাংশের ওপর ফেলা স্পট লাইটের মত আমার কাম্য ছবি-বস্তুতে। দুপাশের আঁধার আর ঠিক ওখানে আলো তখন ভাল ফটোর সুযোগ করে দেয়। অপেক্ষা করলে ঠিক জায়গাতেই ওই 'স্পট লাইট' পেয়ে যেতে পারি। এতে অন্ধকারের সঙ্গে আলোকিত জায়গাটির যে কন্ট্রাস্টের কিনারাটি সৃষ্টি হয় তেমনটি কৃত্রিম আলোর মাধ্যমে সৃষ্টি করা কঠিন।

ওই ফাঁক নানা কিছুতে নানা রকম এফেক্ট দেবে– গুড়ি বৃষ্টিতে, অঝোর বৃষ্টিতে, বৃষ্টি শেষের রোদের ছটায় যখন রঙধনু দেখা যায়- এমনি নানা বৈচিত্রে। শীতের দেশে সেটি ঘটে হালকা তুষারপাতে বা কঠিন ব্লিজার্ডে। তাছাড়া কাল বোশেখীর ধূলিঝড় বা শীতের কুয়াশা যেমন আমাদের স্পট লাইটের জন্য ফ্রেইম কিনারা বানিয়ে দিতে পারে তেমনি অন্যত্রও সেটি দেয় কুয়াশা, বালির ঝড়, সমুদ্রের ঝড় ইত্যাদি। এর সবই ফটোশিল্পীর দুর্যোগে বাইরে গিয়ে কাজ করাকে খুব কঠিন করে তোলে বটে, কিন্তু আলোক সম্পাতের দিক থেকে তাঁকে দারুণ সব সুযোগ এনে দেয়– তাঁর কষ্ট সার্থক হয়।

চিত্রশিল্পীর কাছে আলো। এমন চরম আবহাওয়ায় ফটো-আর্ট সৃষ্টির সুযোগ উচ্চাঙ্গের হলেও সাধারণ মেঘলা আবহাওয়াও কম উপযুক্ত নয়। যা প্রয়োজন তা হলো আলোর তীক্ষ্ণ কনট্রাস্ট। ক্যানভাসের ওপর তুলি হাতে যে চিত্রশিল্পী কাজ করেন এরকম আলো ছায়ার কনট্রাস্ট তাঁকেও সৃষ্টি করতে হয়। নিজ থেকে এমন পরিস্থিতি তাঁর ছবিতে সৃষ্টি করে নিতে হয়। অন্যদিকে ফটোগ্রাফিতে প্রকৃতিই সেই পরিস্থিতি তৈরি করে দেয়। যেমন রেনেসাঁ পরবর্তী বিখ্যাত শিল্পী ভূমীয়াহর 'জ্যোতির্বিজ্ঞানী' ছবির কথাটি বলি। অন্ধকার একটি ঘর যেখানে জ্যোতির্বিজ্ঞানী কাজ করছেন। একদিকে একটি কাচের জানালা দিয়ে আলো এসে তাঁর টেবিলটি আলোকিত করছে, যার ওপর একটি গ্লোব, বই, গ্লোব ধরে থাকা বিজ্ঞানীর হাত আর মুখ– এই অংশগুলো বেশ আলোকিত, বেশ উজ্জ্বল আলো। সেই আলোকিত অংশের ওপরও ছোপ ছোপ ছায়া; কিন্তু ছবির বাকি অংশ আঁধারে রয়েছে বলে কালো না হলেও অনেকটা কালচে ছায়ায়। অর্থাৎ ঠিক ওই স্পট লাইটের মত আলোর ব্যবহার। আলোকিত অংশের বিপরীতে নানা ঘনত্বের ওই কালোর কনট্রাস্টটি খুব কড়া। আলোকিত অংশকে নানা আভায় বেশ সৌকর্যময় করে তোলা হয়েছে। এতে মনে হয় যেন এই আলোকিত অংশকে আঁধার থেকে খোদাই করে বের করে নিয়ে এসেছেন শিল্পী, মার্বেল খোদাই করে সৌকর্যময় মূর্তি বের করে আনার মত। চিন্তা করলে বোঝা যায় এ জন্য শিল্পীকে কতটা তাঁর সৃজনশীলতার পরিচয় ও শ্রম দিতে হয়েছে। ফটোগ্রাফার এর সবই এমনিতে প্রকৃতি থেকে পেয়ে যেতে পারেন।

চিত্রশিল্পীর ওভাবে কনট্রাস্ট সৃষ্টির মাধ্যমে আলোকে আঁধার থেকে খোদাই করে বের করার ভাব সৃষ্টির বড় উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমাত্রিক ক্যানভাসের ওপর আঁকা ওই কামরা ও ওই দৃশ্যকে বাস্তবের মতো ত্রিমাত্রিক রূপ দেয়া। ওই যে আলোকিত অংশের মধ্যে ইতস্তত ছায়া পড়া– ত্রিমাত্রিক রূপ দিতে সেটিও জরুরি। কাজেই শিল্পীকে তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে আলো-ছায়ার খেলার ওপর বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়েছে। ফটোশিল্পীকেও ব্যাপারটি খেয়ালে রাখতে হয়– অর্থাৎ আলোকিত অংশে ছায়ার খেলা আছে কিনা, আর আঁধার অংশেও আলোর খেলা আছে– কিনা তা দেখতে হয়। আর্ট মানে তো উপভোগকারীর মনে ভাবান্তর আনা। ফটোগ্রাফির মাধ্যমেও তখনি আর্ট সৃষ্টি সম্ভব যখন ফটো-শিল্পী আলোর সঙ্গে দ্বৈরতে ওই সৃষ্টি কর্মে নিয়োজিত হতে পারেন।

ধরা যাক একটি বনের কিনারার ফটো তুলছি, কারণ এই কিনারায় এসে কিছু হরিণ বিশ্রাম নিচ্ছে। ঘন বনের ভেতরে আলো নেই, কিন্তু তার মধ্যেও গাছের ফাঁকে ছোপ ছোপ আলো ছায়া থাকতে হবে। আর বাইরে পুরো আলোকিত কিন্তু সেখানেও সুন্দর মৃদু ছায়া থাকবে হরিণের, গাছের, মেঘের।

জীবপ্রেমের ফটো আর্ট- কিছু সাধারণ নিয়মঃ

ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি অনেক ফটোগ্রাফারের সারা জীবনের নেশা ও সাধনা। জীবন্ত কিছু, বিশেষ করে যাদের সম্পর্কে, যাদের পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের কম জানা, সেই বন্য প্রাণীর কোন রহস্য ফটো-আর্টের মাধ্যমে সামনে আসতে পারা কম কৃতিত্ব নয়। সেই আর্ট সৃষ্টিটি অনেক সময় ব্যতিক্রমী ব্যাপার হলেও ওই উচ্চাঙ্গের ফটোগ্রাফাররা কতগুলো খুব সাধারণ দৈনন্দিন নিয়ম কিন্তু ভালভাবে মেনে চলেন, নইলে ওই সৃজনশীলতাটি কঠিন হয়। আর সাধারণ বন্য প্রাণী নিয়ে সৌখিন ফটোগ্রাফাররাও যখন দৈনন্দিন কাজ করেন তখনো। কেমন আলোতে বন্য প্রাণীর ছবি তুলতে হবে? অবশ্যই দুপুরের কড়া রোদে নয়, কারণ তাদের গা ঠিকরে আলো প্রতিফলিত হলে পুরো উদ্দেশ্যটাই মাটি। ভোরবেলা বা সন্ধ্যার আগের নরম আলোতে ওদের খুঁজে নিতে পারলে ভাল, নইলে দুপুরের মেঘলা আবহাওয়াতে। বন্য প্রাণীকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে? সব সময় দুর্গম বনে যেতে হবে তাও নয়, আশপাশেই অনেক বন্যপ্রাণী আছে লুকিয়ে থাকা যাদের স্বভাব। মোটা দাগে একটি নিয়ম হলো যেখানে দুই ভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ এক সঙ্গে মিলেছে সেখানে খোঁজ করাটাই বেশি ফলপ্রসূ – যাকে বলা যায় বসতের কিনারা। বনের ভেতর গহীন বনে খোঁজ করে লাভ নেই, করতে হবে ওখানে নদীর পাড়ে যেখানে বন ফিকে হয়েছে– প্রাণীরা পানি খেতে আসছে। অথবা হ্রদের পাড় পার হয়ে যেখানে তৃণভূমি শুরু হচ্ছে সেখানে। এসব জায়গা হলো বন্যপ্রাণীর জন্য নিজেদের রসদ খোঁজার জায়গা, বিশ্রামের জায়গা, নিজেকে প্রকাশের জায়গা।

প্রাণীতো সব এক সাইজের নয়; যদি তা মানুষের প্রায় সমান উঁচু হয় তা হলে তো সোজা কাজ– নিজের চোখের উচ্চতায় ক্যামেরা রেখে ফটো তোলা যায়। কিন্তু যদি অন্য উচ্চতার হয়? যেমন ঘাসের ওপরের পোকা, মাটিতে কেঁচো, পুকুরে জলচর পাখি তা হলে ফটোগ্রাফারকে তার নিজের ও

সরঞ্জামের উচ্চতা কসরৎ করে উপযুক্ত করে নিতে হবে যেমন মাটিতে শুয়ে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রাণীটির আশপাশের পরিবেশের গুরুত্ব রয়েছে, এগুলো ছায়ায় ঢাকা থাকলে প্রাণীটির ওপর আলোর অভাব হতে পারে। তাই শাটার স্পীড ধীর রেখে লম্বা সময়ে ফটো তোলার অভ্যাস করতে হয়। খুব শান্তশিষ্ট বসে থাকা প্রাণীর ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বেশি সমস্যা না হলেও কিন্তু যদি ছটফট করা কেউ হয় তাহলে লম্বা সময় দেয়া সম্ভব নয়, স্পীড একটু বাড়াতে হবে বৈ কি! বন্য প্রাণী কোথায় কখন দেখা দেবে তার ঠিক নাই তাই ফটোগ্রাফারকে নানা দূরত্বে ভাল ছবি তোলার মত নানা লেন্সের ভাণ্ডার সঙ্গে রাখতে হয়। বহু দূরে গাছের ডালে বসা পাখিকে তোলার জন্য যেমন, তেমনি খুব ছোট্ট পোকাকে বা পতঙ্গকে একেবারে কাছে থেকে তার সকল বিস্তারিত ফুটিয়ে তোলার জন্য উপযুক্ত লেন্স লাগতে পারে।

ক্যামেরার কিছু আধুনিক সুযোগ গ্রহণ করলে যে কোন জায়গায় প্রাণীর ফটো তোলা সহজ হয়। যেমন প্রাণীর নড়াচড়া বেশি হলে ও তা অনিশ্চিত হলে বার্স্ট মোডে পরপর অনেকগুলো ছবি তোলা যায়– এর মধ্য থেকে যে মুহূর্তে প্রাণী নিশ্চল ছিল সেটি বাছাই করে নেয়া যায়। যে প্রাণী হেঁটে হেঁটে, বা উড়ে উড়ে ক্যামেরার থেকে দূরত্ব পরিবর্তন করছে তার জন্য ক্যামেরার ফোকাস মোড ব্যবহার করা যায়, যাতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে সব সময় তাকে ফোকাসে রাখা যায়। ফোকাসের প্রসঙ্গে অনেক সময় প্রাণীর শুধু একটি জায়গা ফোকাসে রেখে বাকিটা আবছা রাখতে চাইবো, যেমন হয়তো চাইতে পারি পাখির মাথার ঝুঁটি বা চোখটির ওপর গুরুত্ব দিতে, তাহলে বাকি অংশ ক্রমে আবছা হয়ে আসলেই গুরুত্বটি সুন্দর ফুটবে। তখন লেন্সের এপারচারটি্ বড় করে খোলার ব্যবস্থা করা যায়, যাতে শুধু কাম্য জায়গাটিই ফোকাসে থাকে, আগে-পিছে অন্য জায়গা নয়।

প্রাকৃতিক আলোতেই বন্য প্রাণীর ছবি তুলতে পারলে ভাল। কিন্তু ফ্ল্যাশ যে ব্যবহার করতে হয় সেটি আমরা আগে দেখেছি– অতিরিক্ত রোদে সামান্য-স্বচ্ছ ছাতার ভেতর দিয়ে এর আলো গিরগিটির ওপর ফেলতে হয়েছে, আলো কমাতে। আবার আলো বাড়াতে হলে সরাসরি ফ্ল্যাশে প্রাণী চমকে উঠতে পারে, যেটি অনেকে নিষ্ঠুরতাও মনে করে। ফ্ল্যাশটি স্বাধীনভাবে নাড়াচাড়া করতে পারার মতো হওয়া চাই, ঠিক যেখানে দরকার সেখানে

আলো ফেলার জন্য। এপারচার, স্পীড, ফোকাস ইত্যাদি আগে ফ্ল্যাশ ছাড়াই ঠিক করে নিয়ে তারপর ফ্ল্যাশ দিয়ে দেখতে হবে ছবি আরো উন্নত হলো কিনা। এমন পরীক্ষা নিরিক্ষা অবশ্য সে ক্ষেত্রেই করা যায় যেখানে প্রাণীটিকে বার বার পাওয়া যায়। রাতের বেলার প্রাণীর ছবিতে তো ফ্ল্যাশই একমাত্র ভরসা। সে ক্ষেত্রে একটি বাড়তি মৃদু একটানা বাতি থাকা চাই যার আলোতে ফোকাস ইত্যাদি করে নিতে হবে, তারপর ফ্ল্যাশ।

সব থেকে বড় কথা হলো ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফারের জীবপ্রেম। প্রাণীটির প্রতি ভালবাসাই তাঁকে ভাল আর্ট সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করবে, সক্ষমও করে। এটি তাঁকে দেবে অপরিসীম ধৈর্য, তার সম্পর্কে জানার ইচ্ছা– তার পরিস্থিতি, প্রতিক্রিয়া, আচরণ, ভাল-মন্দ লাগা সব কিছু। এজন্য ফটো তোলার আগে থেকেই তিনি এর ওপর পর্যবেক্ষণ করবেন, পড়াশোনা করবেন, পরিচিত হবেন। সে রকম হলেই তাঁর আর্টের মধ্যেও মমত্বটি ধরা পড়বে।

ফটোর বিষয় সর্বত্র, তবে আর্ট কোথায়ঃ

আজকাল মোবাইল ফোনে, বিশেষ করে স্মার্ট ফোনে যেই পর্যায়ের ক্যামেরা রয়েছে খুবই ভাল ফটো, এমনকি কোন কোন আর্ট-ফটো সৃষ্টির জন্য তা যথেষ্ট। কাজেই ন্যূনতম প্রযুক্তি নিয়েই আজকাল উৎসাহী যে কেউ শুধু নিজের ও ঘনিষ্ঠদের বিশেষ মুহূর্তগুলোকে ধরে রাখার জন্য নয়, রীতিমত একজন শিল্পী হিসেবে এই আর্ট চর্চা করতে পারেন। মোবাইল ফোন এই চর্চায় আরেকটি সুবিধা এনে দেয় যে সঙ্গে সঙ্গে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কেউ ইচ্ছে করলে তাঁর এরকম একটি আর্ট-ফটো ব্যাপক ভাবে বিভিন্ন গ্রুপের কাছে পাঠাতে পারেন উপভোগ ও সমালোচনার জন্য; এবং তা ফটোটি সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সরাসরি। সব পর্যায়েই এই আর্ট চর্চা দিন দিন সহজতর হচ্ছে। যাকে বলা হয় এরিয়াল ফটোগ্রাফি অর্থাৎ আকাশ থেকে অনেকটা পাখির দৃষ্টিভঙ্গিতে ফটো তোলা তার জন্য এতোদিন বিমান, হেলিকপ্টার ইত্যাদি ব্যয়বহুল আকাশযানের ওপর নির্ভর করতে হতো। সহজলভ্য ড্রোন উদ্ভাবিত হওয়ার পর এই অপ্রাপ্তিটুকুও গুছে গেছে। এই নতুন প্রযুক্তিটি এখন অনেক নবীন শিল্পীকে খুবই আকৃষ্ট করছে।

ড্রোন থেকে ছবি। ড্রোন থেকে এভাবে ছবি তোলার ক্ষেত্রে একটি বড় সমস্যা হলো এটিকে আকাশে অনেক্ষণ ধরে উড্ডীয়মান রাখা ব্যয়বহুল, তাছাড়া এর ওড়ার ব্যাটারীর স্থায়ীত্বও সীমাবদ্ধ। তাই সেটি উড়তে রইলো আর আমি তখন তার ক্যামেরায় দেখা দৃশ্য থেকে পছন্দ করলাম, ফটো নিলাম, তার অবকাশ নেই। আগে থেকে পরিকল্পনা করা থাকা চাই কী তুলবো। বহু কিছু নিয়ে ফটো তেলার সুযোগ থাকলেও এর আর্ট-দৃশ্যটি তাৎক্ষণিক ভাবে খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়; আগে থেকে পরিকল্পনা করাও সহজ নয়, কারণ আগে তো আর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিনা। তবুও তা মনের চোখে দেখতে হবে; গুগল ম্যাপ, গুগল আর্থ, ওকাজে সাহায্য করতে পারে, তাতে ওই জায়গার ওপর থেকে তোলা ছবি রয়েছে বলে। আগে থেকেই কতগুলো ব্যাপার মনে রাখা যায়। কড়া রোদে নানা ভবন আর জলাশয় থেকে আয়নার মত এতে আলো প্রতিফলিত হয়ে ক্যামেরায় ফেরৎ আসলে যে কোন ফটোর দৃশ্যগুলো মাটি হয়ে যেতে পারে। উঠন্ত বা পড়ন্ত বেলাই তাই এর জন্য ভাল; ও সময় অবশ্য ভবন, বৃক্ষ ইত্যাদির বড় লম্বা ছায়া মাটিতে পড়বে, তবে তাকেও আর্ট-সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করা যায়। বিশেষ একটা কিছু যদি লক্ষ্যবস্তু হয় তার কাছে ড্রোনের উচ্চতা বাড়িয়ে কমিয়ে দেখা যায় তার ভাল ফটো-গভীরতা কেমন করে সৃষ্টি করা যায়। যে কোন অবস্থায় অবশ্য ওপর থেকে তোলা ছবিতে অনেকখানি জায়গার দৃশ্য আসে, খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো ওই বিস্তীর্ণ দৃশ্যের মধ্যে কোন প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কিনা তা দেখা। যেমন এমন কিছু খোঁজা যা কিছু জায়গা পর পর পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। হতে পারে একের পর এক বৃক্ষ সারি, অথবা এমন কিছু যা বৃত্তাকারে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আসছে। প্যাটার্নের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আর্ট। আর খোঁজা দরকার কোথাও কোন প্রতিসাম্য দেখা যায় কিনা। ধরা যাক যাকে লক্ষ্যবস্তু করছি তার বাম পাশে একটি কিছু আছে যার হুবহু আরেকটি ডান পাশে আছে- যেমন দুপাশে দুটি দিঘী, প্রত্যেকটি দিঘীর সঙ্গে ছোটখাট বন লক্ষ্যবস্তুটি ঠিক মাঝখানে খোলা জায়গায়। আকাশ থেকে দেখা ওই প্রতিসাম্য, বা নিয়মিত যে কোন জিনিস তাৎক্ষণিক ইতস্তত কোন গোলমেলে জিনিস এসে গুলিয়ে দিতে পারে, যেমন হঠাৎ একদিকে পরক্ষণ অন্যদিকে চলন্ত কিছুর ছায়া পড়ে যাওয়া। তাই ক্যামেরার বার্স্ট ব্যবহার করে ওতে ওঠা সবগুলো ছবিকে হুবহু একের ওপর এক উপস্থাপন করা যায়।

ইতস্তত এসে গুলিয়ে দেয়া জিনিসগুলো একটি অন্যটিকে ক্ষতিপূরণ করে দিয়ে নির্ভেজাল নিয়মিত জিনিসটিকে স্পষ্ট রাখে। আর্টকে খুঁজে পাওয়াটাই বড় কথা– আর্ট-ফটোই যদি উদ্দেশ্য হয়।

ড্রোনের জন্য শুধু কেন, একই কথা তো সাধারণ ছবি তোলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শিল্প-সম্মত কিছু ছবি তুলতে কোথাও গিয়েছি, কিন্তু সে রকম কিছু খুঁজে পাচ্ছিনা। হয়তো পাওয়ার কথা ছিল, পরিকল্পনা ছিল; কিন্তু এর মধ্যে আবহাওয়া বদলে গেছে, পরিস্থিতি বদলে গেছে। নতুন অবস্থাতে আর্ট খুঁজে নেবার উপায় কী? উপায় নতুন ভাবে চিন্তা করে ঠিক করতে হবে। ভেবেছিলাম ওয়াইড এঙ্গেল লেন্স দিয়ে সামনের বিস্তীর্ণ সমুদ্রকে ধরবো, কিন্তু সমুদ্রের দিকটি কুয়াশাচ্ছন্ন হওয়াতে এখন বরং টেলিফটো লেন্স দিয়ে এদিকের দূরের গাছগুলোর মাথায় খুঁজে দেখি সেখানে কিছু ধরা পড়ে কিনা– কোন চমকপ্রদ পাখি, পাখির বাসা, কিংবা অ্যাবস্ট্রাক্ট কোন গড়ন! অথবা নিজেকেই পুরো ঘুরিয়ে ফেলিনা কেন? ভেবেছিলাম সামনের সমুদ্রের কথা, এখন ঘুরে পেছনের পাহাড়গুলোতে মন দিইনা কেন, পাহাড় আর মেঘের খেলার মধ্যে। পাহাড় যে এখানে আছে আগেই জানা ছিল। কিন্তু কখনো তার কথা ভাবিনি। এই ভাবাটি দরকার। ভাল নীতি হলো যখনই অল্পক্ষণের জন্য হলেও কোন নতুন দৃশ্য-সম্ভাবনাময় জায়গার সঙ্গে পরিচিত হবেন ফটোগ্রাফার, তখনই তিনি একটু অনুসন্ধান করে নেবেন কী কী দৃশ্যের সুযোগ সেখানে আছে। আর সেটি যদি করা যায় সুনির্দিষ্ট কম্পোজিশনের ভঙ্গিতে তাহলে সব চেয়ে ভাল।

কম্পোজিশন। ফটোর চার কিনারার ভেতরে দর্শক কী দেখছেন, এবং সেই দেখার মাধ্যমে ফটোগ্রাফার তাঁকে কী বার্তা দিতে চাচ্ছেন, কী অনুভূতি তাঁর মধ্যে জাগাতে পারছেন সেটিই ফটোর কম্পোজিশন। ফটোর ভেতর যত রকম উপাদান আছে তার সবগুলোর সমন্বয় ও বিন্যাস এই কম্পোজিশন। ওই উপাদানগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কগুলো এবং তাদের ঐকতানটি কম্পোজিশন থেকেই স্পষ্ট করতে হয়। যখন শৈল্পিক একটি সৃজন ওই কম্পোজিশনের মধ্যে থাকে তখনই একটি ফটো একটি আর্ট-ফটো হয়ে ওঠে। যাঁরা ওটি দেখবেন তাঁদের চিন্তা ধাক্কা খাবে, হয়তো নতুন কিছু করতে চাইবেন, নতুন করে ভাববেন, হয়তো একটি আন্দোলনে নিজেকে শরিক

করার প্রেরণা পাবেন, অথবা হয়তো মনটি আনন্দে ভরে যাবে। এর জন্য কি অপূর্ব সব সম্ভাবনাময় দৃশ্য খুঁজে পেতেই হবে? না, ভাল শিল্পী এমনকি সাধারণ একটি পারিবারিক গ্রুপ ফটোর মধ্যেও শিল্প সৃষ্টি করতে পারেন। সেটি কী ভাবে সম্ভব? এখানে তো পরিবারের সদস্যরা সুনির্দিষ্ট, তাহলে তাঁর কী করার আছে? বড়জোর তিনি হয়তো বয়স অনুযায়ী তাঁদের সাজাবেন, বা উচ্চতা অনুযায়ী; বামে-ডানে প্রতিসম করেও সাজাতে পারেন। না, তিনি এর কোনটি করবেননা। শিল্পীর সঙ্গে ওদের যদি অন্তরঙ্গ জানাশোনা থাকে তাহলে তিনি হয়তো এক এক জনকে এমন একটি পজিশনে বা ভঙ্গিতে রাখবেন যে তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বটিই অনেকখানি ফুটে ওটে, দর্শককে সেটি আনন্দ ও চিন্তার খোরাক দেয়। এমন সীমিত চৌহদ্দির মধ্যেও যে ব্যক্তিত্ব ফোটানো যায় সেটিই শিল্পীর বাহাদুরি।

আবার এই শিল্পীই যদি ব্যস্ত নগরীর রাস্তার মানুষদের ছবি তুলতে চান যাদেরকে জানাশুনার কোন সুযোগই তাঁর নেই বা ছিলনা, তখন তিনি হয়তো একটু বেশি মনোযোগ দেবেন তাঁর কম্পোজিশনের অপ্রধান উপাদানগুলোতে– তাতে অন্তত বৈচিত্রের অভাব নেই– স্থাপত্যের নানা আকৃতি, দোকান, ফুটপাত, ওভারব্রিজ কী নয়। ওর মধ্যে তিনি চট করে ঠিক করবেন কম্পোজিশনে তাঁর আসল লক্ষ্যের মধ্য থেকে, অর্থাৎ রাস্তার মানুষ থেকে, কাকে কাকে জায়গা দেবেন কাকে দেখাবেন, কেন দেখাবেন সেটি চট্ করে ঠিক করবেন, অপ্রধান উপাদানের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক কী তাও। বড় প্রশ্নটি হবে দর্শকের মনে তিনি কোন্ আবেগটি সৃষ্টি করতে চান- সেটি কি সুখানুভূতি, সেটি কি দুঃখ, সেটি কি সহমর্মিতা, সেটি কি আশা?

যেমন রাস্তায় একটি বাতি তার কাছের বাড়িটির বাইরের একটি অংশতে কেমন স্পট লাইটের মতো আলোকিত করছে তাকে কম্পোজিশনে রেখেও তিনি ফটোর বার্তাটি অনেকখানি বদলে দিতে পারেন। হয়তো আগে পুরো রাস্তায় বাতির সারিটি তিনি তুলতে চেয়েছিলেন, এখন সেই বার্তা বদলে গেলো। চিত্রশিল্পী যেমন কোন কিছু আপনা আপনি হয়ে যাবে কাকতালীয় ভাবে– তাঁর ছবিতে এমনটি কল্পনা করতে পারেন না, আর্ট-ফটোগ্রাফারও তা কল্পনা করা উচিত নয়। একটি সুন্দর কম্পোজিশন হঠাৎ ঘটনাচক্রে হয়ে গেছে আর তা শিল্প হবে, এমন সম্ভাবনা খুব কম। কম্পোজিশন শুধু শিল্পীর

সিদ্ধান্তেই হতে পারে, তাঁর অজান্তে নয়। ঠিক যেটি বলতে চাই সেই গল্পটুকুই যেন কম্পোজিশনে থাকবে, কোন বাহুল্য নয়, কোন অনাবশ্যক জিনিস এসে গল্পটিকে জটিল যেন না করে– ইলেকট্রিকের তার নয়, রাস্তার গাড়িও নয়।

কম্পোজিশনে যা দেখাতে চাই তাকে বলতে পারি পজিটিভ স্পেস। আর কম্পোজিশনে এমন কিছু জায়গা যাতে মনোযোগ দিয়ে দেখার কিছু নেই, বা দেখুক এটি চাইনা, তা নেগেটিভ স্পেস। এই দুইয়ের সুন্দর সমন্বয় করতে পারলে কম্পোজিশন ভাল হয়। সামনে একটি টিলার মত উঁচু জায়গায় একটি পাহাড়ি ভেড়া ঘাস খাচ্ছে। ওটিই আমার লক্ষ্যবস্তু ওটিই পজিটিভ স্পেস। ফটোতে এর ওপর বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারও পেছনে দূরের উঁচু আবছা পর্বতের বরফ ঢাকা শৃঙ্গ। ওগুলো নেগেটিভ স্পেস। ওই সুন্দর পর্বত-দৃশ্য বেচারা একা ভেড়ার থেকে মনোযোগ অনেকখানি কেড়ে নিতে পারতো নেগেটিভ স্পেসের বাড়াবাড়ি করে। তা যেন না হয় সে জন্য ফটোগ্রাফার পর্বতের ওপরেও অনেকখানি জায়গা ফাঁকা রেখেছেন– ওটি বিরান শূন্য। ফলে দর্শকের দৃষ্টির মনোযোগ এখন ভেড়াতেই নেমে আসে। কিন্তু তাই বলে পর্বত উবে যায়না ওটি বরং ভেড়ার পজিটিভ স্পেসকে বাড়তি দ্যোতনা দেয়। সব কিছু মিলে ওই বিশাল পরিবেশে, এক রকম বিস্তীর্ণ শূন্যের মধ্যে ভেড়ার একাকীত্বটাই বার্তা হয়ে আসে।

বিজ্ঞানের পেছনে যখন আর্টের প্রেরণা

বিপ্লবী বিজ্ঞানের পেছনে বিপ্লবী আর্ট

রিলেটিভিটি থিওরি এবং কয়েকটি উপন্যাস:

আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব (থিওরি অফ রিলেটিভিটি) বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পদার্থবিদ্যায় দারুণ বিপ্লবের ঝড় তুলেছিলো। তিন শত বছরের মসৃণ কাণ্ডজ্ঞানের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ নিউটনীয় পদার্থবিদ্যার পর হঠাৎ এসেছিলো এই ঝড়। সেই থেকে আমরা জানি স্থান আর কাল পরম অমোঘ কিছু নয়, সেগুলো গতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, সেই থেকে ভেঙ্গে গেছে এই জগত, বস্তু, শক্তি সব কিছু সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত অনেক বিশ্বাস। রিলেটিভিটি একেবারেই আলাদা মনে করা কিছু কিছু জিনিসকে একাকার করে দিয়েছে, একই জিনিসে পরিণত করেছে– যেমন বস্তু আর শক্তিকে, স্থান আর কালকে, মহাকর্ষ ও ত্বরণকে। ওই যে স্থান আর কাল গতির আপেক্ষিক বলে প্রমাণিত হলো তাতে ধরা পড়লো অদ্ভুত সব ঘটনা– গতি বাড়লে কোন জিনিসের দৈর্ঘ কমে, তার সঙ্গে থাকা ঘড়ি স্লো হয়ে যায় অর্থাৎ কালের চলা ধীর হয়, জিনিসটির ভর বৃদ্ধি পায়। এসব ধরা পড়ার জন্য অবশ্য গতিটি আলোর গতির পর্যায়ের দ্রুত হতে হবে; কিন্তু সেটি বাইরের প্রকৃতিতে এবং আজকাল আমাদের জীবনেও অহরহ ঘটছে, যেমন জিপিএস যন্ত্রে আমাদের অবস্থান নির্ণয়ের সময়। মোট কথা আপেক্ষিক তত্ত্ব আমাদের চেনা জগতকে পুরো মহাবিশ্বকে সম্পূর্ণ নতুন চোখে দেখতে বাধ্য করেছে।

এই তত্ত্বের প্রায় পুরো কৃতিত্ব আইনস্টাইনের, তাঁর একেবারেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে গতির সঙ্গে বিশ্ব চরাচরকে সম্পর্কিত করার সক্ষমতা থেকেই এর জন্ম; যার জন্য প্রয়োজন হয়েছে বিপ্লবীর উপযুক্ত সাহস। তবে এর পেছনে সে সময়ের বিজ্ঞানের নানা চিন্তার প্রণোদনা ছিল। তাঁর পূর্বসূরী ও সমসাময়িক বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ তাঁর আগে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক কিছু প্রধান ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন- যেমন স্থান ও কালের পরম প্রকৃতি, উৎসের গতির সঙ্গে আলোর গতি পরিবর্তিত না হওয়া ইত্যাদি নিয়ে। তাই তিনি তাঁর থিওরিতে স্থান ও কালের পরম প্রকৃতিকে বিসর্জন দিয়ে এবং আলোর গতি

সব পরিস্থিতিতে ধ্রুব একই থাকবে এমন ধরে নিয়েই এগিয়েছিলেন- উভয় ক্ষেত্রে দারুণ বৈজ্ঞানিক সাহসের পরিচয় দিয়ে। অন্য বিজ্ঞানীদের থেকে প্রেরণা তিনি অবশ্যই পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আর্টের চর্চাকারীদের থেকে কোন প্রেরণা কি পেয়েছিলেন? মনে রাখতে হবে তিনি ছিলেন একজন খুবই আর্ট-সংবেদনশীল মানুষ, নিজে সারা জীবন সঙ্গীত চর্চা করেছেন।

আমরা এর আগে আর্টকে অনেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানময় হিসেবে দেখেছি, বিশেষ করে আধুনিক আর্ট তো পদে পদে বিজ্ঞানের সাহায্য নিচ্ছে, এমনটি দেখেছি। এর উল্টোটাও কি সত্য? আধুনিক বিজ্ঞান কি পদে পদে আর্টের সাহায্য নিচ্ছে? না এমন কথা বলা যাবেনা। কিন্তু এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে কিছুটা সূক্ষ্ম ভাবে দেখলে বিজ্ঞানীর মনন, চিন্তন ইত্যাদির পেছনে তাঁর নিজের কাছে বা তাঁর সময়কার প্রিয় আর্টের একটি হাত দেখা যায়। হাজার হলেও বিজ্ঞানের স্ফূরণ ও ঝোঁকগুলো তো মানুষ বিজ্ঞানীর কারণেই গড়ে ওঠে, এবং সেই মানুষগুলো প্রায়ই খুব সংবেদনশীল প্রকৃতির হয়ে থাকেন। আর্টের যে হাতটি তাঁদের মনের ওপর কাজ করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেটি বাইরের বড় আর্ট-আন্দোলন বা জনপ্রিয় আর্ট চাহিদার দ্বারা স্পষ্টত অনুপ্রাণিত হয়ে বেশ চোখে পড়ে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এর প্রভাবটি ঘটে সাধারণ মানুষের, এমনকি অন্য বিজ্ঞানীদেরও অগোচরে অনেকটা পরোক্ষ ভাবে। সেক্ষেত্রে এটি আমাদের গোচরে আসে আর্ট ও সায়েন্স উভয় দিক থেকে অনুপ্রেরণার বিষয়টিতে গবেষণা করতে পারেন এমন গবেষকদের সৌজন্যে। এটি বিরল ঘটনা।

এখন আমরা জানতে পারছি আইনস্টাইন কোন কোন সাহিত্যিকের লেখার দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর এমনি প্রিয় দু'জন জার্মান সাহিত্যিক ছিলেন ফেলিক্স এবার্টি (১৮১২-১৮৮৪) এবং আরন বার্নস্টাইন (১৮১২-১৮৮৪)- উভয়ে হুবহু একই কালে পরস্পর সমসাময়িক, আইনস্টাইনের আগের প্রজন্মে। আইন্টাইন প্রায়ই এই দুই সাহিত্যিকের লেখার অবতারণা করেছেন তাঁর বিজ্ঞান আলাপচারিতায়ও। যেমন এবার্টির ১৮৮৬ সালের উপন্যাস 'তারকা এবং পৃথিবীর ইতিহাস' এর মধ্যে এই সাহিত্যিক আলোর গতির থেকে বেশি গতিতে চল্‌তে পারা মানুষের অবতারণা করেছেন এবং এমন পরিস্থিতির নানা চমৎকারিত্বের দিক তুলে

ধরেছেন। এবার্টির উপন্যাসের নায়ক তাই দূরের তারায় গিয়ে পৃথিবীকে দেখার সুযোগ পান এবং পৃথিবীর পুরানো ইতিহাসগুলো নিজের চোখে দেখতে থাকেন– যেমন নবী ইব্রাহীমের আমলের ঘটনাগুলো। বার্নস্টাইনও তাঁর কোন কোন লেখায় এই ধরনের কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন, যা পরবর্তীকালে রিলেটিভিটি তত্ত্ব সৃষ্ট আপাত প্যারাডক্সগুলোর সঙ্গে মিলে। যেমন বার্নস্টাইন এক উপন্যাসে অদ্ভুত একটি ডাক-ব্যবস্থার কথা কল্পনা করেছেন যার চিঠিপত্র পৌঁছানোর কাজে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের কোন বাছ-বিচার করা হয় না। কাজেই প্রয়োজনে পোস্টম্যান সেখানে আলোর থেকে বেশি গতিতে গিয়ে অতীতের কোন প্রাপককে আজকে তাঁকে লেখা চিঠিটি পৌছিয়ে দিয়ে আসতে পারেন। এই গল্পগুলো তরুণ পাঠক আইনস্টানকে ভাবিয়েছিলো বৈ কি।

বার্নস্টাইনের বিজ্ঞানধর্মী গল্পগুলো আইনস্টাইন ছোটবেলা থেকে গ্রোগ্রাসে গিলেছেন, স্পষ্টত এসব তাঁর চিন্তায় প্রভাব রেখেছে। যেমন বার্নস্টাইন তাঁর গল্পে প্রায়ই কিছু কল্পনায় করা এক্সপেরিমেন্টের কথা বলেছেন। ‘থট্ এক্টপেরিমেন্ট’ নামে পরিচিত এমন এক্সপেরিমেন্ট সত্যি সত্যি করা হয়না, বা করার উপযুক্ত নাও হতে পারে; কিন্তু মাথার মধ্যেই এর প্রত্যেকটি ধাপ একের পর এক খেলিয়ে গিয়ে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যুক্তিসঙ্গত ভাবে– ওটিই থট্ এক্সপেরিমেন্ট। যেমন এমনি একটি থট্ এক্সপেরিমেন্টে বার্নস্টাইন মনে মনে একটি চলন্ত ট্রেনের মধ্যে এক্সপেরিমেন্ট করছেন, যাতে ধরে নেয়া হয়েছে আলোর গতি সব সময় সমান, এটি একটি ধ্রুবক; ফলে অদ্ভুত সব ঘটনা ওই এক্সপেরিমেন্টে ঘটতে থাকে। আরেকটি গল্পে বার্নস্টাইন ‘মহাকর্ষ তরঙ্গের’ অবতারণা করেছেন– একটি ভর যখন অন্যটিকে মহাকর্ষে টানে সেই টানের শক্তিকে তিনি তরঙ্গের রূপ দিয়েছেন।

এর সবই কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বে এবং তা বুঝিয়ে বলার ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে এসেছে। আইনস্টাইন নিজে এক্সপেরিমেন্ট করে করে বিজ্ঞান চর্চা করেননি, যদিও অন্য এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল ব্যবহার করেছেন। তিনি নিজের আবিষ্কারগুলো করেছেন গাণিতিক যুক্তির মাধ্যমে। সেই গণিতের ওপর তাঁর অপরিসীম আস্থা ছিলো, এক্সপেরিমেন্ট করার আগেই তিনি আস্থার সঙ্গে বলতে পেরেছিলেন যে যখন করা হবে তখন এক্সপেরিমেন্ট তাঁর তত্ত্ব

প্রমাণিত হবেই। তিনি নিজে করেছেন থট্ এক্সপেরিমেন্ট– নানা ক্ষেত্রে প্রচুর থট্ এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। বিশেষ করে রিলেটিভিটি থিওরিকে যখন সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন তখন থট্ এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে বুঝিয়েছেন অনেকটা পরিচিত ঘটনার উপমা দিয়ে। সেক্ষেত্রে চলন্ত ট্রেনের ভেতরের এক্সপেরিমেন্ট বার বার এসেছে– বার্নস্টাইনের সেই ট্রেনের এক্সপেরিমেন্টের মত। আইনস্টাইনের সব তত্ত্ব গণিতে প্রমাণিত হয়ে বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই প্রথম থেকেই; কিন্তু বাস্তব এক্সপেরিমেন্টেও এগুলো একের পর এক প্রমাণিত হয়েছে যদিও এক্সপেরিমেন্টগুলো অত্যন্ত জটিল ছিল, মোটেই ট্রেনের উদাহরণের থট্ এক্সপেরিমেন্টের মত সহজ নয়। ট্রেনের যে অল্প গতি তাতে আপেক্ষিক তত্ত্বের কিছুই বাস্তবে পরিমাপযোগ্য নয়। এর কোন কোনটি আবিষ্কারের কয়েক বছরের মধ্যেই অন্য জটিল এক্সপেরিমেন্টে বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর একটি ভবিষ্যদ্বাণী একেবারে হাতে নাতে প্রমাণিত হতে আবিষ্কারের পর দীর্ঘ ১০০ বছর সময় লেগেছে; মাত্র সেদিন ২০১৬ সালে লিগো নামের এক্সপেরিমেন্টে তাঁর মহাকর্ষ তরঙ্গ আবিষ্কার হয়েছে। অথচ আইনস্টাইনের বিজ্ঞান চর্চার আগেই বার্নস্টাইন তাঁর উপন্যাসে তেমনি মহাকর্ষ তরঙ্গের কল্পনা করেছিলেন।

আইনস্টাইনকে মুগ্ধ ও প্রভাবিত করার আরো মন্ত্র বার্নস্টাইনের লেখায় ছিলো। এই ঔপনাসিক যুক্তি ও গণিতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এমন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে বিশেষ মর্যাদার আসন দিতেন। যেমন তাঁর কালের একটি বড় ঘটনা ছিল নেপচুন গ্রহের আবিষ্কার। ইউরেনাস গ্রহটির কক্ষপথের কিছু অনিয়ম লক্ষ্য করে নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব থেকে হিসেব করে অজানা কোন গ্রহের আকর্ষণে এটি হচ্ছে বলে গাণিতিক ভাবে নিশ্চিত হওয়া গিয়েছিলো, এবং তারপর টেলিস্কোপ দিয়ে আকাশের সে জায়গায় অনুসন্ধান করে নেপচুন আবিষ্কৃত হয়েছিলো। বার্নস্টাইন এই ঘটনাকে উচ্ছসিত প্রশংসা করে লিখেছিলেন 'বিজ্ঞানকে বাহবা দিই! বিজ্ঞানের চর্চা যাঁরা করেন সেই বিজ্ঞানীদেরকেও বাহবা! আর বাহবা দিই সেই মানব-মনকে যে মানব-চক্ষু থেকে অনেক স্পষ্ট ভাবে সব কিছু দেখতে পায়।' আইনস্টাইন সে রকমই একটি মানব-মনের অধিকারী হবার চেষ্টা করেছেন যেটি মানব-চক্ষু থেকে অনেক বেশি কিছু দেখবে– হয়তো বার্নস্টাইনের লেখা পড়ে উৎসাহিত হয়ে।

কোয়ান্টাম থিওরিতে কিউবিস্ট আর্ট:

বিংশ শতাব্দীর শুরুর কয়েক দশকে আরেকটি বৈপ্লবিক তত্ত্ব কোয়ান্টাম থিওরি যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন ডেনমার্কের বিজ্ঞানী নীল বোর। কোয়ান্টাম থিওরি যখন নানা বিজ্ঞানীর হাতে ধাপে ধাপে গড়ে উঠ্‌ছিলো তাতে আইনস্টাইন বাস্তব পরীক্ষার ফলকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে আলোর যে তরঙ্গ-ধর্ম আমরা শত শত বছর ধরে জানি এবং যা সুপ্রমাণিত সেটিই এর একমাত্র রূপ নয়, একই সঙ্গে আলোর কণিকা-ধর্মও আছে। অর্থাৎ আলো একই সঙ্গে তরঙ্গ ও কণিকা, যে কণিকার নাম পরে হয়েছে ফোটন। অথচ আলো যে তরঙ্গ এটি বাস্তবে প্রমাণিত এবং আলো যে কণিকা এটিও বাস্তবে প্রমাণিত, উপায় কী? তরঙ্গ বলেই দুটি সরু ফাটলের মধ্য দিয়ে গেলে এটি আলো-ছায়ার ঝালর সৃষ্টি করে। আবার কণিকা বলেই এটি যে অন্য কণিকাকে গিয়ে ধাক্কা দেয়, এক মার্বেল যেভাবে আরেক মার্বেলকে ধাক্কা দেয়, তার মোমেন্টাম মাপা যায়। আইনস্টাইন যে দেখিয়েছেন আলো তরঙ্গ হয়েও কণিকা তার উল্টো ব্যাপারটিও তাত্ত্বিক ও বাস্তব পরীক্ষায় প্রমাণিত হতে দেরি হলোনা। দেখা গেলো ইলেকট্রনের মতো জিনিস যা কণিকা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত তা তরঙ্গও বটে, একই সঙ্গে। অর্থাৎ যে কোন বস্তু-কণিকাও তরঙ্গ! এই সব দ্বৈততা খুবই বিস্ময় আর বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিলো সে সময়।

এই বিভ্রান্তিতে এক রকম শৃঙ্খলা এনেছিলেন নীল বোর। তিনি বল্‌লেন ব্যাপারটিকে পারস্পরিকতার (কম্‌প্লিটমেন্টারিটি) দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যেতে পারে। তরঙ্গ হওয়া বা কণিকা হওয়া একে অপরের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে একটি দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপার মাত্র, আর কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রকৃতিটিই এমন যে তাতে কোন কিছুকে এক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার কোন উপায় নেই। কারণ হিসেবে তিনি দেখলেন এই তত্ত্বে যা যা ঘটে তা গাণিতিক ভাবে থাকে, আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবার কথা নয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এক্সপেরিমেন্ট করে তার ফলাফলকে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করতে হয়। যে মুহুর্ত সেটি করি তখন ফলাফলটি দেখার উপযুক্ত হয়, সবকিছু বাস্তবে চলে আসে। কোয়ান্টাম তত্ত্ব তখন আর বজায় থাকেনা। কোয়ান্টাম তত্ত্ব বজায় থাকার সময় তরঙ্গ ও কণিকা উভয় রূপে মেশানো অবস্থায় থাকলেও বাস্তব এক্সপেরিমেন্টে যখন ফলাফল দৃশ্যমান হয় তখন একে হয় তরঙ্গ রূপে দেখি, নয় কণিকা রূপে

দেখি– উভয় রূপে নয়। কোয়ান্টাম তত্ত্বের আরো নানা বিষয়ের মধ্যে তিনি এই পারস্পরিকতা আছে বলে মনে করতেন। তাঁর এই চিন্তা কোয়ান্টাম তত্ত্বে একটি মূল ধারণা হিসেবে কাজ করেছে।

বোর যে সময় তাঁর পারস্পরিকতার ধারণাটি বিকশিত করার চেষ্টা করছেন ঠিক সে সময় বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও একটি বৈপ্লবিক ভাবে আধুনিক ধারা তুঙ্গে উঠেছিলো কিউবিজম নামে। এর কয়েকজন প্রবক্তা শুধু এই ধারার ছবি আঁকেননি বরং এর পেছনে যে অনন্য শিল্পের তত্ত্ব ছিলো তাও লিখে তুলে ধরছিলেন। কিউবিস্ট শিল্পীদের মধ্যে পাবলো পিকসো, জর্জ ব্র্যাক, জ্যঁ মেটজিঙ্গার, আলবার্ট গ্লাইজেস, রবার্ট ডেলাউনে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এদের মধ্যে বিশেষ করে মেটজিঙ্গার এবং গ্লাইজেস ওই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে বেশ তৎপর হোন, তাঁরা 'কিউবিজম' নামে একটি বইও লেখেন। নীল বোরের আর্ট অনুরক্ত হবার এবং বিশেষ করে কিউবিজমের অনুরক্ত হবার কথা সাম্প্রতিক একটি গবেষণা উদ্ঘাটন করেছে। ডেনমার্কে নীল বোরের কর্মস্থলে মেটজিঙ্গারের আঁকা মূল্যবান একটি ছবি টাঙ্গানো ছিল, যে ছবির নাম 'ঘোড়া নিয়ে নারী'। বোর যে কিউবিজমের অনুরক্ত ছিলেন তা তাঁর বিজ্ঞানের সঙ্গে একেবারে অসম্পর্কিত ছিলনা। কিউবিজমের একটি বড় বৈশিষ্ট হলো ছবিকে একটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শুধু দেখছি একথাটি দর্শকের মনে হবেনা, মনে হবে একই সঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি, সামনের দিকে থেকে মডেলের চোখ মুখ যখন দেখছি তখন পাশ থেকে কানও দেখছি, এমনি বিভিন্ন দিক থেকে। সামনের তল, পাশের তল, উপরের তল সব যেন দর্শক ঘুরে ঘুরে দেখছেন, অথচ একই অপলক দৃষ্টি থেকে না সরে। অনেক ক্ষেত্রে আবার ভেতর বাহির উভয়েই যেন এক সঙ্গে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ যেন একাকার হয়ে যায়।

বিজ্ঞানে পারস্পরিকতার ব্যতিক্রমী ধারণার সঙ্গে একভাবে কিউবিজমের একটি সুদূর সাদৃশ্য রয়েছে বৈকি। যে কোন আর্টের কাজ হলো এর দ্বারা মুগ্ধ মানুষকে নতুন ভাবে চিন্তা করানো। সেদিক থেকে বোরের কিউবিজম প্রীতির একটি ছাপ তাঁর বিজ্ঞান কর্মের ওপর পড়তেই পারে।

একজনের উপন্যাসে ইশারা নানা বিপ্লবী বিজ্ঞানের:

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শুরুটা পরমাণু বিজ্ঞানের একটি দারুণ সমৃদ্ধির সময়– বলা যায় একেবারে সাম্প্রতিক এই বিজ্ঞানটি তখন বিমানের মত টেইক্ অফ করলো। তার কিছু আগে থেকে রকেট বিজ্ঞানটিও যেন টেইক অফ্ করছিলো। পরমাণু বিজ্ঞানে তখন পরমাণুর মাঝখানে যে নিউক্লিয়াস তার বিক্রিয়াগুলো আবিষ্কার হচ্ছিলো তার মধ্যে নানা কণিকা ছুঁড়ে দিয়ে। ১৯৩৪ সালে প্রথমে শক্তিশালী কণিকা ত্বরক যন্ত্রে পজিটিভ প্রোটন কণিকাকে অনেক উচ্চ বেগে নিয়ে গিয়ে সেটি ছুঁড়ে দেয়া হলো– নিউক্লিয়াস নিজে পজিটিভ হওয়াতে ওরকম উচ্চ শক্তি না করে প্রোটনকে ওর মধ্যে পৌঁছানো যেতোনা। এতে নিউক্লিয়াস বদলে গেলো, বাড়তি কিছু শক্তি সৃষ্টি হলো। কিন্তু ইতোমধ্যে নিউক্লিয়াসে পজিটিভ প্রোটনের সঙ্গে চার্জ-নিরপেক্ষ কণিকা নিউট্রন আবিষ্কার হওয়াতে ১৯৩৮ সনে ধীর গতির নিউট্রন নিউক্লিয়াসের মধ্যে ছুঁড়ে দেয়া হলো– এবার বিক্রিয়ায় কিন্তু নিউক্লিয়াসটি দুই ভাগে ভেঙ্গেই গেলো, যাকে বলা হলো নিউক্লিয়ার ফিশন, তাতে বেরিয়ে আসে কিছু শক্তি। কিন্তু সেই সঙ্গে কিছু নিউট্রনও বের হয় যা অন্য নিউক্লিয়াসকেও আঘাত করে সেখানেও ফিশন ঘটায়। এভাবে দ্রুত চেইন রিয়্যাকশন নামের এক থেকে বহুতে ছড়িয়ে পড়ে অকল্পনীয় শক্তির আশ্বাস এটি দিলো। এটিই পরে এটম বোমায় এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে শান্তির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে ভয়াবহ প্রাণনাশ ও ধ্বংসের সৃষ্টি করে, এবং দ্বিতীয়টি এর পর পর বাস্তবায়িত হয়েছে।

ওই চেইন রিয়্যাকশন তাত্ত্বিক ভাবে আবিষ্কারে যখন এসব সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছিলো তার বহু আগে একজন ইংরেজ বিজ্ঞান শিক্ষক ও ঔপনাসিক এইচ জি ওয়েলস তাঁর ১৯১৪ সালে প্রকশিত উপন্যাস ‘বিশ্ব যখন মুক্ত হলো’তে (দি ওয়ার্ল্ড সেট ফ্রি) এটম বোমা কথাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন, অবশ্য ভিন্ন অর্থে। ওটি সাধারণ বোমার মতই শক্তিশালী- এটমের যে ছবিটি তখন সদ্য আবিষ্কার হয়েছে তাঁর দেশের পদার্থবিদ রাদারফোর্ডের দ্বারা, তার থেকেই শক্তি নিয়ে এই বোমা। উপন্যাসের মূল কথা কিন্তু বোমা নিয়ে ছিলনা বরং তা ছিল যুদ্ধের হানাহানি চিরদিনের জন্য বন্ধের জন্য একটি বিশ্ব-সরকার গঠনের চেষ্টা। চেইন রিয়্যাকশনের মাধ্যমে ফিশন থেকে বিপুল শক্তিধর

বোমার সম্ভাবনা দেখেছিলেন এই রিয়্যাকশনটির সম্পর্কে প্রথম ধারণাকারী বিজ্ঞানী লিও জিলার্ড। জিলার্ড বলেছেন ওয়েলসের উপন্যাসটি পড়ার পর থেকেই এটম থেকে বোমার সম্ভাবনার কথাটি তাঁর মাথায় ঢুকেছিলো। ওয়েল্‌স যখন এটম বোমার কথা লিখেছেন, হিরোশিমার এটম বোমা তখন দুই দশকেরও বেশি দূরে। জিলার্ড যখন চেইন রিয়্যাকশনের কথা ভেবেছেন আসল এটম বোমা তখনো অনেক দূরে, ঘটেছে অনেক পরে, তার জন্য আরো বহুতরো আয়োজন দরকার হয়েছে। ওঁদের কেউই এমন বোমার ভয়াবহতার কথা ভাবতেই পারেননি তখন। যেই এটম-গঠনের ওপর ভিত্তি করে ওয়েলস এটম বোমার কথা লিখেছেন, সেই গঠনের আবিষ্কারক রাদারফোর্ড বরং বলেছিলেন বিক্রিয়াটি যদি আরেকটু বেশি দক্ষ হতো তা হলে এর শক্তি দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা যেতো। ঔপনাসিক বোমার আইডিয়া দিলেন, আর বিজ্ঞানী এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা ভাবলেন। অনেক আগাম ভাবনা হলেও দুটাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে।

এইচ জি ওয়েলসের আরেকটি উপন্যাস হলো ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত 'দুই দুনিয়ার যুদ্ধ' (ওয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ডস)। এর খুঁটিনাটি যদিও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার থেকে আরো অনেক বেশি দূরের ছিল তার মধ্য দিয়েও পরবর্তী দশকগুলোতে বিজ্ঞান প্রভাবিত হয়েছে, কারণ এটি ছিল অত্যন্ত নাটকীয় ও জনপ্রিয় উপন্যাস। এতে মঙ্গল গ্রহে মানুষের সঙ্গে তুলনীয় বুদ্ধিমান প্রাণীরা থাকে। ওরা পৃথিবী আক্রমণ করেছে। লন্ডনের কাছে তুমুল যুদ্ধ হয়েছে, সেখানে মানুষের কামানের বিরুদ্ধে ওরা মারণ-রশ্মি, রাসায়নিক অস্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করেছে। মঙ্গুলেরা প্রায় জিতেও গিয়েছিলো, কিন্তু মানুষের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়ে সবাই মারা পড়েছিলো। পৃথিবীর বাইরে এলিয়েনের কথা প্রথম সাহিত্যে এনে ওয়েল্‌স অনেকের মনে দাগ কেটেছিলেন– তাছাড়া আন্তগ্রহ ভ্রমণের জন্য মহাশূন্য যানের বিষয়টিও সামনে এনেছিলেন।

ওয়েলসের এই সফল উপন্যাস আরো অন্যান্য রকম সব অনবদ্য আর্ট সৃষ্টির সুযোগ করে দিয়েছে। এগুলো নিয়ে নাটক, রেডিয়ো নাটক, সিনেমা ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। সবই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। এ সিনেমা এখনো বহু মানুষ দেখে। কিন্তু কিছুটা পরোক্ষভাবে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে সেগুলো যেই

প্রেরণা রেখেছে, অসংখ্য বিজ্ঞানাৎসাহীর জন্য একাধিক দিকে যে আবহ সৃষ্টি করেছে তার মূল্য বোধ হয় আরো বেশি।

ন্যানো-টেকনোলজির শুরুতে স্থাপত্য থেকে প্রেরণা:
অতি ক্ষুদ্র আনবিক পর্যায়ের কিছু গঠনে বিশেষ ধরনের গুণ লাভ সম্ভব করে ন্যানো-টেকনোলজির সূত্রপাত হয়েছে। আজ এর ফলে অতি ক্ষুদ্র অবয়বে ইলেকট্রনিক ডিভাইস, বিশেষ মজবুত নির্মাণ, যান্ত্রিক মেশিন ইত্যাদি পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে, যা এমনকি রক্তনালির মধ্য দিয়েই চলে যেতে পারে। বিজ্ঞানে এটি একটি বৈপ্লবিক নতুন দিক। ন্যানো-টেকনোলজি এভাবে শুরু থেকে অনেক দূর এগিয়েছে। ১৯৬০ এর দশকেরও শুরুর দিকে ন্যানো-টেকনোলজির সূত্রপাত হয়েছিলো কার্বনের ৬০টি এটমের সমন্বয়ে কার্বন-৬০ নামের একটি বিশেষ অণু গঠনের মাধ্যমে। স্পেকট্রাম বিশ্লেষণ এবং আরো নানা পদ্ধতিতে কার্বন-৬০ এর সঠিক গঠনটি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ এতে কার্বনের ৬০টি এটম কী রকম ভাবে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে সামগ্রিক ভাবে এমন অণুগঠন দিয়েছে, এবং অণুগুলোর সমন্বয়ে এমন কিছু বৃহত্তর গঠন সম্ভব হয়েছে যে তাতে অভিনব কিছু যান্ত্রিক বস্তুগুণ সম্ভব হয়েছে। ফুটবলের গায়ের পাঁচ বাহু যে তালির মত টুকরা সেলাই করা অংশগুলো পরস্পর সুন্দর ফিট করে এর গোলকাকৃতি গঠন সৃষ্টি করে এটি অনেকটা সেরকমের। এখানে বহুভূজ নানা রিং পরস্পরের সঙ্গে ফিট হয়ে গিয়ে একটি খাঁচার মত গোলক সৃষ্টি করে। তার বিশেষ গুণগুলোর চাবিকাঠি এখানেই।

এই গঠনটির ধারণা আবিষ্কারকরা প্রথম পেয়েছিলেন আধুনিক একটি বিশেষ স্থাপত্য ডিজাইন থেকে, যে ডিজাইনে ভবন নির্মাণ কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে জনপ্রিয় হয়েছে। এতে ধাতব ফ্রেমের এমনি এক একটি রিং পরস্পর সবদিকে পূর্ণ প্রতিসাম্যের মধ্যে সংযুক্ত করে একটি খাঁচার মত গম্বুজ গড়ে নিয়ে তাকেই দ্রুত নির্মাণ-ক্ষম ভবনের কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। স্থাপত্য বিদ্যায় এটি জিওডেসিক গঠন হিসেবে পরিচিত। গত শতাব্দীর একজন বিখ্যাত আমেরিকান স্থপতি, ডিজাইনার এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টা দার্শনিক আর বাকমিনিস্টার ফুলার এই জিওডেসিক নির্মাণ রীতিটি উদ্ভাবন করেছিলেন। এর বৈশিষ্ট হলো আকার ও ওজনের তুলনায় এটি অনেক বেশি

চাপ সহ্য করতে পারে তা গম্বুজ বা অর্ধগোলক অবস্থায়ও, আবার পূর্ণ গোলক অবস্থায়ও। তাছাড়া এর সারল্য ও নান্দনিকতার আর্টটিও স্থপতি মহলের এবং সাধারণ মানুষের মন জয় করে।

কার্বন-৬০ কে একটি উপযুক্ত গঠন দিতে গিয়ে আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানীরা যে ধরনের উপাত্ত এই অণুটি সম্পর্কে পাচ্ছিলেন তাতে জিওডেসিকের ডিজাইনটা নানা ভাবে তাঁদের চিন্তার পশ্চাদপটে এসেছে, এবং শেষ পর্যন্ত অণুর জন্য এই গঠনটিই খুঁজে পাওয়া গেছে। স্থপতি বাকমিনিস্টার ফুলারকে সম্মান দেখাতে গিয়ে তাই অণুটির পুরো নাম দেয়া হয়েছে বাকমিনিস্টার ফুলারিন। এভাবে স্থাপত্য ডিজাইনের অনুপ্রেরণায় ভিত্তি রচিত হয়েছে ন্যানো-টেকনোলজির।

সনাতন আর্টের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রযুক্তি

ত্বকের সুরক্ষায় চীনা বস্ত্র ডিজাইন:

খালি গায়ে বাইরে রৌদ্রস্নান করতে হলে সাবধান থাকতে হয় যাতে সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ত্বকের ওপর মাত্রাতিরিক্ত না পড়ে– কারণ তা গুরুতর চর্মরোগ, এমনকি ক্যানসারও ঘটাতে পারে। তাই কতটা রশ্মি পড়লো তা মাপার ও লক্ষ্য করার একটি সহজ উপায় প্রয়োজন।

এজন্য আজকের ফ্যাশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে সরাসরি ত্বকে উল্কি (টাট্টু) এঁকে তাকে যদি আলট্রা-ভায়োলেট পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা যায় তাহলে খালি গায়ে উল্কির ফ্যাশন প্রদর্শন এবং ওই পরিমাপ উভয়ে একসঙ্গে চলতে পারবে প্রযুক্তি বা মাপজোকের কোন চিহ্ন বাইরে না দেখিয়ে। বিশেষ ভাবে তৈরি জেলরূপী পদার্থকে এমন ন্যানো-শীট বা অতি পাতলা পর্দায় রূপ দেয়া যাচ্ছে এবং তাতে রঙ-বস্তুও যোগ করা যাচ্ছে যা একাধারে উল্কির কাজ করতে পারে আবার আলট্রা-ভায়োলেট সংবেদী হয়ে এই রশ্মি পড়ার পরিমাণ অনুযায়ী রং পালটাতে পারে।

রৌদ্রস্নান করার সময় উল্কির রঙ পাল্টানোটি একাধিক কারণে দ্রুত লক্ষ্য করার দরকার হতে পারে। শীতের দেশে অনেকে এভাবে গায়ে রোদ লাগিয়ে (আলট্রা-ভায়োলেট) শরীরে ভিটামিন ডি তৈরির ব্যবস্থা করেন যা স্বাস্থ্যের জন্য খুব প্রয়োজন। আবার সেই আলট্রা-ভায়োলেট বেশি হয়ে যাওয়াও

বিপজ্জনক। রং পরিবর্তন দেখে বোঝা যায় ভিটামিন ডি তৈরির জন্য যথেষ্ট রশ্মি গায়ে লেগেছে কিনা, আবার এটি নিরাপদ মাত্রার মধ্যে আছে কিনা।

যাঁরা প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছিলেন তাঁরা চীনা ঐতিহ্যের বিজ্ঞানী। তাঁরা ভাবছিলেন ছুটিতে সাগরধারে ফুর্তি করে অনেকে এক সঙ্গে রৌদ্র স্নানের সময় গায়ের চামড়ার ওপরের রং ঘন ঘন লক্ষ্য করা ঠিক হবেনা। ওটিকে চামড়ার ডাক্তারী পরীক্ষার মত মনে হবে এবং এমন করাটি বেমানান হবে, তাতে ফুর্তির পরিবেশটাই মাটি হবে। তাই তাঁদের মনে পড়ে গেলো চীনা ট্যাং রাজবংশের অভিজাত মহিলাদের পোষাকের বর্ণাঢ্য ডিজাইনগুলোর এখনকার জনপ্রিয়তার কথা। তাঁরা এই ডিজাইনগুলো কাপড়ের পরিবর্তে গায়ের এই উল্কিতে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলেন। ডিজাইনগুলো এতো বিচিত্র ও বাহারি হয় যে সব সময় মহিলারা একে অপরের পোষাকে এগুলো দেখেন ও এ নিয়ে আলোচনা ও প্রশংসা করেন। এখন রৌদ্রস্নানে খালি গায়ে উল্কির ওপর তাঁরা পরস্পরের এই ডিজাইন দেখছেন ও প্রশংসা করছেন। সেই সঙ্গে ওই আর্ট-আবহের মধ্যেই আলট্রা-ভায়োলেট মাপার কাজটিও ও সম্পর্কে বেশি কথা না বলেই সম্পন্ন হয়ে যাচ্ছে– কারণ গায়ের উল্কির রঙের ওপর সব সময় নজর থাকছে কথাবার্তার ভেতরেই।

চীনা হস্তাক্ষর-শিল্পের ডিজাইনে সোলার সেল:

নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে সারা দুনিয়া ঝুঁকে পড়াতে সৌর শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ডিভাইস সোলার সেলের (সৌর কোষ) কদর অনেক বেড়ে গেছে। আগে দক্ষ সোলার সেল হিসেবে শুধু সিলিকন কৃষ্টালের তৈরি সেলই ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হতো; সেগুলো দৃঢ় বলে বাঁকানো যায়না, ভারী, ব্যয়সাপেক্ষ। এখন পাতলা পর্দার আকারের সোলার সেলগুলোও বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছে, সেগুলো যে কোন আকৃতির তলের ওপর প্রিন্ট করে দেয়া যায়। বিশেষ করে পলিমার-প্লাস্টিক ধরনের সাধারণ অর্গানিক বস্তু দিয়েও যখন এরকম সোলার সেল তৈরি সম্ভব হচ্ছে। নতুন যে প্রশ্নটি সামনে এসেছে তা হলো ওভাবে প্রিন্ট করে দেয়ার সব থেকে সহজ পদ্ধতি কী হতে পারে। সহজ করতে করতে এখন পেইন্টিং স্প্রে করার মত স্পিন কোটিং, মুদ্রণ যন্ত্রের মত একটি ব্লেইডের মত ধারালো পাত দিয়ে টেনে কালির শুধু পাতলা পর্দার প্রলেপ রাখার ডক্টর ব্লেডিং, কম্পিউটার প্রিন্টারে এক সময় ব্যবহার

করা ইংকজেট প্রিন্টিং যাতে নোজল থেকে কালি ছুঁড়ে দেয়া হয়, কাপড়ের ওপর ইমেজ ছাপ দেবার মত স্ক্রীন প্রিন্টিং এরকম নানা পদ্ধতিকে সোলার সেল প্রিন্ট, করার জন্য উপযুক্ত করে নেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি আরো অদ্ভুত এক পদ্ধতিকে এগুলোর থেকেও যুৎসই মনে করা হচ্ছে সেটি হলো 'মাওবি' নামের চীনা হস্তলিপি আর্টের একটি বিশেষ পদ্ধতিকে কম্পিউটারের সঙ্গে যুক্ত করে সোলার সেল প্রিন্টের উপযুক্ত করে নেয়া। চীনের প্রাচীন ঐতিহ্যের এই ক্যালিগ্রাফি বা হস্তাক্ষর শিল্প জটিল নান্দনিক আকৃতির চীনা বর্ণমালাকে খুবই চমৎকার শিল্প-রূপ দিয়ে থাকে, যার সৌকর্যের অনেকটাই নির্ভর করে তুলি চালনার ওপর। তুলি দিয়ে লিখেই এই শিল্পের চর্চা হয়। মাওবি পদ্ধতির যে তুলি চালনা তাতে হস্তাক্ষর ফুটিয়ে তোলার কিছু সুবিধা আছে বিশেষ করে তা যদি অসমতল তলের ওপর আঁকতে হয়। এই জন্য মাওবি তুলির গঠনটিই খুব সাহায্য করে, প্রাণীর খুব নরোম লোম দিয়ে তুলিটি তৈরি। এই লোমের পৃষ্ঠদেশে এমন ন্যানো-পর্যায়ের কিছু ক্ষুদ্র গঠন থাকে যাতে আঁকার সময় সূক্ষ্ম ভাবে কালি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ফলে কালির অপব্যবহার হয়না আবার যা আঁকা হচ্ছে তাও চাহিদা মত হয়।

চীনা হস্তাক্ষর শিল্পে মাওবি তুলি নিয়ন্ত্রণ করেন মাস্টার শিল্পী ও তাঁর সযত্ন নির্দেশনায় ছাত্র-শিল্পীরা। কিন্তু সোলার সেল প্রিন্ট করার কাজে এই নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেয়া হয়েছে কম্পিউটারের হাতে যা মোটরের চালনার মধ্য দিয়ে তুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সোলার সেল ডিভাইস তৈরি করতে হলে প্রয়োজনীয় বস্তুর এক একটি স্তরের ওপর ঠিক ভাবে অন্য স্তর দিতে হয় এবং সব শেষে সংলগ্ন করতে হয় ইলেকট্রোডগুলো। প্রোগ্রাম করা কম্পিউটার মাওবি তুলিকে সেভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এগুলো এঁকে দেয়। এভাবে ন্যানোমিটার থেকে মাইক্রোমিটার পর্যন্ত পুরুত্বের স্তর প্রয়োজন মত আঁকা যায়।

অন্তত প্রায় দুই হাজার বছর ধরে সমাদৃত একটি আর্ট যে আধুনিক প্রযুক্তির জন্য বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, বিজ্ঞানের খুবই সূক্ষ্ম ও জরুরি কাজের সহায়ক হবার জন্য, সেটি বেশ লক্ষ্যণীয়। এই উদাহরণ

দেখিয়ে দিচ্ছে যে আজ শুধু আর্টের আসরে বিজ্ঞানের ডাক পড়ছেনা, কখনো কখনো উল্‌টোটাও হচ্ছে– বিজ্ঞানের আসরে আর্টের ডাকও পড়ছে।

বিজ্ঞানের কিছু গভীর প্রশ্ন করছে আজকালকার সাধারণ আর্ট

প্রথম কাঠ-শিল্প মানুষ কবে কোথায় গড়েছিলো:

প্রশ্নটি ইতিহাসের হলেও প্রত্নতত্ত্বের হাত দিয়ে এটি বিজ্ঞানের কাছেই চলে গিয়েছে। এ ধরনের প্রশ্নের নিষ্পত্তি সাধারণত করতে হয় প্রত্নতত্ত্বে পাওয়া নিদর্শন থেকে। কিন্তু হাজার দশেক বছরের ওদিকে আরো প্রাচীন সময়ে গেলে সেই নিদর্শন সবই প্রায় পাথরের এবং অল্প কিছু হাড়, দাঁত, শিং এর তৈরি জিনিস। এসব ছাড়া বাদবাকি কিছু নেই বল্‌লেই চলে– কাজেই তখন সবই প্রস্তর যুগ। অন্য সব কিছু পচনশীল হওয়াতে কোন ভাবে সংরক্ষিত হয়নি। মাঝে মাঝে খুবই ব্যতিক্রমী পরিবেশে উদ্ভিজ আঁশের তৈরি কিছু দড়ি ইত্যাদি, চামড়া, বেতের তৈরি বাস্কেট এসব ছিটেফোটা সংরক্ষিত হয়ে গেছে; সেখান থেকে আমরা জানি পাথর- হাড়- শিং এর বাইরেও তাদের ব্যবহার্য বিরাট জগত ছিল। কিন্তু তাতে কাঠের তৈরি তেমন কিছু সেভাবেও পাওয়া যায়নি। অথচ হাতিয়ার আর আর্টবস্তুতে সৌকর্য আনার ক্ষেত্রে কাঠ যে খুবই উপযোগী জিনিস তা আমরা আজকের কাঠের কাজের বিচিত্র সম্ভার থেকে বুঝতে পারি– বাড়ি নির্মাণ থেকে শুরু করে আসবাব, যন্ত্র, ছোট্ট মিনি আর্ট পর্যন্ত। আর এটি শুধু আজকের নয় ওই পচে যাওয়ার ব্যাপারটি এড়িয়ে যত পুরানো দিনের নিদর্শনে যাওয়া সম্ভব ছিল পুরোটাতেই দেখেছি কাঠের কাজের পুরো মুনশিয়ানা কয়েক হাজার বছর আগেও ছিল। অথচ তার আগের কিছু নেই।

প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতুহল বিজ্ঞানীদেরকে ওই না পাওয়া নিদর্শনের দিকে খেয়াল রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। মাত্র কয়েক বছর আগে ২০১৯ সালে এ নিয়ে প্রত্নতত্ত্ববিদদের একটি আবিষ্কার সবাইকে হকচকিয়ে দিয়েছে। তানজানিয়া ও জাম্বিয়া দেশের সীমানার কাছে কালাবা জলপ্রপাতের ভাটিতে এমন কিছু অতি প্রাচীন কাঠের সন্ধান পাওয়া গেছে যা দেখলে বোঝা যায় যে এগুলোর ওপর মানুষের সুন্দর কাজের পরিচয় আছে। বয়স নির্ণয় করে বোঝা গেলো যে একাই প্রায় ৫ লক্ষ বছর পুরানো এবং তখনই এর ওপর কাজ হয়েছে। সময়টি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে ওই মানুষ আমাদের প্রজাতির মানুষ ছিলনা,

তার আগের কেউ ছিলো; আমাদের মতো হোমো সেপিয়েন্স না হয়ে খুব সম্ভব হোমো নিয়ানডার্থালিস। কিন্তু ওদেরও হাতিয়ার তৈরির হাত আমাদের থেকে মন্দ ছিলনা।

কাঠটিকে পাওয়া গেছে খাড়া উন্মুক্ত শিলার মধ্য থেকে আংশিক বের হয়ে থাকা অবস্থায়। জলপ্রপাতের আর্দ্র আবহে কিছুটা সৌভাগ্যক্রমে কাঠটি এতকাল ধরে সংরক্ষিত হয়ে রয়েছে। দেড় মিটার লম্বা একটি বীমের আকারের কাঠটি এক প্রান্ত সরু করা। সেই প্রান্ত থেকে কিছু দূরে কাঠে ছোট বর্গাকৃতির একটি গর্ত করা যার ভেতর প্রায় ঐ গর্ত সাইজের আর একটি কাঠ জোর করে ঢুকানো। এসব তো প্রাকৃতিক ভাবে এমনি এমনি হয়ে যেতে পারেনা– কোন এক প্রাচীন কাঠশিল্পীকে এর ওপর কাজ করতে হয়েছে। দেখে মনে হয় পানির ওপর দিয়ে শুষ্ক অবস্থায় নানা জিনিসকে যেন পার করা যায় সে জন্য কোন কাঠের সেতুর প্লাটফরমের অংশ ছিল। এই কাঠের কাছেই পাথরের তৈরি যে ধারালো হাতিয়ারগুলো পাওয়া গেলো তাও সাক্ষ্য দিচ্ছে ওখানে কাঠশিল্পীর কাজের।

প্রথমে ওখানেই কার্বন ডেইটিং করার ব্যবস্থা হলো যা ৩০-৪০ হাজার বছর পর্যন্ত নিদর্শনের বয়স নির্ণয় করতে পারে। দেখা গেলো এটি আরো অনেক প্রাচীন। তখন ওই কাঠ বৃটেনে আনতে হলো অতি সাবধানে। সেখানে ল্যাবোরেটরিতে লুমিনেসেন্ট টেস্ট করে বোঝা গেলো এর বয়স ৫ লক্ষ বছর। সেদিনের নিয়ানডার্থাল মানুষ যে ভাবে কাঠের সংযোগটি তৈরি করেছে, তার থেকে ও পারিপার্শ্বিকতা থেকে পুরো সেতু পরিকল্পনার যে ইশারা পাওয়া যাচ্ছে তা আজকের যে কোন কাঠশিল্পী ও প্রযুক্তিবিদের কাছে বেশ যুক্তিসঙ্গত ও দক্ষ কাজ বলেই মনে হবে। গত কয়েক হাজার বছর ধরে আজ পর্যন্ত কাঠের কাজের যে অসামান্য নমুনাগুলো আছে তাতে কাঠের মধ্যে এভাবেই কাঠের খিল ঢুকিয়ে সংযোগ স্থাপনের প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শিল্পীদের এই কৌশলটি মাথার মধ্যে ছিল বলেই ওই কলাবা জলপ্রপাতে বিজ্ঞানীরা এত প্রাচীন কাজটিকে সনাক্ত করতে পেরেছেন। কিন্তু সেটি ছিল নেহাতই প্রাথমিক সনাক্ত, তারপরেই ডুব দিতে হয়েছে বিজ্ঞানের আরো গভীরে, খাঁটি খবরটি বের করে আনার জন্য।

কচ্ছপের খোলে নিউক্লিয়ার বোমার ইতিহাসঃ

নিউক্লিয়ার ফিশন বোমা, যা এটম বোমা হিসেবেই বেশি পরিচিত হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে তার দুটি বিধ্বংসী মারণ ব্যবহারটিই সবাই জানে। কিন্তু তার আগে পরে পরীক্ষামূলক ভাবে আরো বহুবার এই বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে, এবং সেই সঙ্গে অন্য রূপ নিউক্লিয়ার ফিউশন বোমাও যা হাইড্রোজেন বোমা হিসেবেই বেশি পরিচিত। এসব এমন জায়গায় ঘটানো হয়েছে যে সঙ্গে সঙ্গে প্রাণনাশ বেশি না হলেও তেজস্ক্রিয় উপাদান ছড়িয়ে পড়ার কারণে দীর্ঘমেয়াদে মানুষের স্বাস্থ্যহানি, মৃত্যু ঘটেছে; এবং পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এই রকম ঘটনা এখনো চল্‌ছে। দেখা যাচ্ছে কচ্ছপের যে খোল আর্টবস্তু হিসেবে আর্দৃত সেটিই এসবের ইতিহাস বহন করছে।

যে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে এসব ক্ষতি হয়েছে এবং তেজস্ক্রিয় কণাগুলো প্রাণীর গায়ে জমেছে সব জায়গায় তার রেকর্ড রাখার কোন ব্যবস্থা ছিলনা। কিন্তু এই বছর (২০২৩) আগস্ট মাসে প্রকাশিত এক নিবন্ধে অদ্ভুত এক কাকতালীয় উপায় বের হয়ে এসেছে প্রকৃতিতেই এই রেকর্ড খুঁজে পাওয়ার জন্য। দেখা গেছে কচ্ছপের খোলের ওপরের দিকে স্কুট্‌স নামের যে বস্তু স্তরে স্তরে গড়ে উঠে থাকে তাতেই এই তেজস্ক্রিয় কণাগুলো জমে জমে একটি রেকর্ড আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। এই স্কুটস জিনিসটি দিয়ে প্রাণীর শিংও তৈরি হয়। খোলের কোন স্তরে জমেছে সেটি লক্ষ্য করে বলা যায় এটি কখনকার বিস্ফোরণ থেকে এসেছে। ম্যাস স্পেকট্রোসকোপির মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল উপায়ে এর যে কোন স্তরে তেজস্ক্রিয় কণা জমার পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। নানা জায়গার নানা কচ্ছপের খোলার নানা স্তরের এই রেকর্ডের পরিমাপ কালপঞ্জী অনুযায়ী নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণের একটি ইতিহাস রচনা করে ফেলতে পারছে, গাছের গুড়ির রিংগুলোর অবস্থা থেকে অতীতের পর পর নানা বছরের জলবায়ু ও পরিবেশ যেভাবে নির্ণয় করা যায় অনেকটা সেভাবে।

মজার ব্যাপার হলো কচ্ছপের খোল জিনিসটি যতটা না বিজ্ঞানীর কাজের জিনিস তার চেয়ে অনেক বেশি আর্টিস্টের কাজের জিনিস। পানির কাছিম বা স্থলের কচ্ছপ উভয়েই যে আজ বিলুপ্তির পথে বলে পরিগণিত হচ্ছে তার একটি বড় কারণ হচ্ছে এর খোলার এত রকম শিল্প-ব্যবহার। সনাতন চীনা

ওষুধে ও সেখানে সেকেলে মানুষের ভাগ্য গণনায় এর স্থান থাকাটি এর সর্বনেশে চাহিদার একটি বড় উদাহরণ। তাছাড়া অলঙ্কার, চিরুণি, নান্দনিক বাক্স ইত্যাদি তৈরির বহু আর্টে এটি অপরিহার্য। দীর্ঘকাল ধরে নানা দেশে এটি উচ্চ শিল্প কর্মের উপাদান হিসেবে জনপ্রিয়।

বর্তমান নিউক্লিয়ার বোমা রেকর্ডের কাজে কচ্ছপের গুরুত্বের আবিষ্কারটির পেছনে অবশ্য কাজ করেছে আর্টিস্টের কাছ থেকে এর প্রতি আগ্রহটি সায়েন্টিস্টদের কাছে যাওয়ার মাধ্যমে। বিজ্ঞানীর নজর পড়েছে একে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানোর উপায় হিসেবে এর দেহ, জীবনযাত্রা, বংশবৃদ্ধির ওপর পরিবেশের প্রভাবটি গবেষণা করতে গিয়ে। সেই সুবাদে নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণ স্থলের কাছাকাছি সামুদ্রিক কাছিম ও স্থল কচ্ছপের ওপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবকে দেখতে হয়েছে। তা ছাড়া সাম্প্রতিক কালে জাপানে ফুকুশিমা ভূমিকম্প ও তার ফলে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের মহা বিপর্যয়টিতেও কচ্ছপসহ স্থানীয় প্রাণীর ওপর প্রতিক্রিয়া তাঁরা পরীক্ষা করে যাচ্ছেন।

বর্তমান গবেষণাটি সম্ভব হয়েছে ১৯৪৫ সালে প্রথম পরীক্ষামূলক নিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণের পর বেশ কিছু বছর ধরে যে নিউক্লিয়ার বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে বা সে রকম তেজস্ক্রিয়তা নি:সরণ হয়েছে সেখানে কাছাকাছি থাকা কচ্ছপ স্যাম্পল হিসেবে সংগ্রহ করে। এর মধ্যে আছে ১৯৫৯ সালে দক্ষিণ পশ্চিম যুক্তরাষ্ট্রের মোহাবে মরুভূমি থেকে একটি স্থল কচ্ছপ, ১৯৭৮ সালে প্রশান্ত মহাসাগরে মার্শাল আইল্যান্ডসের থেকে সামুদ্রিক কাছিম, ১৯৮৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ক্যারোলিনা থেকে নদীর কাছিম, ১৯৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসির ওকরিজ রিজারভেশন থেকে স্থল কচ্ছপ। এগুলোর সবই কোন না কোন ভাবে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার তেজস্ক্রিয়তায় উন্মুক্ত থাকার কথা। এগুলো ছাড়াও তুলনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে আরিজোনার মরুভূমি থেকে ১৯৯৯ সালে সংগ্রহ করা হয়েছে একটি স্থল কচ্ছপের খোল। সব মিলিয়ে এগিয়ে গেছে এদের খোলের নানা স্তরের বিশ্লেষণে নিউক্লিয়ার দূষণের ইতিহাস।

চাঁদে বসবাসের রসদঃ

সামনে মানুষ যখন আবার চাঁদে যাবে, তখন তার ওখানে কিছুদিন থাকার পরিকল্পনা আছে। কারণ এর পর মঙ্গল গ্রহে বা আরো অন্যত্র যেতে চাঁদকে যাত্রা শুরুর স্টেশন হিসেবে ব্যবহারের ইচ্ছে রয়েছে, কারণ তাতে কাজটি অনেক সহজ হবে। কিন্তু এই সব কিছুর আগে চাঁদে দীর্ঘস্থায়ী ভাবে থাকার জন্য সেখানকার জীবনযাত্রার জন্য নানা রসদের প্রয়োজন হচ্ছে এবং চল্‌ছে তার পরিকল্পনা। পৃথিবীতেও দুর্গম অন্য রকম কোন জায়গায় দীর্ঘ সময়ের জন্য যেতে হলে সেই জীবনে শারীরিক মানসিক অনেক ভালমন্দ ভেবে ঠিক করতে হয় কী কী লাগতে পারে, কোথায় পাব। এই পরিকল্পনা একটি আর্ট– যা এখন চাঁদের জন্য করতে হচ্ছে বিজ্ঞানময় ভাবে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে এ রসদ চাঁদে তৈরি করে নেয়াই হবে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ, পৃথিবী থেকে বার বার আসা যাওয়া করে সরবরাহের চেষ্টা না করে। দীর্ঘ মেয়াদে এভাবে পৃথিবী থেকে এত দূরে বার বার সরবরাহ প্রায় অসম্ভব হবে। চাঁদেই সবকিছু তৈরি করার ভাল উপায় হবে থ্রি-ডি প্রিন্টারের দ্বারা ওগুলো সেখানে প্রিন্ট করে নেয়া। আমরা এরকম প্রিন্টার দিয়ে যন্ত্রাংশ, আসবাব যাই তৈরি করিনা কেন তার জন্য কোন প্লাস্টিক ধরনের কাঁচামাল ব্যবহার করি যা নরম থাকা অবস্থায় জিনিসটি গড়ে, তারপর শক্ত হয়ে যায়। একই রকম বিকল্প কাঁচামাল চাঁদেই পাওয়া যাবে মনে করা হচ্ছে। এ নিয়ে গবেষণার ওপর ভিত্তি করে একটি পরিকল্পনা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

চাঁদে আপাতত বাসস্থান আর জীবনযাত্রার নানা কিছু প্রয়োজন হবে– তৈজস, আসবাব, খাবার সবই। এসবের কাঁচামালের মধ্যে চাঁদের যে জিনিসটির দিকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি তা হলো ওখানে থাকা টিটানিয়াম। পৃথিবীতে ফোমের বিছানা ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহৃত জিনিসের মত টিটানিয়াম অক্সাইডের ফোম চাঁদে থ্রি-ডি প্রিন্টারে নানা জিনিস তৈরিতে প্রধান কাঁচামাল হতে পারবে। চাঁদে একটি বড় প্রয়োজন হবে নিজেদেরকে সূর্যের আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি থেকে বাঁচানো– বায়ুমণ্ডলের আচ্ছাদন না থাকায় এটি সরাসরি গায়ে এসে পড়তে পারে। টিটানিয়ামের একে বাধা দেয়ার গুণ আছে– কাজেই সেটি দিয়ে থ্রি-ডি প্রিন্টারে পোষাক, বাড়ি, আশ্রয় ইত্যাদি তৈরি করা যাবে। টিটানিয়ামের আরেক গুণ হলো বহু রকম রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দ্রুত করে, সহজ করে। এটিও চাঁদে রসদ তৈরি করার সময় খুব

কাজ করবে। যেমন বিশুদ্ধ বাতাস ও পানির সরবরাহ পেতে, নানা ব্যবহৃত জিনিসকে রিসাইক্লিং করতে। আর ওদিকে খাবার দাবার আসবে পানিতে সার মিশিয়ে ওই মিশ্রণের ওপর কৃষিকাজ চালিয়ে। একটি বড় প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে মাধ্যাকর্ষণ কম সেখানে থ্রি-ডি প্রিন্টার কাজ করবে কিনা। তার জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে বর্তমান স্পেস ষ্টেশনে; সেখানে থাকা মহাশূন্যচারীরা এটি দিব্যি ব্যবহার করতে পেরেছেন ওজনহীন থাকা সত্ত্বেও।

কিন্তু তৈরির যন্ত্র, কাঁচামাল এসবের ব্যবস্থা হয়ে গেলেই চাঁদে জীবন যাপনের রসদ তৈরির ব্যবস্থা হয়ে যায়না। এগুলো কাজে লাগার মত, পছন্দ হবার মত ডিজাইন চাই। সেটি যতটা না বিজ্ঞানীর কাছ থেকে আসবে তার চেয়ে বেশি আসতে হবে ডিজাইনারদের কাছ থেকে, আর্টিস্টদের কাছ থেকে– বাসার ডিজাইন, পোষাকের ডিজাইন, তৈজস, আসবাব সবকিছুর ডিজাইনের জন্য তাঁদেরকে প্রয়োজন– এমনকি ব্যবহারের চিরুণিটি পর্যন্ত। চাঁদের বিশেষ অবস্থা সব কিছুর ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে; আর্টিস্টের কাজ জীবনকে ঠিক মত বোঝা, সেটি চাঁদের জীবন হলেও। ওভাবেই তাঁরা প্রত্যেকটি জিনিসকে ওখানকার জীবন-বান্ধবও করে তুলবেন। তাঁরাও পুরো পরিকল্পনার অংশ। তাঁদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ চাঁদের জীবনের অভিনবত্বটিকে ঠিক মত ধরতে পারার, এবং সেটি পৃথিবীর মানুষের কাছে এতটাই স্বচ্ছন্দ করার যাতে সেখানে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক কাজ চালাতে পারে ও উপভোগ করতে পারে।

প্রাচীন পদচিহ্নের আর্টস ও সায়েন্স

সায়েন্সটি এই প্রাচীন পদচিহ্ন খুঁজে পাওয়ার মধ্যে, অথবা আসল পদচিহ্ন দেখে প্রাচীন মানুষ সেগুলো পাথরের ওপর কী নিখুঁত ভাবে খোদাই করেছে তা খুঁজে পাওয়া, তার বয়স নির্ণয় করা ইত্যাদি। আর আর্ট হলো সেই অনেক প্রাণীর পদচিহ্ন পাথরে খোদাই করার অপূর্ব শিল্পকলা। সেটি প্রাচীন শিল্পীদের আর্ট। আর অন্য আর্ট হলো তাদেরই বংশধর আজকের আদিবাসী মানুষের পক্ষে সেই খোদাই করা পদচিহ্নের প্রাণীগুলোকে সনাক্ত করতে পারা। মনে হচ্ছে এক্ষেত্রে আর্টই সায়েন্সকে ডেকে এনেছে।

একেবারেই সম্প্রতি নামিবিয়ার মধ্য-পশ্চিম অঞ্চলে পাহাড়ী দেয়ালের শিলায় একেবারে ঘন করে থাকা একটি প্যানেলে বহু রকম প্রাণী ও মানুষের খোদাই করা পায়ের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। ৪০৭টি পদাঙ্ক এখানে খোদাই করা আছে অল্প কিছু পরিসরে। ওতে প্রাণীবৈচিত্রও প্রচুর, বেশির ভাগই বড় স্তন্যপায়ী। তবে পাখির পদচিহ্নও অন্তত ৬০টির। কোন কোন প্রাণীর একারই অনেকগুলো, আবার অন্যগুলোর মাত্র দু'একটি। এই সব কিছু নিয়ে খোদাই করা এসব পদচিহ্নের ওপর একটি গবেষণা সম্প্রতি সম্পন্ন হয়েছে।

লাল পাথরের ওপর ওই যে পদচিহ্নগুলো সেগুলো দৃশ্যত অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে খোদাই করা হয়েছে, খুব পরিচিত যে কয়েকটা প্রাণীর পদচিহ্ন সবাই চেনে গবেষকরা তার সঙ্গে তুলনা করেই তা বুঝতে পেরেছেন। এর বয়স নির্ণয় করে দেখা গেছে খোদাই করা হয়েছে ৫ হাজার বছর আগে। এই গবেষণায় মুখ্য ভূমিকা রেখেছে জার্মানীর দুটি বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁরা পাথরের খোদাই করা প্যানেলটির খুব সুস্পষ্ট ডিজিটাল ইমেজ জার্মানীতে নিয়ে সেখানে উপযুক্ত সফ্‌টওয়্যারের মাধ্যমে আসলটির মতই তিন মাত্রায় জাজ্বল্যমান করে তুলেছেন। নামিবিয়ার ওই অঞ্চলের ৫ হাজার বছর আগের প্রাণী সমূহের পায়ের ছাপ থেকে প্রাণীগুলোকে সনাক্ত করার কাজের জন্য কিন্তু ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবোরেটরি বা গবেষকদের ওপর নির্ভর করা হয়নি– বলা যায় আধুনিক বিজ্ঞানের ওপরও নির্ভর করা হয়নি। বরং ওই নামিবিয়ায় আদিবাসী লোকজ সংস্কৃতি ও প্রযুক্তির যে সংস্থা রয়েছে সেখান থেকে তিনজন আদিবাসী শিকার-সহকারী অভিজ্ঞ মানুষকে এ কাজে নিয়োজিত করা হলো জার্মানীতে ডেকে ইমেজগুলো দেখিয়ে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ওই আদিবাসীরা নামিবিয়ার ওই অঞ্চলে শিকার করেছেন, তাঁদের পূর্বপুরুষদের থেকে লোকজ সংস্কৃতির মাধ্যমে শিকার প্র্রাণীগুলোর সম্পর্কে জ্ঞান চর্চা করে গেছেন একটি আর্টের মত। তাঁরা ওই প্রাণীদের পদচিহ্নকে আদ্যোপান্ত চেনেন এবং তার থেকে প্রাণীটির সম্পর্কে অনেক তথ্য আন্দাজ করতে পারেন– তার লিঙ্গ, বয়স, আহত না সুস্থ ইত্যাদি। হেঁটে দৌড়ে চলে যাওয়া পশুগুলোকে শিকারের জন্য অনুসরণ করতে তাঁদেরকে এই তথ্যগুলো সাহায্য করে– প্রাচীন কাল থেকে একটানা করে এসেছেন। বংশগত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এই বিষয়গুলো তাঁদের জন্য আর্টে পরিণত হয়েছে।

৪০৭টি পায়ের ছাপের ৯০% তাঁরা সনাক্ত করতে পেরেছেন– এর সবগুলো আজ ঠিক ওই অঞ্চলে না থাকলেও কাছাকাছি আছে। এর মধ্যে জিরাফ, সাদা বা কালো গণ্ডার, উটপাখি, স্প্রিংবক হরিণ, লিওপার্ড, জেব্রা, প্রধান। অন্যান্যগুলোর মধ্যে আছে বানর, বেবুন, সজারু, শিয়াল, হাতি, সিংহ, চিতা, বেশ কিছু পাখি মোট ৪০টি প্রজাতি। প্রজাতি সনাক্ত করেই তাঁরা থেমে যাননি, ওই পায়ের ছাপ থেকেই তাঁরা বলতে পেরেছেন যে পদচিহ্নগুলোতে অল্পবয়সীদের তুলনায় বয়স্ক প্রাণী অনেক বেশি, স্ত্রীর তুলনায় পুরুষ অনেক বেশি। ওই পক্ষপাতিত্ব কেন, প্রাণী নির্বাচনেও বা পক্ষপাতিত্ব কেন, এই সবও আবার গবেষণার বিষয় হয়েছে– এর থেকে সেই প্রাচীন শিকারি-সংগ্রাহকদের মনস্তত্ত্বও কিছুটা উদ্ঘাটিত হয়েছে বৈ কি। হয়তো ওই ব্যাপারটিই শিল্পী-মনের একটি অভিব্যক্তি। যেই শিল্পী মন তাদেরকে এত কষ্ট করে এতগুলো প্রাণীর পায়ের চিহ্ন এমন নিখুঁত ভাবে তাঁদের জানা সব তথ্যকে প্রতিফলিত করে খোদাই করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো।

পাতা কাহিনী

পাতা কেন এত বিচিত্র:

স্কুলে শিশুদেরকে যখন প্রথম ড্রইং শেখানো হয় তখন প্রায়ই একটি সোজা-সাপটা পাতা আঁকতে দেয়া হয়, শুরুতে একটি পাতার চারিদিকে পেন্সিল ঘুরিয়ে এনেই সেটি করতে দেয়া হতে পারে। গাছের পাতার সঙ্গে একটি শিল্প-সম্পর্ক তখন থেকেই তৈরি হয়ে যায়। পাতাকে পরে বিজ্ঞানের ক্লাসেও আলোচনার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তেমনি বইয়ের পৃষ্ঠার ভাঁজে ভাঁজে নানা আকৃতির পাতা রেখে সেগুলোকে শুকাতে দেয়াটি গোড়া থেকেই শিশুদের একটি সখ হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতির জীববৈচিত্রের প্রাথমিক আকর্ষণটিই বোধ হয় ওই পাতার ওপর দিয়ে ঘটে। আবার বয়স্ক উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরাও অনেকটা একই কায়দায় সব শ্রেণীভুক্ত উদ্ভিদের ওপর নজর রাখার জন্য তার পাতা, পাতার গুচ্ছ বা পুরো চারাকে শুকিয়ে চাপে রেখে হার্বেরিয়াম নামে সংরক্ষণ করেন। মনে হতে পারে পাতা এতো মামুলি ও পুরানো আকর্ষণের ব্যাপার যে এর বৈচিত্র সম্পর্কে জানা হয়ে গেছে বহুদিন আগে। কথাটি কিছুটা সত্য হলেও এ জানার শেষ কিন্তু হয়নি, সাম্প্রতিক কালেই বরং অনেকগুলো মূল বিষয়ের সুরাহা হচ্ছে। শৈশব থেকে ফুলপাতার প্রতি আকর্ষণটি সঞ্জীবতা ও

সৌন্দর্যের জন্য মনের একটি বড় আকর্ষণ, সব আর্টে যা হয়। এটিই বিজ্ঞানকে ডেকে এনেছে।

পাতার মূল কাজ হচ্ছে সালোক সংশ্লেষণ– সূর্যের আলো আর সবুজ ক্লোরোফিলের সাহায্যে কার্বন ডাই অক্সাইড ও পানি থেকে নিজের খাদ্য কার্বোহাইড্রেট ও অক্সিজেন তৈরি করা। সূর্যের আলোটি যেন ভাল করে ধরতে পারে, পানির সরবরাহ যেন এর সর্বত্র যায়, তাপ হারানো থেকে যেন রক্ষা পায়, পোকা মাকড় থেকে যেন নিজেকে সুরক্ষা দিয়ে পারে– ওই দিকগুলো বিবেচনাতেই পাতার আকৃতি ও আচরণ বৈচিত্র। পাতাটি কি নিজের একটাই একক না বহু ভাগে বিভক্ত, পাতা কি পুরু না পাতলা, তার ওপর শিরার বিন্যাস কী, এসবের পেছনে কারণগুলো এখন গবেষণায় আরো ভাল ভাবে উদ্ঘাটন হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যে পরিবেশের সামান্য এদিক ওদিক হবার কারণে পাতার ভিন্নতা সৃষ্টি হতে পারে– এমনকি একই উদ্ভিদেও। আবার বিবর্তন ইতিহাসটিও এখানে গুরুত্বপূর্ণ– অতীতে পরিবেশ সংকটে কী রকম পাতা সুবিধা পেয়েছিলো সেটি অনুযায়ীই আজকের পাতা। তাই একেবারেই ভিন্ন অবস্থান, ভিন্ন পরিবেশেও একই ইতিহাসের কারণে পাতা একরকম হতে পারে। যেমন খুব সুপরিচিতি একটি পাতা ম্যাপল গাছের পাতার কথা ধারা যাক– জাপান, ইতালী, কানাডার মত পরস্পর সুদূর ও ভিন্ন পরিবেশে ও ম্যাপল পাতা একই ভাবে সুন্দর কয়েকটি অংশে বিভক্ত, যদিও বিস্তারিত বিভাজনে পার্থক্য আছে এদের। যার যার সংস্কৃতিতে যার যারটি যথেষ্ট গুরুত্ব পায় এই পাতা– যেমন কানাডা যখন তার নতুন পতাকা বেছে নিয়েছিলো তখন তার সুগার-ম্যাপলের পাতাকে এতে মূল প্রতীক করেছে।

দেখা গেছে এক উত্তর আমেরিকাতেই একই ম্যাপল গাছের বীজ বিভিন্ন উত্তাপ-অঞ্চলে নিয়ে গেলে সেই গাছের স্বাভাবিক আকৃতিটি মোটা দাগে পাওয়া যায় বটে কিন্তু কিনারাগুলো যেখানে ভেঙ্গে ভেঙ্গে নানা অংশ হয়েছে তার কৌণিকতা ওখানকার উত্তাপ অনুযায়ী সূক্ষ্ম ভাবে বদলে গেছে– কোথাও বেশি কাঁটা কাঁটা সূক্ষ্ম কোণে হয়েছে, কোথাও বেশি মসৃণ গোলাকার ধারণ করেছে– এতই সংবেদী এরা আবহাওয়াতে। আর মোটা দাগে কত অংশে ম্যাপল পাতা ভাগ হচ্ছে সেটা নির্ভর করছে গাছগুলো বিষুব রেখার থেকে

উত্তরে বা দক্ষিণে কত দূরে অর্থাৎ কত শীতলতর জায়গায়। যত উত্তরে বা দক্ষিণে হবে ভাগের সংখ্যা তত বাড়ে, আর করাতের দাঁতের মত কিনারার দাঁতগুলোর সংখ্যাও বাড়ে। আবার যত বৃষ্টিবহুল জায়গার গাছ তত পাতা বড় হয়েছে।

এখন পাতা গবেষণায় একটি নতুন উপসর্গ এসেছে তা হলো জলবায়ু পরিবর্তনে এর কী হচ্ছে। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন জীবের ওপর বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনের প্রথম আঘাত উদ্ভিদেই দেখা যাচ্ছে বেশি, আর এই আঘাতের সম্পর্কে আমাদের আগাম বার্তা দিচ্ছে উদ্ভিদের পাতা; তাই তার দিকে তাকাতে হবে। অবশ্য পাতার দিকে আমরা এমনিতেই তাকাই সেটি উদ্ভিদের সঙ্গে আমাদের অন্তরঙ্গতার কারণে, আমাদের নানা আর্টে তার স্থান থাকার কারণে। যেভাবে পাতাকে দেখে এসেছি সেভাবে অবশ্য আর পারছিনা– ক্রমেই যেন তার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের পীড়নের কষ্টটি স্পষ্ট হয়ে ওঠছে।

বর্ণাঢ্য পাতার শরত:

আমাদের দেশে শরত ঋতুটির কোন আলাদা গুরুত্ব নেই, তাকে যেন লক্ষ্যই করিনা, অন্তত গাছের পাতার তখন কী হচ্ছে লক্ষ্য করিনা। এর কারণ আমরা চির সবুজ গাছের দেশ, শরতে বেশির ভাগ পাতায় নাটকীয় পরিবর্তন আসেনা, ঝরেও পড়েনা। শীতপ্রধান দেশে বর্ণাঢ্য শরতের দৃশ্যটি রীতিমত দেখার মত– প্রকৃতি যেন পাতার নানা রঙে রঙে জ্বলে ওঠে, পাতাগুলো যেভাবে খসে খসে উড়ে উড়ে এদিক ওদিক যায়, মাটিতে ঝরে পড়ে, জমতে থাকে সেও এক দৃশ্য। এই কিছুদিনের বর্ণাঢ্যতাটি বরাবর স্থান পেয়েছে শিল্পীর আঁকা চিত্রে, আর্ট-ফটোগ্রাফিতে। যদিও এটি সামনে শীতের তীব্রতা, গাছগুলো ন্যাড়া হয়ে যাবার কথাটিও স্মরণ করিয়ে দেয়, তবুও শেষ দিন পর্যন্ত মানুষ শরতের এ দৃশ্য উপভোগ করে।

বিজ্ঞানের জন্য পাতার এই সুন্দর দৃশ্যটি নেহাৎ একটি পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া, আসল কাজটি হলো শীতের আগমনী বার্তায় দিন যখন ক্রমে সংক্ষিপ্ত হয়ে আসে তখন সূর্যালোকের সাহায্যে গাছকে তার খাদ্য তৈরির কাজটি গুটিয়ে ফেলে দীর্ঘ নিদ্রায় যেতে প্রস্তুত করা যাতে নতুন খাবারের প্রয়োজন না হয়।

তার আগে শেষ খাবারটুকু তৈরি করে তা জমাবার চেষ্টায় পাতাকে এমন রঙীন করা যাতে সেটি সূর্যের আলোর ভেতরের বিশেষ বিশেষ আলাদা রঙের অংশকে দক্ষভাবে ব্যবহার করতে পারে। সাধারণত পাতা সূর্যের আলোর বর্ণালীর লাল ও নীল অংশ শোষণ করে সবুজ অংশটি প্রতিফলিত করে– তাই পাতাকে সবুজ দেখি। এতে ক্লোরোফিল কাজ করে। কিন্তু ক্লোরাফিল ছাড়া আরো কিছু রঙ-বস্তু পাতায় থাকে। শরতে ক্লোরোফিল দুর্বল হয়ে এলে সেগুলো কাজ শুরু করে। ক্লোরোফিল যেমন সবুজ করে, অ্যানথেসিয়ানিন নামের অন্য রঙ-বস্তুগুলো পাতাকে লাল ও খয়েরি করে। ক্যারোটিড ও ম্যানথোফিল রঙ-বস্তু আবার পাতাকে কমলা ও হলুদ রঙের করে। ফলে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ এর কোন কোনটিকে সচল করে শরতে ওই সব নানা রং ধারণ করে। সে সময় তারা তার পরিপূরক আলোক অংশকে সালোক সংশ্লেষণের জন্য ব্যবহার করতে পারে– বছরের শেষ আলোর ব্যবহার।

কোন্‌টির কী রং হবে তা অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে। অনেক প্রজাতি রং বদলানোটিকেই লাভজনক মনে করেনা। তাই রং সবুজই থাকে। কিন্তু যাদের জন্য লাভজনক হয় তারা প্রজাতির বিবর্তন ইতিহাস অনুযায়ী তা করে- যেমন ম্যাপল গোষ্ঠির নানা গাছের পাতা হয় লাল অথবা হলুদ; অ্যাসপেনের সুন্দর সোনালী-হলুদ, এগুলোরও আবার তার বিশেষ অবস্থানের কারণে রঙের আভায় পরিবর্তন ঘটে যেমন পাহাড়ের ঢালে নিচের দিকেরগুলোর এক রকম, উপরের দিকেরগুলো অন্য রকম।

শিল্পীর ছবি, মানুষের আনন্দ, পর্যটকের দলবেঁধে বেড়ানো– সব হয়ে থাকে শুধু এই রঙের জৌলুষ দেখতে। এসব বিজ্ঞানকে অনুপ্রাণিত করে, ওগুলো তাকে উৎসাহ যোগায় আজ– এখনো পাতার মূল্যকে নতুন ভাবে বুঝে নিতে, তার কোষে কোষে গিয়ে অনুসন্ধান করতে।

বিদ্যুৎ চালিত গাড়ি আসছে ভাল কথা, তবে . .

লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা আদিবাসীদের কী হবেঃ

ইলেকট্রিক ভেহিকল (ইভি) বা বিদ্যুৎ চালিত গাড়িকে এখন উন্নত বিশ্ব পৃথিবী রক্ষার বড় পথ মনে করছে– এটি গ্রীন হাউস গ্যাস উদগীরণ করেনা বলে। বায়ুমণ্ডলে গ্রীন হাউস গ্যাস না যেতে দিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনকে

ঠেকানোর অন্যতম উপায় মনে করা হচ্ছে একে। বড় দেশগুলোর একটি প্রতিজ্ঞা আছে সামনের একটি তারিখের মধ্যে ওভাবে গ্রীন হাউস গ্যাস যেতে দেবার একটি নেট জিরো অর্জনের– অর্থাৎ কত কার্বন ছাড়ছে আর কত কার্বন শোষণ করছে তাতে কাটাকুটি হয়ে শূন্য করার প্রতিজ্ঞা। ওই প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য আরো একটি তারিখ যার যার মত করে ঘোষণা করেছে নানা দেশ– এর মধ্যে তেল জ্বালানিতে চলা গাড়ির ব্যবহার বন্ধ হবে, তারো আগে তৈরি বন্ধ হবে; শুধু থাকবে ও তৈরি হবে ইভি। ইতোমধ্যেই ইভি'র চাহিদা দ্রুত বাড়ছে ওসব দেশে; পথেঘাটে, অফিসে বাসায় এর ব্যাটারিতে যেন বিদ্যুৎ ভরে রিচার্জ করা যায় সেজন্য ব্যাপক সরবরাহ ব্যবস্থাও চালু হচ্ছে– বর্তমানের পেট্রোল স্টেশনের মত বিদ্যুৎ স্টেশন।

কিন্তু পৃথিবীকে বাঁচাবার জন্য এই যে ইভি তার পরিকল্পনায় কিছু গলদ রয়ে গেছে যা সবাই লক্ষ্য না করলেও কেউ কেউ করছেন। ইভি'র প্রাণ যে ব্যাটারি তাকে একেবারেই উন্নত ব্যাটারি হতে হয়, যা ওজনের তুলনায় অনেক চার্জ নিতে পারে, বহুবার চার্জ দেয়া নেয়া করার পরও ভাল থাকে। সেই উন্নত ব্যাটারিতে প্রচুর নিকেল, লিথিয়াম ইত্যাদি বিরল ধাতু প্রয়োজন। চাহিদা যত বাড়ছে এগুলোকে সুবিধামত জায়গার খনিতে আর পাওয়া যাচ্ছেনা; এখনই হাত বাড়াতে হচ্ছে এমন সব জায়গায় যেখানে তা করা উচিত নয়। যেমন পৃথিবীর অবশিষ্ট যেই বনভূমি কার্বন শোষণ করে নেট জিরো অর্জনে সহায়তা দিচ্ছে সেই বনের গভীরে ঢুকতে হচ্ছে এসব ধাতুর সন্ধানে। তাতে শুধু মূল্যবান বন নষ্ট হচ্ছে তা নয়, বনের গভীরে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা অনেক আদিবাসী গোষ্ঠির অস্তিত্বই এ কারণে বিপন্ন হচ্ছে।

ওরকম বনের গভীরের একটি গোষ্ঠির কথা দৈবক্রমে প্রকাশিত হয়ে গেছে ওরকম আদিবাসীদের জন্য কাজ করে এমন একটি প্রতিষ্ঠানের তৎপরতায়। ইন্দোনেশিয়ার একটি দুর্গম ছোট দ্বীপ হালমাসের প্রায় আগাগোড়া ঘন বাদল বনে ঢাকা। সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল নামক ওই প্রতিষ্ঠানের একজন গবেষক ক্যানিয়াস রাসেল সেখানকার এক অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হয়েছেন। ওই বনে থাকে একেবারে আড়ালে থাকা, অন্য মানুষের কোন সংস্পর্শের বাইরে থাকা একটি ছোট নৃগোষ্ঠি হোঙ্গানা মানাওয়া। রাসেল ও তাঁর সহকর্মীরা ওদের কথা জানলেও, বাইরে থেকে নজর রাখলেও, ওদের বিশেষ

সংস্কৃতিতে হস্তক্ষেপ হবে এমন কোন যোগাযোগ তাদের সঙ্গে করেননা। কিন্তু তাঁরা সেখানে না গেলেও খনি-কোম্পানীর লোকজন লটবহর ও বুলডোজার নিয়ে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিলো কারণ এখানে এই দ্বীপে আছে নিকেল সঞ্চয় এবং তা ইভির ব্যাটারীর চাহিদা মেটাতে খুব প্রয়োজন। ওদের দেখতে গিয়ে রাসেল হঠাৎ দেখেন বুলডোজারের শব্দ পেয়ে বন থেকে বেরিয়ে এসে নদীর ধারে একটু খোলা জায়গায় তীরধনুক হাতে বুলডোজারের গতিপথ রোধ করে দাঁড়িয়েছেন দুজন আদিবাসী। অতি সবলের বিরুদ্ধে অতি দুর্বলের আত্মরক্ষার জন্য রুখে দাঁড়ানোর কী নিস্ফল প্রচেষ্টা! তিনি চট্ করে কয়েক মিনিটের একটি ভিডিয়ো এর করে ফেলতে পেরেছেন।

অত্যন্ত দুর্গম জায়গার ওই ছোট্ট ভিডিয়োটি গুরুত্বপূর্ণ অনেক কথা বল্ছে। নেট জিরোর স্বার্থে আমরা ইভি সহ অনেক ব্যবস্থা নেবো, কিন্তু সেটি কোনো আদিবাসী প্রাচীন সংস্কৃতির বা তাদের নিজেদেরই অস্থিত্বের বিনিময়ে নয়। এমনি সব অলক্ষ্যে থাকা ভুক্তভোগীর পক্ষে বার্তা জলবায়ু ঘিরে বড় বড় বিশ্ব সম্মেলনে হয়তো পৌঁছেনা কিন্তু রাসেল ও সারভাইভ্যাল ইন্টারন্যাশনাল তারপরও ওই ভিডিওর মত প্রামাণ্য সাক্ষ্য হাতে সারা দুনিয়ায় ওদের কথাগুলো পৌঁছাতে চান। শেষ পর্যন্ত সমাধান বিজ্ঞানকে করতে হবে– ব্যাটারির উপাদানগুলো পাওয়ার বিকল্প পদ্ধতি বের করে। সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক অগ্রাধিকার কখনো কখনো এভাবে বৈজ্ঞানিক অগ্রাধিকারকে চ্যালেঞ্জ করছে। বিজ্ঞানকে তা বিবেচনায় নিয়েই এগুতে হচ্ছে।

ব্যবসায়ীর চোখ সমুদ্রতলের খনির দিকেও:

ইভি'র ব্যাটারির জন্য একেবারে মূল উপাদান হিসেবেই প্রয়োজন লিথিয়াম, নিকেল, কোবাল্ট। সব রকম কাজের জন্য এগুলোর বিশ্ব চাহিদা যা ছিল এখন এক লাফে এটি বহু গুণ বেড়ে যাবে। কিন্তু শুধু এইগুলোই নয় এই ব্যাটারিরই আনুসঙ্গিক প্রযোজনে প্রচুর কপার, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি ধাতুও লাগে। এগুলোরও চাহিদা বেড়ে যাবে। ২০৪০ সালের মধ্যে এক কোবাল্টেরই চাহিদা হয়ে যাবে ৩০ গুণ। পৃথিবী যে সব খনি অঞ্চলে সহজে উৎপাদন বাড়ানো যায় সেগুলোর সংখ্যা এখন কমে এসেছে, সে জন্যই তো গভীর বনে হানা দিতে হচ্ছে। তাই এখন সম্পূর্ণ নতুন আরেকটি দিকে চোখ দিচ্ছে ইভি গাড়ির ব্যবসা, ব্যাটারি ব্যবসা, এবং তাদের সরবরাহকারী

কোম্পানীগুলোর ব্যবসার ভবিষ্যৎদর্শীরা। সেটি হলো খনির একটি নতুন দিগন্ত– সমুদ্রের তলায় খননের ব্যবস্থা! এখনো যেটি একটি প্রায় সম্পূর্ণ অব্যবহৃত দিগন্ত; কিন্তু সেখানে হাত দেয়া সুবিবেচনার কাজ হবে কিনা সেটি গুরুতর প্রশ্ন।

যে খনিজগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলো মিশ্রিত শিলার ডেলা অনেক সাগরের তলদেশে প্রচুর ছড়ানো রয়েছে। শেষ অবধি এগুলোই হতে পারে ওসব খনিজের বড় উৎস। কিন্তু সাগরতল আঁচড়িয়ে এসব ডেলাকে তুলে আনতে হলে অত্যন্ত জবড়জঙ্গ খনিকরণ যন্ত্রকে সাগরতলে নামাতে হয়, যা কিনা ওখানকার ইকোসিষ্টেমকে অন্যান্য দুর্যোগে ফেলতে পারে।

দানবের মত শিল্পযন্ত্র যখন থেকে প্রবল হয়ে ওঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, তখন শিল্পোন্নত দেশের কবি-সাহিত্যিকরা পৃথিবীর স্থলভাগ নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সাহিত্য ও অন্যান্য নানা আর্টে। টিএস ইলিয়টের কবিতা 'ওয়্যাস্ট ল্যান্ড' কবিতাটির কথা স্মরণ করা যায়। স্থলের ওপর যন্ত্রদানবের এই থাবা অনেকদিনের হলেও সাগরের শীতল গভীর তলে তা এতদিন পড়েনি, এবার পড়তে যাচ্ছে।

ব্যাটারি উপাদানের জন্য সাগর তলের খনির বড় পরিকল্পনা করা হচ্ছে হাওয়াই দ্বীপ থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরের অঞ্চলটিকে নিয়ে। একে নিয়ে প্রথম যে দু'জন মানুষ ভেবেছেন তাঁদের নামে এই অঞ্চলটির নাম ক্লারিয়ন-ক্লিপারটন জোন বা সি সি জেড। ওই খনিজ ডেলাগুলোর প্রাচুর্য আছে এই অঞ্চলের সাগরতলে। ওই গভীর সমুদ্র অবশ্য মাছ ও অন্যান্য সমুদ্র-প্রাণীর জন্য খুব উর্বর জায়গা নয়। তবুও এর বিরল জলজ প্রাণীর ইকোসিস্টেম মূল্যবান। বিশাল সব খনি-যন্ত্র যখন এখানে ডেলা তোলার জন্য খনন চালাবে, সব ডেলা আগে সমুদ্রের ওপরে তুলে আনবে, শুধু খনিজ-সমৃদ্ধগুলো রেখে বাকিগুলো আবার সেখানে ফেলে দেবে। এসব করতে গিয়ে সমুদ্রের তল থেকে পিঠ পর্যন্ত পানিকে উথালপাতাল করে ফেলতে হবে, একটি ভয়ানক কাদা-ঝড় সৃষ্টি করে। ওটি আগাগোড়া সমুদ্রের ইকোসিস্টেম ধ্বংস করে জলজ প্রাণীর জন্য বিধ্বংসী হবে বলেই বিজ্ঞানীরা বলছেন। আর

যে শব্দবোমার সৃষ্টি হবে অনেক দূর পর্যন্ত গিয়ে সেটি প্রাণীর আরো ক্ষতি করবে।

ভাগ্য ভাল যে এমন ধ্বংসযজ্ঞ এখনো শুরু হয়নি, বিজ্ঞানীদের সাবধান বাণীতে একটু থমকে দাঁড়িয়েছে। আইডিয়াটি মাথায় আসার পরপর ১৯৮৯ সালে একটি প্রথমিক পরীক্ষার ফলাফল খারাপ ইঙ্গিত দিয়েছে। চার বর্গমাইল এলাকায় ওভাবে খনন কাজে ডেলা তুলে এবং ফেলে পুরো ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে। ওই ঘটনার পর এই এলাকাটি থেকে প্রায় সব সামুদ্রিক প্রজাতি উধাও হয়ে গিয়েছিলো। এমনকি ২০১৯ সাল পর্যন্ত কোন কোন প্রজাতি ফেরৎ আসেনি। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য পরিকল্পনা নিয়ে বিজ্ঞানীরা দুই ভাগে বিভক্ত– এক দল বল্‌ছেন খনি-প্রযুক্তির উন্নয়ন করে এমন ধ্বংসাত্মক পরিণতি এড়ানো যাবে। অন্য দল সমুদ্রে খনির চিন্তা সম্পূর্ণ রূপে বাদ দেয়ার পক্ষপাতী। তবে এ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানীরা একা নিতে পারবেন না। পরিবেশবাদী, জীবপ্রেমী মানুষকেও তাতে অংশ নিতে হবে। আজকের টিএস ইলিয়টের মত সংবেদনশীল সাহিত্যিক-শিল্পীদেরকেও।

ম্যাপের সরল টান-পৃথিবীর বিজ্ঞান

আটটি টানে পৃথিবীর ছাদঃ

তাজিকস্তান দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে গর্নো বদখশান জায়গাটি খুবই উঁচু পার্বত্য ভূমি; ভূবিজ্ঞানীরা একে পামীর মালভূমি বলেন। এই মালভূমিরই কিছু কিছু অংশ প্রান্তিক ভাবে বিস্তৃত হয়েছে আফগানিস্তানে, কিরগিস্তানে, পাকিস্তান ও চীনে। চারিদিকে তাদের থেকেও নিচে সুউচ্চ বরফ-শুভ্র পর্বতশৃঙ্গ দেখে এই পামীরের মানুষের ধারণা হয়েছে যে তাঁরা পৃথিবীর সবার ওপরে আছেন; এজন্য পামীরের নাম দিয়েছেন বাম্‌-ই-দুনিয়া অর্থাৎ পৃথিবীর ছাদ। কথাটি ছিল ওখানকার মানুষের মুখে, কিন্তু এক সময় ভূ-বিজ্ঞানীদেরও খুব মনে ধরলো কথাটি, তবে তাঁরা দেখলেন শুধু পামীরকে এই সম্মান দেয়া যুক্তিসঙ্গ নয়, একে ঘিরে এমনিই জবরদস্ত উঁচু ভূমি আরো আছে। যেমন তিব্বতের মালভূমি, হিন্দুকুশ পর্বত, হিমালয় এবং খোদ উচ্চতম শৃঙ্গ এভারেস্ট সেখানে আছে। এসব জায়গাকেও তাই পৃথিবীর ছাদ বলা হতে লাগলো– এর ফলে ভূগোলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য তো অন্তত কিছু ধোঁয়াশা সৃষ্টি হতে পারে। যতদিন মানুষের মুখে মুখে ছিল কথাটি ততদিন সমস্যা

হয়নি, বিজ্ঞানীরা একে জটিল করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে ওই সাধারণ মানুষেরই একজন এই জটিল বিষয়ের ভেতরেও সরলীকরণের একটি চেষ্টা নিয়েছেন। আটটি মাত্র সহজ টানে তিনি পৃথিবীর ছাদ জিনিসটি আসলে কী তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন।

এই টানগুলোর মধ্যে বিজ্ঞানকে অবহেলা করা হয়নি। কিন্তু তা করা হয়েছে বিজ্ঞানের খুঁটিনাটিকে এড়িয়ে পামীরের ও প্রতিবেশী জায়গার সাধারণ মানুষেরও বোঝার মত করে, এমনকি দুনিয়ার সাধারণ মানুষেরও বোঝার মত করে। যিনি এটি করেছেন তিনি মানচিত্রবিদ বিজ্ঞানী হিসেবে তা করেননি, সেটি তিনি নন্; বরং নিজের অনুভূতির প্রতি সাড়া দিয়ে, কৌতুহল থেকে ইতিহাস ও দর্শনের কিছু সাধারণ চর্চায় একটি ম্যাপকে যতটা সরল করা যায় কয়েকটি পৃথক টানে সেটিই করেছেন। এটি তিনি কোন জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ আকারে করেননি বা কোন মানচিত্র প্রকল্পের অংশ হিসেবেও নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে অনেকটা অনায়াসে সাধ্য কাজের মত করেই করেছেন। তাঁর নাম আরাইব আলী বেগ। এই প্রসঙ্গে তাঁর যেই পরিচয়টি সব চেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক হবে তা হলো তিনি 'কারাকোরাম-হিমালয়-হিন্দুকুশ পর্বতের গল্প' নামে একটি বই লিখেছেন।

যা তিনি এঁকেছেন তাকে প্রথম দর্শনে কোন ম্যাপ বলেই মনে হবেনা, মনে হবে খেলাচ্ছলে একটি আঁকিবুকি। মাঝখানে একটি ছোট বৃত্তের ভেতর লেখা আছে 'পামীর'। এটাই যেন সূর্য আর এর থেকে সূর্যের রশ্মির মত তবে একটু এঁকে বেঁকে গিয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে সাতটি অনায়াসে টানা রেখা এরা এক একটি সুউচ্চ পর্বতমালা। বাম দিক থেকে যদি শুরু করি পামীর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে গেছে সেটি হিন্দুকুশ, মাঝারি দৈর্ঘের রেখা। তারপর উত্তর-পশ্চিমে যাওয়া আলাই একই রকম দৈর্ঘের। উত্তর-পূর্ব দিকে যাওয়া এদের থেকে লম্বা রেখা তিয়েনশান। আরো একটু পূর্ব দিকে কোণ করে একই দৈর্ঘের আলতাই তাগ। সোজা পূর্ব দিকে একই মাপের কুয়েন লুন। আর পামীরের চারিদিকে ঘোরাটি সম্পূর্ণ করে এর দক্ষিণ পূর্ব দিকে গিয়ে দক্ষিণে কিছুটা দোল খেয়ে উঠে পূর্বে যাওয়া দীর্ঘতম রেখাটি হিমালয়। সুর্যের উপমাটি দিলাম ছোট বৃত্তের চারিদিকে রেখাগুলো ছড়িয়েছে বলে। আরো ভাল উপমা হবে সাতটি সূতা যেন নানা দিকে এঁকে বেঁকে বাতাসে উড়ছে

আর তাদের সবগুলোর ভেতরের দিকের প্রান্তটি এক জায়গায় গিট্টু দেয়া ওই পামীরে। প্রত্যেকটি সূতা অত্যন্ত উঁচু একটি পর্বতমালা, আর পামীর হলো সেই জায়গা যেখানে তাদের সবার প্রান্ত এসে জট বেঁধেছে। এটি সাধারণ মুখের কথা; কিন্তু বিজ্ঞানও সেটিই বলছে, তাই পামীরের পোষাকী নাম দেয়া হয়েছে পামীর গ্রন্থি (পামীর নট্)– গ্রন্থি মানে গিট্টু। তাই এই সরল আঁকিবুকির ম্যাপটিও বলে দিচ্ছে পামীর হলো সাত ছাদের সম্মিলিত ছাদ।

ওই অঞ্চলের বেশ কয়েকটি দেশ জুড়ে বিস্তৃত আটটি রেখার প্রত্যেকটি নিয়ে এখনো দারুণ ব্যস্ত রয়েছে দুই রকম গবেষণা– একদিকে বিজ্ঞানের, অন্যদিকে ইতিহাস ও রাজনীতি-অর্থনীতির। নানা দিকে বিস্তৃত সাত পর্বতমালার বৈজ্ঞানিক মিলগুলো যেমন লক্ষ্যণীয় তেমনি প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্টগুলোও। আবার এগুলো অতিক্রম করার মধ্যেই রয়েছে প্রাচীন যোগাযোগের ইতিহাস সিল্ক রোড ইত্যাদির– প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের, চীনের সঙ্গে ইউরোপের। একই সঙ্গে আছে আজকের কারাকোরাম হাইওয়ে, চীনের উচ্চাকাঙ্খী বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্প– রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইঙ্গিতে ভরপূর। এই সব মিলে আরাইব আলী বেগের একটানে আঁকা আটটি রেখার সহজ ম্যাপকে টুইটারের অনেক পাঠকের কাছে অত্যন্ত শিক্ষণীয় মনে হয়েছে। কেউ কেউ ইতোমধ্যে একে পৃথিবীর জটিলতম জায়গায় সহজতম ম্যাপ আখ্যাও দিয়েছেন। 'কোরাকোরাম-হিমালয়-হিন্দুকুশ পর্বতের গল্প' বইটির লেখকের উপযুক্ত কাজই বটে।

নিরাপদ করিডর– প্রাণীদের জন্য মানচিত্র-জাল:

যুগে যুগে যে মানচিত্রবিদ্যা গড়ে ওঠেছে, ম্যাপ তৈরি হয়েছে, তার প্রায় সবই মানুষের জন্য, মানুষের স্বার্থে। আমাদের রাজনৈতিক বাটোয়ারা দেখাতে বা সম্পদ, যোগাযোগ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সহজে বুঝতে ম্যাপগুলো এসেছে। কিন্তু অবশেষে এখন এমন কিছু জায়গার ম্যাপও তৈরি করতে হচ্ছে যেখানে মানুষের যাওয়ার অধিকার নেই, গেলেও সেখানে তার অগ্রাধিকার নেই– ওটি প্রাণীদের জায়গা, তাদের রিজার্ভ বা অভয়াশ্রম। অনেক দেশে এগুলো বিখ্যাত সব ন্যাশনাল পার্ক নামেও পরিচিত। এসব ম্যাপ দেখলেই অগ্রাধিকারটি বোঝা যায়– প্রাণীদের বিচরণ, খাদ্য ও পানির যোগান, লম্বা পথে চলার সুযোগ যেখানে নিজেদের গোষ্ঠির নতুন নতুন অন্যদের সাক্ষাত

মিলবে, নিরাপত্তা, আশ্রয়, বিশ্রামের সুযোগ, সপরিবারে দল বেঁধে চলা ও আনন্দ করার সুযোগ ইত্যাদির দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। অনেক দেশেই এগুলোর স্বতপ্রণোদিত ব্যবস্থা রয়েছে বন্য প্রাণী ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য; এগুলো দেশের মানুষের জন্য সম্পদ রক্ষা করে, আবার তাদের শিক্ষা, পর্যটন ও আনন্দের সুযোগ করে দেয় সতর্কতার সঙ্গে সীমাবদ্ধ জায়গায় থেকে উপভোগ করে। কিন্তু অন্য কিছু দেশ জাতিসংঘ জীববৈচিত্র রক্ষার অবশ্য-পালনীয় নিয়মগুলোর কারণে এটি করছে। এই নিয়মে প্রত্যেক দেশকে তার আওতাধীন স্থলের ও জলের অন্তত ১৩ শতাংশ প্রাণীদের জন্য সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে আলাদা করে দেয়াটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অবশ্যম্ভাবী বিলুপ্তির হাত থেকে বন্য প্রাণীর সিংহভাগকে রক্ষা করতে হলে তাদের বসতের জন্য খাস করে এই জায়গা ছেড়ে দেবার কোন বিকল্প নেই। আমাদের দেশ নিজ থেকেও নয়, জাতিসংঘ নিয়ম মানার জন্যও নয়, কোন ভাবেই এই কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করেনি; কিন্তু অন্য অনেকে চমৎকার ভাবে করেছে।

প্রত্যেক প্রাণীর টিকে থাকার ও স্বচ্ছন্দ ভাবে বিকশিত হবার জন্য তাকে তার প্রয়োজনীয় দূরত্ব জুড়ে চলাফেরার সুযোগ পেতে হয়, সেটিকে বলা হয় তার ন্যূনতম রেঞ্জ। এই সুযোগটি না পাওয়ার কারণেও শেষ পর্যন্ত অনেক প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়। এতে বড় যে ব্যাপারটি কাজ করছে তা হলো ওভাবে দূরে দূরে অন্যদের আবাসে না যেতে পারলে নিকটাত্মীয়দের বাইরে নতুন নতুন জেনেটিক গুণ সম্পন্ন সঙ্গী-সঙ্গিনীর সাক্ষাত ও তাদের মধ্যে প্রজনন সম্ভব হয়না, যা শেষ অবধি তাদেরকে অন্তপ্রজননের কারণে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যায়। সমস্যা হলো বড় সাইজের প্রাণী প্রজাতিদের ক্ষেত্রে এরকম ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দূরত্বটি বেশ দীর্ঘ। এ কারণে বিশাল সব ন্যাশনাল পার্কও তাদেরকে অবাধ বিচরণের যে সুযোগ দেয় তাও যথেষ্ট হচ্ছেনা। সেটি যাবতীয় প্রাকৃতিক রসদ পাওয়ার জন্য যেমন সত্য, জেনেটিক বৈচিত্র পাওয়ার ক্ষেত্রেও তাই। তাই এখন প্রস্তাব আসছে বেশি বেশি করিডরের– যেমন দেশের ও আশেপাশের দেশের বিভিন্ন ন্যাশনাল পার্কগুলোকে প্রশস্ত এক রকম প্রাকৃতিক সড়কের মাধ্যমে পরস্পর যুক্ত করে দেয়া। এই করিডরগুলোতেও আসলে অভয়াশ্রমের মত একই নিরাপদ প্রাকৃতিক পরিবেশ

বজায় থাকে, যাতে প্রাণীরা কোন রকম বিঘ্নের সম্মুখীন না হয়ে একটি বড় অভয়াশ্রম থেকে অন্যটিতে চলে যেতে পারে, ফিরেও আসতে পারে।

এগুলো একটানা এমন ভাবে করে দিতে হচ্ছে এবং লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে যাতে একটি করিডরের কোথাও রাজপথ, রেলপথ, জনবসতি, বিদ্যুৎ লাইন, অনতিক্রম্য খাল-নদী, জলাশয় ইত্যাদি না থাকে যা প্রাণীদের চলাচলকে বিপজ্জনক করতে পারে, বা নিরুৎসাহিত করতে পারে। অনেক সময় শত শত মাইলের, এমনকি হাজার মাইল দীর্ঘ করিডর হওয়াতে এ ধরনের বিঘ্ন এসে পড়া স্বাভাবিক বলেই সতর্কতার প্রযোজন। লক্ষ্য রাখতে হয় করিডরের পরিবেশ আগাগোড়া প্রাসঙ্গিক প্রাণীগুলোর অনুকূল কিনা, পাখি থেকে শুরু করে বড় থেকে ছোট্ট প্রাণী প্রাণী পর্যন্ত সবার জন্য। চেষ্টা করা হয় অনেক প্রাণীর যে স্বাভাবিক মৌসুমী অভিবাসন পথ আছে তার সঙ্গে মিলিয়েই করিডরগুলো স্থাপন করা। করিডরের আইডিয়াটি অবশ্য নতুন কিছু নয়, ইউরোপে স্পেন থেকে ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ড হয়ে ইতালি পর্যন্ত করে দেয়া মেগা-করিডরের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

তবে সব রকম ন্যাশনাল পার্ক ইত্যাদিকে প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটিকে করিডর দিয়ে যুক্ত করাটি এখনো নানা দেশে পরিকল্পনার পর্যায়ে। সেখানে তাই এগুলোর একটি নেটওয়ার্ক-ম্যাপ তৈরি করা জীবপ্রেমিক পরিবেশবাদীদের ও ভূ-পরিকল্পনাবিদদের একটি খুব প্রিয় কাজ। অনেকে পরিকল্পনার শুরুতে এর একটি সরল নেটওয়ার্ক-ম্যাপ তৈরির চেষ্টা করছেন, সহজ-সরল রেখায় নানা ন্যাশনাল পার্ককে যোগ করার সর্বোত্তম জায়গা কোন্‌গুলো হতে পারে- যেখানে প্রাণীরা আপন ভূবনে হারিয়ে যেতে পারবে, এখানে ওখানে লোকালয়ে চলে এসে নিজেদের বিপদ ঘটাবেনা। তাঁরা মনে মনে যে চিত্র দেখেন সেখানে ন্যাশনাল পার্কগুলো মানুষের হাজারো ব্যস্ত একটানা দখলদারিত্বের মাঝে এখানে ওখানে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত বন্য প্রাণীর আবাস হয়ে থাকবেনা– করিডরের মাধ্যমে সারা দেশ জুড়ে গড়ে উঠবে তাদেরও একটানা নির্বিঘ্ন আবাস, একটি নেটওয়ার্কের মত। সত্যিকারের বাস্তবায়নের জন্য অবশ্য গবেষণা প্রয়োজন– প্রাণী আচরণের ওপর যেমন গবেষণা, মানব-আচরণের ওপরও গবেষণা। শেষ পর্যন্ত নেটওয়ার্কটি যথাসম্ভব সরল হতে হবে, প্রাণী ও মানুষ উভয়ের জন্য এটি যেন স্বাভাবিক

প্রবণতার মধ্যে হয়, সাংঘাতিক ঘোরপেঁচের কিছু না হয়– সাধারণ রাস্তার নেটওয়ার্ক পরিকল্পনায়ও আমরা যা চাই, সেরকমই নান্দনিকতা।

যেমন এই প্রসঙ্গে ইরানের দুটি অভয়াশ্রমের মধ্যে একটি করিডরের পরিকল্পনার কথা ধরা যাক। এ জন্য লিওপার্ড বাঘের অভ্যাস ও আনাগোনার ওপর গবেষণা করতে হয়েছে। দেখা গেছে এখানে কৃষকদের চাষবাসের যে প্যাটার্ন তাতে কিছু কিছু চাষের জায়গা করিডরের খুব কাছে পড়বে। এগুলোর বন্টন প্যাটার্নটির খুঁটিনাটি উপাত্ত হাতে থাকা চাই। লিওপার্ডরা গেরস্ত বাড়ির গরু ছাগলকে আক্রমণ করতে খুব ভালবাসে। এটিকে মাথায় রেখে যদি করিডরের প্ল্যান করা যায় তা হলে করিডরটি ৪০% সংক্ষেপ হয়ে যাবে। আর একটি ব্যাপার সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে। বন্যপ্রাণীরা যে ভাবেই হোক মানুষের সামনে পড়াটাই সব থেকে বেশি এড়িয়ে যেতে চায়। এরকম একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে কালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্রুজের উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলগুলোতে যে কাউগার বা পুমা নামের পার্বত্য সিংহ দীর্ঘ পথে আনাগোনা করে তারা দুর্গম যাত্রার প্রাকৃতিক বাধাগুলো অতিক্রমের জন্য যে শক্তি ব্যয় করে তার সমান শক্তি ব্যয় করে ওখানকার বিরল মানুষের বসতগুলো এড়িয়ে চলার কাজে। খুবই পরিশ্রম করে এরা এই মানুষ বসতগুলোর অবস্থান বের করে, তারপর ওগুলোকে অনেক দূর দিয়ে এড়িয়ে চলার জন্য তাদের চলাচল পথ ঠিক করে।

প্রাণী করিডরের আসল ম্যাপ তৈরির আগে নানা লোকজ অভিজ্ঞতাকে আমলে এনে উৎসাহী মানুষরা সরল নেটওয়ার্ক ম্যাপ নিজেরাই খাড়া করছেন, বদলাচ্ছেন, আবার খাড়া করছেন। সেই প্রাথমিক জ্ঞানের ভিত্তিতে নেয়া হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রকল্প।

পানি উঠে, গ্লোব নড়ে:

পৃথিবীর যে গ্লোবটি অন্তত স্কুলে পড়ার সময় সব ছাত্রের টেবিলে থাকে তাকে নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ কখনো হয়নি। গ্লোবটি আমরা হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখি কেমন করে পৃথিবী তার অক্ষের ওপর ২৪ ঘন্টায় একবার ঘুরে যায়। অক্ষটি কল্পনা করি উত্তরে আর দক্ষিণে যেখানে ওটি গ্লোবের ফ্রেমের সঙ্গে আটকানো থাকে ঘোরার সুযোগ রেখে; আটকাবার ওই দুটি বিন্দু

কল্পনায় যোগ করে বাড়িয়ে দিলেই যেন একটি শলা উত্তরের একটি বিন্দুতে গ্লোব ফুঁড়ে ওপরে উঠলো, দক্ষিণেও তাই। অক্ষটি কেমন যেন একটু নুইয়ে থাকে সূর্য-সমতলের লম্ব থেকে ২৩$\frac{১}{২}$ ডিগ্রি কোণ যার থাকার ফলে আমাদের দেশের মত বিষূব রেখার উত্তরে বা দক্ষিণে থাকা জায়গাগুলোতে দিন রাতের দৈর্ঘ বদলায়। একটি জিনিস স্কুলে আমাদেরকে বলা হয়নি কিন্তু বিজ্ঞানীরা জানেন যে ওই ফুঁড়ে বেরুবার জায়গাটি কিন্তু সব সময় একই থাকেনা, একটি নিয়ম ধরে দীর্ঘ কালের ব্যবধানে খুব কাছাকাছি নানা জায়গা দিয়ে ফুঁড়ে বের হয়– ভূগোলে এটি হবার বেশ কিছু কারণ আছে। সেই কারণ থেকে হিসেব করে জায়গাটি কখন কোথায় হবে তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু এই মাত্র কয়েক বছর আগে ২০১৬ সালে একটি নতুন জিনিস আবিষ্কার হয়েছে। এই অক্ষ ফুঁড়ে বেরুবার জায়গাটির যে পরিবর্তন সাধারণ ভৌগলিক কারণে হয় এখন তাতে ক্রমাগত আরো সামান্য কিছু যোগ করতে হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে। সেটি ঘটছে সমুদ্রের ভাসমান বিশাল বিশাল বরফ চাঁই স্থায়ী হিমশৈলগুলো (আইসবার্গ) ভূ-পৃষ্ঠ উষ্ণতার কারণে গলে যাচ্ছে এবং তার ফলে পৃথিবীর নানা অংশে ভরের যে বন্টন সেটি বদলে যাচ্ছে বলে। ভরের এই বন্টন অক্ষের দিক পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই একটি কারণে পরিবর্তনটি আমাদের নিজের কৃতকর্মের ফল, কারণ গ্রীন হাউস গ্যাস উদ্গীরণ করে হিমশৈল গলাবার ব্যবস্থা আমরাই করে দিচ্ছি।

এখন আরো সম্প্রতি আর একটি বিজ্ঞান গবেষণার খবর আমাদেরকে আরো আঁৎকে তুলছে। আমরা নিত্য যে পানি ব্যবহার করছি, বিশেষত কৃষিতে সেচের জন্য যেই পানি ব্যবহার করছে সেটি ভূগর্ভ থেকে তোলার ফলেও অক্ষের দিক সামান্য পরিমাণে পরিবর্তিত হচ্ছে। বর্তমানে এভাবে ভূগর্ভ থেকে প্রতি বছর পানি তোলার পরিমাণ একটি বিশাল আয়তনের, আর তার ফলেও আমরা পৃথিবীর ভরের বন্টন যথেষ্ট বদলিয়ে ফেল্‌ছি। যেখান থেকে তুলছি পানিটা যদি ভূগর্ভে ঠিক সেখানেই ফেরৎ যেত তা হলে এটি হতোনা। গবেষণায় দেখা যাচ্ছে আমরা সারা দুনিয়ায় পাম্প করে ভূগর্ভ থেকে পানি তুলছি প্রতি বছর মোট ২,১৫০ গিগাটন। তার মাত্র অর্ধেক তোলার জায়গাতেই ভূগর্ভে সরাসরি ফেরৎ যায়, কাজেই সেটি কোন পরিবর্তন ঘটায়না, কিন্তু বাকি অর্ধেক নানা ভাবে সমুদ্রে চলে যায়; বিশেষ

করে শুকিয়ে জলীয় বাষ্প হয়ে বৃষ্টি রূপে। এতে এক জায়গার পানির ভর চলে যাচ্ছে অন্য জায়গায়। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর অক্ষ নড়ে যাবার ক্ষেত্রে আরো একটি ছোট্ট কারণ যোগ হয়।

ভাবতে কেমন লাগে আমি পাম্প করে যা পানি তুলছি তাতে আমার গ্লোবের দিকটি একটু পাল্‌টে যাচ্ছে– ব্যাপারটা আমার হাতেই! ভূগর্ভ থেকে পানি তোলার আরো অনেক অপকার আছে– কিন্তু মনে হয় এর মত আর কিছু সবাইকে এত নাড়া দেবেনা। ছোট গ্লোবটি বিনয়ের সঙ্গে মাথা নুইয়ে টেবিলে বসে থেকে প্রত্যেককে যেভাবে সতর্ক করতে পারে আর কিছু কি তা পারে? একটি ম্যাপ, একটি গ্লোব, একটি নক্‌শা আর্টের ভঙ্গিতে আমাদের মনকে নাড়া দেয়। সেই অন্তরঙ্গতা থেকে সে আমাদের জন্য, বিজ্ঞানের জন্য প্রশ্ন তৈরি করে। তখন বিজ্ঞানের মধ্যে আমরা উত্তর খুঁজি, আর্টকে বদলাই।

আর্টের প্রশ্ন, গণিতের উত্তর

পরিযায়ী পাখি ঠিক কোন্ পথে যাবে:

পাখি দেখা যাদের সখ, বিশেষ করে পরিযায়ী পাখির আসা যাওয়া দেখার, পাখির সব কিছু নিয়ে তাদের উৎসাহের কোন সীমা নেই। পরিযায়ী পাখির ক্ষেত্রে কখনো উড়ে যাওয়া বলাকা কী প্যাটার্নে নিজেদেরকে বিন্যস্ত করে তা লক্ষ্য করে তাকিয়ে থাকেন কোন্ পথে ওরা যাচ্ছে, কখনো ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখি কোন্ জলাশয়ে এসে নামলো তাদের আচরণ লক্ষ্য করেন, তাঁদের সবাই ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত থাকেন পাখিদের ভিডিয়ো করতে। তাঁদের অনেকে এর মধ্যে বহু শিল্প-উপাদান খুঁজে পান। এগুলোকে তাঁরা শুধু ফটোগ্রাফিতে নয়, পাখির দলবদ্ধ আচরণের নানা দিক নানা শিল্প মাধ্যমে প্রকাশ করেন। তাঁদের কাজের একটি বৈজ্ঞানিক দিকও থাকে– সেটি সৌখিন পাখি পর্যবেক্ষক ‘নাগরিক বিজ্ঞানীদের’ কাজ হিসেবে। সারা দুনিয়ার এত জায়গায় পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা যে এর সম্পর্কে সব দিক থেকে ব্যাপক উপাত্ত না পেলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গড়ে তোলা কঠিন হয়। এ জন্য বিজ্ঞানী না হয়েও পাখি পর্যবেক্ষকদের একটি বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব আছে। তবে অসংখ্য পাখির এই একত্র ভ্রমণ, দীর্ঘপথ অক্লান্তভাবে পাড়ি দেয়া, এক এক জায়গায় এক সঙ্গে নেমে কলকাকলিতে মুখরিত করে রাখা– সব কিছুর মধ্যে

একটি অদ্ভুত নান্দনিকতার সন্ধান পান ওই একই মানুষরা, তাই কোন্‌টিকে ছেড়ে কোন্‌টি প্রধান হয়ে ওঠে বলা মুশকিল।

পাখি যখন কোন জায়গা থেকে উড়ে যায়, আর পথের মধ্যে উৎসাহীরা দেখেন তখন দুটি প্রশ্ন তাঁদের মনে উঁকিঝুঁকি দেয়। প্রথমটি হলো– ওই যে দূরে উড়ে যাওয়া ঝাঁক সেগুলো কোন্ পাখি? সেগুলোর সাধারণ গোষ্ঠি পরিচয় কিছুটা আন্দাজ করতে পারলেও ঠিক কোন্ প্রজাতির কোন জাতের পাখি তাকে দূর থেকে একেবারে সঠিক ভাবে সনাক্ত করার কোন উপায় নেই। অন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো ওরা কোন্ পথে যাবে? যাত্রা শুরু করার পর পাখিগুলোর গন্তব্য অঞ্চলটি মোটামুটি জানা থাকলেও ঠিক কোন্ পথে সেখানকার কোথায় যাবে তা আগাম বলা সম্ভব হয়না। এই দুটি ব্যাপারেই সৌখিন পাখি পর্যবেক্ষকরা অভিজ্ঞতা থেকে নানা রকম ভবিষ্যদ্বাণী করার কৌশল বের করে থাকেন বটে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তা খুব সফল হয়নি। পর্যবেক্ষকদের ওই ভাবনা, ওই আন্দাজটি বরাবরের মতো এক একটি আর্টের পর্যায়েই থেকে গেছে সায়েন্স হতে পারেনি। যাত্রার রোমান্সটি অনুভব করি, কিন্তু যাত্রাপথ বলতে পারিনা।

তবে অতি সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে গাণিতিক মডেলিং করে পাখিদের সম্ভাব্য পথের একটি দিশা এখন পাওয়া যাচ্ছে, যদিও হুবহু পথটি এখনো পুরো নিশ্চিত করা যায়না। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত এই গবেষণা বিবরণীতে দেখা যায় এতে 'বার্ডফ্লো' (পাখি প্রবাহ) নামে একটি সফ্‌টওয়্যার গড়ে তোলা হয়েছে যা ওভাবে পথের দিশা দিতে পারছে। এর প্রয়োগের একটি নমুনায় দেখা গেছে বসন্তের শুরুতে আমেরিকান উডকক নামের যে পাখি টেক্সাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলের আরো কয়েকটি রাজ্যে শীত কাটিয়ে একেবারে কানাডা সীমান্তে তাদের স্বাভাবিক বসতে ফিরে যায়। প্রত্যেকটি পাখি-দলের ক্ষেত্রে বার্ডফ্লো সফ্‌টওয়্যারটি ব্যবহার করে তার যাওয়ার ও আসার পথের ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু এরকম সফ্‌টওয়ারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করতে হয়েছে বলে তাকে আগেকার বহু পাখিদলের চলার পথের অসংখ্য উপাত্ত দিয়ে ট্রেনিং দিতে হয়েছে। এক্ষেত্রে কাজটি সহজ নয়, কারণ উপাত্ত পাওয়ার জন্য পাখির পথ চলাকে হুবহু অনুসরণ করা কোন প্রযুক্তি দিয়েই ভাল ভাবে করা সম্ভব নয়।

এখানে বরং নির্ভর করা হয়েছে সাধারণ পাখি পর্যবেক্ষকদের থেকে পাওয়া কিছু উপাত্তের ওপর। বিভিন্ন স্থানে প্রতি সপ্তায় একটি প্রজাতির পাখিকে কী সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে, এবং এক একটি জায়গায় পাখির মোট সংখ্যা, এই দুটি তথ্য থেকে ওই পাখির আগেকার চলার পথের উপাত্ত নির্ণয় করা হয়েছে। মোট পাখির মধ্যে এই পাখির অনুপাত অনেক বেড়ে যাবে যদি এসময় দূর থেকে আসা ওই পাখি ওই জায়গার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। এরকম ব্যাপক ভাবে সংগৃহীত তথ্য থেকেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য ডাটাবেস গড়ে তোলা হয়েছে। কাজেই সর্বত্র ছড়ানো অনেক পাখি-প্রেমিক পর্যবেক্ষক আছে বলেই অতি বৈজ্ঞানিক ভাবে গড়ে তোলা এই ভবিষ্যদ্বাণীর উপায় আবিষ্কৃত হতে পেরেছে। অথচ তাদের কাজটি নেহাতই ভালবাসার ওপর ভিত্তি করা, সরল কৌশলের কাজ।

তবে ডাটাবেইসকে পরিশীলিত করে নেবার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সুযোগও নেয়া হয়েছে। যেমন অন্য গবেষণার কাজে কিছু কিছু পাখির সঙ্গে জিপিএস যন্ত্র দেয়া আছে যা ওড়ার সময় প্রত্যেক পর্যায়ে নিজের অবস্থানটি দূরে বিজ্ঞানীকে জানিয়ে দিয়ে দিয়ে যায়– এমনি ভাবে নিজের পথটিকে হুবহু বলে দিয়ে যায়। তাছাড়া বিমান বন্দরের রাডার যন্ত্রে যেভাবে আকাশে যাওয়া আসা করা বিমানগুলো ধরা পড়ে তেমনি নানা জায়গায় থাকা রাডারেও কাছে দিয়ে উড়ে যাওয়া পাখি ধরা পড়ে। তবে এতে ভুল হবার সুযোগ থাকে যথেষ্ট, কারণ ঝাঁকের পাখির প্রজাতিটি তো রাডারও বুঝতে পারেনা, অন্য পাখিও হতে পারে। অবশ্য যদি অন্য ভাবে জানি যে এই অঞ্চলে ওসময় কাম্য পাখিটি বেশি দেখা যাচ্ছে, ওখানে রাডারে চিহ্নিত হওয়া পাখির ঝাঁক ওই প্রজাতির হবে এমন সম্ভাবনা ধরে নেয়া যায়। কাজেই শেষ পর্যন্ত পাখি পর্যবেক্ষকদের তথ্য দরকার হচ্ছেই।

পথের ভবিষ্যদ্বাণী যেভাবে করা গেছে সে ভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন এর সঙ্গে ওখানকার পরিবেশের ও জলবায়ুর উপাত্তগুলো যুক্ত করার চেষ্টা করছে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে পাখির পথের কী রকম পরিবর্তন তারও ভবিষ্যদ্বাণীর আয়োজন চল্‌ছে। ওগুলো যে জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণা সহ আরো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে খুবই উপকারী তথ্য হবে এবং নানা রকম বিশেষজ্ঞ,

নীতি নির্ধারক, পাখি প্রেমিক সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে তাতে উৎসাহ নেবেন এবং ওই মডেলের বিকাশে অবদান রাখবেন তাতে সন্দেহ নেই।

'সংখ্যার বিগ্‌ব্যাং'- সাহিত্য চর্চার ফলে গণিতপ্রীতি:

মনিল শুরি ভারতীয় বংশোদ্ভুত একজন আমেরিকান গণিতবিদ। কিন্তু সাহিত্য জগতেও প্রচুর নাম করেছেন– ঔপন্যাসিক হিসেবে। নিজের সাহিত্য চর্চায় তাঁর একটি প্রয়াস সব সময় থেকেছে, সেটি হলো গণিতের মজা যারা এখনো পায়নি সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সেই মজা দেয়া। এ ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্বাস তাঁর সাহিত্য যাদের কাছে ভাল লাগবে, সেই সুবাদে গণিতও তাদের ভাল লাগবে। এই ভাল লাগানোটি তাঁর একটি ব্রত। তাঁর কথা হলো তিনি নিজে গণিত চর্চা করে পুরো আনন্দ পাননা যদি না তাঁর আশেপাশের সবাই গণিতের মধ্যে মজা পান, এর রস আস্বাদনে অন্তত চেষ্টাটুকু করতে পারেন। উপন্যাস লেখা সম্পর্কেও তাঁর একই কথা– দশ জন তা পড়তে ভালবাসেন বলেই তিনি লেখেন। অবশ্য তাঁর সব সাহিত্য উপন্যাস নয়, নানা রকম সাহিত্য তিনি সৃষ্টি করেন, সেটি গণিত নিয়েও কম নয়।

মনিল শুরির সর্বশেষ বইটিও গণিত নিয়ে– কিন্তু সাহিত্য-ধর্মী: নাম 'সংখ্যার বিগ ব্যাং'। আধুনিক তত্ত্বে মহাবিশ্বের সৃষ্টির মুহুর্তটিকে বলা হয় বিগ ব্যাং। এটি একটি অনন্য অদ্ভুত মুহূর্ত– যখন ছিল শুধু শূন্য, স্থান বা কাল কিছুই ছিলনা, ওর মধ্য থেকে হঠাৎ একটি বিন্দুর আকারে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিলো– তাতেই শুরু হলো স্থান, শুরু হলো কাল, শুরু হলো মহাবিশ্বের সব কিছু। তবে কী করে ওরকম একটি ঘটনা সম্ভব হলো, কিছু নেই থেকে সব কিছু? এর আগে কী ছিল? স্থান-কাল কিছু ছাড়া একটি অবস্থা তো কল্পনাও করা যায়না, যেন একটি অগম্য কিনারা যার ওদিকে যাওয়া যায়না, শুধু এদিকেই থাকতে হয়। গণিতে এমন অবস্থাকে বলা হয় একটি সিঙ্গুলারিটি। মনিল শুরি চেয়েছিলেন গণিতের একেবারে মৌলিক সহজ জিনিসগুলো থেকে সিঙ্গুলারিটির ধারণাটি তাঁর সাহিত্যে গড়ে তোলা– সেই সঙ্গে মহাবিশ্বের সৃষ্টির কথা। এটি পড়লে বোঝা যায় এখানেও তিনি মহাবিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্বটির দুর্দান্ত বিষয়গুলোর অবতারণার সুযোগে গণিতের প্রতিও আগ্রহ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।

সাধারণত গণিতকে যে সব লেখকরা জনপ্রিয় করতে চান তাঁরা দৈনন্দিন জীবনে এবং জনপ্রিয় নানা কাজে গণিতের ব্যবহারগুলো তুলে ধরেন। তবে যেটুকু গণিতের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত হয়েছেন সেটি ভাল লেগেছে এমন সব পাঠকের দিকেই তাঁরা নজর দেন। সেই পাঠকদের জন্য গণিতের আরো চমকপ্রদ বিষয়গুলো তুলে ধরে তাঁদেরকে আরো উৎসাহিত করেন। কিন্তু যে পাঠকরা গণিতে বিমুখ, একে নিজেদের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন বিষয় মনে করেননা, তাঁদের জন্য সেরকম লেখা কাজ করবেনা। শুরি তাঁদের জন্যই সাহিত্য রচনা করেন, তিনি তাঁদেরকে তাঁর উপন্যাসের ও অন্যান্য সাহিত্যের মাধ্যমে অন্য এক ভূবনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন যেখানে তাঁরা আকৃষ্ট হয়ে বুঁদ হয়ে পড়তে পারেন। সেই সুযোগেই গণিতকে সেখানে এনে তাকেও একই ভাবে ভাল লাগাবার চেষ্টা করেছেন, আগে যাঁদের ভাল লাগতোনা। সংখ্যার বিগ ব্যাং বইটিতে মহাবিশ্বের সৃষ্টির থেকে সংখ্যার বা গণিতের যে সিঙ্গুলারিটির ধারণা তাকে সামনে এনেছেন। সিঙ্গুলারিটি এমন একটি গাণিতিক বিষয় যা বিজ্ঞানীর বাস্তবতায় ঘটনা হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়, একই সঙ্গে এটি মহাবিশ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি কিনারা। সংখ্যার কথায় বল্‌লে সেইখানটিতে সংখ্যাটি হলো ইনফিনিটি বা অসীম যেটি বাস্তবতায় ধারণ করার মত কোন সংখ্যা নয়। এই ভাবে মহাবিশ্বের কথা আর সংখ্যার কথা মজা করে বোঝার চেষ্টা, এই দুইয়ের মধ্যে আনাগোনার মধ্য দিয়ে বইটিতে মনিল শুরি উভয় বিষয়ে পাঠকের দারুণ কৌতুহল গড়ে তুলেছেন।

মনিল শুরির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাঁকে দেখিয়েছে অধিকাংশ দেশে, সেটি কম উন্নত হোক অথবা বেশি উন্নত হোক, গণিত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ব্যাপক অনীহা ও ভুল বুঝাবুঝি রয়েছে। তাঁর জন্মভূমি ভারতে যেখানে তিনি গণিতবিদ হয়ে উঠেছেন সেখানে সাধারণ মানুষকে গণিত থেকে দূরে থাকতে দেখেছেন। কিন্তু সেখানে তাঁদের গণিতের প্রতি ভয় থাকলেও গণিত না জানার ব্যাপারে তাদের কিছু লজ্জাবোধ থাকতে ও গণিতবিদদের কাজের বিষয়ে সশ্রদ্ধ আগ্রহ থাকতে দেখেছেন। কিন্তু এখন যেই যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি নিজের দেশ করেছেন সেখানেও দেখছেন সাধারণ মানুষ গণিত জানেননা এবং তাকে ভয় করেন, কিন্তু তাঁরা স্পষ্ট বলে দেন যে তাঁরা গণিতের ধার ধারেননা, এটি তাঁদের আকর্ষণ করেনি কখনো। একথা বলার পর তাঁরা সামনের গণিতবিদের কাছ থেকে নির্লিপ্ততার সঙ্গে সরে যান। এই

মনোবৃত্তিটাই তাঁকে সব চাইতে বেশি ব্যাথা দেয়, এবং একেই তিনি পরিবর্তন করতে চেষ্টা করছেন তাঁর সাহিত্য দিয়ে।

ওই যে বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষ তাঁদের সঙ্গে গণিতের পরিচয় প্রায় ক্ষেত্রেই স্কুলেই শেষ হয়ে যায়। খুব সরল কিছু পাটিগণিত, অ্যালজেব্রা, জ্যামিতির অতিরিক্ত কোন গণিত সারা জীবনে প্রয়োজন হবার কারণ দেখেন না। স্কুলে যদি বাধ্যতামূলক ভাবে কোয়াড্রেটিক ইকোয়েশনের সমাধান করে থাকেন, বাকী জীবনে কোনদিন ওই নামটি শোনারও কোন প্রয়োজন তাঁর হবেনা। এর বিপরীতে অবশ্য কেউ বলতে পারেন ওই সাধারণ মানুষ তো এ্যাক্সপ্রেশনিস্ট আর্টের বিষয়ও বোঝেন না এবং তা তাঁর জীবনে কোন কাজে লাগেনা। কাজেই এক্ষেত্রে তো আর্টও গণিতের মতই। কিন্তু তাই বলে কি আমরা এ্যাক্সপ্রেশনিস্ট আর্টে আকৃষ্ট হবোনা? অধিকাংশ মানুষ আকৃষ্ট হতে চাইবেন এমনই বলবেন। কিন্তু গণিতের ক্ষেত্রে তা বল্‌বেন না। গণিতবিদদের নিয়ে যে ক'টি সিনেমা তৈরি হয়েছে সেখানে গণিতবিদকে একজন পাগল জিনিয়াস হিসেবেই দেখানো হয়েছে, স্বাভাবিক আকর্ষণীয় ব্যক্তি হিসেবে নয়। সিনেমা নির্মাতারা ওখানে গণিত-প্রীতিকে মোটামুটি একটি বাতিক বা রোগ হিসেবেই দেখাতে পছন্দ করেছেন। সিনেমা যা করেছে অন্যান্য আর্টও গণিতের জন্য তার চেয়ে বেশি কিছু করেনি। মনিল শুরি তাঁর সাহিত্য দিয়ে এর বিপরীতটিই করতে চেয়েছেন।

যোগাযোগ সবার সঙ্গে সবার

কষ্টে থাকা উদ্ভিদের চিৎকারঃ

অনেক প্রাণীদের সঙ্গে যেমন, উদ্ভিদের সঙ্গে মিতালি করার ইচ্ছাটাও মানুষের চিরন্তন; সাধারণ মালি বা কৃষক এটি করেন তাঁদের কাজ করতে গিয়ে, অন্য সাধারণ মানুষ শুধু মনের টানে উদ্ভিদের হাসি-কান্না দেখেন– হাসিতে আনন্দে মন ভরে যায়, কান্নায় মন বিচলিত হয়। যে কোন যোগাযোগের আকাঙ্খাই মানুষকে শিল্প সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে; সাহিত্য, দৃশ্য-নির্ভর শিল্প– চিত্রশিল্প বা ভাস্কর্যের মত, অথবা করে দেখানোর শিল্প– সঙ্গীত বা নৃত্যের মত। উদ্ভিদ জগতের সঙ্গে যোগাযোগও সেই জগতের সংবেদনশীলতার জন্য, নান্দনিকতার জন্য, যা শিল্পীদেরকে সৃজনশীলতার দিকে নিয়ে যায়। যোগাযোগের আসল প্রকৃতিটি ধরিয়ে দেন বিজ্ঞানী; যদিও বাকি সবার কাছ

থেকে প্রেরণা আসে বলেই তিনি এই প্রকৃতিটি উদ্ঘাটনে উৎসাহী হন। আমাদের বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু নিজেই একাধারে এতে আর্টের প্রেরণা ও বিজ্ঞানের উদ্ঘাটন উভয়েই সৃষ্টি করেছেন। তিনি অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং সূক্ষ্ম সব যন্ত্র তৈরি করেছেন– বলতে গেলে পুরোপুরি যান্ত্রিক ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে, যাতে নানা রকম পীড়নে উদ্ভিদের টানাপোড়েনটি আমাদের গোচরে আনা যায়। উদ্ভিদের ছোট্ট নড়াচড়ার প্রতিক্রিয়াগুলোকে বিবর্ধিত করে তিনি তাকে পরিমাপ ও গবেষণার মধ্যে এনেছিলেন। আবার সাহিত্যিক রূপে তিনিই তাঁর 'অব্যক্ত' বইয়ে উদ্ভিদের বেদনাকে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন।

পরবর্তী কালের নানা বিজ্ঞান গবেষণায় দেখা গেছে যে যে কোন ভাবে পীড়িত হয়ে বা আঘাতে 'ব্যথা' পেলে উদ্ভিদ ওই সব যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া ছাড়াও আরো নানা ভাবে তা প্রকাশ করে– যেমন নিজের রং বদলিয়ে অথবা গন্ধ বদলিয়ে। গন্ধের ক্ষেত্রে তার শরীর থেকে কিছু অর্গানিক অণু নির্গত করে যার পরিবর্তিত গন্ধ দূরের অন্যদের কাছে যেতে পারে। খরায় জলকষ্টে ভুগলে, উদ্ভিদভোজী প্রাণীর কামড় খেলে, অন্য কোন ভাবে আঘাত পেলে এমনি প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে– প্রত্যেকটির জন্য পৃথক প্রতিক্রিয়া। মজার ব্যাপার হলো এই গন্ধ সিগন্যালটি কাছাকাছি থাকা একই রকম অন্য উদ্ভিদও টের পায়, এবং একই পীড়ন ওদের ওপরও যেন না ঘটতে পারে সে জন্য তারা আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও নিতে পারে। তাদের পারস্পরিক যোগাযোগের জন্যই সিগন্যাল ব্যবস্থাটি উদ্ভিদের মধ্যে বিবর্তিত হয়েছিলো, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ যেন তার একটি উপরিপাওনা। ওই অর্গানিক অণুর প্রকৃতির মধ্যে, অর্থাৎ ওই সিগন্যালের মধ্যেই কোন ভাবে তথ্যটি রয়েছে যে উদ্ভিদটি কী রকম পীড়নের কষ্টে রয়েছে।

এগুলোর আবিষ্কার আগেই ঘটেছে। বাকি ছিল শুধু সরাসরি আওয়াজ করে উদ্ভিদ নিজের কষ্টের কথা বলতে পারে কিনা তা। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত একটি বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফল দেখে মনে হচ্ছে সেটিও আর বাকি থাকেনি। এখন আমরা কষ্টে থাকা উদ্ভিদের আর্ত চিৎকারও শুনতে পারি, বুঝতেও পারি। এই গবেষণাটি হয়েছে টম্যাটো আর তামাক উদ্ভিদ নিয়ে। একটি 'শব্দ বাক্সের' ভেতর উদ্ভিদগুলো রাখা হয়েছে, আবার অন্য পর্যায়ে বড় একটি গ্রীন হাউসের মধ্যে অন্য নানা উদ্ভিদের মধ্যেও রাখা

হয়েছে। দেখা গেছে এসব টম্যাটো আর তামাক চারার কাছে সংবেদনশীল মাইক্রোফোন রাখলে তাতে ওই উদ্ভিদ থেকে আসা অতি উচ্চ ফ্রিকোন্সির আলট্রা-সাউন্ড ধরা পড়ছে এবং রেকর্ড করা যাচ্ছে। একই রকম উদ্ভিদকে তিন বিভিন্ন অবস্থায় রেখে তার প্রত্যেকটি থেকে আসা এই শব্দ রেকর্ড করা হয়েছে। একটিতে উদ্ভিদকে পানি বঞ্চিত রেখে জলকষ্টে রাখা হয়েছে খরার উদ্ভিদের মত। আরেকটিতে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত উদ্ভিদ। আরো একটিতে স্বাভাবিক ভাল অবস্থাতে থাকা উদ্ভিদ। তিনটি থেকে আসা শব্দকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সিগন্যাল বহন করতে দেখা গেছে। এর মধ্যে প্রথম দুটাকে তো কষ্টে থাকা উদ্ভিদের আর্ত চিৎকার হিসেবে গণ্য করাই যায়।

প্রশ্ন হলো এই চিৎকারের মধ্যে আর্তনাদের কোন তথ্য আমরা বের করতে পারি কিনা, অর্থাৎ উদ্ভিদ তার কষ্ট নিয়ে কিছু বলতে চাচ্ছে কিনা আর সেটি আমরা বুঝতে পারছি কিনা। সেটি উদ্ঘাটনের জন্য এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ও মেশিন লার্নিং এর সহায়তা নিয়েছেন। যেমন টম্যাটো উদ্ভিদের বহু স্যাম্পল থেকে বিভিন্ন রকমে জলকষ্টে থাকা এবং বিভিন্ন ভাবে আসতে পাওয়া উদ্ভিদের শব্দ কী ভাবে এসেছে তার ব্যাপক উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমেই মেশিন লার্নিং ঘটতে পেরেছে। সেভাবে তামাক উদ্ভিদেরও। ওভাবে আবার টম্যাটো ও তামাকের চিৎকার পরস্পর থেকে আলাদা করার এবং আরো নানা উদ্ভিদ যে সেখানে এক রকম ‘নয়েজ’ বা কোলাহল সৃষ্টি করছে তার থেকে ওই আসলটির বার্তা ফিল্টার করে নেবার অভ্যাসটিও মেশিন লার্নিং এর ট্রেইনিঙে এসেছে। এ ভাবে গড়ে ওঠেছে উদ্ভিদের আর্ত চিৎকারের বক্তব্য বোঝার জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মডেল। এ যেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাম্প্রতিক যে মডেলগুলো অদ্ভুত অপরিচিত বিদেশী ভাষা বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয়, অনেকটা সেভাবে।

এতো শুধু প্রাথমিক পদক্ষেপ। আশা করা হচ্ছে যে এই মডেল চাষের ক্ষেতের উদ্ভিদ ফলানোর সময় কোথায় কোন্ উদ্ভিদে কী কষ্ট সৃষ্টি হয়েছে– খরা, রোগাক্রমণ, পোকার আক্রমণ ইত্যাদির ব্যাপারে উদ্ভিদের নিজের পাঠানো আর্ত বার্তা এক জায়গায় বসে পাওয়া যাবে, এবং সঠিক জায়গায় দ্রুত প্রতিকার নেয়া সম্ভব হবে। আরো গবেষণা চলবে অন্য প্রাণী ও উদ্ভিদ এই সব আর্ত বার্তা শুনতে পারে কিনা এবং তাতে কোন প্রতিক্রিয়া দেখায়

কিনা। এই সব কিছুর নানা বাস্তব উপকার অবশ্যই গবেষণার লক্ষ্য হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে সবার সাথে সবার যোগাযোগে সব মানুষের যে একটি কৌতুহল ও আকাঙ্খা আছে সেটিকে পরিতৃপ্ত করার বিষয়টিও বাদ যাবেনা। জগদীশ চন্দ্র বসুর মত অনেক বিজ্ঞানীর উদাহরণে আমরা দেখেছি বিজ্ঞানী মন কখনো শিল্পী মন থেকে দূরে থাকেনা– একই অনুপ্রেরণা থেকে তাঁরা সৃষ্টি করেন।

বেড়ালের সঙ্গে আলাপঃ

আমাদের খুব কাছের যে ক'টা পোষা-প্রাণী আছে তার মধ্যে বেড়াল বোধ হয় সব থেকে বেশি নির্লিপ্তের ভাব করে। কুকুর বা অন্য কেউ কেউ যে ভাবে মনিবের সঙ্গে সব সময় খুনসুটির মধ্যে থাকে বেড়াল কিন্তু তা নয়– তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা কথায় সাড়া দেয়ার অভ্যাস কম। এটি অবশ্য সামনা সামনি চোখে পড়ার মত সাড়ার কথা। তবে বেড়ালের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠ তাঁরা ঠিকই জানেন যে নীরবে তার ভালবাসা ও আনুগত্য প্রকাশ করতে এবং মান-অভিমান দেখাতে বেড়ালও কম যায়না। এখন কিছু নতুন গবেষণার ফল দেখে মনে হচ্ছে যে বেড়ালের সব আচরণ ও আবেগ যে আমাদেরকে নীরব অনুভূতি দিয়ে বুঝতে হয় তার একটি কারণ হলো সরাসরি প্রদর্শনের জন্য তার যে ভাষা সেটি আমরা বুঝতে শিখিনি। দেখা যাচ্ছে বেড়ালের এই সরাসরি বক্তব্যটি তার মুখে নয় আছে তা চোখে।

বিড়াল-প্রিয় যে কোন মানুষ লক্ষ্য করে থাকবেন যে বেড়ালের একটি অভ্যাস চোখ দুটিকে আধ বোজা অবস্থায় চিকন একটু ফাঁকে খোলা রেখে তাকিয়ে থাকা। ওই অবস্থাতেই খুব ধীরে ধীরে সে চোখের পলক ফেলে– চোখ পুরো বন্ধ করে, আবার ধীরে ধীরে আধ খোলা অবস্থায় ফিরে এসে। সবাই ভাবেন এইটুকু করতে বেড়ালের ভাল লাগে। কিন্তু এখন ২০২০ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে এর মধ্যে অনেক কিছুই বেড়াল জানাতে চায়। এতে ইতস্তত বেশ কিছু পোষা বেড়ালকে তাদের মালিক সহ গবেষণা কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য মালিকরা ছাড়াও গবেষকদের নিজেদের মধ্যেও কেউ কেউ এতে বেড়ালের সঙ্গে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন। এভাবে একটি বেড়ালের সঙ্গে দু'রকম মানুষের বিক্রিয়া হয়েছে– একজন তার অতি পরিচিত মালিক। অন্য জন তার একেবারে অপরিচিত।

যখন মালিক তাঁর বেড়ালের মুখোমুখি হবেন তখন মুখের দিকে তাকিয়ে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যথাসম্ভব চোখে চোখ রেখে। সাধারণত বেড়াল এটি খুব বেশি করেনা, কারণ সে একে আক্রমাণত্মক একটি আচরণ মনে করে ভয় পায়। তবে গবেষণায় মালিক তাকে এতে নির্ভয় দিয়ে চোখে চোখে তাকাতে অভ্যস্ত করতে পারেন। তাছাড়া গবেষণাতে মালিক তাই করেন যা বেড়াল অভ্যাসবশত নিজে নিজে করে– তিনি নিজের চোখ আধবোজা অবস্থায় নিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে ধীরে ধীরে বার বার পলক ফেলেন, পুরোটাই বেড়ালকে দেখিয়ে দেখিয়ে। দেখা গেছে যে মালিকের এটি করা দেখে বেড়াল নিজেও বার বার এই একই কাজ করতে থাকে। এটি রেকর্ড করা হয়েছে এবং তখন বেড়াল তার চোখে কী করেছে তাও রেকর্ড করা হয় ভিডিয়ো করে। এগুলো যতগুলো ক্ষেত্রে করা হয়েছে বেড়ালের আচরণটি সব বেড়াল ও মালিকের ক্ষেত্রে সংখ্যাতাত্ত্বিক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

একই রকম কাজ বেড়ালকে অপরিচিত গবেষকের চোখে চোখে তাকানোর অবস্থায়ও করা হয়েছে। যদিও এক্ষেত্রে অপরিচিতির কারণে একটু বেশি দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রেও বেড়াল শেষ পর্যন্ত সাড়া দিয়েছে। অপরিচিত মানুষটি যে রকম আধবোজা চোখ থেকে পলক ফেলেছে, বিড়াল নিজেও তাই করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে সেই অপরিচিত গবেষক বিড়ালের চোখে তাকিয়েছেন বটে কিন্তু ঐ আধবোজা পলক ফেলার কাজটি করেননি। সে ক্ষেত্রে বেড়াল কিন্তু তাঁর দিকে কোন মনোযোগই দেয়নি। মালিকের ক্ষেত্রেও তিনি শুরুতে ওটি না করলে বেড়াল মনোযোগ না দিয়ে চলে যায়।

এই সব রেকর্ডিং, সব বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে চোখের ওই ইশারা বেড়ালের জন্য এক ধরনের বার্তা, এবং তার উত্তরে বেড়াল একই বার্তা দেয়। একে একটি ‘হ্যালো’ বলে যা ‘কেমন আছেন’ বলে হাসি দেবার মত একটি বার্তা বলেই মনে হয়– বেড়ালের সঙ্গে সরাসরি আলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

তার অতি পরিচিত যে মালিক তিনি যখন তার ভাষাতেই হ্যালো বলেন তখন সে খুব খুশি হয়েই সঙ্গে সঙ্গে তাতে সাড়া দেয়, আমরা অন্তরঙ্গ কাউকে দেখলে যা করি। অপরিচিতের ক্ষেত্রে প্রথমে একটু দ্বিধায় থাকলেও

নিজের ভাষায় হ্যালো শোনার পর সেটি কেটে যায়, এবং এক্ষেত্রেও সে একই বার্তা ফিরিয়ে তাঁকে স্বাগতম জানিয়েছে। বেড়াল স্বল্পভাষী প্রাণী, তাই তার অনেক খানি আলাপ এই হ্যালো আর স্বাগতমের হাসির মধ্যেই সেরে ফেলে। তবে সেটি মুখোমুখি আলাপের ক্ষেত্রে সত্যি হলেও এই স্বল্পভাষী বেড়াল তার নীরব আবেগ প্রকাশ করে তা পুষিয়ে দেয়। ওই বেড়ালকেই দেখা যায় তার মালিকের জন্য বাড়ির ফটকের কাছে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে, যখন আসতে দেখে হৈ চৈ করে ফুর্তি প্রকাশ না করলেও তাকে বাড়ির ভেতরে নীরবে অনুসরণ করে তার আবেগ প্রকাশ করতে। খাওয়া দাওয়া নিয়ে, পাশে বসতে দেয়া নিয়ে জেদ করতে বা অভিমান করতে তাকে দেখা যায়। এগুলো বেড়াল-প্রিয় মানুষরা মোটামুটি আগে থেকে জানতেন। কিন্তু ওই সামনাসামনি চোখের ভাষায় হ্যালো বলা– এই আবিষ্কারটি একেবারেই নতুন। যে বিজ্ঞানীরা এরকম গবেষণা করেন তাঁরা কি বেড়ালের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের আর্টগুলোতে নির্লিপ্ত থেকে তা করতে পারেন?

কনসার্টে শ্রোতাদের হার্টেও ঐকতান:

সঙ্গীত দেহ-মনকে আপ্লুত করে, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে সহায়তা করে সেটি বহুদিন ধরে বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত সত্য। কাজেই দেহ-মনের সঙ্গে সঙ্গীতের যে একটি বিক্রিয়া আছে তা স্পষ্ট। বিজ্ঞানে প্রমাণ হবার আগেই সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ সেটি ঠিকই অনুভব করেছেন– সঙ্গীতের আর্টের মধ্যেই সেই ভাল লাগা, সেই অন্য ভূবনে চলে গিয়ে দেহ-মনে প্রশান্তির আনার বিষয়টি নিহিত আছে। কিন্তু সম্প্রতি যা গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে তা বিশেষ করে কনসার্ট সঙ্গীতের ক্ষেত্রে, যেখানে একটি হলঘরে বেশ কিছু সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ একটি বিশেষ আবহে আচ্ছন্ন হয়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে সঙ্গীতে ডুবে থাকেন। সঙ্গীতটাও হয় জমজমাট প্রকৃতির, যাতে এভাবে হলঘরটি ভরে যায় এমনি বলতে হবে। সে রকম পরিবেশে হলভর্তি সব মানুষ শারীরবৃত্তের মধ্যে এক তালে আবর্তিত হওয়ার ছন্দটি খুঁজে পেয়েছেন বলতে হবে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত একটি গবেষণায় অংশগ্রহণকারী বিজ্ঞানীরা এমনই বলছেন। এই ফলাফলটি বড়ই অদ্ভুত– এটি সঙ্গীতের সঙ্গে শুধু একজন শ্রোতার দেহ-মনের সম্পর্ক নয়, বরং সঙ্গীত অনেক মানুষের দেহ-মনকে একই সূত্রে গেঁথে দিচ্ছে, নিজের প্রভাবে।

গবেষণাটি অবশ্য করা হয়েছে শুধু ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের কনসার্টে এক সঙ্গে থাকা সীমিত সংখ্যক মানুষের ওপর, তবে তার তাৎপর্য অনেক। তিনটি ভিন্ন চেম্বার মিউজিক হলে বীটাফোন, ডীন, এবং ব্রাহমের রচিত তিনটি সিম্ফোনি-মিউজিকের কনসার্টে থাকা ১৩২ জন শ্রোতার শারীরবৃত্তকে কনসার্ট চলাকালেই পরিমাপ করা হয়েছে। তাছাড়া এ অনুষ্ঠানের আগে ও পরে ভিন্ন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে তাঁদের প্রত্যেকের নান্দনিক প্রবণতা, সঙ্গীত ক্ষেত্রে পছন্দের অগ্রাধিকার, সঙ্গীতের ব্যক্তিগত উপভোগের দিকগুলো ইত্যাদি জেনে নেবার চেষ্টা। করা হয়েছে, এবং তাঁদের প্রত্যেকের সার্বিক ব্যক্তিত্বটিও আন্দাজ করার চেষ্টা ব্যক্তিত্বের দিক থেকে কেউ ছিলেন অন্তর্মুখি, কেউ বহির্মুখি; কেউ সরল, কেউ জটিল ইত্যাদি। কনসার্টের সময় অলক্ষ্যে ক্যামেরা তাঁদের প্রত্যেকের মুখ চোখ লক্ষ্য করে গেছে এবং প্রত্যেকের শরীরে সংযুক্ত নানা ইলেকট্রোড দিয়ে শারীরবৃত্তের নানা কিছু রেকর্ড করা হয়েছে।

পরে ফলাফলের বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে হৃৎকম্পনের হার, নিশ্বাসের হার, স্নায়ু সিগন্যাল প্রবাহ, শরীরের নড়াচড়া ইত্যাদি দিক থেকে কনসার্ট এগুবার সঙ্গে সঙ্গে সবার মধ্যে ধীরে ধীরে একটি ঐকতান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শুরুতে সেগুলো যতই আলাদা থাকুক না কেন। এ যেন সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও আশ্চর্যজনক ভাবে একই সুরে চলে এসেছেন। দেখা গেছে যারা যত খোলা মনের মানুষ, নতুন অভিজ্ঞতাকে উপভোগ করার উৎসাহ বেশি ও অন্যের সঙ্গে মিলিয়ে চল্‌তে পটু, তাঁরাই দ্রুত ওই ঐকতানে যোগ দিতে পেরেছেন। যাঁরা কিছুটা নিউরোটিক বা ভগ্ন-ব্যক্তিত্বের তাঁদের পক্ষে যেমন ঐকতানে আসা কঠিন হয়েছে, তেমনি খুব হই-হুল্লোড় করা মানুষও তাতে ভাল যোগ দিতে পারেনি। যাঁর সঙ্গীতপ্রীতি যেদিকে সেই কনসার্টে গিয়েই তিনি বেশি দ্রুত অন্যদের লয়ে যোগ দিতে পেরেছেন। যেমন বীটাফোনের বা ব্রাহমের মত কম্পোজারদের সৃষ্ট একটু সনাতন ক্ল্যাসিকালে যাঁরা আসক্ত তাঁরা সেই দু'জনের কনসার্টে, আবার ডীনের সৃষ্ট আধুনিক ক্ল্যাসিকালে যাঁরা তাঁরা শুধু সেটিতেই স্বচ্ছন্দে শারীরবৃত্তের ঐকতানে যোগ দিয়েছেন। এর সবই কিন্তু স্বয়ংক্রিয় ভাবে শরীরে ঘটেছে, তাঁদের নিজের কোন ঐচ্ছিক হাত ছিলনা, কিন্তু সঙ্গীত সেভাবেই তাঁদেরকে দেহ-মনে যুক্ত করে দিয়েছে।

যদিও একই রকম গবেষণা এখনো পপ্ কনসার্টের মত সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী সঙ্গীতের জন্য করা হয়নি, তবুও বিজ্ঞানীরা মনে করছেন সেখানেও শারীরবৃত্তের ঐকতানটি দেখা যাবে; এবং তাও ব্যক্তিত্ব ও নান্দনিক পছন্দের ওপর নির্ভর করবে। পপ কনসার্টের ঐকতানটি গবেষণা ছাড়াও খোলা চোখেও বেশ নজরে পড়ার মত– যেভাবে শ্রোতারা মুক্তভাবে সেখানে তালে তালে নড়াচড়া করে, নাচে যা হৃদকম্পন ইত্যাদির মধ্যেও প্রতিফলিত হবার কথা। তবে এক্ষেত্রে সত্যি সত্যি কতটা হয় তা গবেষণার আগে বোঝা যাবেনা। সঙ্গীতে নিজেদেরকে সমর্পন ব্যাপারটি বহুদিন ধরে একটি আর্ট হিসেবে আলোচিত ও সমালোচিত হয়েছে। তারই সূত্র ধরে এখন সেটি বিজ্ঞানের পরিমাপ যন্ত্রের কাছে সোপর্দ হয়েছে। বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য সমস্যা নির্বাচিত করার ব্যাপারে আর্টের সঙ্গে এক রকম পরামর্শের বিষয়টি যেন দিন দিন বেশি স্পষ্ট হচ্ছে।

স্থান-কালের দূরত্বে কল্পনা ও বাস্তব

স্টার ট্রেকের ন্যানো-প্রোবঃ

টেলিভিশনের ও মুভির কল্যাণে স্টার ট্রেক সিরিজের থেকে বেশি জনপ্রিয় বিজ্ঞানের কল্পকাহিনী মেলা ভার। ওখানে বোর্গ নামের এক ‘সাইবার-প্রজাতির’ কথা আছে। সেই প্রজাতির অতি শক্তিশালী হয়ে ওঠার পেছনে বড় কারণ তাদের ন্যানো-প্রোব– অতি ক্ষুদ্র রোবট যা কিনা সাধারণ জীবের কোষ পর্যায়ে পর্যন্ত ঢুকে তাকে অদ্ভুত সব ভাবে বদলিয়ে দিতে পারে, যেমন তার সামাজিক চেতনাবোধকে পর্যন্ত উল্টেপাল্টে দিতে পারে। এই শেষের কাজটির ফলশ্রুতি হবে ওই জীব তার নিজস্ব সভ্যতাকে এমন ভাবে মুচড়িয়ে নেবে যে সে বোর্গের সভ্যতার মধ্যেই একীভূত হয়ে যাবে। তার সক্ষমতা অতি সূক্ষ্ম, অতি ধ্বংসাত্মক এবং অতি আবোধ্য। সাধারণত সায়েন্স ফিকশন তো এ ভাবেই তার সাহিত্য বিস্তার করে– কল্পনাকে যথেচ্ছ বাড়তে দিয়ে। এজন্য অবশ্য এটি শুরু করে বিজ্ঞানে সত্যি সত্যি আছে, অন্তত বিজ্ঞান এমন কিছুর সম্ভাবনার হদিশ পেয়েছে, সে রকম জায়গা থেকে। কিন্তু তার ওপর ভর করে শিগগির যেমন খুশি তেমন দিকে চলে যায় যতটা না বিজ্ঞানের খাতিরে তার চেয়ে অনেক বেশি সাহিত্যের খাতিরে। স্টার ট্রেকের ন্যানো-

প্রোবের ক্ষেত্রে এই ফিকশন ভর করেছে বিজ্ঞানের ন্যানো-টেকনোলজির ওপর।

সাধারণত ফিকশন যখন একেবারেই যথেচ্ছ ঘুড়ি ওড়ানোর মত হয় তখন বিজ্ঞানীরা সেদিকে আর নজর দেন্না। কিন্তু যেহেতু স্টার ট্রেক অত্যন্ত জনপ্রিয় ও দীর্ঘকাল ধরে কৌতূহলী গল্প-প্রেমিক মানুষের ওপর যথেষ্ট প্রভাবশালী, বিজ্ঞানীরা এর প্রতি একেবারে নির্লিপ্ত থাকতে পারেন না। এর কারণ এরকম ফিকশন এমন ক্ষমতা রাখে যে সাধারণ মানুষের কাছে সত্যিকার ন্যানো-কণিকা বা ন্যানো-ডিভাইস যতটা পরিচিত তার থেকে অনেক বেশি পরিচিত ও জাজ্বল্যমান হলো এই কাল্পনিক ন্যানো-প্রোব, তার সকল ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী কাজকর্ম সমেত। বিজ্ঞানের সত্যিকার ন্যানো টেকনোলজি এক মিটারের একশ' কোটি ভাগের এক ভাগ সাইজের ছোট অণু গঠিত কণিকা নিয়ে কাজ করে, নতুন ধরনের বস্তু ও ডিভাইস তৈরি করে এর চমকপ্রদ কিছু গুণের সুযোগ নিয়ে– যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক, আলোক, ইলেকট্রনিক ইত্যাদি। যেটুকু আবিষ্কৃত ও অর্জিত হচ্ছে শুধু তাই বল্‌তে পারে, এর সীমাবদ্ধতাগুলোকেও তাকে তুলে ধরতে হয়। ওদিকে জনমনে যদি সায়েন্স ফিকশন কাল্পনিক সব অসাধ্য ধারণার সৃষ্টি করে, তখন তার নিজের বিজ্ঞান গবেষণার গণ-সংযোগে ও পৃষ্ঠপোষকতায় বিঘ্ন ঘটে, ভুল ধারণার সৃষ্টির মাধ্যমে। স্টার ট্রেকের ন্যানো-প্রোব জীবের জীবনকে ইচ্ছে মত পরিবর্তন করে ফেলতে পারে, তার চিন্তা-চেতনাকেও। যেমন একটি ক্ষেত্রে এটি নতুন ধরনের রক্ত-কোষ তৈরি করতে পারে যার কাজই সাধারণ রক্ত থেকে আলাদা। ন্যানো-প্রোব সাহিত্যে এগুলো তুড়ি মেরে করে ফেলতে পারে। কিন্তু সমস্যা হলো গল্পের ন্যানো-প্রোবে আবার সত্যিকার বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলছে মনে হবে এমন কিছু কথা সব সময় রাখা হয়। যেমন জীবের কোষে গিয়ে কিছু বাস্তব কাজ– ধরা যাক রক্তনালীর অস্ত্রোপচার– যা বিজ্ঞানের ন্যানো-যন্ত্রগুলো এখনই করতে পারছে। কিন্তু বাদবাকি যে সব কথা স্টার ট্রেক বলে সেগুলো বিজ্ঞানের কোন রকম আওতার ভেতরেই নেই, সুদূর সম্ভাবনার মধ্যেও নেই। ফলে এটি সাধারণ মানুষের চিন্তায় বেশ গোলমাল লাগিয়ে দিতে পারে কিছু সত্য কিছু অসত্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে।

এই সব দিক থেকে বিজ্ঞানকে এবং স্টার ট্রেকের মতো আর্টকে উভয়কে সতর্ক থাকতে হচ্ছে। তবে দুইয়ের একত্র কাজের ও পরস্পরকে প্রভাবিত করার অনেক সুযোগ তারপরও রয়েছে। বিজ্ঞানের নানা নিয়মের শাসনের ভেতরে না থেকে ফিকশন যে কল্পনার স্বাধীনতা নিচ্ছে সেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানকে পথ দেখিয়েছে এমন বলা না গেলেও বিজ্ঞানের জন্য একটি চিন্তার অবকাশের যতি যে তৈরি প্রায়ই করে তা বলতে হবে। যেমন ধরা যাক আমরা সাধারণ আটপৌরে বাস্তব জীবন-চিন্তাতেও অনেক সময় গল্প থেকে ইশারা পাই, গল্প এসে উপমার মাধ্যমে ওই বাস্তব চিন্তাকে ভাল ভাবে বোঝার সুযোগ করে দেয়, তাকে নতুন ভাবে দেখতে শেখায়, অনেক সময় নতুন ভাবে প্রকাশ করতেও শেখায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সেটি প্রচুর হয়ে থাকে। তবে স্টার ট্রেক যেমন দেখিয়েছে আর্ট বিজ্ঞানকে অনুপ্রাণিত যেমন করে, বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে তার জন্য সমস্যাও সৃষ্টি করে।

মঙ্গলে বাসের জন্য নগর পরিকল্পনা:

মঙ্গল গ্রহে এখনো আমরা যেতে পারিনি, যদিও যাওয়ার আয়োজন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। যাওয়ার পর ওখানে কলোনি করার ইচ্ছে আছে, তাই পূর্ণাঙ্গ একটি নগর পরিকল্পনা দরকার মঙ্গলে দীর্ঘকালীন বসবাসের উপযুক্ত করে। পৃথিবীতে যে কোন একটি নগর পরিকল্পনাতে বিজ্ঞান আর আর্টস মিলিয়ে যত রকম ভাবে সৃষ্টিশীল হতে হয় মঙ্গলে এই নগর পরিকল্পনায়ও তার সবই লাগে। কিন্তু পার্থক্য হলো ওখানে অর্ধেক বাস্তব আর অর্ধেক কল্পনা! কারণ মঙ্গলকে সশরীরে গিয়ে আমরা এখনো দেখিনি।

মঙ্গল অবশ্য এখন অপরিচিত জায়গা নয়, এ মুহূর্তে আমাদের একাধিক রোবট তার বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করছে, মাটি খুঁড়ে সেখানকার বস্তুর রাসায়নিক বিশ্লেষণ করছে, ছোট হেলিকপ্টার উড়িয়ে ওপর থেকে জরিপ করছে। যথেষ্ট তথ্যভাণ্ডার ইতোমধ্যেই জমেছে– তার ভিত্তিতেই আগাম নগর পরিকল্পনা করে রাখার জন্য বেশ কিছু নামকরা স্থপতি কোম্পানীকে আহ্বান জানানো হয়েছিলো; সব থেকে সন্তোষজনক নগর পরিকল্পনা এসেছে ২০২১ সালে আবিবু নামের কোম্পানীটি থেকে– তারা 'নুওয়া' নামের একটি মঙ্গুলে নগরের পূর্ণ ডিজাইন করে দিয়েছে।

যেহেতু নগরটি মঙ্গল গ্রহের কাজেই শুধু ডিজাইন একটি করে দেয়াটিই যথেষ্ট নয়, ওখানকার সব বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় এনে এটি বিশাল এক কর্মযজ্ঞের বিস্তারিত প্রকল্প বই নয়। নুওয়া আড়াই লক্ষ মানুষের থাকার মত একটি বড়সড় নগরী- এর জায়গা নির্বাচন থেকে শুরু করে প্রতিদিনের খাদ্য রসদ কী ভাবে আসবে তাও সেই নগর পরিকল্পনার অংশ করতে হয়েছে। নুওয়া নামটি এসেছে চীনা উপকথার এক দেবীর নামে, একটি শহরের ভিত্তি স্তম্ভ তৈরি করার জন্য যিনি নিজের জাদুকরী শক্তি দিয়ে পাঁচটি জগদ্দল পাথরকে গলিয়ে ফেলেছিলেন। নুওয়া নগরটির স্থান নির্বাচন করা হয়েছে মঙ্গলের থারসিস অঞ্চলে এমন একটি জায়গায় যেখানে পর্বত-দেয়ালের আড়ালে পর্বত-গুহায় পুরো নগরের সঙ্কুলান হয়, অথচ সামনে গুহার বাইরেই কৃষি উৎপাদনের সুযোগ আছে। আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি, কসমিক রশ্মি ইত্যাদি থেকে জীবনরক্ষার জন্য মঙ্গলের গভীর ভূগর্ভে থাকা শহরে থাকতে হবে এমন ধারণা বাতিল করে নুওয়া মোটামুটি ভূমি সমতলে থাকারই ব্যবস্থা করেছে এমন পাহাড়ী গুহার সুযোগ নিয়ে সেখানেই মারাত্মক রশ্মিগুলো থেকে সুরক্ষা পাওয়া যাবে।

এই ডিজাইনে নগরের ভবনগুলো হবে বড় বড় টিউবের সমন্বয়ে প্রত্যেকটি লম্বায় ৬০ মিটার আর প্রশস্ততায় ১০ মিটার বিভিন্ন টিউব পরস্পর সুড়ঙ্গ পথে যুক্ত। টিউবের সঙ্গেই কাছে থাকবে সবুজ এলাকা, আর পুরোটাতেই উত্তাপ, বায়ুচাপ, বাতাসের চলাচল ইত্যাদি স্বাভাবিক বসবাসের মত করেই সৃষ্টি করা হবে– বাতাস, পানি সব সময় বিশোধিত করে বার বার রিসাইক্লিং করা হবে। মঙ্গল গ্রহ পৃথিবী থেকে অনেক দূরে; পৃথিবী থেকে কোন রসদ এনে এই নগর গড়া যাবেনা, সবই মঙ্গল থেকেই সংগ্রহ করতে হবে– এই লাল মাটির ভূমি থেকে। এটি নগর পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ছিল বিরাট একটি চ্যালেঞ্জ। কিন্তু তারও একটি কাজের রোড ম্যাপ এতে আছে। কী ভাবে মঙ্গলেই সৃষ্টি করা হবে পৃথিবীর মত কার্বন চক্র, অক্সিজেন চক্র এবং নাইট্রোজেন চক্র যা রোড ম্যাপের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মঙ্গলে খাদ্য ফলাবার কৃষির জন্য এর দরকার হবে।

নুওয়া নগরের পরিকল্পনাকে অবশ্যই বিজ্ঞানময় হতে হয়েছে। পৃথিবীর মানুষকে মঙ্গলে স্বচ্ছন্দে থাকার ও কাজ করার ব্যবস্থা করে দিতে বিজ্ঞানই

ভরসা। তাই যাঁরা পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করেছেন তাঁরা অধিকাংশই বিজ্ঞানী–বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই ছিল তাঁদের সহায়। এর বহু কিছুই হয়তো ল্যাবোরেটরিতে এবং পৃথিবীর অনুরূপ পরিস্থিতিতে সফল হয়েছে। কিন্তু তাঁদেরকে দেখতে হয়েছে মঙ্গলের যে ভূমিতে মানুষ এখনো যায়নি সেখানে নগর গড়ার বাস্তবতায় সে সব কতখানি যুৎসই হবে। এত বড় কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা করতে তাঁদেরকে বাস্তববাদী হতে হয়েছে। সেই সঙ্গে আরো একটি জিনিস তাঁদের জন্য খুবই প্রয়োজন হয়েছে, মানুষের কল্পনায় রূপ পাওয়া একদিন পৃথিবীর বাইরে আবাস গড়ার স্বপ্ন ও আকাঙ্খা, যেটি শত শত বছর ধরে চলেছে, তারও একটি প্রতিফলন বাস্তব-সম্মত ভাবে ঘটাতে হয়েছে। বিজ্ঞানীর কল্পনা যে রকম সেখানে স্থান পেয়েছে তেমনি স্থান পেয়েছে সাহিত্যিক-শিল্পী সহ অন্যান্য স্বপ্ন দ্রষ্টারও। পৃথিবীর কোন জায়গায় নিজেদের ল্যাবেরাটেরি থেকে লাফ দিয়ে বিরান মঙ্গলে গিয়ে সবার স্বপ্নকে রূপ দেবার দায়িত্ব তাঁরা নিয়েছেন। সেদিক থেকেই নুওয়া নগরটি সম্পর্কে বলা যায় অর্ধেক তার বাস্তব আর অর্ধেক কল্পনা। এই কল্পনার বিষয়টি খুবই প্রয়োজন, নগরের যে মানুষ এবং তাঁদের যে জীবন মঙ্গলে গড়ে উঠবে তার অনেক ইশারা ওখানে রয়েছে।

প্রাচীন মিশরের সাপঃ

সাপ প্রাণীটি প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে নানা ভাবে জড়িয়ে আছে। প্যাপিরাসের ওপর লেখা প্রাচীন মিশরীয় ছবিলিপি হীরোগ্লিফে যেমন সাপের চিহ্ন দেখা যায় তেমনি তার চিত্রশিল্প, উপকথা ইত্যাদিতেও নানা রকম সাপের আনাগোনা রয়েছে। সাপের পূজা প্রাচীন মিশরের ধর্ম আচারে একটি বড় স্থান দখল করে আছে। প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় সাপকে শক্তির একটি প্রতীক হিসেবে দেখা হতো যা জীবন প্রবাহে মৃত্যুছোবল আনতে পারে। সে জন্য সব রকম ক্ষেত্রে বিষধর সাপের ছড়াছড়িই ছিল সেখানে। কিন্তু আসলেও কি সেদিনের মিশরের পরিবেশে এত রকমের সাপের অস্তিত্ব ছিল। তখনকার কালচার আর আর্টের বর্ণিত সাপ বাস্তবের সাপের প্রাচীন ও নতুন অস্তিত্বের বিজ্ঞান গবেষণারও জন্ম দিয়েছে। সাপকে ওই কালচারে যে ভাবে

জাদুবিদ্যার অংশ করা হয়েছে তাতে এ সম্পর্কে পণ্ডিতরা মনে করেন মূলত তাদের সঙ্গে সাপের সম্পর্কটি ছিল ভীতির। ওই কারণেই ধর্মে, রাজকীয় পরিধানে, লিপিতে, উপকথায় সর্বত্র সাপকে এতো উঁচু স্থান দেয়া হয়েছিলো। একে গহনা ও অন্যান্য অলঙ্কারের মোটিফ হিসেবেও প্রচুর ব্যবহার করা হয়েছে। সাপকে ধর্মীয় এক রহস্যময় প্রতীকে পরিণত করার আরেকটি কারণ ছিল মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে প্রাচীন মিশরীয়দের এক অদ্ভুত আসক্তি। জীবনে সাপের ছোবল থেকে আত্মরক্ষা যেমন একটি লক্ষ্য ছিল, তেমন আকাঙ্খা ছিল এই জীবন থেকে পরের জীবনে যাবার সময় পথে সাপ যেন তার মন্দ জাদু নিয়ে পথ আগলে না দাঁড়াতে পারে।

তবে সেদিন মিশরে কত বেশি আর কত রকমের বিষধর সাপ বাস্তব পরিবেশে ছিল সেটি জানতে হলে এখানকার প্যাপিরাসে এ সম্পর্কিত অনুসন্ধানী লেখাগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয়। বৈজ্ঞানিক বিষয় তুলে ধরতে প্রাচীন মিশরীয়দের কার্পণ্য ছিলনা। এ জন্য গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা ধাত্রীবিদ্যা, জীববিদ্যা, অস্ত্রোপচারের বর্ণনা, মমি করার নিয়ম ও আচার ইত্যাদির নানা বয়ানের অনেকগুলো মূল্যবান হীরোগ্লিফিক দলিল প্যাপিরাসের রোল হিসেবে সংরক্ষিত আছে, যেগুলোর পাঠোদ্ধার বহু আগেই সম্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে ওই অঞ্চলের বর্তমান বিভিন্ন সাপ প্রজাতি সমূহের ওপরও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চলেছে। ২০২৩ সালের অক্টোবরে প্রকাশিত একটি গবেষণায় বৃটেনের ব্যাঙ্গোর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা প্রাচীন মিশরের প্যাপিরাস সূত্র ও বর্তমান মিশর ও তার আশপাশের দেশগুলোতে পাওয়া সাপের প্রজাতি বিশ্লেষণ করে ওই প্রাচীন সময়ে মিশরের বিষধর সাপের প্রজাতি প্রাপ্যতা নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক চিত্র খাড়া করতে পেরেছেন।

এটি খাড়া করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বর্তমান মিশরের এবং ক্রমে অতীতে গিয়ে পরিবেশের এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের একটি মডেল তৈরি ও ব্যবহার করেছেন। এই মডেলকে প্রাচীন মিশরীয় ওই সময় পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে গিয়ে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিষধর সাপের নানা প্রজাতির প্রাপ্যতার বিবেচনা করেছেন। এই চিত্রের সঙ্গে মেলানো হয়েছে 'ব্রুকলিন প্যাপিরাস' নামে পরিচিত দলিলটি যা বাহ্যত খৃষ্টপূর্ব ৬৬০ থেকে সৃষ্ট পূর্ব ৩৩০ সালের বর্ণনা বলে দাবি করলেও মনে করার কারণ আছে যে এটি আরো প্রাচীন কোন

প্যাপিরাসের পুনর্লিখন। এই দলিলে সেই আমলে ৩৭টি বিষধর সাপ প্রজাতির কথা উল্লেখ আছে তবে এর থেকে ১৩টির বর্ণনা হারিয়ে গেছে। বাকিগুলোর সাপের বর্ণনা তো আছেই, আর তার কামড় খেলে রুগীর মধ্যে বিষক্রিয়ায় কী কী লক্ষণ দেখা যায় তারও বর্ণনা আছে।

তবে সমস্যা হলো সেই বর্ণনা থেকে বৈজ্ঞানিক সত্যগুলো বের করে আনা– কারণ তা এখানকার নির্ভেজাল বৈজ্ঞানিক বর্ণনার মত নয়, বরং এর সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে আছে জনশ্রুতি, জাদুবিদ্যা, সাপের অতিন্দ্রীয় সক্ষমতা ইত্যাদির কথাও। ফলে এর থেকে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রজাতিগুলো সনাক্ত করা কঠিন হয়েছে। সেই অভাবটি পূরণ করা হয়েছে আজকের এই অঞ্চলে পাওয়া যাওয়া বিষধর সাপের খুঁটিনাটি জীবতাত্ত্বিক তথ্যগুলোর সঙ্গে প্রাচীন বর্ণনা মিলিয়ে। মোটের ওপর মনে হচ্ছে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমানে আসতে আসতে বিষধর সাপের প্রজাতি সংখ্যা এখানে অনেক কমে গেছে, এসবের প্রাপ্যতাও। ওই সময় মিশর অনেক বেশি আর্দ্র ও সবুজ ছিল বলে সাপের আস্তানা হিসেবে বেশি উপযুক্ত ছিল। আজ সে সব জায়গা অনেক শুষ্ক- প্রায় মরুভূমিতে পরিণত। বরং মিশর থেকে বেশ দূরে আফ্রিকার তখনকার আর্দ্রতার অঞ্চল সমূহে সাপের পরিস্থিতিটিই প্রাচীন মিশরের সঙ্গে বেশি মিল্‌ছে।

মঙ্গল গ্রহের মত স্থানের দূরত্ব থেকে যখন বিজ্ঞানকে কাজ করতে হয় তখন যেমন কল্পনার সঙ্গে বেশি যুক্ত হতে হয়, শুধু ল্যাবোরেটরিতে যা পাচ্ছি তার ওপর নির্ভর করা যায়না, তেমনি কালের দূরত্বে বিজ্ঞান চর্চা করতেও সেই একই কথা। প্রাচীন মিশরের সত্যিকার পরিবেশে সাপের উপস্থিতির বৈজ্ঞানিক বর্ণনাকে তাই সেদিনের প্যাপিরাসের উপকথা, জাদু মেশানো কিছু কিছু বাস্তব বর্ণনা আর আজকের একেবারেই বৈজ্ঞানিক বর্ণনা, উভয়কে এক জায়গায় আনতে হয়েছে। এই দুইয়ের মধ্যে ব্যবধান ৩ থেকে ৪ হাজার বছরের। তারপরও একত্রই করতে হয়েছে এত ভিন্ন দুই যুগের গবেষণাকে।

জীববৈচিত্রের বিজ্ঞান, জীবপ্রেমের আর্ট

বিজ্ঞান জাদুঘরের এ কোন্ জাদু:

জাদুমন্ত্রের মত আকর্ষণ করবে এমন আশা করেই এর নাম জাদুঘর। এর ইংরেজি বা পাশ্চাত্য নাম মিউজিয়াম– গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে আনন্দের

সঙ্গে চিন্তা করার জায়গা। এ জন্য কিছু হলঘরের মধ্যে দুনিয়ার বহু রকম জ্ঞানের জিনিসও দেখার জিনিসকে হাতের কাছে এনে দেয়া হয়। বহু কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে সেই প্রাণীকে যেমন কাছে এনে দেয়, তেমনি নিত্য নতুন আবিষ্কার হয়ে চলেছে যা তাও। শত ভুবনের জিনিসকে আমার নিজস্ব ভূবনে যেমন এনে দেয়, তেমনি সম্পূর্ণ নতুন ভূবন আমার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। ছোটবেলায় তার প্রতি যে জাদুর আকর্ষণ সৃষ্টি হয় বড়বেলায়ও তা চলে যায়না। এর জাদুর শেষ কখনো হয়না। তবে হলঘরের সাজানো ওই দেখার জিনিসগুলো কখনো এক জায়গায় ঠেকে থাকেনা। যেটুকু দেখা যায় তার আড়ালে বিস্তৃত হয়ে আছে তা নিয়ে অনেক গবেষণা; যার কারণে দেখা যাওয়ার জিনিসগুলো ক্রমেই আরো উন্নত হতে থাকে। কৌতুহল থেকে গবেষণা, গবেষণা থেকে কৌতুহল এমনি করেই চলে। বিশ্ববিদ্যালয় এক ভাবে জ্ঞান দান ও জ্ঞান সৃষ্টির কাজ করে। জাদুঘর অন্য ভাবে সেটিই করে এর প্রদর্শন, অংশগ্রহণমূলক কাজ এবং গবেষণার সমন্বয়ে। এ জন্যই অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগেও জাদুঘর থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাদুঘর যেমন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে তারই প্রকাশ ঘটাবার জন্য যেন সংক্ষেপে উইট্স নামে পরিচিত দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানাটমিকাল সায়েন্স বিভাগের শত বর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ওই বিভাগের জাদুঘর একটি অস্থায়ী প্রদর্শনীর আয়োজন করে। পুরো আয়োজনটি ছিল এমন একটি ব্যবস্থা সেখানে বালক-বালিকারা থেকে শুরু করে পণ্ডিত ব্যক্তিরা পর্যন্ত সবাই মহা আনন্দে নিজের হাতে বিজ্ঞানের কিছু কাজ করে দেখতে পারেন। কাজগুলোর প্রত্যেকটির পেছনে থাকে খুবই বড় রকমের কৌতুহল এবং এত সম্পূর্ণ একটি কাজ নিজে করার আনন্দ। যেমন নানা রকম নানা বিবর্ধনের মাইক্রোস্কোপ দিয়ে প্রাণীদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কী ভাবে দেখতে হয়; প্রত্নতাত্ত্বিক খনন স্থলে প্রাচীন নিদর্শনের খোঁজ কী ভাবে করতে হয়, চেহারা বিশ্লেষণ করে কী ভাবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে কোন মানুষকে চিনে ফেলে; একটি ভ্রূণ কী ভাবে ধাপে ধাপে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়; একটি কঙ্কাল থেকে কীভাবে আসল মানুষের প্রায় নিখুঁত পূর্ণ অবয়ব ও চেহারা তৈরি করে ফেলা যায় এবং তাকে সনাক্ত করা যায় ইত্যাদি। এগুলো এমন জিনিস যাতে একজন কিশোর বা কিশোরী যেমন মজা পাবে তেমনি এগুলোর কথা বহুদিন ধরে জেনে এসেছে এমন প্রবীণ মানুষও জীবনে প্রথম

বারের মত বাস্তবে এটি করে রীতিমত শিশুসুলভ আনন্দ পান। প্রায়ই দেখা গেছে যে বাবা মা ছেলে মেয়ে মিলে পুরো পরিবার লেগে গেছে এই কাজে।

একজন উঠতি ক্ষুদে বিজ্ঞানীকে বড় বিজ্ঞানী হিসেবে গড়তে হলে পুরো পরিবারকেই হাত লাগাতে হবে। জাদুঘর এ কাজেই পটু– সবাইকে কাজে আনার কৌশলে। এর লক্ষ্য একটি বিজ্ঞান সমাজ। জাদুঘরগুলোরও একটি সমাজ আছে। যখন এক জোট হয়ে সব জাদুঘর কোন একটি বিষয়ে ফোকাস করে তখন অনেক বড় লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে– এমনটি অতীতে মাঝে মাঝে হয়েছে। সম্প্রতি (নভেম্বর ২০২৩) বৃটেনের সব ধরনের সব জাদুঘরের প্রতিনিধিরা টেইট মডার্ন জাদুঘরে একত্র হয়ে জলবায়ু পরিবর্তন রোধের চেষ্টায় কাজ করার জন্য কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। জাদুঘরগুলো সম্মিলিত ভাবে নিলে অনেকগুলোর ক্ষেত্রে শত শত বছর ধরে তাদের যে অসংখ্য কর্মী, বিজ্ঞানী, সংগ্রাহকদের সাধনার ফসল দুলর্ভ সংগ্রহ তাদের কাছে আছে তা দিয়ে পরিবেশ পরিবর্তন, জলবায়ু সংকট, জীববৈচিত্র ধ্বংসের পুরো কালক্রমিক চিত্রটি জাজ্বল্যমান করে তুলে ধরা সম্ভব। যেমন জীববৈচিত্র ধ্বংসের বর্তমান প্রক্রিয়াটি মানুষের সৃষ্ট, এবং এটিকে বলা হয় সর্বশেষ গণ-বিলুপ্তি। বিশ্বব্যাপী সাম্প্রতিক বিলুপ্ত প্রাণীর অসংখ্য নমুনা জাদুঘরে রয়েছে– সেই সঙ্গে আগের পাঁচটি গণবিলুপ্তির নমুনাও রয়েছে। ওই পাঁচটির থেকে ষষ্ঠটির পার্থক্য সবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে জাদুঘরগুলো যেভাবে দেখাতে পারবে, আর কেউ তেমন নয়। ওই পরিবার শুদ্ধ সবাই নিজের হাতে কাজ করার কথাটি মনে করলেই সেটি বোঝা যায়। সব ধরনের জাদুঘর যে এই ক্ষেত্রে জীববৈচিত্রের বৈজ্ঞানিক চেতনাটি সামনে আনতে পারছে- তাই দেখিয়ে দিচ্ছে আর্টের মধ্যেই থাকতে পারে বৈজ্ঞানিক আবেদন।

বনকুসুমে গেঁথেছি মালাঃ

ঘাসের লন করলে, ফুলের বাগান করলে আমরা সবার বাহবা পাই, কিন্তু বাড়ির সামনে নানা রকম ঘাস-গুল্মে বনফুল ফুটতে দিলে সমালোচনার সুরে অনেকে বল্‌বেন অলস তুমি জায়গাটিকে জংলা বানিয়ে রেখেছো। কিন্তু এই তথাকথিত জংলাগুলোই বেশি বেশি সৃষ্টি করার জন্য কোন কোন দেশ রাষ্ট্রীয় ভাবে প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর লক্ষ্য হলো শুধু বন্য গুল্ম ও বন্য ফুলের বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে বিস্তীর্ণ এলাকায় এসব গুল্মের তৃণভূমি ঝোপ-ঝাড়

গড়ে তোলা, যেখানে ছোট বড় বিচিত্র প্রাণী অনুকূল পরিবেশে বসবাস করতে পারবে। দেশব্যাপী এটি ঘটলে পরিবেশের সৌন্দর্য এবং জীববৈচিত্র রক্ষা উভয় উদ্দেশ্য সম্পন্ন হবে– ভূ-প্রকৃতিও ভাল থাকবে। এমনি একটি প্রকল্প হলো বৃটেনের ইডেন প্রকল্প যার আওতায় একটি 'বনফুল ব্যাংক' স্থাপন করা হয়েছে। বৃটেনের নানা জায়গায় বনফুল-সমৃদ্ধ তৃণভূমির দৃশ্যপট সৃষ্টি করার জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা দেয়ার জন্য এই ব্যাংকের সৃষ্টি। লক্ষ্যটি হলো জীববৈচিত্রের সংরক্ষণ ও তার ক্রমবৃদ্ধি। বর্তমান তৃণভূমি যা আছে সেগুলো ক্রমাগত হারিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোকে রক্ষা করে নতুন নতুন এলাকায় তা বিস্তৃত করার কাজ করছে ইডেন প্রকল্প। একই সঙ্গে এসব অঞ্চলে যাঁরা থাকেন তাঁরা একটি বিরান জায়গা না দেখে বনফুলে সুশোভিত নান্দনিক পরিবেশে থাকবেন। তাছাড়া ঝোপঝাড় তৃণভূমির যে সব পারিবেশিক উপকার কৃষি ও জীবন-জীবিকার ভেতরে গড়ে উঠে তার সুবিধাও তাঁরা ভোগ করবেন।

যে সব প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা, ভূমি-মালিক তাঁদের কাজে ওই একই লক্ষ্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবেন বনফুল ব্যাংক তাঁদেরকে আর্থিক সহায়তা দিতে এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় সহায়তাটি আরো নানা রূপও নিয়েছে। যেমন বনফুলের নানান বীজ যেন প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এজন্য দেশের নানা জায়গায় বহু বীজতলা স্থাপন করা হয়েছে বনফুল ব্যাংকের সহায়তায়। ওই বীজ তৃণভূমিতে লাগিয়ে সেখানকার গুল্ম ইত্যাদিকে সব সময় নবায়নযোগ্য করে রাখা যায়; নতুন তৃণভূমি সৃষ্টিও করা যায়। ব্যাংক এ জন্য বীজতলাগুলোতে বীজের সংগ্রহ, বিশোধন, সংরক্ষণ ও বন্টনের দায়িত্বও পালন করে। নিজ উদ্যোগে উদ্যোক্তারা যেন বীজতলা ইত্যাদি স্থাপন করতে উৎসাহিত হন সে জন্য ব্যাংক একটি জাতীয় বনফুল কেন্দ্র স্থাপন করেছে।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত সারা বৃটেনে বনফুল সমৃদ্ধ যে তৃণভূমি ছিল তার ৯৭% যুদ্ধপরবর্তী এই পুরোটা সময়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এক সময় তাকে ঘিরে যে পোকা, পতঙ্গ, পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর মেলা ছিল তার অনেকটাই হারিয়ে গেছে। তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য এই চেষ্টা। ওই পুরানো পরিবেশের প্রতি জীবপ্রেম নিয়ে আর্টিস্ট সুলভ মায়া

ছাড়া এটি যেমন সম্ভব নয়, তেমনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও কার্যক্রম এবং ব্যবসায়িক সুযোগ ছাড়াও সম্ভব নয়।

আরো এক রকমের আহ্বান আছে এই শত বনফুলের বিকাশ চাওয়ার মধ্যে। সেটি হলো শুধু বিস্তীর্ণ তৃণভূমি গড়ে তোলা নয়, নিজেদের বাসার, ভবনের, শহরের যে জায়গাগুলোতে সাধারণত ঘাসের লন, ফুলের বাগান ইত্যাদি থাকে তার বদলে সেখানে বনফুলের দৃশ্য গড়ে তোলা, অর্থাৎ একে সব সবুজের মেলায় নিয়ে যাওয়া সম্মানের সঙ্গে। এখানেও উদ্দেশ্য জীববৈচিত্র রক্ষার বেশি সুযোগ পাওয়া। আর বনফুলকে নিজের কাছে নিয়ে এসে এর নান্দনিক শোভা সর্বক্ষণ উপভোগের সুযোগ সৃষ্টিও লক্ষ্য। একই রকম ঘাসের মুড়িয়ে রাখা লন নয় বরং স্বাধীন ভাবে বাড়তে দেয়া বিচিত্র বনফুলের বর্ণাঢ্যতা। শুধু শত ফুল নয় শত জীবের আশ্রয়ের জন্যও এমন পরিবেশ যে বেশি উপযোগী সে কথা বিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে সবার কাছে স্পষ্ট করাটিও এই আন্দোলনের অংশ। আর গবেষণার কথা যদি বলি তা হলে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে উপযুক্ত জায়গা আর কী হতে পারে? ক্যাম্ব্রিজে এমন বনফুল সম্ভারের একটি ভাল উদাহরণ যেমন সৃষ্টি করেছে, তেমনি ওর ওপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাও চালিয়েছে। এর বিখ্যাত কিংস কলেজের পেছনে কিংবদন্তী-খ্যাত যে লন ধরে বহু জ্ঞানীগুণীরা হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করে এসেছেন, তর্ক বিতর্ক করে এসেছেন, তার কিছু অংশ এখন বনফুলের গুল্মে ঢাকা। কাছেই অবশ্য সনাতন ঘাসের লনও রয়েছে। কাজেই এখানে একই জায়গায় ও পরিবেশে উভয়ের তুলনামূলক গবেষণার সুযোগ ঘটেছে।

দেখা গেছে একই আয়তনের ঘাস লনের চেয়ে বনফুল গুল্ম ঝাড়ে ৩.৮ গুণ বেশি ধরনের জীব পাওয়া গেছে– উদ্ভিদ, পোকা, পতঙ্গ, মাকড়সা সবই বেশি। ছোট জীবের সংখ্যাও অনেক বেশি– সব জীবের দেহের মোট ওজন যদি নিই সেটি ২৫ গুণ বেশি! শুধু ভেতরের জীব নয়, এরা বাইরের জীবকে আমন্ত্রণও জানায়ও বেশি, যেমন এটির ফলে এখানটায় পোকা-খেকো বাদুড়ের আনাগোনা অনেক বেড়ে গেছে। এখানে বীজ ফেলা হয়েছিলো শুধু ৩৩টি প্রজাতির গুল্মের। এখন দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে আরো ৫৫টি প্রজাতি

এসে হাজির হয়েছে প্রাকৃতিক ভাবে, এগুলোর বীজ কোন না কোন ভাবে এসে হাজির হয়ে এখানে প্রশ্রয় পেয়েছে।

আটলান্টিকের ওপারে যুক্তরাষ্ট্রেও যখন বনফুলের বিকাশকে উৎসাহিত করা হয়েছে সেখানে মিনেসোটা রাজ্যে এটি করার আরো একটি কারণ তুলে ধরা হয়েছে। তা হলো এসব ফুল থেকে মৌ সংগ্রহ করার লোভে মৌমাছি, প্রজাপতি, মথ ইত্যাদি অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং এরাই আবার পাশের চাষের ক্ষেতে পরাগ সংযোগে সাহায্য করছে। এই পুরো আন্দোলনটি একটি বড় ভুল ভাঙ্গতেও সাহায্য করেছে। বহুদিন ধরে কৃষি, বাগান, বন ইত্যাদিতে যাদের উৎসাহ তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে স্থানীয় প্রজাতিগুলোর মধ্যে বাইরে থেকে বিজাতীয় প্রজাতির উদ্ভিদ আনাটি ক্ষতিকর। এগুলো স্থানীয় প্রজাতির ওপর এত বেশি পীড়ন সৃষ্টি করে যে সেটি উৎখাত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এ কথাগুলো যুগে যুগে বলা হয়েছে এবং শুধু সাধারণ মানুষ নয়, বিশেষজ্ঞরাও এ কথা আওড়িয়ে গেছেন– ঠিক কীভাবে ক্ষতি করে, উৎখাত করে, আদৌ করে কিনা তার খুব খোঁজখবর না নিয়েই। অনেক সময় পরস্পর-বিরোধী যুক্তিও এর জন্য দেখানো হচ্ছিলো– একদিকে বলা হচ্ছে বাইরের থেকে আনা উদ্ভিদ ওখানে টিকবেনা, দুর্বল হবে, অন্যদিকে বলা হচ্ছে এদের দাপটে স্থানীয় উদ্ভিদগুলো ম্রিয়মান হতে হতে উৎখাত হয়ে যাবে। দু'একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে কোন রাক্ষুসে উদ্ভিদ এসে এমনটি দাপট যে দেখায়নি তা নয়, কিন্তু তার কারণে সব অস্থানীয় উদ্ভিদকে ক্ষতিকর মনে করাটির কোন কারণ নেই। এরকম আরো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা, তার এক রকম কালচার, অনেক সময় নিজ জিনিসের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বিজ্ঞানের চিন্তার মধ্যেও ঢুকে পড়ে, সত্যিকার বিজ্ঞান গবেষণার দ্বারাই যার নিরসণ হতে পারে। বনফুল আন্দোলনে ব্যাপারটি বেশ ভালভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। এর গুরুত্বই হচ্ছে শতফুল ফুটতে দেয়া- যেগুলোই এখানকার ভূমি ও আবহাওয়াতে হেসে খেলে বড় হতে পারে; দেশের না বিদেশের যে প্রশ্নটি কখনো আসেইনি। সুশৃঙ্খল ঘাসের কৃষি হলো কিনা তাও নয়।

ঐতিহাসিক জীব-বৈচিত্রের আকরকে রক্ষা:

নানা শক্তিশালী স্বার্থ-বুদ্ধির কাজের ফলে জীববৈচিত্র ধ্বংস হচ্ছে– আমাজোন বনের মত যে ঘন বাদলবন বনদস্যু গাছ-ব্যবসায়ীদের কাছে নষ্ট হচ্ছে, যে সব ব্যবসা হাতীর দাঁতকে বা গণ্ডারের শিংকে লক্ষ্যবস্তু করতে গিয়ে ওই বিশালকায় প্রাণীদেরকে বিলুপ্তির পথে ঠেলে দিচ্ছে, যে ফ্যাক্টরি জাহাজ তিমির বংশ উজাড় করছে সেখানে এগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কিন্তু জীববৈচিত্র নষ্ট হওয়ার আর একটি কারণ সম্প্রতি বড় হয়ে ওঠছে এর প্রতি মানুষের আগ্রহের কারণে এক ধরনের ইকোট্যুরিজম সৃষ্টির ফলে। জীববৈচিত্রের কিছু কিছু ঐতিহাসিক আকর এখন অনেক পর্যটককে আকর্ষণ করছে। জীববৈচিত্রকে রক্ষার একটি উপায় হিসেবেই এরকম পর্যটনকে উৎসাহিত করা হয়েছিলো, এখনো করা হয়। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন শিল্পের কারণে ওই আকর্ষণই জীববৈচিত্রের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগ্রহও বজায় রাখতে হবে, আবার এর দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতিটিকেও মোকাবেলা করতে হবে– এ দ্বিমুখী কাজটি এখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

স্থলে যেমন বাদলবন সমুদ্রে তেমনি প্রবাল দ্বীপ আর প্রবাল প্রাচীর হলো জীববৈচিত্রের আকর। এখানে উপকূল থেকে কিছু দূরে স্বল্প গভীর পানিতে গড়ে ওঠে প্রবাল কীটের কলোনি। এ কীটের কোষকলার ফাঁকে ফাঁকে থাকে সূর্যের আলোর সাহায্য সালোক সংশ্লেষণে খাদ্য তৈরিতে সক্ষম ক্ষুদ্র আলগি। কীট আলগিকে আশ্রয় দেয়, আলগি কীটকে খাদ্য দেয়– উভয়ের এই পারস্পরিক সাহায্যে পুরো জায়গাটি হয়ে ওঠে উর্বর, সৃষ্টি করে খুবই ঘন জীববৈচিত্র নিয়ে একটি ইকোসিস্টেম। রঙীন প্রবালগুলো এক রকম পাথুরে ফুলের মত; তাছাড়া আশ্রয় আর খাদ্যের লোভে বিচিত্র মাছ আর জলজ অন্যান্য প্রাণীতে জায়গাটি সুন্দর ভরপুর। প্রবাল দ্বীপের এই আকর রূপের জন্য এর সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা, খ্যাতি দুনিয়ার দেশে দেশে। সব মিলিয়ে পর্যটকদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় স্থান।

সব প্রবাল, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে বিখ্যাত প্রবাল প্রাচীর গ্রেট বেরিয়ার রীফ নষ্ট হচ্ছে নানা কারণে। যার মধ্যে প্রধান একটি হলো জলবায়ু পরিবর্তন। এর ফলে পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি ও এসিডিটি বৃদ্ধি প্রথমে রং জ্বালিয়ে প্রবালকে সাদা করে ফেল্ছে, তারপর তাকে মেরে ফেল্ছে। পর্যটনও এখন

প্রবাল নষ্টের একটি বড় কারণ হয়ে পড়ছে। এতে সৃষ্ট দূষণ সংবেদনশীল প্রবাল কীটকে মেরে ফেলতে যথেষ্ট। তা ছাড়া বেআইনী ভাবে প্রবাল ভেঙ্গে এর ব্যবসা গড়ে তোলা– ঘর সাজানো, উপহার হিসেবে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদির জন্য, তাও প্রবালের জন্য মারাত্মক হয়ে পড়েছে। প্রবাল পুনরুদ্ধারের জন্য প্রচুর গবেষণা চল্‌ছে। এর মধ্যে নেদারল্যান্ড সমুদ্র গবেষণা কেন্দ্র একটি উপায় উদ্ভাবন করেছে যেটি বেশ সহজ সরল মনে হচ্ছে।

এতে সাধারণ বেদানা ফলের গাছের ডানপালা দুমড়ে মুচড়ে পিরামিড আকৃতির কিছু গঠন তৈরি করা হয়েছে। এগুলোকে সারিবদ্ধ ভাবে উপকূলের কাছে সমুদ্রে ফেলা হয়েছে কৃত্রিম প্রবাল প্রাচীরের মত। নেদারল্যান্ড উপকূলে ওয়াডেন জায়গাটিতে এটি করা হয়েছে। ছয় মাস ধরে পরীক্ষা চালাবার সময় দেখা গেছে কীভাবে আলগি এসে ওখানে বাসা বেঁধেছে, আর এর খোপখাপের তলের ওপর আকড়ে ধরে বার্নাকল কাঁকড়ার মত করে শক্ত ভাবে সংলগ্ন হয়েছে নানা প্রজাতির এমনি প্রাণী। এগুলোর আকর্ষণে ও আশ্রয়ে ওই ছয় মাসেই এখানে সমাবেশ হতে দেখা গেছে বিচিত্র মাছ সহ নানা জলজ প্রাণীর, অনেকটা প্রবালের ইকোসিস্টেমের মত। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন ভবিষ্যতে যখন কাঠের ওই কৃত্রিম প্রবাল পঁচে অবক্ষয়িতও হয়ে যাবে তখন ওই ইকোসিস্টেমের টানে আসল প্রবাল তার স্থান দখল করবে।

জীব বিবর্তনের আবিষ্কর্তা চার্লস ডারউইন খ্যাত গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে পর্যটনের বিষয়টি এখন খুব বেশি করে নজরে আসছে। আজ থেকে প্রায় দু'শ বছর আগে প্রশান্ত মহাসাগরে এই অনেকগুলো ছোট ছোট দ্বীপের সমাহারটিকে নিজের গভীর পর্যবেক্ষণে এনেছিলেন সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ তরুণ ডারউইন। তিনি তখন একজন শিক্ষানবীশ বিজ্ঞানী হিসেবে এইচ এস এস বীগল নামের একটি পালতোলা যুদ্ধ জাহাজে কাজ নিয়ে পাঁচ বছরের জন্য বিশ্ব ভ্রমণ করছিলেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল জাহাজ বিশ্বব্যাপী যেখানে যেখানে ভিড়ছে তিনি তার স্থল ভাগে ঘুরে ঘুরে ওখানকার প্রাণিজগত পর্যবেক্ষণ করবেন ও নমুনা সংগ্রহ করবেন। ১৮৩৫ সালে তিনি যখন গ্যালাপাগোসে এসেছিলেন তখন এই জনশূন্য দ্বীপগুলোকে তিনি একটি জীবন্ত ল্যাবোরেটরি হিসেবে পেয়েছিলেন কিছু জীবের ওপর গবেষণা

চালাতে। সব থেকে বেশি কাজ করেছেন এখানকার বিখ্যাত চড়ুই ও বিশাল কচ্ছপের ওপর। উভয়েরই বহু রকমের প্রজাতি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এবং তাদের মধ্যে পার্থক্যগুলো ও তার সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক তাঁকে পরে প্রাকৃতিক নির্বাচনে বিবর্তনের ওপর তাঁর তত্ত্বটি আবিষ্কারে সহায়তা দিয়েছিলো। ওর মধ্যে ১৪ প্রজাতির চড়ুই এবং ১২ প্রজাতির কচ্ছপ সেখানে এখনো আছে। তাছাড়া এই একই জায়গার কাছে ফ্লেমিঙ্গো ও পেঙ্গুইনের মত পরস্পর একেবারে ভিন্ন স্বভাবের পাখি উভয়কেই দেখা যায়। ডারউইনের কারণে অত্যন্ত বিখ্যাত এই জায়গায় পর্যটকের ভিড় এমন বেড়েছে এবং তাঁরা এখানকার সীলদেরকে এত মাছ খাওয়ান যে এই সীলকে আর পেঙ্গুইনগুলো মোটেই পরোয়া করেনা, সামনেই ঘুরে বেড়ায়।

ঐতিহাসিক জীববৈচিত্র মানুষকে এখানে আসতে আগ্রহী করেছে সেটি ভাল কথা। কিন্তু এখন বার্ষিক পর্যটকের সংখ্যা আড়াই লাখের ওপরে চলে গিয়ে রীতিমত একটি অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। এর যে মূল আকর্ষণ জীববৈচিত্র সেটিই এখন বিনষ্টির পথে চলে যাচ্ছে– ২০টি মূল্যবান প্রাণী-প্রজাতি এখন বিলুপ্তির পথে। দ্বীপগুলো যে দেশের অধীনে সেই ইকুয়েডোরের সরকার পর্যটনের আর্থিক সুবিধাটির ওপর এতো গুরুত্ব দিচ্ছে যে এর মূল বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিতে ভুলে যাচ্ছে। অথচ এর ইতিহাস, এর যে জীবিতাত্ত্বিক অতুলনীয় গুরুত্ব, তার যে রোমান্টিক আকর্ষণ তাকে উৎসাহিত করাটাও জরুরি। সবদিক রক্ষা করে পর্যটন নীতি কী হওয়া উচিত তার গবেষণায় এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন দেশের সম্মিলিত উদ্যোগ গ্যালাপাগোস সায়েন্স সেন্টার। এর বিজ্ঞানীরা একটি গাণিতিক মডেল গড়ে তুলেছেন যা বলে দিচ্ছে কীরকম পর্যটকদের সংখ্যা কত হলে এখানকার জৈব পরিবেশে তার কী প্রভাব দেখা দেবে। এটি করতে গিয়ে তাঁদেরকে পর্যটকদের শ্রেণী বিভাজন করতে হয়েছে। কোন্ ধরনের পর্যটক দ্বীপের কোথায় যান, কী দেখেন, কী করেন, তাঁদের আগ্রহ ও উৎসাহের জায়গাটি কী, তাঁদের শিক্ষা ও কালচার পশ্চাদপট কী, ইত্যাদি নির্ণয় করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে অতীতে উপাত্তের ও বৈজ্ঞানিক নিয়মগুলোর ওপর ভিত্তি করে মডেল গড়ে তাঁরা এখন পর্যটন নীতি নির্ধারণের জন্য আদর্শ নীতির ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছেন।

এদিকে ডারউইনের বিখ্যাত ভ্রমণের দুই শত বার্ষিকীকে সামনে রেখে হল্যান্ডের একটি পালতোলা বড় জাহাজ ওস্টারশেডকে দূর সমুদ্র যাত্রায় নামিয়ে তাঁর পথ অনুসরণে বিশ্ব ভ্রমণের আয়োজন করেছে কিছু উৎসাহী মানুষ। তাতে বিজ্ঞানে আগ্রহীরা যেমন থাকবেন, তেমনি পালের জাহাজ চালাতে উৎসাহীরাও থাকবেন। এক সঙ্গে এই দুই ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি করার একটি দুর্লভ আয়োজনের অংশ হয়েছেন তাঁরা। পর্যটক নিয়ন্ত্রণের কৌশল নির্ণয় কঠিন নির্মোহ বৈজ্ঞানিক কাজ হতে পারে, কিন্তু তাই বলে বিজ্ঞানের রোমান্সকে বিসর্জন দেয়া যাবেনা। ওই জায়গাটিতে আর্টের রোমান্সের সঙ্গে তার পার্থক্য সামান্য।

একজনের ফটোগ্রাফিতে জীববৈচিত্র:

একজন আমেরিকান ফটোগ্রাফার জোয়েল সারটোর তাঁর ফটোগ্রাফি সাধনার বিষয়বস্তু করেছেন জীববৈচিত্রকে। যত বেশি সম্ভব প্রজাতির জীবকে তিনি তাঁর আলাদা আলাদা ফটোতে ধারণ করতে চান– অনেকটা একই ঢঙের প্রোট্রেট ফটোতে যা দিয়ে আমরা একটি দলের বা প্রতিষ্ঠানের সব মানুষের মুখচ্ছবির এলবাম তৈরি করি আনুষ্ঠানিক ভাবে। তিনি এর নাম দিয়েছেন 'ফটো আর্ক' অর্থাৎ এটি যেন নূহ নবীর জাহাজের (আর্ক) মতই সব প্রাণীর নমুনা সংরক্ষণ করে রাখছে– অবশ্য ফটোর আকারে। সারতোর এ পর্যন্ত মেট ২০ হাজার পৃথক প্রাণী-প্রজাতিকে এভাবে সংরক্ষণ করেছেন ফটোতে।

তাঁর উদ্দেশ্য একটিই– সব রকম প্রজাতির প্রতি মানুষের পরিচিতি ও আগ্রহ গড়ে তোলা যাতে সেটি হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে সে বেদনা প্রত্যেককে স্পর্শ করে। সবাই যাতে জীববৈচিত্র রক্ষায় নিজের কাজটুকু করতে উদ্বুদ্ধ হোন। ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফাররা সাধারণত যেভাবে ছবি তোলেন সারতোর সেই পথে অগ্রসর হন্‌নি। তিনি প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রাণী ও তার পরিবেশকে আর্ট-ফটোতে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেননি। কোন নাটকীয়তা বা বিশেষ মুহুর্তের জন্য অপেক্ষাও তিনি করেননি। বরং তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন একক ওই প্রাণীটির ওপর– তার অবয়ব, তার গোষ্ঠি-পরিচয় ফটোতে স্পষ্ট ফুটে উঠছে কিনা সেটি লক্ষ্য রেখেছেন তিনি, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক– কেউ যেন বাদ না পড়ে। এজন্য বনে গিয়ে বন্যপ্রাণী অনুসন্ধানের অনিশ্চয়তার মধ্যে তিনি পড়তে চান্‌নি। তিনি বরং নির্ভর

করেছেন চিড়িয়াখানা বা অন্যরকম প্রাণী সংরক্ষণাগারের ওপর যেখানে তিনি সহজে প্রাণীটিকে পাবেন এবং অনেক্ষণের জন্য পাবেন- তার ভাল পোট্রেট ফটো তোলার জন্য। আমরা যেভাবে সাদা বা কালো ব্যাকগ্রাউন্ডে পার্সপোর্টের জন্য ফটো তুলি, সব বাহুল্য বাদ দিয়ে শুধু মানুষটিকে পুরোপুরি সনাক্ত করার জন্য, তিনিও যেন তাই করছেন।

প্রত্যেক ছবিতে তিনি যেন প্রাণীটির চোখের দিকে চোখ রেখে যেন বলেছেন আমি তোমাকে চিনি, তোমার ব্যক্তিত্বকে সম্মান করি; তোমাকে বেশ সুন্দর ও বুদ্ধিদীপ্ত দেখাচ্ছে। তোমাকে বাঁচালে পৃথিবী উপকৃত হবে। ওই প্রাণী রীতি- মত বিশাল হতে পারে আবার পিপড়ার মত ক্ষুদ্র হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিত্বে কারো গুরুত্ব কম দেয়া হয়নি। তাঁর ওই ২০ হাজার যে বিচিত্র প্রাণীর ছবি তা ইতোমধ্যেই দুনিয়ার অনেক মানুষকে মুগ্ধ করেছে। এগুলোর নানা রকম ব্যবহার হচ্ছে, তার ছোট বড় করা বিভিন্ন পরিবেশনে বিভিন্ন কপি নানা ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রজেক্টারের মধ্যে দিয়ে এর অনেকগুলো বিশাল আকারে বড় বড় ভবনের সাইজে ভবনের ওপর প্রক্ষেপন করা হচ্ছে– বিশেষ করে বিখ্যাত সব ভবনে অনেক মানুষের দেখার উপযোগী করে। এর মধ্যে রয়েছে নিউইয়র্কে আম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, রোমের ভ্যাটিকানে সেন্ট পীটার্সের মত ভবনও। এ যেন বিশ্ববাসীকে ডেকে এক একটি প্রাণী বল্‌ছে আমি ছিলাম, আমি আছি, আমি থাকতে চাই। সারটোরের আশা প্রাণীর এই জনপ্রিয়তা সবার সচেতনতায় পরিণত হবে এবং তার ফলে জীববৈচিত্র রক্ষার জন্য আরো গবেষণা ও উদ্যোগের সূচনা হবে। গোড়া থেকেই এই ফটোগ্রাফার তাঁর আর্টকে বিজ্ঞানের কাজে নিবেদিত করেছিলেন।

জলবায়ু পরিবর্তন কাকে না ভাবিয়ে রেখেছে?

ফ্যাশন-ব্যবসায়ীর চিন্তাঃ

মনে হতে পারে যাঁর ব্যবসা ফ্যাশন নিয়ে, দামি উপাদানে তৈরি দামি ব্র্যান্ডের পোষাক নিয়ে– জলবায়ু পরিবর্তনের কোন আঁচ তাঁর গায়ে লাগার কথা নয়। ওই ব্যবসা হলো শিল্পীদের নিয়ে, ডিজাইনারদের নিয়ে, মডেলদের নিয়ে, পাদপ্রদীপের আলোতে যাঁরা উদ্ভাসিত; জলবায়ু পরিবর্তনের কথা ভাবার তো দরকার নেই তাঁদের। কিন্তু ভুল্‌লে চল্‌বেনা ফ্যাশনের ওই মঞ্চ তাঁরা ততক্ষণই দখল করে রাখতে পারেন যতক্ষণ দুনিয়ার নানা প্রান্ত থেকে ফ্যাশন

সৃষ্টির বস্ত্র উপাদানগুলো তাঁদের কাছে এসে পৌঁছতে পারে। অন্য অনেক ব্যবসার মত ওই যাকে বলে সাপ্লাই চেইন সেটি এই ফ্যাশন ব্যবসাকেও ব্যতিব্যস্ত রাখে। তার ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের আঘাত আসছে সেখানেই। আর এই কারণে স্থানীয় ভাবে ও বৈশ্বিক ভাবে জলবায়ু পরিবর্তনকে ঠেকিয়ে রাখা এর ফলাফলগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার যে গবেষণা তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ও তাকে উৎসাহিত করার দায়টি ফ্যাশন ব্যবসায়ীদেরও কম নয়।

উন্নত সূতিবস্ত্র-নির্ভর ব্র্যান্ড পোষাকগুলোর কথা যদি বলি, এটি একটি বিশাল ব্যবসা; অথচ বছর বছর জলবায়ু দুর্যোগগুলো কার্পাস তুলার সরবরাহ একেবারে অনিশ্চিত করে তুলেছে। এটি সরবরাহের দুটি প্রধান জায়গা পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসে শুধু ২০২৩ বছরটিতেই পরস্পরের বিপরীতমুখী দুর্যোগে এই ফসলের সর্বনাশ হয়েছে। পাকিস্তানে ঘটেছে অভাবনীয় বর্ষার বন্যা, মানুষের অর্ণনীয় কষ্ট ছাড়াও তুলা নষ্ট হয়েছে ৪০%। আর টেক্সাসে ইতিহাসের শীর্ষ গরম ও খরা এও তুলা নষ্ট করেছে ২৮%। এর থেকে কিছু কম নষ্ট হলেও নিজ নিজ উৎসে জলবায়ু পরিবর্তনে তুলা, সিল্ক, উল, আঁশ প্রদায়ী নানা উদ্ভিদ– এগুলোর দারুণ ক্ষতি হয়েছে।

অন্য বড় বিপর্যয় হলো বিশেষ বিশেষ জায়গার যে প্রাণীগুলো থেকে ফ্যাশন উপাদান আসে তারা নানা রকম চাপের সম্মুখীন হওয়াতে। গরম জায়গায় উত্তাপ বেড়ে গিয়ে রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ছে– গরুর ও ভেড়ার চামড়ার সরবরাহ এ কারণেই কমে গেছে। তাছাড়া জলবায়ু বদলে যাওয়াতে কাশ্মীরের ছাগল, পাশমিনা ছাগল ইত্যাদি; দক্ষিণ আমেরিকার ভিচুনা, আলাপাকারা বিপদে পড়েছে– তাদের বিখ্যাত পশমগুলো দিতে পারছেনা। ব্র্যান্ডগুলোকে তখন অনেক কিছু নতুন ভাবে চিন্তা করতে হচ্ছে। মূল উপাদানগুলোর বিকল্প কিছু নিয়ে তাদেরকে ফ্যাশন সাজাতে হচ্ছে। কিন্তু যে ধরনের ভবিষ্যদ্বাণী ও ঝুঁকি নির্ণয় এক্ষেত্রে প্রয়োজন সেটি সহজ নয়। সেই কঠিন কাজটি তাঁদের করতে হচ্ছে, বিজ্ঞান কী বলে তার দিকে কড়া নজর রাখতে হচ্ছে।

শুধু উপাদান সরবরাহ পাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী নয়, চাহিদার ভবিষ্যদ্বাণীটি অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। ইউরোপে, কানাডায় গ্রীস্মে যে রকম গরমের সঙ্গে কিছুদিন আগেও পরিচয় ছিলো এখন তা সব অভিজ্ঞতাকে

ভেঙ্গেচুরে উর্ধ্বমুখী হয়েছে। সেক্ষেত্রে গরমে ব্যবহার হবার মতো ফ্যাশন বস্তু কি আর আগের মত থাকতে পারবে? চাহিদার জায়গাগুলোতে শীত-গ্রীষ্ম বর্ষার আচরণটি যদি বদলে যেতে থাকে তা ফ্যাশন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কূলোতে পারবে কিনা সেটিই প্রশ্ন। স্বল্প মেয়াদে এর সঙ্গে সহ-অবস্থানের জন্য নানা বিকল্প সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করা হচ্ছে– যার একটি থেকে অন্যটিতে দ্রুত পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু সেটি মোটেই আদর্শ ব্যবস্থা নয়। আরো দীর্ঘ মেয়াদে যে পরিবর্তনটি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়তে পারে তা হলো ওই সব প্রাকৃতিক উপাদানের পরিবর্তে কৃত্রিম উপাদানে চলে যাওয়ার– মোটের ওপর সিনথেটিক কাপড় চামড়া ইত্যাদির ভিত্তিতে। ফ্যাশনের শিল্প দিন দিন সেদিকে ঝুঁকে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর একই উপাদানকে বার বার ব্যবহার করার যে রীতিকে রিসাইক্লিং বলা হয় সেটিও এর কল্যাণে ফ্যাশনে পরিণত হবার একটি দরজা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে।

ব্যবসার উন্নতি চাইলে তার জন্য স্থিতিশীল পরিবেশ লাগে– যে কোন অস্থিতিশীলতাকে এড়াবার জন্য, নিশ্চয়তার মধ্যে থাকার জন্য এটি সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। ফ্যাশন ব্যবসা তার ব্যতিক্রম নয় বলেই উপাদানের দিক থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের আঁচটি এত বেশি তার গায়ে লাগছে। এখানে নানা বৈজ্ঞানিক সম্ভাবনার সঙ্গে যোগাযোগ না করে, সেগুলোকে উৎসাহিত না করে ফ্যাশনের আর্টও চল্‌তে পারছেনা।

পনির প্রস্তুতকারীদের শীর্ষ সম্মেলনঃ

২০২২ সালে পানির প্রস্তুতকারীদের একটি সামিট বা শীর্ষ সম্মেলন যুক্তরাষ্ট্রের ভেরমন্টে যখন হয়ে গেলো তখন তা যে খুব বেশি হৈচৈ ফেলেছিলো তা নয়- কিন্তু ওই ডেইরি শিল্পীদের কাছে ওটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আজকের জলবায়ু পরিবর্তনে পনির প্রস্তুতকারীদের সামনে বড় বড় কিছু প্রশ্ন এনে দাঁড় করিয়েছে– সেটিই ছিল সামিটের প্রধান বিষয়বস্তু। জলবায়ু পরিবর্তন এমনিতে পনির উৎপাদনের জন্য বড় সমস্যা নয়- স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে ৪-৫ হাজার বছর আগে এমনি এক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণেই বর্তমান রাশিয়ার স্টেপ্‌স তৃণভূমি অঞ্চলের মানুষ দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য গ্রহণে অভ্যস্ত হতে বাধ্য হয়েছিলো। সাধারণত শৈশবের পর মানুষের দুধ হজম হয়না, প্রয়োজনীয় এনজাইম তৈরি করতে পারেনা বলে। কিন্তু সেকালের এক

জলবায়ু পরিবর্তন ওই সময় ওই জায়গার মানুষকে কৃষির পরিবর্তে পশুচারণের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য করে, ফলে ওদের মধ্যে ওই দুধ-হজমের এনজাইমটি বিবর্তিত হয়। পনির তৈরি তখন থেকে। বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনেও অন্য অনেক উদ্ভিদের চাষ ব্যাহত হলেও তৃণভূমির ঘাসের পক্ষে অনেক চরম জলবায়ুতেও বেঁচে থাকার সুযোগ রয়েছে। কাজেই অন্য প্রাণী যত সহজে জলবায়ুর কাছে কাবু হয়ে পড়ে গরু ছাগল ভেড়া উটের মত ঘাস খাওয়া, জাবর কাটা প্রাণী ততটা নয়।

কিন্তু এই প্রাণীগুলোই আবার বর্তমান জলবায়ু পরিবর্তনকে উস্কে দিচ্ছে ঘন ঘন মুখে হাই তুলে প্রচুর পরিমাণে মিথেন গ্যাস বাতাসে ছেড়ে। যেই মিথেন গ্রীন হাউস গ্যাস হিসেবে কার্বন ডাই অক্সাইডের থেকে অনেক গুণে বেশি কার্যকর। এই বিষয়টি পনির তৈরি ও অন্যান্য সব রকম ডেইরি শিল্পকে জলবায়ু পরিবর্তন রোধ আন্দোলনের বিপক্ষে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া অতিরিক্ত গরু-ছাগল-ভেড়া মানে তৃণভূমিকে মুড়িয়ে ফেলে জীববৈচিত্রের একটি বড় আবাসকে দূর করা। ভেরমন্ট শীর্ষ সম্মেলনে তাই পনির শিল্পের ক্ষেত্রে বড় রকমের কোন নীতিগত বাধার সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে কিনা সেই উদ্বেগটি ভুলে যাওয়া হয়নি।

কিন্তু মানুষ কি পনিরের মায়া ত্যাগ করতে পারবে? এটিতো নেহাৎ একটি খাদ্য মাত্র নয়, বিশেষ করে ইউরোপীয় সংস্কৃতির মানুষের কাছে। অনেক জায়গার মানুষের কাছে এটি রীতিমত একটি ঐতিহ্য যা সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে স্বীকৃত। এরকম ছোট, অন্যথা বৈশিষ্টহীন অনেক জায়গাকে দুনিয়ার মানুষ তার পনির দিয়ে চেনে। ওই জায়গার যাবতীয় বৈশিষ্টই তার পনিরে– নরমান্ডি (ফ্রান্স), লামাঞ্চা (স্পেন), চেডার (ইংল্যান্ড), আল্‌কমার (হল্যান্ড), গ্রুয়েরিজ (সুইজারল্যান্ড), ভেরমন্ট (যুক্তরাষ্ট্র) ইত্যাদি আরো অনেক। কী কারণে এর প্রত্যেকটির পনির বিশিষ্ট, পনিরপ্রিয় মানুষ এর এক একটির জন্য পাগল? কোথা থেকে আসে তার বৈশিষ্ট? কেউ বলেন তার মাটি যেখানে ঘাস জন্মে ও গরু খেলে তার দুধ থেকে পনির হয়; কেউ বলেন এটি তার বিশেষ পদ্ধতি; আবার কেউ বলেন যেভাবে তৈরির পর পনিরকে গাঁজানোর জন্য বহুদিন রেখে দেয়া হয় তাতে যে বিশেষ জীবাণু কাজ করে তারই কৃতিত্ব এটি। এমনি স্বাদ-গন্ধ, এমনি ঐতিহ্য আর এমনি মানুষের

ভাল লাগাকে কেন্দ্র করে পনির আজ শুধু দুগ্ধশিল্পীর শিল্পই নয় ছোট বড় অনেক কোম্পানীর পৃথিবীজোড়া বড় ব্যবসাও বটে। এর সব উদ্যোক্তরা বিজ্ঞানে অবদান রাখতে চায়– যে বিজ্ঞান জাবরকাটা প্রাণীদেরকে তাদের বদনাম থেকে অব্যাহতি দেবে। যাতে পনির শিল্প, পুরো ডেইরি শিল্প, গোচারণ, ভেড়া পালন ইত্যাদির সঙ্গে জলবায়ুর কোন বৈরি সম্পর্ক ভবিষ্যতে না থাকে।

গরুর খাদ্যে বিশেষ বাড়তি উপাদান যোগ করে গরুর পেটে মিথেন তৈরির পরিমাণ কমানো ও তার হাইয়ের সঙ্গে এর উদগীরণ কমানোর কিছু গবেষণা ইতোমধ্যেই সাফল্যের মুখ দেখছে। আরো একটু ভবিষ্যৎমুখী গবেষণাও রয়েছে যেখানে জিন-কারিগরির মাধ্যমে হাই তোলার ব্যাপারটিকেই অনেকটা কমিয়ে ফেলা হয়েছে। ভেড়ার ক্ষেত্রে এরকম বিশেষ জিন-পরিবর্তিত ভেড়া মিথেন উদ্গীরণ অনেকটাই কমিয়ে আনার সম্ভাবনা দেখাচ্ছে। যদিও পনির শীর্ষ সম্মেলন প্রস্তুতকারী ও পনির ব্যবসায়ীর দিক থেকেই সব কিছুকে দেখেছে, বিজ্ঞানের জগত থেকে তাঁদের আর দূরে থাকার উপায় নেই। পনির সংস্কৃতিও জলবায়ু পরিবর্তন গবেষণায় একটি অনুপ্রেরণা।

জলবায়ু পরিবর্তনে গৃহ-নির্মাণ:

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বিশেষ করে উপকূল অঞ্চলে যা ঘটছে, এবং ঘটার প্রকোপ ক্রমাগত বাড়ছে, তাতে বাড়ি তৈরির ব্যাপারের সব থেকে বেশি গবেষণা দরকার ছিল আমাদের দেশে। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, সমুদ্রপৃষ্ঠ উচ্চতা বৃদ্ধি, জমিতে ও জল প্রবাহে নোনা ঢুকে যাওয়া ইত্যাদি জলবায়ু পরিবর্তনের সকল ফলশ্রুতির ভুক্তভোগী আমরা। সে কারণে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের বাইরেও সাধারণ মানুষের নিত্য থাকার বাড়িঘর নিয়ে নতুন ভাবে চিন্তার প্রয়োজন আছে। অন্যান্য দেশে অবশ্য সেই চিন্তার কোন বিরাম নেই। কারণ দীর্ঘ-মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনের পাগলা ঘোড়াকে কিছুটা বাগে আনার স্বপ্ন সচেতন মানুষের থাকলেও, স্বল্প মেয়াদে এর সঙ্গে আপোষ করেই যে আমাদেরকে বসবাস করতে হবে তা বলাই বাহুল্য।

সে সব দেশের অনেকগুলোতে ওপরের বিভিন্ন সমস্যাগুলো রয়েছে। তার ওপর আছে যেখানে কোন কালে বন্যা হয়নি সেখানে বন্যা ও বর্ষণ, যেগুলো

শীতের দেশ বলে পরিচিত সেখানে এখন চরম গরমে প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে। আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে কোন কোন দেশে দাবানলের তীব্রতা ও বিস্তৃতি বৃদ্ধি। দাবানল এখন বনে সীমাবদ্ধ থাকছেনা, চলে আসছে মানুষের গুরুত্বপূর্ণ জনপদে– ধ্বংস হচ্ছে বাড়ি, এবং এই প্রথম দগ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে মানুষ, ২০২৩ সালে গ্রীষ্মে দাবানলে হাওয়াইতে যা হয়েছে তা রীতিমত শিউরে ওঠার মত। এর সব কিছুর মোকাবেলা মানুষকে করতে হচ্ছে তাদের বাড়ি থেকেই, সেই বাড়িটি কেমন হলে ন্যূনতম নিরাপত্তাটি রক্ষিত হবে?

ঘূর্ণিঝড়ে ঘরকে মজবুত করতে হবে, বন্যায় পানির বাইরে টেকসই অবস্থায় রাখতে হবে, নোনার থেকে সাধারণ ফলন ও পানীয় জলকে কীভাবে রক্ষা করতে হবে, চরম গরমে ঘরকে কী ভাবে ঠান্ডা রাখা যাবে, আগুন যখন কাছে চলে আসে তখন এই বাড়ী কীভাবে নিরাপত্তা দিতে পারবে ইত্যাদি নানা সমস্যার সমাধান করাই হবে এ নিয়ে গবেষণার লক্ষ্যগুলো। চিরাচরিত ভাবে এগুলোর সমাধান করতে গেলে আবার মূল সমস্যাকেও উস্‌কে দেবার ব্যাপারটি ঘটে যেতে পারে। যেমন উচ্চ গরম নিবারণের জন্য যদি সাধারণ ফসিল জ্বালানিতে তৈরি বিদ্যুৎ ব্যবহার করি তা হলে জলবায়ু পরিবর্তনকেই বাড়িয়ে দেয়া হবে। সেখানে নবায়নযোগ্য শক্তির বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে হবে, অথবা যাকে বলা হয় নিষ্ক্রিয় উত্তাপ নিয়ন্ত্রণে বাড়িকে এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যা, ছায়া সৃষ্টি করে, ওপরে চিমনি বা টাওয়ারের মত পরিচলনের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের মধ্য দিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করে, উত্তাপ-নিরোধী নানা ব্যবস্থা নিয়ে তা করা যাবে। জলোচ্ছাসে বাড়িকে রক্ষার জন্য পানির উচ্চতার সঙ্গে বাড়িকেও ভাসিয়ে উঁচুতে তোলার ব্যবস্থাও উদ্ভাবন করা হয়েছে।

এই সমাধানগুলোর সবগুলো যে শুধু উচ্চ প্রযুক্তির মাধ্যমে চিন্তা করা হচ্ছে তা মোটেই নয়। নানা দিক থেকে এই ব্যাপারে ইশারা পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে যার ভেতর আছে ইরান, আফ্রিকার কোন কোন দেশের বসত নির্মাণের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য– যেমন ঘর ঠাণ্ডা রাখার ব্যাপারে, তেমনি আছে আজকের নানা গোষ্ঠির লোকজ সংস্কৃতি থেকে পাওয়া কৌশলও। উদাহরণ স্বরূপ যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ পশ্চিমে সেনোরাম মরুভূমিতে খুব দীর্ঘকায় বড় যে ফণীমনসা জাতীয় ক্যাকটাস ওপরে উঠে কয়েক শাখায় বিভক্ত হয় তার থেকেও উপযুক্ত বাড়ির আন্দাজ পাওয়া গেছে। এতে গাছটির বাইরের

খোলক বাকি অংশকে ছায়া দিয়ে শীতল রাখে, বাতাসের পরিচলনের মাধ্যমেও শীতল রাখে। সরাসরি ওই ক্যাকটাসকে অনুসরণ করে নিষ্ক্রিয় শীতলীকরণের আয়োজন করেছেন বিজ্ঞানীরা।

তাপনিরোধী বস্তু দিয়ে বাড়িকে উত্তাপ, শীত এবং আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য পুরু কাদার আবরণ থেকে শুরু করে আধুনিক বস্তু-বিজ্ঞানের মাধ্যমে তৈরি কাচ পর্যন্ত ব্যবহার হয়েছে। ওই কাচ এমন ভাবে তৈরি যাতে বাইরের আলো-তাপ যত বেশি পড়বে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে কালচে হয়ে গিয়ে তা রোধ করবে; কাজেই ঘরকে একটি নির্দিষ্ট উত্তাপে রাখা সম্ভব কোন বিদ্যুৎ শক্তি ব্যয় না করেই।

নতুন একটি বড় প্রয়োজন যা অনেক জায়গায় এসে গেছে তা হলো দাবানলের আগুন থেকে বাড়িকে যথাসম্ভব নিরাপদ রাখা। এই ব্যাপারে একটি উপায় চেষ্টা করা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে দাবানলের নানা প্রকৃতি থেকে আগুন এগুবার পথটি আগে থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারা। সেটি জেনে সেই পথ থেকে দাহ্য গাছপালাগুলো সরিয়ে আগুনকে ওখানেই নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন আগুননিরোধী পর্দা, দেয়াল ইত্যাদির ওপর কাজ চলছে, যাতে আগুন এসে গেলেও ঠেকিয়ে রাখা যায়। এমনকি ঘরের ভেতরেও যাবতীয় আসবাবপত্র সম্পূর্ণ অদাহ্য ও আগুন-নিরোধী বস্তুতে তৈরি করা যায় কিনা যে চেষ্টাও চলছে।

এই সব গবেষণায় একটি লক্ষ্য করার বিষয় হলো এতে সাধারণ মানুষের সাধারণ বাড়ির দিকে নজর দেবার মাধ্যমে একজন গেরস্থের দৈনন্দিন জীবনকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিরোধের সংগ্রামে নিয়ে এসেছে। তাঁদের এবং তাঁদের বাড়ি নির্মাতাদের পূর্ণ সহযোগিতা ও উৎসাহ ছাড়া এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রাটি চালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। তাই সাধারণ মানুষের গৃহ-পরিকল্পনায় এখন জলবায়ু পরিবর্তনের বিজ্ঞানের বিষয়ে প্রচুর কথা থাকছে।

পাখির জন্যও বাসা– উদ্দেশ্য একই:

অন্য আরেক রকম গৃহ-নির্মাতারাও জলবায়ু এবং জীববৈচিত্র নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, তবে তাঁরা মানুষের ঘরের জন্য নয়, পাখির আশ্রয় হিসেবে তাঁদের

জন্য ঘর তৈরি করে দেয়ার জন্য। ডেনমার্ক দেশটি বায়ু-বিদ্যুৎ প্রকল্পে তার অগ্রগতির জন্য বিখ্যাত– বিশেষ করে উপকূলের কাছে সমুদ্রের মধ্যেই অনেক উইন্ড টারবাইন স্থাপন করে বায়ু-বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য। ওদেশের কোম্পানী ওয়েস্টের্ড অন্য নানা দেশেও সমুদ্রে ওভাবে উইন্ডে টার্‌বাইন স্থাপন করেছে– যেমন বৃটেনের সাফোক অঞ্চলে সমুদ্রতীর থেকে এক কিলোমিটার দূরে সাগর বুকে অনেকগুলো। এই বায়ু-বিদ্যুৎ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নবায়নযোগ্য শক্তির একটি ভাল উদাহরণ। কিন্তু সমস্যা হলো উইন্ড-টারবাইনগুলো এখানকার কিছু সামুদ্রিক পাখিকে বিলুপ্তির দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

শুধু সাফোক উপকূলে নয়, উন্নত অনেকগুলো দেশে উইন্ড টারবাইনে কাটা পড়ে প্রচুর পাখি মারা যাচ্ছে– একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রেই বছরে ৩ লক্ষ পর্যন্ত পাখি মারা যায়। সাফোকের এমনি একটি গুরুত্বপূর্ণ পাখি কিটিওয়েক এভাবে বিলুপ্তির কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। ওই কোম্পানীই তাই এখন ওই সমুদ্রেই উইন্ড টারবাইনকে আশ্রয় না করে কিটিওয়েক পাখি যেন বিকল্প আশ্রয় পেতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছে পরীক্ষামূলক ভাবে। এটি সফল হলে ওভাবে ‘পাখির বাসার’ ব্যবস্থা করে অন্য অনেক সামুদ্রিক পাখির জীববৈচিত্রকে রক্ষা করা সম্ভব হবে ভাবছেন বিজ্ঞানীরা।

বিলুপ্তির থেকে রক্ষা করার একটি প্রধান উপায় হলো নিরাপদ জায়গায় বাসা বেঁধে পাখিকে বংশ রক্ষার সুযোগ দেয়া। এজন্য এ পরীক্ষায় অনেকগুলো পাখি যেন নিরাপদে বাসা বেঁধে থাকতে পারে এমন একটি কলোনি-বাড়ি বানিয়ে দেয়া হয়েছে অগভীর সমুদ্রের শক্ত ধাতব পিলার গেঁড়ে তার ওপরে, সমুদ্রের পৃষ্ঠ থেকে কয়েক মিটার উঁচুতে। বাসা বাঁধার একটি আশ্রয় করে দিলাম, বাকি কাজ তারা করবে ব্যাপারটি এতটা সহজ নয়। এর জন্য সেখানে পাখি প্রজনন সুবিধা-অসুবিধাগুলো দেখার জন্য গঠন করা হয়েছে রীতিমত একটি গবেষণা টিম– পক্ষীবিদ, স্থপতি ও প্রকৌশলীদের সমন্বয়ে, কারণ সমুদ্রে ওই আশ্রয় নির্মাণ ওদের সবার জন্যই একটি চ্যালেঞ্জ– বিশেষ করে মূল উদ্দেশ্যের দিকে যদি লক্ষ্য রাখতে হয়।

কলোনি-বাড়িটি আসলে একটি বড় অষ্টভুজ আকৃতির কামরা যার আটটি দেয়াল বাইরে থেকে আটটি খাড়া সমতল হিসেবে দেখা যায়; ওপরে তার

ছাদ। ওই আটটি তলের প্রত্যেকটির বাইরে, অর্থাৎ দেয়ালের বাইরের এক একটি তলকে পাখির জন্য একটি আকর্ষণীয় খোপ খোপ জায়গা হিসেবে গড়া হয়েছে। যাতে দূর থেকে উড়ে আসা পাখি অনায়াসে এসব খোপ দেখতে পায় এবং সেখানে নিজেদের বাসা করতে আগ্রহী হয়। বাসা করার সকল সুবিধা ওখানে দেয়া থাকে। কামরাটি ঘিরে ওরকম আটটি ভিন্ন ভিন্ন তল থাকার সুবিধা হলো তাতে মৌসুম, সময় ও স্থানীয় পরিস্থিতি অনুযায়ী কোন তল হবে ছায়ায়, কোন তল হবে রোদে, কোন তল বায়ু প্রবাহের দিকে, কোনটি তার বিপরীতে, এমনি নানা বিকল্পের মধ্যে পাখি তার বাসার স্থান বেছে নিতে পারে যে কোন একটি তলে। ওভাবে খাড়া তল, খোপ ইত্যাদি করার পেছনেও একটি উদ্দেশ্য আছে। এখানে এই সব সামুদ্রিক পাখি সাধারণত বাসা বাঁধে ইংল্যান্ডের তীরে অবক্ষয় হওয়া পাহাড়ের একেবারে খাড়া দেয়ালের মত গায়ে। চকের মতো চূনা পাথরের তৈরি বলে যার রং সাদা এবং যাতে রয়েছে অনেকগুলো গর্তের খোপ। পাখিরা সমুদ্র থেকে উড়ে এসে এখানে খোপের মধ্যে বাসা বাঁধে প্রাকৃতিক ভাবে। কলোনি-বাড়ি সমুদ্রের মধ্যেই তাদেরকে সেই সুবিধা দেয়ার জন্য ও আকৃষ্ট করার জন্য ওই প্রাকৃতিক জায়গাটিরই অনুকরণ করেছে– রঙও রেখেছে প্রায় সাদা। পাখির বাসার স্থপতিদেরকে এসব গবেষণা করে বের করতে হয়েছে। দেখতে হয়েছে নীল আকাশ, সমুদ্রের পানির রং এসবের মধ্যে কলোনি-বাড়ির রং ও আকৃতি যেন পাখির চোখে ভয়ের কিছু না হয়ে পরিচিত ও আকর্ষণীয় কিছু হয়ে ওঠে।

আটটি তলের সাতটিতেই পাখির বাসার ব্যবস্থা, অষ্টম তলটি গবেষকদের আসা যাওয়ার দরজা– কামরার ভেতরে তাঁদের জন্য সুকৌশলে তৈরি ল্যাবোরেটরি। ওখানে বসে তাঁরা বাকি সাত তলের পাখিদেরকে নীরবে পর্যবেক্ষণ করে যেতে পারেন, নিজেদের উপস্থিতি পাখিদেরকে আদৌ জানতে না দিয়ে। যতক্ষণ পাখি উইন্ড টারবাইনকে তাদের একমাত্র আশ্রয় মনে করেছে ততক্ষণ ব্যাপারটি তাদের জন্য বিপজ্জনক ছিল। এখন কাছেই বিকল্প আকর্ষণীয় বাসা বাঁধার জায়গা তাদের সুরক্ষা ও বংশবৃদ্ধিতে অনেক অবদান রাখবে, এটিই আশা। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই কোন এক-রৈখিক বিষয় নয়। নবায়নযোগ্য শক্তি পেতে গিয়ে পাখির জন্য যে বিপদ তাকেও যদি একই সঙ্গে নিরসণ না করা যায় তা হলে লড়াই সফল

হবেনা। আর এ লড়াই মোটেই শুধু বিজ্ঞানীদের লড়াই নয়, এটি সবার, সব রকম মানুষের– বিশেষ করে সৃজনশীল মানুষদের। পক্ষীবিদ আর প্রকৌশলী কাজ করছেন পাখির বাসার আর্টিস্ট ডিজাইনারকে নিয়ে।

প্রত্নতত্ত্বের চর্চায় নানা মানুষের অনুভূতি

প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে মানুষ কী ভাবে:

প্রত্নতত্ত্বের কথা এলেই মনে হয় এটি খুব প্রাচীন সব কিছুর সন্ধানে আছে– প্রাচীন মানুষের বা প্রাচীন প্রাণীর। কিন্তু তার কাজ সব সময় অতি প্রাচীনকে নিয়ে নাও হতে পারে, কিছুটা পুরানো দিনের কথা এলেই ওটি কাজে লেগে যায়। যেমন ১৭০০ শতকের মাঝামাঝি এক সময় রটে গিয়েছিলো যে বিখ্যাত রাজনীতিবিদ বিজ্ঞানী যুক্তরাষ্ট্রের বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিন তাঁর বালক ছেলেকে সাথে নিয়ে বজ্রসংকুল বৃষ্টির দিনে ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎ নামিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে সে দেশের ও ইউরোপের নানা পত্রিকায় এই ঘটনার ছবি ও কার্টুন ছবি নানা ভাবে ছাপানো হয়েছিলো। আজ বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ এই পত্রিকা-ছবিগুলোর গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন যে ফ্রাঙ্কলিন এমন বিপজ্জনক কাজ করেননি। এটিও প্রত্নতত্ত্বের একটি কাজ। আবার এই প্রত্নতত্ত্বই বিভিন্ন স্তরের শিলার মধ্যে ইরিডিয়াম নামের বিরল ধাতুর হঠাৎ বেশি থাকা দেখে তার থেকেই আইডিয়া পেয়ে সন্ধানে লেগে যান সাড়ে ছয় কোটি বছর আগে দুনিয়ার সব ডাইনোসর কেমন করে বিলুপ্ত হয়েছিলো তার খোঁজে।

যারাই প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে একটু পরিচিত হয়েছে তারাই জানে কীভাবে এর সঙ্গে জড়িতরা ছোট্ট অতি সাধারণ কিছু নমুনা থেকে বড় সব ঘটনার আলামত পেয়ে যান। তাঁদের কাছে অবশ্য কিছুই তুচ্ছ নয়। মেক্সিকোতে প্রাচীন মানুষের কঙ্কালের দাঁতের ফাঁকে যে একটু ভুট্টার কণা কেমন করে জানি সংরক্ষিত হয়ে গিয়েছে মাইক্রোপস্কোপে তার কোষকলার বৃত্তান্ত দেখে বোঝা গেছে ওটি আজকের চাষ করে ফলানো ভুট্টার মত, ক্ষুদ্র তুচ্ছ দানার বন্য ভুট্টা নয়। ওখান থেকে বোঝা গিয়েছে ওই ৪-৫ হাজার বছর আগে মেক্সিকোর মানুষ ভুট্টার কৃষি প্রবর্তন করতে পেরেছিলো। শিকারি- সংগ্রাহক জীবনযাত্রা থেকে কৃষির জীবনে আসা যে কোন মানব গোষ্ঠির জন্য একটি খুবই বড় ঘটনা– এক্ষেত্রে এটিই মেক্সিকোতে বড় বড় সভ্যতার সূত্রপাত

করতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; অথচ কঙ্কালের দাঁতের ফাঁকে আধখাওয়া শস্য কণাকে তুলে না আনলে এসব কি আমরা জানতাম?

প্রত্নতত্ত্ব নানা ভাবে কাজ করলেও সাধারণ মানুষের কাছে এর যে ছবিটি সব সময় ফুটে ওঠে তা হলো খোঁড়াখুঁড়ির কাজের ছবি, মাটি সরিয়ে সেখানে কিছু আবিষ্কারের চিত্র। কিন্তু তেমন কোন খোঁড়াখুঁড়ি না করেই প্রত্নতাত্ত্বিক বড় বড় আবিষ্কার করে ফেলতে পারেন। কয়েক বছর আগে ২০১৯ সালে প্যারিস নগরের কেন্দ্রে বিখ্যাত নটারডেম গির্জায় আগুন লেগে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো মধ্যযুগের এই অপূর্ব কীর্তির। তার পোড়া ছাইগুলো সরাতে গিয়ে ওখান থেকেই উঠে আসলো এই গির্জার পেছনের অনেক অজানা ইতিহাস শুধু ছোটখাট কিছু নিদর্শনের থেকেই। এখানে খোঁড়াখুঁড়ির প্রয়োজন হলোনা। কিন্তু আবার মিশরের যে অঞ্চলে বড় পিরামিডগুলো রয়েছে সেই পুরো অঞ্চলটিতে মনে হয় কয়েক শত বছর ধরে প্রত্নতত্ত্ববিদদের খোঁড়াখুঁড়ি আর শেষ হতেই চাচ্ছেনা। ক'দিন পর পর এমনি নতুন পুরাতন খোঁড়াখুঁড়ির থেকে যেন কিছু না কিছু উন্মোচিত হচ্ছে!

খোঁড়াখুঁড়ির প্রয়োজন হোক বা না হোক নিদর্শন খুঁজে পাওয়া একটি প্রথম ধাপ মাত্র। আসল উন্মোচনগুলো হয় সেই নিদর্শনকে যখন ল্যাবোরেটরিতে নিয়ে পরীক্ষা করা হয়; তার আদ্যোপান্ত জানার চেষ্টা করা হয়। এই সব প্রত্নতত্ত্ববিদদের জন্য অত্যন্ত লোমহর্ষক ব্যাপার। তবে সাধারণ মানুষের কাছেও কম রোমান্টিক নয়। মানুষ ইতিহাসের ভক্ত; প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে ইতিহাসের গল্প তার মুখে মুখে থাকে এবং সেগুলো অন্যদেরকে বলতে সে ভালবাসে। জনশ্রুতিতে চলে আসা ওসব গল্প কিন্তু এখনো ইতিহাসের উপাদান হচ্ছে। কাজেই প্রত্নতত্ত্ব যা খুঁড়ে বা তুলে আনছে মানুষের গল্প থেকে তা বেশি দূরে থাকতে পারেনা, অন্তত স্থানীয়ভাবে তো নয়ই। স্থানীয়ভাবে আরো অনেক কিছু ঘটে প্রত্নতত্ত্বের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নিয়ে। প্রত্নতত্ত্ববিদ যখন কোথাও খনন করতে আসেন স্থানীয় মানুষের কৌতুহল, উদ্বেগ অনেক বেড়ে যায়– ভুল্‌লে চলবেনা তাদেরই হাজার বছর আগের পূর্বপুরুষদের নিয়েই তো এত সব কাজের উদ্যোগ! ওই মানুষগুলো আধুনিক নগরবাসীই হোন কিংবা আদিবাসী ভূমিপুত্রই হোন তাঁদের চিন্তা, তাঁদের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিতে হয়। অনেক সময় তাঁদের অনেকেই স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে

এগিয়েও আসেন প্রত্নতত্ত্বে হাত লাগাবার জন্য। এজন্যই কট্টর বিজ্ঞান হয়ে মানুষের অন্যান্য সুখ-দুঃখের, ভাবনার সঙ্গে নির্লিপ্ত থাকাটি প্রত্নতত্ত্বের সাজেনা। আজকের মানুষের পূর্বস্মৃতি, রোমান্টিক কল্পনা এই সব কিছুকেও নিয়ে কাজ করতে হয় প্রত্নতত্ত্ববিদকে; চেষ্টা করতে হয় সেই মনোজগতের কাছাকাছি যাবার। মৌখিক ইতিহাস, জনশ্রুতি ইত্যাদিও তাঁর কাজে খুবই সহায়ক হয়। কে বলে তিনি শুধু প্রাচীন মানুষের চিন্তা করেন, আজকের মানুষের চিন্তাটিও তাঁর কাছে জ্বলজ্যান্ত। এসবই করে তুলেছে প্রত্নতত্ত্বকে আর্ট এবং সায়েন্সের একটি সুন্দর মেশাল। সেটি প্রাচীন মানুষের জন্য তো বটেই, আজকের মানুষের জন্যও বটে।

এয়ারপোর্টটি নতুন, কিন্তু ম্যামথগুলো প্রাচীন:

মেক্সিকো সিটির কাছে একটি নতুন বিমান বন্দরের নির্মাণকাজ করতে গিয়ে অনেক ম্যামথ ফসিলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে সম্প্রতি। ম্যামথ হলো হাতির পূর্বপুরুষ, হাতির থেকে আরো অনেক বড়। হাতি এখন মেক্সিকো দেশটিতে বা এমনকি তার পুরো মহাদেশে বা এর সংলগ্ন অন্য মহাদেশটিতেও কোথাও নেই। কিন্তু বহু হাজার বছর আগে এই পূর্বসূরী প্রাণীরা ছিল। বিমান বন্দরের এই অল্প জায়গাতেই তো পাওয়া গেছে মোট ২০০টি বিশাল-দেহী ম্যামথের কঙ্কাল। বোঝাই যাচ্ছে এ অঞ্চলে খোঁড়াখুঁড়ি করে খুঁজলে আরো অনেক পাওয়া যাবে। যে কঙ্কালগুলো পাওয়া গেছে তা যে গোটা কঙ্কাল হিসেবে পাওয়া গেছে তাও নয়। অনেক পরিশ্রমে তার ভাঙ্গাচোরা অংশগুলোকে জুড়ে জুড়ে মোট ২০০টি কঙ্কাল দাঁড়িয়েছে। এমন বড় জনসংখ্যা থেকে ধরে নিতে পারি বর্তমানে তা না থাকলেও এক কালে এখানকার পরিবেশ ম্যামথদের জন্য বিশেষ উপযোগী ছিল। হ্রদের পাড়ে বনাকীর্ণ উদ্ভিদ সম্ভারের জায়গায় তারা বিপুল সংখ্যায় ঘুরে বেড়াতো।

আসলে মেক্সিকো সিটির এই উত্তরাঞ্চলটিতে ম্যামথের বাস যে ছিলো তা আগেই এখানে ওখানে দু'একটি ফসিলের মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছিলো। তাই ২০১৮ সালে এখানে বিমান বাহিনীর সান্তা লুসিয়া বেইসের কাছে যখন সর্ব সাধারণের জন্য একটি নতুন বিমান বন্দর তৈরির কাজে হাত দেয়া হয় তখন প্রত্নত্ত্ববিদদের একটি টিমকেও এ কাজের সঙ্গে লাগিয়ে রাখা হয়েছিলো। স্থানীয় মানুষরাও প্রত্নতত্ত্বের ব্যাপার স্যাপারের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিলো।

কারণ মেক্সিকো সিটির পুরো অঞ্চলটি প্রাচীন আজটেক সভ্যতার কেন্দ্র হিসেবে (আজটেক রাজধানীই পরে মেক্সিকো সিটি হয়েছে), তার আগের নানা সভ্যতার জন্য, ভুট্টা ও কুমড়া কৃষি উদ্ভাবনের জন্য, এবং ম্যামথ সহ বিশালাকায় প্রাচীন পশুর জন্য (মেগাফনা) প্রত্নতত্ত্ববিদদের প্রচুর মনোযোগ বহুদিন থেকে পাচ্ছিলো। এখানকার কালচারে, জনশ্রুতিতে, গল্প-কাহিনীতে প্রাচীনকালের কথা ভালভাবেই মিশে আছে। তাই সান্তা লুসিয়া অঞ্চলটির এই কর্মযজ্ঞে অনেকের নজর ছিলো।

তবে ২০০টি ম্যামথের ভাঙ্গা ভাঙ্গা হড়ের যে বিশাল সমারোহ শুধু বিমানবন্দর এলাকাতেই পাওয়া আরম্ভ হলো তখন প্রত্নতত্ত্ববিদদের ওই টিমকে আরো বড় করতে হলো, স্থানীয় উৎসাহী মানুষদের মধ্য থেকে স্বেচ্ছাসেবীর প্রয়োজন হলো। সবাই মিলে ৩ হাজার হেক্টর জায়গা থেকে শুধু ম্যামথের হাড় সংগ্রহ করলো– মোট ৮ হাজারটি হাড়। এক সময় উত্তর আমেরিকা পুরো মহাদেশে– কানাডা থেকে মেক্সিকো পর্যন্ত সর্বত্র– ম্যামথ ও অন্যান্য মেগাফনা যে ঘুরে বেড়াতো যে কথা জানা ছিলো। এমনো তত্ত্ব ছিল যে মানুষ দল বেঁধে শিকার করেই ওখানে মেগাফনার দিনের সমাপ্তি ঘটিয়েছিলো। কিন্তু এই সান্তা লুসিয়ায় যেই সংখ্যায় ম্যামথ পওয়া গেলো তা রীতিমত অবিশ্বাস্য। এটি সেদিনের মানুষে-ম্যামথে সম্পর্কটি আবার নতুন ভাবে আলোচনায় এনেছে। এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান তাঁরা এখনো থামান্নি, সেটি চল্ছে। কিন্তু একই সঙ্গে আজকের মানুষের কাছেও সেদিনের জীববৈচিত্র, এবং তার অবক্ষয়ের পেছনে মানুষের হস্তক্ষেপের বিষয়টি স্পষ্ট করাটিও প্রয়োজন মনে করছে এখানকার সচেতন মানুষরা। তাঁরা চান পর্যটকদের জন্য প্রিয় এই জায়গা আরো প্রিয় হোক, ওই বিষয়গুলো অনুভব করার জন্য। তাই এয়ারপোর্টের কাছেই এক কালের ম্যামথ অধ্যুষিত জায়গাতেই ম্যামথ মিউজিয়াম গড়ে সবাইকে ভাবতে দিতে চান। তাঁদের কল্পনায় ধরা দেবে এখানকার সেদিনের পরিবেশ, ম্যামথ, এবং তাদের প্রতি আচরণে মানুষের ভুল; সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি রোধে এটি সহায়ক হবে ইতিহাস আর জাদুঘর-বিদ্যার আর্টের দ্বারা মুগ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে। এই অনুভূতিই আরো বিজ্ঞান-অনুসন্ধানের প্রেরণা যোগাবে।

নারী-পুরুষ সমতা নিয়ে অতীতজনরা কী ভাবতোঃ

আজও অন্তর থেকে সবাই নারী-পুরুষ সমতার বিশ্বাস করেন কিনা সন্দেহ– ওটি মুখের বাক্যে যতটা নয়, তার থেকে বেশি আচরণের মধ্যে ফুটে ওঠে। অনেক সময় ওটি আপাত নির্দোষ বৈজ্ঞানিক কিছু আপ্ত বাক্য সৃষ্টির মধ্যেও ফুটে ওঠে যার একটি হলো- সুদূর অতীতে শিকারি সংগ্রাহকদের জীবনে পুরুষ শিকার করতো আর নারীরা সংগ্রহ করতো। একে প্রায়ই প্রমাণিত সত্য বলে প্রচার করা হয়। শিকারে বেশি সক্ষমতার দরকার হয়, ঝুঁকি অনেক, তাই ওটা শুধু পুরুষদের দ্বারাই সম্ভব ছিল– ওটিই হলো প্রতিপাদ্য বিষয়। কাজেই আজও যে পুরুষের হাতে কঠিন কাজগুলোর দায়িত্ব সেটি কোন চাপিয়ে দেয়া ব্যাপার নয়, বরং বৈজ্ঞানিক অপরিহার্যতা। আশপাশের বনবাদাড় থেকে সেদিন যেমন নারীরা শিকড়, শাক, শস্য, ফল সংগ্রহ করেছে এখনো অনুরূপ 'সহজতর' কাজগুলো করতে পারে। এই ট্র্যাডিশন চল্‌ছে।

এই ধারণাগুলো মূলত লোকজ হলেও তা যে এতো ব্যাপক সমর্থন পেয়েছে তার কারণ হলো বিজ্ঞানের কাছেও তা প্রশ্রয় পেয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত হিসেবেই। এখন নতুন আরো মনোযোগী গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে সিদ্ধান্তগুলোর ওপর লোকজ সংস্কৃতির ও পুরুষ-প্রধান মনোবৃত্তির হাত আছে। এখন নতুন তথ্য বের হবার একটি কারণ হচ্ছে যে নৃতত্ত্ববিদ ও প্রত্নতত্ত্ববিদদের মধ্যে এখন অনেক বেশি লিঙ্গ-সমতা অর্জিত হয়েছে এবং অনেক বেশি খোলা চোখ ও মন নিয়ে ব্যাপারগুলো দেখা সম্ভব হচ্ছে। গবেষণার একটি দিক হলো আজকের আদিবাসী শিকারি-সংগ্রাহক গোষ্ঠিগুলোর মধ্যে অতীতের অনেক আচরণ হুবহু এসেছে ধরে নেয়া। সেক্ষেত্রে আগের গবেষকরা শিকার সংক্রান্ত প্রশ্নগুলো ওই আদিবাসীদের পুরুষদেরকেই শুধু করেছেন, আর সংগ্রহ সম্পর্কে প্রশ্ন শুধু নারীদেরকে। পূর্ব ধারণা থেকে তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন যে নারীদের সঙ্গে শিকারের কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাদেরকেও যখন এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলো দেখা গেলো তারাও যথারীতি সব রকম শিকারে অংশ নেয়, এমনকি দু:সাধ্য বড় বড় পশু শিকারেও। আবার পুরুষরাও শিকড়-শস্য ইত্যাদি সংগ্রহে রীতিমত অংশ নেয়। এরকম নতুন একটি অনুসন্ধানে সারা দুনিয়ার ৩৯১টি শিকারি-সংগ্রাহক গোষ্ঠির তথ্য জানা গেছে– যার মধ্যে ৬৩ টিতে নারী-পুরুষের কাজ সম্পর্কে স্পষ্ট জানা গেছে। এর ৫০টি ক্ষেত্রেই নারীরা নিয়মিত শিকারে অংশ

নিয়ে থাকে। যারা নারীদের শিকার করা প্রাণীর বিস্তারিত তথ্য দিয়েছে তাদের মধ্যে ৩৩% নারী বড় প্রাণী এবং ৪৬% নারী ছোট প্রাণী শিকার করে থাকে। অনেকে ছোট শিশুকে সঙ্গে নিয়ে শিকার করে থাকে এমনো বলেছে। এ কথা স্পষ্ট যে শিকার ব্যাপারটি, এমন কি বড় প্রাণী শিকারের ব্যাপারটিও, পুরুষের মধ্যে মোটেই সীমাবদ্ধ নেই; নারীরা নিয়মিত ভাবে তাতে অংশ নিচ্ছে এবং অতীতে যে নিতো তাও মনে করাই স্বাভাবিক। এর বিপরীত কথাগুলো আমরা প্রয়োজনীয় তথ্য না জেনেই প্রচার করে আসছি।

প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে এই বিষয়টির অন্য কিছু প্রমাণের কথা বলা হতো প্রাচীন যেই বহু কবরে মৃতদেহের সঙ্গে শিকারের অস্ত্রশস্ত্র, সরঞ্জাম ইত্যাদিকে কবর দিতে দেখা গেছে তারা প্রায় সবাই পুরুষ। এটি পুরুষ শিকার করে আর নারী সংগ্রহ করে এমনি তত্ত্বকে সমর্থন যুগিয়ে আসছে। ২০২৩ সালে প্রকাশিত এ সম্পর্কে একটি গবেষণায় এমনি কিছু প্রাচীন কবরের থেকে সিদ্ধান্তগুলো কেমন করে নেয়া হয়েছে তা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। এতে অতীতের অনেকগুলো ভুল স্পষ্ট হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ পেরুর আন্দিজ পার্বত্য এলাকায় উইনিমায়া প্যালিক্সা নামক জায়গায় নয় হাজার বছর আগের একজন মহিলার কবরে দেয়া কিছু শিকারের সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। অতীতে যে প্রত্নতত্ত্ববিদরা ওটি পরীক্ষা করেছেন তাঁদের কাছে ওগুলো শিকার সংক্রান্ত সরঞ্জাম নয় বলে মনে হয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে ওগুলো শিকারের অস্ত্র, ও বড় প্রাণীদেহ কাটাচেরা করার হাতিয়ার। আরেকটি সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক জরিপে দেখা গেছে যে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় পাওয়া ২৭টি কবরে যেখানে শিকারের অস্ত্র পাওয়া গেছে সেখানে ১১টিতেই শায়িত আছে একজন নারীর কঙ্কাল বা মরদেহ। আর অস্ত্রগুলো সবই বড় বড় প্রাণী শিকারে ব্যবহৃত। ব্যাপারগুলো এখন বোঝা যাচ্ছে, তার কারণ আগে এর বেশির ভাগকেই পুরুষের দেহ বলে সাব্যস্ত হয়েছিলো– ভাল করে পরীক্ষা না করেই। ধরেই নেয়া হয়েছিলো শিকারের অস্ত্রের সঙ্গে যখন আছে তখন নিশ্চয়ই পুরুষ হবে, বেশি দেখার কী আছে। বিজ্ঞানের থেকে লোকজ বিশ্বাস এখানে বেশি কাজ করেছিলো।

আরেকটি বর্তমান পরীক্ষায় অদ্ভুত একটি ব্যাপার ধরা পড়েছে। এখন যদি একটি বর্শা নিক্ষেপ প্রতিযোগতায় নারী পুরুষ দুরকম প্রতিযোগীই অংশ নেয়,

দেখা যায় পুরুষরাই গড়পড়তা বেশি দূরে বর্শা নিক্ষেপ করতে পারে– এই ব্যাপারে তাদের হাতের জোর বেশি। অতীতেও নিশ্চয়ই তাই হতো শিকারের সময়। হয়তো সে জন্যই প্রাচীন কালে এক রকম বর্শা নিক্ষেপক যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছিলো। এটির সরল রূপ হলো একটি লাঠির মত, যার আগায় একটি খোপ থাকতো যাতে বর্শার দণ্ডটি কিছুটা ভরে রাখা যেতো। বর্শা ছোঁড়ার সময় এই লাঠিটিকে লিভার হিসেবে ব্যবহার করে তাকে ঘুরিয়ে বর্শাটি ওই খোপের ভেতর থেকে ছুঁড়ে দিলে কিছু বাড়তি যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যেতো। এর ফলে একই শক্তি প্রয়োগ করে বর্শা বেশি জোরে বেশি দূরে যেতে পারতো, অথবা কম শক্তি দিয়ে ছুঁড়েও খালি বর্শা বেশি শক্তিতে ছোঁড়ার সমান দূরত্বে যেতে পারতো। ফলে নারীরাও নিজের শক্তিতে নিক্ষেপক থেকে ছুঁড়ে বর্শাকে পুরুষের মত দূরত্বে নিতে পারতো। এর প্রমাণ পাওয়া গেলো সাম্প্রতিক একটি পরীক্ষায়। ১০৮ জন তরুণ ও তরুণীকে বর্শা এবং বর্শা নিক্ষেপকারী ব্যবহার ট্রেনিং দিয়ে তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়েছে। তারা সবাই মোট ২১৬০ বার বর্শা ছুঁড়েছে খালি বর্শা ও নিক্ষেপক থেকে ছুঁড়ে দেয়া উভয় রকমে। দেখা গেছে খালি বর্শা যারা সবচেয়ে দূরে নিয়েছে তাদের অধিকাংশই পুরুষ। কিন্তু নিক্ষেপক থেকে যারা বর্শাকে সবচেয়ে দূরে নিয়েছে তাদের মধ্যে নারী ও পুরুষ প্রায় সমান সংখ্যায় রয়েছে।

কাজেই প্রাচীন কালেও নারীরা শিকারে গেলে বর্শা চালানোতে পিছিয়ে থাকার কোন কারণ ছিলনা– কারণ নিক্ষেপক ব্যবহার করে তারা শারীরিক শক্তিতে পিছিয়ে থাকার ব্যাপারটিকে তুচ্ছ করতে পারতো। অন্তত প্রত্নতত্ত্বের দোহাই দিয়ে নারী-পুরুষ অসাম্যের জনশ্রুতিকে পাত্তা দেয়ার দিন এখন শেষ হয়ে গেছে। সেদিনের জন্য শিকার গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে সেই শিকারের উদাহরণটি দেয়া হলো। আজকের এগিয়ে যাওয়ার জন্য যে সব ক্ষেত্র সেখানেও পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে তাকালে দেখা যাবে একই রকম সুযোগ দেয়া হলে উভয়ে একই পর্যায়ের কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম। আরো একটি জিনিস ক্রমে স্পষ্ট হচ্ছে যে এ নিয়ে বিজ্ঞান যেখানে ভুল করেছে সেখানে দোষটি বিজ্ঞানের নয়, বরং বহিরঙ্গে নারীকে ও পুরুষকে যেভাবে, ঐতিহাসিক ভাবে-চিত্রিত করা হয়েছে সাহিত্যে, ছবিতে, নাটকে– তারই

প্রভাব বিজ্ঞানে গড়েছে। বিজ্ঞানে আর্টের প্রভাবটি খুব স্পষ্ট– সেটি ভাল মন্দ উভয় ফলাফল বয়ে আনতে পারে।

বিজ্ঞানীদের বহু-মহাবিশ্ব তত্ত্ব; জনমনে অন্য প্রভাব

গল্প তৈরিতে যুৎসই, বিজ্ঞানে তত নয়:

আমাদের মহাবিশ্ব সম্পর্কে বিজ্ঞান এখন বেশ স্পষ্ট বক্তব্য দিতে পারছে; এর সম্পর্কে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বটি হলো বিগ্ ব্যাং থিওরি। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ১৪০০ কোটি বছর আগে একটি মুহূর্তে সম্পূর্ণ একটি শূন্যাবস্থা থেকে হঠাৎ ক্ষুদ্র বিন্দুর আয়তনের অতি উত্তপ্ত অতি ঘন মহাবিশ্বটির জন্ম হয়েছে– ওই মুহূর্তটিরই নাম দেয়া হয়েছে বিগ্ ব্যাং, একটি বড় ঘটনা বা বিস্ফোরণ বোঝাতে। ওই শূন্যাবস্থা কথাটিরও মানে হলো সত্যিই শূন্য– স্থান বলে কিছু নেই, কাল বা সময় বলেও কিছু নেই– ওটিই সব কিছুর শুরু। তার পরের মুহূর্ত থেকে অসম্ভব দ্রুততায় বিন্দুটি বড় হয়েছে, ক্রমশ ঠান্ডা ও পাতলা হয়েছে; এর মধ্যে শক্তি এক পর্যায়ে বস্তুকণার রূপ নিয়েছে, শক্তি ওই বস্তু থেকে আলাদা হয়ে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ বড় করেছে, অতি পাতলা ফিনফিনে বস্তু কোথাও কোথাও বেশি ঘন হওয়াতে মাধ্যাকর্ষণে ওই জায়গাগুলোতে পূঞ্জীভূত হয়ে তারা ও তারার পুঞ্জ গ্যালাক্সি গঠন করেছে। এগুলোতে প্রচণ্ড ভর নিজের কেন্দ্রের ওপর ধসে পড়ার কারণে সেখানে উত্তপ্ত হয়ে জ্বলে ওঠেছে, ফলে নিউক্লিয়ার ফিউশন শক্তি উৎপাদন শুরু হয়েছে। আর মহাবিশ্ব এমনি অসংখ্য গ্যালাক্সি এবং বেশির ভাগ বস্তুশূন্য স্থান ও কাল হিসেবে আজ বিশাল আকার ধারণ করেছে। ক্রমাগত এটি আরো বড় হচ্ছে, আরো অধিক হারে বড় হচ্ছে। এটিই আমাদের মহাবিশ্বের অতীত থেকে বর্তমান, আমাদের জানা মত যত কিছুর অস্থিত্ব আছে তার সবই এর মধ্যেই।

আমাদের এই মহাবিশ্ব সম্পর্কে যা জানা গেছে তার সব কিছুই তাত্ত্বিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং বাস্তব তথ্য থেকে এর যে গাণিতিক মডেল তাতেও এর তত্ত্বটি সুন্দর খাপ খেয়ে যায়– সেই অর্থে এটি বাস্তব পরীক্ষায়ও প্রমাণিত।

কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানীরা তাঁদের অন্য কিছু ব্যাখ্যার সুবিধার্থে আমাদের মহাবিশ্বের বাইরে অন্য মহাবিশ্ব আছে, এমনকি তাদের সংখ্যা অসংখ্য হতে পারে এমন তত্ত্বও দিয়েছেন– তবে এ পর্যন্ত একেবারেই তাত্ত্বিক ভাবে। এর

গাণিতিক এক রকম ভিত্তি আছে, তবে বাস্তবে এমন কোন তথ্য নেই যা এমন অদ্ভুত তত্ত্ব প্রমাণ করতে পারে। আপাতত বাস্তব প্রমাণ করার কোন সুযোগও দেখা যাচ্ছেনা। কারণ আমাদের পাঠানো কোন সিগন্যাল ওই বাড়তি কোন মহাবিশ্বে পৌঁছতে পারবেনা। বিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী কোন সিগন্যালই, কোন তথ্যই, আলোর গতির থেকে দ্রুততর বেগে চলতে পারেনা, কিন্তু যেই স্থান-কালে ওই বাড়তি মহাবিশ্ব গঠিত তা ঠিকই আলোর গতির থেকে বেশি গতিতে আমাদের মহাবিশ্ব থেকে সরে যাচ্ছে। কাজেই তার সঙ্গে আমরা কোনদিন কোন সিগন্যাল বিনিময় করতে পারবোনা, তার সম্পর্কে কিছু জানতেও পারবোনা, সেরকম সিগন্যাল পেয়ে; সেগুলোতে আসা যাওয়া করার প্রশ্নতো ওঠেই না। তবুও তত্ত্বটি ঠিকই খাড়া হয়েছে এবং এর উপর তাত্ত্বিক গবেষণা চল্‌ছেই।

বিজ্ঞানে বহু-মহাবিশ্বের ধারণাটি এভাবে নেহাৎ তাত্ত্বিক ভিত্তিতে থাকলেও ওই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কিছুটা নিয়ে কল্পকাহিনীতে সেটি বেশ আসর জমিয়ে বসেছে। অন্য মহাবিশ্বের ব্যাপারে আমাদের নিজেদের মহাবিশ্বের সমান্তরালে কাহিনী বোনার সুযোগ প্রায় অফুরন্ত। কল্পকাহিনী রচয়িতারা এর পূর্ণ সুযোগ নিয়েছেন, পাঠকরাও তা লুফে নিয়েছেন। এটি সম্ভব হয়েছে তাঁরা এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেননি বলে, ইচ্ছে মত পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়েই গল্প বুনেছেন।

এই কল্পকাহিনীর কুশীলবরা এক মহাবিশ্ব থেকে আরেক মহাবিশ্বে অনায়াসে ঘুরে বেড়ান। কখনো পর্যটকের মনোভঙ্গি নিয়ে নিজেকে ওখানকার থেকে আলাদা রেখে এবং ওখানকার কিছুর সঙ্গে জড়িত না হয়ে; কখনো আবার ওখানে অভিবাসী হয়ে ওখানকার সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় জড়িত হন। আমাদের মহাবিশ্বের সঙ্গে অন্য মহাবিশ্বের সময়ের এক রকম ধারাবাহিকতা তাঁরা প্রতিষ্ঠিত করেন– আমাদের নিজেদের টাইম লাইনের সঙ্গে জড়িয়ে। কিন্তু এখানেও লেখক কখনো স্বাধীনতা নিয়েছেন, যেমন তাঁর কোন কোন মহাবিশ্বে টাইম লাইনে সময় স্বাভাবিক ভাবে সামনের দিকে যায়না, যেমন করে বাস্তব বিজ্ঞানে সম্ভব না হলেও আপেক্ষিক তত্ত্বে কথিত ভাবে পেছনের দিকেও যায়। আবার যা কোন বিজ্ঞানে নেই সে রকম অদ্ভুত ভাবে 'পাশের

দিকেও’ যায়। লেখক যা খুশি তাই ঘটাতে পারেন– বিজ্ঞানের বা গণিতের কোন তোয়াক্কা না করে।

এসব গল্প পাঠককে দারুণ শিহরিত করতে পারে, কারণ এটি এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া নয়, এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহ বা এক গ্যালাক্সি থেকে অন্য গ্যালাক্সিতে যাওয়া নয়; বরং এক মহাবিশ্ব থেকে অন্য মহাবিশ্বে যাওয়া। সেখানে সময়ের টাইম লাইন সম্পূর্ণ গুবলেট হতে পারে, জীবন জিনিসটার মানেও অন্য রকম হতে পারে, এমনকি বিজ্ঞানের নিয়মও সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু পাঠকের শিহরণটি খুবই বাস্তব। আর্টে তার মূল্য আছে।

কিন্তু হায়, বিজ্ঞান এসব থেকে অনেক দূরে রয়ে গেছে, যদিও বিজ্ঞানই ওই গল্পের প্রাথমিক সুযোগ করে দিয়েছে। প্রতিষ্ঠিত বাস্তব তথ্যে সমর্থিত কোন তত্ত্বকে বিজ্ঞানীরা পছন্দ না হলেও বাতিল করতে পারেননা, কিন্তু শুধু তত্ত্বের দ্বারা খাড়া করা ধারণা চূড়ান্ত নয়, এ নিয়ে বিতর্ক থাকে। বহু-মহাবিশ্বের ধারণা বিজ্ঞানীদের মধ্যেই এখনো যথেষ্ট বিতর্কিত। অনেকে একে দুর্বল যুক্তিতে খাড়া করা তত্ত্ব মনে করেন। কাজেই কল্পকাহিনীতে যুৎসই হলেও এই তত্ত্ব বিজ্ঞানে খুব একটা যুৎসই অবস্থায় নেই– গল্পের শিহরণ জাগানো ব্যাপারগুলো অবশ্য পাঠকদের প্রিয়।

বহু-মহাবিশ্বের ধারণা কেন এলো, আরেক মহাবিশ্বে যাবার উপায় কী:

যুৎসই না হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞানীরা বহু-মহাবিশ্বের ধারণাটি দিলেন কেন? এতে মহাজাগতিক বিজ্ঞান কী ভাবে এগিয়ে গেলো? এর বড় কারণ হলো এতে অন্য কিছু প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের ক্ষেত্রে আরো কিছু সমর্থন পাওয়া যায়– সেখানে এমন কিছু সমস্যা এখনো রয়েছে যার সমাধান বহু-মহাবিশ্ব তত্ত্বের মাধ্যমে সহজেই করা যায়। যেমন এ যুগের পদার্থবিদ্যার খুব শক্তিশালী তত্ত্ব কোয়ান্টাম তত্ত্বের ক্ষেত্রেই দেখা যাক। এখানে অণু-পরমাণুর মত ক্ষুদ্র জিনিসের ক্ষেত্রে তা কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছে, কোথায় কী গতিবেগে যাচ্ছে, সে তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে জানা সম্ভব নয় নীতিগত ভাবেই। এই তত্ত্বের মতে ওটি এখানেও আছে, ওখানেও আছে, সবখানে আছে; তত্ত্ব শুধু ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে কোথায় থাকার সম্ভাবনা কত। কাজেই এ তত্ত্বের আওতায় থাকার সময় এটি নানা অবস্থার একটি সংমিশ্রিত অবস্থায় থাকে–

এর অবস্থান, বেগ, বা অন্য যে কোন কিছুর অবস্থা এরকম সংমিশ্রিত হতে পারে। ওই সংমিশ্রিত অবস্থায় কোন অবস্থার সম্ভাবনা কত শুধু সেটিই বলা সম্ভব। এই কথাটিকে কিছুটা রস করে বোঝানো হয় একটি উপমা দিয়ে। ধরা যাক বাক্সের ভেতরে অদৃশ্য থাকা একটি বেড়ালের কোয়ান্টাম সংমিশ্রিত অবস্থা হলো এটি বেঁচেও আছে এবং মরেও গেছে। বেঁচে থাকার সম্ভাবনা এবং মৃত থাকার সম্ভাবনা তত্ত্ব থেকে জানা আছে– এর বেশি কিছু নয়। অবশ্য বিজ্ঞানকে শেষ অবধি জানতে হয় জিনিসটি ঠিক কী অবস্থায় আছে, তা বাস্তব এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে– মিশ্র অবস্থায় নয়, সুনির্দিষ্ট একটি অবস্থায়। তার মানে তখন আমরা আমাদের আগেকার প্রচলিত তত্ত্বে চলে আসবো, কোয়ান্টাম তত্ত্বের আগের সাধারণ প্রচলিত তত্ত্বে, কোয়ান্টাম তত্ত্বে নয়। এক্সপেরিমেন্টের সব সরঞ্জাম সহ সবকিছু তখন সাধারণ তত্ত্বের বিষয়, আমাদের কাণ্ডজ্ঞানও যা সমর্থন করে, কোয়ান্টাম তত্ত্ব তখন চুপসে যায়– আর থাকেনা। তখন অবশ্য কোন্ অবস্থায় তাকে বাস্তবে দেখবো তার সুনির্দিষ্ট রূপটি কোয়ান্টাম তত্ত্বে দেয়া সম্ভাবনা মেনেই দেখা দেবে। বেড়ালের ক্ষেত্রে বাক্স খুলে যখন বেড়ালটাকে সত্যি বাস্তবে দেখবো তখন বেঁচেও আছে, মরেও গেছে এমন সংমিশ্রিত অবস্থার কোয়ান্টাম তত্ত্ব চুপসে যাবে, তখন হয় তাকে জীবিত পাব, নয় মৃত পাব– নির্ভর করবে ওই সম্ভাবনা অনুযায়ী।

সমস্যাটি ওই চুপসে যাবার ব্যাপারটিতে। এক্সপেরিমেন্ট করে দেখলে কোয়ান্টাম তত্ত্বের মিশ্র অবস্থাগুলোর মধ্যে থেকে একটি বাস্তবে পেলাম, বাকি সম্ভাবনাগুলোর কী হলো, ওগুলো কোথায় গেল? বহু-মহাবিশ্বের তত্ত্ব দিয়ে বিজ্ঞানীরা ওই চুপসে যাওয়ার ব্যাপারটিকে আরো পরিস্কার করতে পারলেন। তাঁরা বল্‌লেন এক্সপেরিমেন্ট করে যেই অবস্থায় জিনিসটিকে পেলাম সেটিই আমাদের মহাবিশ্বে ঘটে যাওয়া ঘটনা। আসলে কোয়ান্টাম তত্ত্বে মিশ্র অবস্থার যে ঘটনাটি দেখছিলাম সেটি আমাদের মহাবিশ্বে ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বাকি মহাবিশ্বগুলোতেও সমান্তরাল ভাবে ঘটে, যদিও সেখানকার কেউ তা অনুসরণ করতে পারেনি, আমরা যে রকম পারিনি। কিন্তু যখন বাস্তব এক্সপেরিমেন্ট করেছি আমাদের মহাবিশ্বের জন্য এর একটি বিশেষ বাস্তবতা আছে সেটিই আমরা এখানে দেখেছি। অন্য সম্ভাবনাগুলো অন্য মহাবিশ্বগুলোর এক একটির বাস্তবতায় আছে। ওখানে কেউ এক্সপেরিমেন্ট করলে তারা ওই

অবস্থাতেই দেখতো। বেড়ালের উপমায় বাক্স খোলার পর আমরা বেড়ালকে জীবিত দেখলে অন্য কোন মহাবিশ্বে বাক্স খুললে তাকে মৃত দেখাতো। কারণ বেড়ালের ঘটনা আমরা শুরু করার পর থেকে অন্যান্য মহাবিশ্বেও তা সমান্তরালভাবে ঘটতে আরম্ভ করতো। সব ঘটনাই আমাদের মহাবিশ্বের ঘটার সময় তার একটি প্রতিরূপ অন্য মহাবিশ্বগুলিতেও ঘটে, এই ধারণা এ ভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্বকে ব্যাখ্যার সুযোগ করে দিলো।

পদার্থবিদ্যায় আর একটি বড় সমস্যা হলো এর দুটি বড় তত্ত্ব– কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব একই সঙ্গে প্রয়োগযোগ্য হয়না। যদি তা হতো তা হলে বিগ ব্যাং এ মহাবিশ্ব সৃষ্টিটিকে সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতো। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী একেবারে শূন্যতার মধ্যেও যে কোন বিশাল পরিমাণ শক্তি ধার করা যায়, তবে পর মহুর্তেই তা শোধ করে আবার শূন্যতার অবস্থায় চলে যেতে হয়। কিন্তু যাওয়ার ঠিক আগে যদি তাকে একটি মহাজাগতিক স্থান-কাল বুদবুদ এসে গ্রাস করতে পারে ও সেটি দ্রুত বড় হতে থাকে তা হলে ওটিই বিগ ব্যাং এ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে পারে। আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী শূন্যের অবস্থাতেই স্থান-কাল বুদবুদের ওরকম ফেনা থাকে যেখানে বুদবুদগুলোর ক্রমাগত জন্ম ও মৃত্যু হচ্ছে। এর মধ্যে কোন কোন বুদবুদ হঠাৎ সৃষ্ট শক্তিকে গ্রাস করে বড় হয়ে একটি মহাবিশ্ব গঠন করে, চুপসে যাবার আগেই। ওরকম বুদবুদের সংখ্যা অসংখ্য বলে এই ব্যাখ্যায় মহাবিশ্বের সংখ্যাও অসংখ্যই হবার কথা। এই ব্যাখ্যার জন্য বহু-মহাবিশ্বে তত্ত্বের প্রয়োজন। বহু মহাবিশ্ব এভাবে বিগ ব্যাংকেও ভাল ব্যাখ্যা করে।

মহাজাগতিক বিজ্ঞানীরা আমাদের মহাবিশ্বের অগ্রযাত্রায় একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন– এতে প্রত্যেকটি পর্যায়ে কিছু সংকটের ব্যাপার আছে যার প্রত্যেকটি এমন ভাবে নিস্পত্তি হয়েছে যাতে পরবর্তীতে আমরা মানুষরা আসতে পেরেছি। তার একটু সামান্য ব্যতিক্রম যদি কোন পর্যায়ে হতো তা হলে আমরা আসতামনা। ওই সংকটে সৃষ্ট বিজ্ঞানের ধ্রুবক সংখ্যাগুলোর মান সামান্য অন্য রকম হলে এমন ঘটনা ঘটতো যে মানুষ আসতে পারতোনা। এমন সংকট পরিস্থিতি ছিল মহাবিশ্ব স্ফীত হবার বেগে, তারা সৃষ্টির সময়, পৃথিবীর মত প্রাণের উপযোগী গ্রহ সৃষ্টির সময়, বিবর্তনের নিয়ম সৃষ্টির সময়,

ডাইনোসর ও অন্য সব গুরুত্বপূর্ণ প্রাণী বিলুপ্ত হলেও কিছু স্তন্যপায়ীরা বেঁচে যাবার ক্ষেত্রে, এমনি ভাবে পদে পদে। এই অদ্ভুত বিষয়টিকে বলা যায় মানবমুখিতা। এর যুক্তি হলো এতগুলো সূক্ষ্ম ঘটনা সব একেবারে কাকতালীয় ভাবে ঘটতে পারেনা। নিশ্চয়ই উদ্দেশ্যটি ছিল মানুষ যাতে আসতে পারে। কিন্তু একটি প্রাণীকে আনার জন্য এতসব কিছু ঠিকঠাক ঘটবে বিজ্ঞান এমন কথাকেও মেনে নিতে পারেনা। মানবমুখিতার এই উভয় সংকট থেকে মুক্তি দিতে পারে বলেও অনেকে বহু-মহাবিশ্ব তত্ত্বের ওপর আস্থা রাখেন। কারণ তখন একে বৈজ্ঞানিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আসলেও ওই ব্যাপারগুলো কাকতালীয় ভাবে ঘটেছে– অসংখ্য রকম হবার যদি সুযোগ থাকে তা হলে সবকিছু ঠিকঠাক মানবমুখি হবার এমন কাকতালীয় অসম্ভব ঘটনা ঘটারও একটি ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকে। আমাদের মহাবিশ্বে ঠিক এমন একটি ক্ষীণ সম্ভাবনার সুযোগ নিয়ে আমরা এসেছি। কিন্তু অন্য সব সম্ভাবনাগুলোও ঘটেছে অন্য নানা মহাবিশ্বে। সেখানে হয়তো সব সংকট অন্য কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হয়েছে মনে হচ্ছে।

কিন্তু এতদিন ধরে বহু মহাবিশ্ব তত্ত্বের পক্ষে ব্যবহৃত এই মানবমুখিতার সমাধানটিও সম্প্রতি বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছে। সম্ভাবনার হিসেবে খুব সরল একটি ভুল দেখিয়ে একে বাতিল করছেন কেউ কেউ। ধরা যাক একটি নগরে ১০০টি জুয়া খেলার কেন্দ্র আছে লটারির মত ব্যবস্থায় জুয়া খেলার জন্য। একজন জুয়াড়ি সেখানে একটি কেন্দ্রে পর পর যে কয়টা বাজি হয়েছে তার সবগুলোতে তার জিতে যাওয়া একটি ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু শহরের সব জুয়া কেন্দ্রের সব জুয়াতে তিনিই জিতবেন এমন ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকাও সম্ভাবনার নিয়ম অনুযায়ী অসম্ভব। আমাদের মহাবিশ্বে সব সংকট মানুষ আসার পক্ষে যাওয়াটি এরকম অসম্ভব সম্ভাবনার ব্যাপার। এর রহস্য থেকেই যাচ্ছে, বহু-মহাবিশ্ব তত্ত্ব কোন সাহায্য করছেনা।

তারপরও বৈজ্ঞানিক যুক্তিতেই অনেক তাত্ত্বিক এই তত্ত্বের পক্ষে। তাঁদের পরবর্তী প্রশ্ন হলো বহু-মহাবিশ্ব যদি থাকেই তাহলে সেগুলো সম্পর্কে জানবো কী ভাবে, সেখানে যাব কী ভাবে। আপাতত তো বিজ্ঞান বল্‌ছে উভয়েই অসম্ভব তাদের গতির কারণে। কল্পকাহিনীর লেখকের কাছে এটি কোন সমস্যাই নয়। কত বিখ্যাত মুভি তৈরি হয়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে ওই

কল্পকাহিনীর ওপর! নামগুলোও শিহরিত হবার মত- 'সবখানে সকিছু একই সঙ্গে', 'ড স্ট্রেঞ্জ ও উন্মাদের বহু-বিশ্ব', 'লৌকি স্পাইডারম্যান- নিজ বিশ্বে ফেরার উপায় নেই'– এমনি সব নাম। বিজ্ঞানীদের জানা নেই এমন সব অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক নিয়ম ও প্রযুক্তির ব্যবহার করেন তাঁরা এক মহাবিশ্ব থেকে অন্যটিতে যাওয়ার জন্য। তবে বিজ্ঞানের মত মনে হবার জন্য এসবের নামে বিজ্ঞানের পরিচিত শব্দ ব্যবহার করেন। যেমন 'কোয়ান্টাম ব্লু-টুথ' নামের প্রযুক্তি তাঁরা ব্যবহার করেন দুই মহাবিশ্বের মধ্যে সংযোগের জন্য। সেটি যে কী বস্তু তা বিজ্ঞান জানেনা, কিন্তু মনে হয় কল্পকাহিনীর লেখক জানেন, আর পাঠক ধরে নেবেন যে এটি তাঁর স্মার্টফোনে থাকা ব্লু-টুথের মত বৈজ্ঞানিক কিছু একটা। কাজেই সায়েন্স ফিকশনের কল্যাণে জনমনে বহু মহাবিশ্ব নিয়ে কোন সমস্যা নেই, কিন্তু বিজ্ঞানীর কাছে সমস্যা আছে।

সেই সমস্যা সত্ত্বেও কোন কোন পদার্থবিদ কোয়ান্টাম কম্পিউটারের মত ডিভাইসে অন্য মহাবিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের একটি আশার আলো দেখতে পান। আমরা হয়তো ভবিষ্যতে কোয়ান্টাম কম্পিউটারের এমন একটি উন্নত রূপ পাব যার মাধ্যমে নিজেকেই তাতে আপলোড করে অন্য মহাবিশ্বে পোঁছানো সম্ভব হবে। কোয়ান্টাম কম্পিউটার হলো এমন জিনিস যাতে ওর ভেতরের কণিকার অবস্থা বাইরে সেই কণিকার সঙ্গে কোয়ান্টাম-বিজড়িত থাকা অন্য কণিকার অবস্থা দেখে জানা যাবে কারণ একটি অন্যটির ঠিক উল্টো হবে। সেই বাইরের কণিকা যতই দূরে থাকুক না কেন এটি জানা যাবে। আমি নিজেই যদি সেই ভেতরের কণিকার জায়গাটি নিই তাহলে আমার কোয়ান্টাম বিজড়িত আরেকটি রূপ অন্য মহাবিশ্ব থেকেও আমার খবর পেতে পারবে।

কোন কোন পদার্থবিদ প্রাথমিক গাণিতিক ধারণা হিসেবে এক মহাবিশ্ব থেকে আরেক মহাবিশ্বে যাবার জন্য স্থান-কালের মধ্য দিয়ে একটি সুড়ঙ্গপথের ধারণা দিতে পেরেছেন যাকে বলা হয় ওয়ার্মহোল বা কীটের গর্ত। ব্যাপারটা এমন যে স্বাভাবিক পথে অন্য মহাবিশ্বের যাওয়া বা সিগন্যাল পাঠানো সম্ভব না হলেও এই ওয়ার্মহোল যেন স্থানকালে একটি শর্টকাট সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করে যার ভেতর দিয়ে সেখানে পৌঁছা সম্ভব। যেমন দুই মহাবিশ্বে দুটি ব্ল্যাক হোলের মধ্যে এমন একটি সুড়ঙ্গপথ তাত্ত্বিক ভাবে সম্ভব। যথারীতি

পদার্থবিদ নিজে এই ধারণাকে তত্ত্বের বাইরে বাস্তবতায় না নিতে পারলেও কল্পকাহিনীতে এখন ওয়ার্মহোল নিত্যকার ঘটনা। সাধারণ পাঠকের কাছেও মহাজাগতিক বিজ্ঞানের যত না আদর তার চেয়ে অনেক বেশি ওয়ার্ম হোলের কল্পকাহিনীর।

তবে কল্পকাহিনীর এই যে বহু-মহাবিশ্বের মত ধারণাগুলোকে আঁকড়ে ধরা এর একটি মূল্য রয়েছে– মানুষকে এসব সম্ভাবনার চিন্তার মধ্যে রাখাটিও বিজ্ঞানের জন্য একটি ইতিবাচক কাজ। এখন হয়তো সত্যিকার ধারণাগুলো শুধুই গাণিতিক, কিন্তু গণিত যখন বাস্তবকে স্পষ্ট ভাবে অতিক্রম করে আরো কিছু দেখায়, তখন বিজ্ঞান একটি পথ খুঁজে পায়– এবং শেষ পর্যন্ত ওই পথকেও বাস্তবে নিয়ে আসে। যেমন আমরা বাস্তবে সব কিছুকে দৈর্ঘ, প্রস্থ, উচ্চতা এই তিন মাত্রায় বড়জোর দেখতে পাই। কিন্তু গণিত অনায়াসে চার মাত্রার কথা বলে তাকে অনুসরণ করে। বিজ্ঞানও চারমাত্রিক জিনিসের কথা বলে যেমন পদার্থবিদ্যার স্থান-কাল; এমনকি অনেক মাত্রার কথাও বলে। বিজ্ঞানের ও গণিতের ছাত্ররা অনায়াসে এই সব বহু মাত্রা নিয়ে কাজ করে, যদিও তারাও বাস্তবে তিন মাত্রার থেকে বেশি কিছু দেখেও না, মাথায় ধারণও করতে পারেনা। শেষ পর্যন্ত ওই বহুমাত্রিক গণিত বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়ে যেতে পারছে– যেমন আইনস্টাইনের চার মাত্রিক স্থান-কাল এখন মহাজাগতিক সব বাস্তবতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। তেমনি আশা করা যায় বহু-মহাবিশ্বের বা ওয়ার্মহোলের গণিতও একদিন বৈজ্ঞানিক বাস্তবতায় দেখা দেবে। কল্পকাহিনী অন্তত সেই আশা পাঠকের মধ্যে জাগিয়ে রাখছে অসংখ্য পাঠককে এখনই কল্পনার অন্য মহাবিশ্বে পৌছে দিয়ে।

শিশুদের বড় করার দায়িত্ব দশ জনার; পড়া-লেখার ব্যাপারটিও

ওই যে আফ্রিকান প্রবাদ রয়েছে ‘একটি বাচ্চাকে বড় করে তুলতে পুরো গ্রামের প্রয়োজন’- এই কথাটি কতখানি সত্য তা প্রমাণ করার জন্যই যেন ওখানকার একটি শিকারি-সংগ্রাহক গোষ্ঠির মধ্যে গবেষণা করে দেখা হয়েছে। অন্য অনেক প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় পুরো দলশুদ্ধ সবাই নবজাত শিশুকে বড় করে তোলার কাজে লেগে যায়; মানব শিশু যেহেতু ওদের থেকেও অসহায় হয়ে জন্মায় তাদেরো তো সে রকমই অনেকের যত্ন প্রয়োজন হবার কথা, দীর্ঘ শৈশব ও বাল্যকাল জুড়ে।

ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বিবর্তন-নৃতাত্ত্বিক নিখিল চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি গবেষণায় সম্প্রতি ব্যাপারটি দেখার চেষ্টা করেছেন, কঙ্গোর বেনজেলে নামের একটি শিকারি-সংগ্রাহক আদিম গোষ্ঠির মধ্যে। মানুষের মস্তিষ্কটি যেহেতু প্রায় পুরাপুরিই শিকারি-সংগ্রাহক অবস্থাতে থাকার সময় বিবর্তিত হয়েছে, মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা বোঝার জন্য গবেষণাটি তাদের ওপরেই করা উচিত। ১৮ জন ছোট শিশুর ওপর সর্বক্ষণিক লক্ষ্য রেখে গবেষকরা দেখেছেন এক এক জন শিশুকে প্রতিদিন ক'জন আলাদা বয়স্ক মানুষ দেখা-শোনা করেছে তার বাবা-মা সহ। দেখা গেছে প্রত্যেক শিশু মোট গড়পড়তা ৯ ঘন্টা যত্ন পেয়েছে এবং যত্ন নিয়েছে ন্যূনতম ১০ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন বয়স্ক মানুষ! যে কোন শিশুর কান্না শোনা যাওয়ার গড়পড়তা ২৫ সেকেন্ডের মধ্যে কেউ না কেউ এসে তার কান্না থামাবার চেষ্টা করেছে– এর মধ্যে অর্ধেক বার এসেছে মা– বাকি অন্য বয়স্করা। শুধু বেনজেলেদের দেখে তো দুনিয়ার যাবতীয় শিকারি-সংগ্রাহকদের ক্ষেত্রে কেমন হয়, কেমন হতো তা বোঝা যাবেনা, তবে একটি দিগ্‌দর্শিকা তো অবশ্যই পাওয়া যায়।

এইই যেখানে মানব মস্তিষ্কের প্রবণতা, সেক্ষেত্রে আধুনিক বাবা-মা-সন্তানের যে 'নিউক্লিয়ার পরিবার' অন্তত নাগরিক জীবনে রয়েছে তার চিত্রতো সম্পূর্ণ আলাদা! কাজেই এখানেও আলাদা করে গবেষণা প্রয়োজন শিশুকে দীর্ঘক্ষণ একা থাকতে দিয়ে, কাঁদতে দিয়ে, মাঝে মাঝে মায়ের বা মায়ের বিকল্প কারো যত্ন দিয়ে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধিকে কোন ভাবে বিঘ্নিত করা হচ্ছে না তো। বেনজেলেদের মত পরিস্থিতির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নিউক্লিয়ার পরিবারের পরিস্থিতির তুলনামূলক গবেষণার প্রয়োজনীয়তাটি বিজ্ঞানীরা খুব অনুভব করছেন। হ্যাঁ বিজ্ঞানীরা অবশ্য আগেভাগেই বলছিলেন যে শিশুরা পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, কাজেই তুলনাটি সব সময় যথার্থ নাও হতে পারে। তাছাড়া অন্যদের যত্নের তুলনায় পুরোটা মা-বাবার দেয়া যত্নের উচ্চতর মান থাকতে পারে। তারপরও মস্তিষ্কের স্বাভাবিক চাহিদাটি যেটি শিকারি-সংগ্রাহক সময়ে বিবর্তিত হয়েছে তাকে তুচ্ছ করা যায়না। তাই তুলনামূলক গবেষণা প্রয়োজন বৈ কি।

এমনি গবেষণার প্রয়োজন শিশুদের আরো অনেক বিষয়ে যেদিকে আমরা মোটেই ভ্রুক্ষেপ করছিনা, করা উচিত। পরিবার ও সমাজচিন্তার দিক থেকেও

এসব বৈজ্ঞানিক গবেষণার চাহিদা সৃষ্টি হওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ বহু শিশুর পড়তে অসুবিধা হবার ব্যাপারটি দেখা যাক। আমাদের দেশে এটি আশঙ্কাজনক আকার ধারণ করেছে– দেখা যাচ্ছে পুরো প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করেও অনেক শিশু স্বচ্ছন্দে পড়তে পারছেনা। অথচ শিক্ষার একটি মূল ভিতই হলো স্বচ্ছন্দে পড়তে পারা। বলা হয় যে পড়তে শেখানোটি একটি পাত্র থেকে বিদ্যা আরেকটি পাত্রে ঢেলে দেবার মত নয়, বরং একটি আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার মত। আগুনের এই যে ছোট্ট শিখাটি দিয়ে দেয়া হলো এটি দিয়ে যে সারাটি জীবন উজ্জ্বল আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারবে। সেখানেই যদি ঘাটতি থাকে তাহলে শিক্ষা কোথায় যাবে?

এই আক্ষেপ শুধু আমাদের নয়, যুক্তরাষ্ট্রের মত উন্নত দেশেও এই আক্ষেপ প্রবল ভাবে দেখা দিয়েছে– কারণ দেখা গেছে সেখানে চার বছর স্কুলে পড়ার পরও দুই-তৃতীয়াংশ শিশু স্বচ্ছন্দে পড়তে পারেনা, আর এর পর সব বয়সের সবাইকে নিলে প্রতি পাঁচ জনের একজন স্বচ্ছন্দে পড়তে পারেনা। এজন্য খোদ কেন্দ্রীয় সরকার নানা প্রেসিডেন্টের সময় একের পর এক প্রকল্প নিতে বাধ্য হয়েছে– খুব সফল হয়নি, কারণ এ নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ঘাটতি ছিল। সম্প্রতি ‘পড়ার বিজ্ঞান’ নাম দিয়ে এর ওপর একটি জরিপ ভিত্তিক পরিকল্পনা সৃস্টি করা হয়েছে। দেখা গেছে সব প্রকল্পে শুধু একটি জিনিসের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তা হলো ফোনিক্স। এর মানে অক্ষরের সঙ্গে আওয়াজের সম্পর্কটি শিশুদের মধ্যে ধাতস্থ করে দেয়া। শিক্ষক, অভিভাবক সবাইকে এই কাজটি বার বার করতে বলা হয়েছিলো।

কিন্তু ‘পড়ার বিজ্ঞান’ বলছে এতে শব্দ চেনার দক্ষতাটি গুরুত্বপূর্ণ। ফোনিক্স তো থাকবেই, তার সঙ্গে পুরো সিলেবলগুলো এবং পুরো শব্দগুলো এক সঙ্গে দেখা মাত্র চেনার ক্ষমতা জন্মাতে হয়। তার মানে এগুলোর একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্কগুলোও শিশুর চোখে ধরা পড়ে– ফলে একটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা হলে অন্যটির সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা সহজ হয়।

আরো একটি জিনিস খুব দরকার তা হলো ভাষা বোঝার ক্ষমতা। তার মানে পুরো বাক্য কী রকম কথা বলতে চাইলো তা পড়ে বোঝার ক্ষমতা; শুধু শব্দ চিনলেই হবেনা, বাক্যের মধ্যে শব্দের ব্যবহারটিও বুঝতে হবে। শব্দ চেনা ও ভাষা বোঝা এই দুই যখন সমান তালে ঘটতে পারে তখনই পড়া

স্বচ্ছন্দ হয়। মাতৃভাষার মুখের ভাষার অনেকটাই মস্তিষ্কের জন্মগত ক্ষমতা থেকেই চলে আসে, তা খুব কষ্ট করে কাউকে শেখাতে হয়না। পড়াটি কিন্তু অন্য ব্যাপার, তা শেখাতে হয়। কী ভাবে শেখাতে হয় তার গবেষণায় মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশকে উদ্দীপ্ত করার ব্যাপারটি এম আর আই স্ক্যানিং করে দেখাটাও ব্যবহার করা হচ্ছে। এ ভাবেই বেরিয়ে আসছে ফোনিক্স, গোটা সিলেবল চেনা, গোটা শব্দ চেনা, ভাষা বোঝা ইত্যাদির তুলনামূলক গুরুত্বগুলো।

একবার স্বচ্ছন্দে পড়তে শিখলে সেই ক্ষমতাটি সারা জীবন কমবেশি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু লেখার ব্যাপারটি সেরকম নয়। স্কুলে থাকতে আমরা বাধ্যতামূলক ভাবে হয়তো অনেক কিছু লিখি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে যদি পেশাগত জীবনে বেশি কিছু লিখতে না হয়, বা নিজের সৃষ্টিশীল লেখক হবার প্রেরণা না থাকে, তা হলে চিঠি ইত্যাদির মত দু'একটি জরুরি প্রয়োজনে ছাড়া অধিকাংশ মানুষ বেশি কিছু আর লেখার প্রযোজনীয়তা অনুভব করেনা। তাতে জীবনের কোন ইতর-বিশেষ হয় বলে কেউ মনে করেনা। কিন্তু সম্প্রতি সায়েন্টিফিক আমেরিকান জার্নালটি ভিন্ন কথা বলছে তাদের গবেষণা থেকে। গবেষণায় লেখক, সাংবাদিক, সাধারণ মানুষ যাঁরা কোনদিন তেমন কিছু লেখেননা তাঁরা সহ সাধারণ মানুষ অংশ নিয়েছেন। যে কথাটি ফুটে উঠেছে তা হলো যে কোন মানুষের জন্য নিজেকে চেনাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর অন্তত এ কাজের জন্য লেখার অভ্যাস বজায় রাখা জরুরি।

নিজেকে চেনা মানে কী? নিজের চিন্তা; নিজের ভাল-লাগা মন্দ লাগার বিষয় বা ব্যক্তিত্ব; নিজের আকাঙ্খা, ভয়; নিজের অন্তরঙ্গ সম্পর্কগুলো; এগুলো আমি নিজের কতটা ভাল অনুধাবন করতে পারি, নিজের কাছে স্পষ্ট করতে পারি– সেটিই নিজেকে চেনা। কাজটি সহজ নয়। তবে গবেষণাটি দেখিয়ে দিচ্ছে নিজেকে চেনার একটি চমৎকার উপায় হলো প্রায় প্রতিদিন এমন কিছু লেখা যেখানে নিজের ভাব ও চিন্তা প্রকাশের সুযোগ আছে।

অন্যের গোচরে আনার জন্য সে লেখা হতে পারে, সাহিত্যের মত কিছু, আলোচনার মত কিছু। তবে সে রকম হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। শুধু নিজের জন্য লিখলেও উদ্দেশ্যটি সাধন হবে– ডায়রি, জার্নাল বা এমনি কিছু। তাতেই বরং নিজের ভেতরের অনেক বেশি কিছু বেরিয়ে আসবে–

কথার পর কথা যোগাতে গেলে এটি আপনা থেকে হবেই। লিখতে বসে খাতার সাদা পাতার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়, লেখকের জড়তা নামে এই ব্যাপারটি কে না জানে। কিন্তু সেটি শেষ হতে বেশি সময় নেবেনা। নিজেকে নিয়ে নানা প্রশ্ন নিজেকে করলেই লেখা বেরিয়ে আসবে, উত্তর লেখার ইঙ্গিত সেই প্রশ্নের মধ্যেই থাকবে। তেমন ইঙ্গিত প্রতিদিন নতুন ভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে।

লেখকের জড়তা যদি সহজে কাটতে না চায়, তা হলে ওই ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য নিজেকে করার জন্য প্রশ্নের সন্ধানে আমরা অন্যের প্রকাশিত লেখায়, চিঠিতে, সাহিত্যে তা খুঁজতে পারি। এমনকি গুগল সার্চ করে, বা সেখানে একটানা এলোমেলো ব্রাউজ করে গিয়ে তা পড়ে যেতে পারি। দেখবো ওই সব ক'টির অনেক শব্দ, অনেক বাক্য, অনেক ধারণা প্রশ্নের আকারে নিয়ে সে প্রশ্ন নিজেকে করা যেতে পারে। তারপর একবার জড়তা ভেঙ্গে লিখতে শুরু করে দিলে আজকের মত তৈরি হয়ে যাবে আমার নিজের মনের আয়না।

শিশুকে বড় করা, তাকে স্বচ্ছন্দে পড়তে শেখানো, লিখতে শেখানো সেই লেখা সারা জীবন নিজের জন্য প্রয়োগ করতে শেখানো সবই ভাল করে করার উপায় বিজ্ঞান বলে দিতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের কাছে চাওয়ার ব্যাপারটি মানব মনের দৈনন্দিন আর্টের অংশ। মনের আকাঙ্খাগুলোকে ছোটবেলা থেকে নিজের কাছে ফুটিয়ে তোলাটাই সেই আর্ট। ওই আর্ট ছাড়া কিছুই হবেনা। বৈজ্ঞানিক কৌতুহলের জন্মও ওই মনের আর্টের মধ্যে।

আগামী দিন

বহমান দিন, এখন সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

এ বইয়ে সায়েন্স ও আর্টের একত্র চিন্তার যত উদাহরণ দেখেছি তাতে প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেক কিছু এসেছে। এর থেকে বোঝা যায় এগুলো আবহমান কাল থেকে মানুষের নিত্য সঙ্গী। মানুষ আর্ট সৃষ্টি করতে গিয়ে বিজ্ঞানের সাহায্য নেয়, আবার বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে গিয়ে আর্টের অনুপ্রেরণা নেয়। কাজেই 'আর্ট না সায়েন্স', এই কথাটি আমাদের কলেজ শিক্ষার্থীর সামনে সনাতন একটি বিভাজন মূলক প্রশ্ন হলেও প্রশ্নটি মানব মনের বিশ্ব-দৃষ্টি লাভের চিরন্তন পিয়াসের অংশ, তার ঐক্যের অর্থে। তাই ২০২৩ বছরটি শেষ প্রান্তে এসে যদি বোঝার চেষ্টা করি আর্টস-সায়েন্সের রাজ্যে সামনের বছরটিতে, অথবা ১০ বছর পর, অথবা ২০-৩০ বছর পর কী হবে, বা কী হতে পারে, তাতে এত দীর্ঘ চির বহমানতার মধ্যে একটি বিশাল বেমানান ব্যতিক্রমী কিছু খুঁজে পাওয়া খুব স্বাভাবিক নয়– বরাবরের মত কিছু ঢেউ অবশ্য থাকবেই।

একথা মেনে নিয়েও যদি এই বইয়ের উদাহরণগুলোর দিকে আবার একটু লক্ষ্য করি তা হলে বুঝতে পারবো একটি অত্যন্ত বড় ঢেউ, একটি বড় উল্লম্ফনের সব আলামত যেনো গত কয়েক বছর ধরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর্টের কাজে আর সায়েন্সের কাজে একে এতো বেশি এতো ঘন ঘন এই উদাহরণগুলোর মধ্যেই দেখ্‌ছি যে সামনে এটি কী করবে তা ভাবার বিষয়– এটি হলো এআই, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। বাস্তব পৃথিবীর জন্য যেমন এটিই আগামী দিনের প্রতীক হয়ে উঠছে, তেমনি এই বইয়ের আর্ট-সায়েন্সের আলোচনার শেষে সামনের হাতছানি হিসেবে এটিই গুরুত্ব পাওয়া উচিত মনে করেছি।

চ্যাট জিপিটি:

সাম্প্রতিক কালে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তিকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে যে অকল্পনীয় রকম বিপুল পরিমাণে উপাত্তকে তা সংগ্রহ ও

বিশ্লেষণ করতে পারছে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। এটাই এআইয়ের ক্ষমতার উৎস; ওই উপাত্ত-ভাণ্ডারের মধ্যে কোথায় কোথায় পারস্পরিক সম্পর্ক দেখা যায়, কোথাও কোন প্যাটার্ন দেখা যায় কিনা সেটি খুঁজে নেবার সক্ষমতা তার মধ্যে এক রকমের সৃজনশীলতাকে এনে দেয়। এটি এমন একটি ক্ষমতা যাতে মনে হয় ওই উপাত্তগুলো যেখান থেকে এসেছে এআই তার মধ্যে কিছু অর্থ বুঝতে পারছে, যেই অর্থ মানুষ বুঝতে পারেনা মানুষের এত দ্রুত এত উপাত্ত নিয়ে কাজ করার ক্ষমতার অভাবে। এই অর্থ খুঁজে পাওয়াটির কারণেই এআইকে সায়েন্সে এবং আর্টে এত ব্যবহার করা সম্ভব হচ্ছে। আর এটি সবে শুরু মাত্র।

স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এই অসংখ্য গুণের থেকে শুরু করে নিজস্ব এক সৃজনশীলতায় এআই বিশ্ববিজ্ঞান এবং বিশ্ব কলাবিদ্যার চর্চায় তার নিজের আলাদা স্থান করে নিতে পারছে। এর পর আর্টকে যখন একেবারে সারা মনজুড়ে উপভোগ করবো অথবা বিজ্ঞানে কোন আবিষ্কার দেখে যখন মুখ হা হয়ে যাবে, বুঝতেই পারবোনা যে এর পেছনে কৃতিত্বটি কি মানুষের বেশি, না কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বেশি। ক্রমে শেষেরটির গুরুত্ব বাড়বে, হয়তো দূরবর্তী এক সময় আগাগোড়াই এটি এআইয়ের কৃতিত্ব হবে, মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই। ২০২৩ এ লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল নামে পরিচিত এক ধরনের সফ্টওয়্যারের ব্যবস্থায় এআইকে সর্বসাধারণের হাতের কাছে পৌঁছে দিয়ে একটি মাইল ফলক স্থাপন হয়েছে। চ্যাট জিপিটি নামে অ্যাপ বা ওয়েবসাইটে নিয়ে নিজের কম্পিউটারে ডাউনলোড করে এই সুযোগ এসেছে, তারপর ঠিক এমনি ধরনের আরো কয়েকটি। কম্পিউটারে গুগল সার্চ করে কিছু জানা যে রকম সম্ভব তেমনি চ্যাট জিপিটিকে কিছু নির্দেশ লিখে লিখে দিয়ে এবং চ্যাট করার মত এমন নির্দেশ সংক্রান্ত আরো কথাবার্তা এটির সঙ্গে চালিয়ে তাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বা সমস্যা সমাধান তো করতেই দেয়া যায়, তাছাড়া কোন রচনা, গল্প, কবিতাও লিখতে বলা যায় যা সম্পূর্ণ নতুন ও সৃজনশীল ভাবে। তার পক্ষে এটি কীভাবে সম্ভব হয়?

এও অসংখ্য উপাত্তের সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের ফল। এর জন্য যে প্রোগ্রাম তাকে বলা হয় মেশিন লার্নিং।। এর মাধ্যমে ওই উপাত্তগুলোর বিশ্লেষণে চ্যাট জিপিটিকে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয় আত্মস্থ করতে

এবং তার মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক ও প্যাটার্ন খুঁজে পেতে। বিশাল উপাত্ত-ভাণ্ডার সংগ্রহ করে ব্যাপক ক্ষেত্রে এই ট্রেনিং দেয়া হয়েছে তা খুব স্পষ্ট। যেমন শুরুতে চ্যাট জিপিটিকে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সময়ের পর ইন্টারনেটে আসা কোন বিষয়ে ট্রেনিং দেয়া হয়নি বলে এর পরের সময়ে ইন্টারনেটের তথ্য ব্যবহার করে এটি তখন কোন কাজ করতে পারেনি, তার আগের সবই তার কাজে সন্নিবেশ করতে পেরেছে। কিন্তু এখন তার ট্রেনিং এমন পর্যায়ে আনা হয়েছে যাতে এটি নিজেই বর্তমান ইন্টারনেট ঘেঁটে সেখান থেকে তথ্য তার কাজে ব্যবহার করতে পারে। নির্দেশ পেলে তা বুঝবার ক্ষমতাও এর জন্মেছে পূর্বের সব উদাহরণ-উপাত্ত থেকে ভাষার ওপর এই ভাবে জানা ও দক্ষতা অর্জনের ফলে। এই নির্দেশ অনুযায়ী এখন ওই বিশাল তথ্য-ভান্ডারে বুঝে নেয়া প্যাটার্ন অনুযায়ী যৌক্তিক ভাবে শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে চ্যাট জিপিটি তাকে দেয়া কাজটি লিখে দেয়– প্রশ্নের উত্তর, সমস্যার সমাধান, গল্প-কবিতা-রচনা যাই হোক। ওই কাজ করা এবং এই সম্পর্কে নির্দেশদাতার যে মন্তব্য, শুদ্ধ করার অনুরোধ, আরো স্পষ্ট করার অনুরোধ ইত্যাদি পালনও এক ভাবে তার ক্ষমতাকে সমৃদ্ধ করে– এর পর বাড়তি দক্ষ হয়, ওই ভুল সে এড়িয়ে চলে। কাজেই ট্রেনিং এবং অভিজ্ঞতা যত বেশি হয় ততই চ্যাট জিপিটি আরো ভাল ও সূক্ষ্মভাবে কাজ করতে পারে। এভাবে মেশিন লার্নিং আরো যে বহু ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে যেমন বিজ্ঞান গবেষণায় অথবা আর্ট সৃষ্টিতে– সেখানেও এআই একই ভাবে কাজ করেছে। বিজ্ঞান গবেষণায় বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য তার প্রয়োজন মাফিক এ ধরনের আলাদা বিশেষ মেশিন লার্নিং প্রোগ্রাম করা হয় এ সম্পর্কিত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য। মেশিন অর্থাৎ শক্তিশালী কম্পিউটার এই সফট্ওয়্যারের সাহায্যে এ কাজ যত বিশাল সংখ্যায় যত দ্রুত করতে পারে, মানুষ তার সামান্য ভগ্নাংশও পারেনা– এখানেই এআইয়ের ম্যাজিক।

শিশুরা কান্না, গাছের কথা, বিজাতীয় ভাষা:

আগামী বছরগুলোতে এই ম্যাজিক আমাদের জীবনযাত্রাকে এক্কেবারে বদলে দেবে এমন একটি সম্ভাবনা দিন দিন সত্য হতে চলেছে। বিশেষ করে যেই সায়েন্স-আর্টের সম্পর্কে কথা আমরা এখানে বলেছি, তার দুই দিককেই এটি

শুধু প্রভাবিত করবেনা, এর চর্চার দায়িত্বটিও অনেকখানি নিজের হাতে তুলে নেবে- ক্রমেই মানুষের হস্তক্ষেপ কমিয়ে ফেলে। একটি অতি সাধারণ কাজ, অথচ মনে হতে পারে খুবই অসাধারণ ক্ষমতা দেখাচ্ছে এআই, এমন একটি সাম্প্রতিক কিনতে পাওয়া জিনিসের কথা বলি– দোলনায় ছোট্ট বাচ্চার খেলনার থেকে দেখতে বেশি কিছু নয়। ধরা যাক একজন অনভিজ্ঞ মা ছোট বাচ্চাটি নিয়ে হিমসিম খাচ্ছেন, প্রায়ই বাচ্চাটি মাঝে মাঝে কাঁদে বলে। সব কান্না একই ব্যবস্থায় থামানো যায়না। বিভিন্ন কান্নার তিনটি প্রধান কারণের কথা মা ভাবতে পারেন– ক্ষুধা লাগে বলে, পেটে ব্যথা হয় বলে, দোলনায় একা থেকে থেকে বিরক্ত হয়ে কোলে উঠতে চায় বলে। কিন্তু কখন এই তিনটির কোনটি হচ্ছে তা বুঝতে না পেরে তাঁকে প্রায়ই কান্না থামাতে বিফল হয়ে অস্থির করে তুলছে। তাঁর সমস্যাটি সমাধান করার জন্যই এআই চালিত এই ছোট্ট ডিভাইসটি বাচ্চার কাছে রাখা হয়– সুন্দর দেখতে খেলনার মত, বাচ্চার কান্না রেকর্ড করার জন্য মাইক্রোফোনের ছিদ্র আছে; নিচে তিন রঙের তিনটি ছোট বাতি একটি পাশে লেখা ক্ষুধা লেগেছে, আরেকটিতে লেখা পেট ব্যথা, তৃতীয়টিতে কোলে উঠবে। কান্নার সময় যেই বাতিটি জ্বলে ওঠে কান্নার কারণ সেটিই, তার প্রতিকার করলে কান্না থামতে দেখা যায় ৯৬% ক্ষেত্রে। এটি সম্ভব হয়েছে এর আগের অনেক মা ও অনেক আয়ার অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া উপাত্ত থেকে মেশিন লার্নিঙের মাধ্যমে। অসংখ্য কান্না (শব্দের প্রকৃতি, ফ্রিকোয়েন্সি)ও তারপর ওই তিন প্রতিকারের এক একটিতে কান্না থামা বা না থামার ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে তার রয়েছে অসংখ্য উপাত্ত। এগুলো বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় কান্নার কোন্ প্যাটার্নের কী অর্থ– মা বা আয়ার পক্ষে অত সূক্ষ্ম ব্যাপার বোঝা সম্ভব না হলেও এআই তাৎক্ষণিক বুঝে।

শিশুর কান্না বোঝার জন্য যে নীতি ব্যবহৃত হয়েছে অনেকটা সে ভাবেই টম্যাটো উদ্ভিদের 'আর্ত চিৎকার' বুঝা গেছে এই বইয়ের আগের এক উদাহরণে। তিন বিভিন্ন অবস্থায় থাকা টম্যাটো চারার কাছে খুব সংবেদী মাইক্রোফোন রাখা হয়েছে তার থেকে নির্গত শ্রবণ-অযোগ্য আল্ট্রা-সাউন্ড রেকর্ড করার জন্য। একটি টম্যাটো চারাকে পানি না দিয়ে খরায় রাখা হয়েছে, একটি ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত, অন্য একটি স্বাভাবিক ও সুস্থ। ফলে ওই আল্ট্রা-সাউন্ডে সূক্ষ্ম সব পার্থক্য থাকে– প্রথম দুটির ক্ষেত্রে যাকে আর্ত চিৎকার বলেছি। এখন মেশিন লার্নিংঙে ট্রেনিং দেয়া সফটওয়্যার

ঠিকই বুঝে ফেলবে উদ্ভিদ থেকে আসা কী রকম আলট্রা-সাউন্ডের অর্থ কী– কোন্‌টি খরার কথা বলছে, কোনটি আহত হবার কথা বলছে, কোনটি ভাল থাকার কথা বলছে, মেশিন লার্নিং ট্রেনিং হয়েছে এমনি তিনটি অবস্থায় আরো বহু টম্যাটো চারাকে রেখে এবং তাদের অবস্থার নিরিখে আলট্রা-সাউন্ডের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে তার কোন্ প্যাটার্নের কী বক্তব্য তা সফটওয়্যার শিখে ফেলার মাধ্যমে। উদ্ভিদের আর্ত চিৎকারের বক্তব্যটি বোঝার উপায় করে দিয়েছে উপাত্তগুলোর মধ্যে প্যাটার্নটি আবিষ্কারের মাধ্যমে। ওপরের উদাহরণ দুটিই নিখাদ বিজ্ঞান গবেষণার অংশ। কিন্তু ঠিক একই পদ্ধতিতে মেশিন লার্নিং একটি নতুন ভাষা তা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ও বিজাতীয় ভাষা হলেও, শিখে এআইকে সেই ভাষা থেকে অনুবাদের কাজে সক্ষম করতে পারে। এক্ষেত্রে বিজাতীয় ভাষাটির বহু লক্ষ ঘন্টার কথোপকথন রেকর্ড করে তার মধ্যে পরস্পর সম্পর্ক, পরস্পর ক্রম এবং প্যাটার্ন আবিষ্কার করে তার নানা কথার অর্থটি উদ্ধার করা হয়েছে ইংরেজিতে প্রকাশের জন্য, এভাবেই এটি ওই ভাষার অনুবাদক হয়েছে। এমন এআই অনুবাদ করে করে পরস্পরের ভাষায় বলতে ও লিখতে পারে। দুনিয়ার যে কোন ভাষার জন্য এটি সম্ভব, ইতোমধ্যেই প্রধান ভাষাগুলোর এরকম এআই ভিত্তিক অনুবাদক রয়েছে। দুনিয়ার বহু ভিন্নভাষী দেশে গেলে এবং স্মার্টফোনে এই অনুবাদক থাকলে কথাবার্তা বলতে কোন অসুবিধাই হয়না। ভবিষ্যতে দুনিয়ার কোথাও হবেনা।

বিশিষ্ট মানুষের নকল, নতুন মিডিয়া তারকা:

ভাষার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক অনেক। ব্যক্তির মুখের কথা যেমন তার বহু কথোপকথনের উপাত্ত-ভান্ডার বিশ্লেষণ করে বুঝে ফেলা যায় তেমনি তার কথা বলার ভঙ্গি, তার শারীরিক অভিব্যক্তি, বক্তব্যের বৈশিষ্টগুলো, এবং নানা ব্যক্তিত্বের এমনি সব বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে অসংখ্য উপাত্ত নিয়ে আরো বড় উপাত্ত-ভাণ্ডার গড়া যায় এবং তার বিশ্লেষণে ওইগুলোরও অর্থ বুঝে ফেলা যায়। ফলে এগুলোর সংমিশ্রণে যে কোন একটি ডিজিটাল ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করে দিতে পারে ওই সফ্‌টওয়্যার। এরকম বেশ কিছু সম্পূর্ণ নতুন ডিজিট্যাল ব্যক্তিত্ব গণমাধ্যমে বহুদিন ধরে দেখানোর ফলে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেছে কোন কোন সত্যিকার গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বের মত। তারা আছে টেলিভিশন সংবাদ পাঠক, টেলিভিশন শো'র মধ্যমণি, ইত্যাদি নানা

ভূমিকায়। তারা যথারীতি অন্যদের সঙ্গে ক্রিয়া-বিক্রিয়া করতে পারে, ঘটনার প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে। ওই যে ট্রেনিঙের মাধ্যমে সম্ভাব্য যাবতীয় উপাত্তের ভেতর পরস্পর সম্পর্ক ও প্যাটার্ন আবিষ্কার করে ফেলে, ওখান থেকেই বেছে নিয়ে পছন্দসই একটি ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার এই সক্ষমতা। এতো তো গেলো প্রোগ্রামারদের পছন্দ অনুযায়ী একটি কাল্পনিক নতুন ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির কথা, কিন্তু মূলত একই পদ্ধতিতে সত্যিকার কোন মানুষেরও হুবহু ডিজিট্যাল ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি সম্ভব। সেটি তার চেহারা সহ ব্যক্তিত্বটি যেমন হতে পারে, শুধু কথা বলার বা লিখে চ্যাট করার মত ব্যক্তিত্বও হতে পারে।

মার্টিন স্যালিগম্যান নামের ৮১ বছরের একজন খ্যাতনামা আমেরিকান মনস্তত্ত্ববিদ দেখলেন তাঁর কয়েকজন চীনা প্রাক্তন ছাত্র চীন থেকে তাঁর জন্য একটি সফ্টওয়্যার পাঠিয়েছেন, ওখানেই তৈরি করে। বেইজিং ও উহানে ওই এআই বিশেষজ্ঞরা তাঁদের শিক্ষকের পুরো ব্যক্তিত্বটি তুলে এনেছেন ওই সফ্টওয়্যারের মধ্যে– নাম দিয়েছে 'আস্‌ক মার্টিন' (মার্টিনকে জিজ্ঞেস কর)। কারণ এর সাহায্যে এই প্রফেসরের সঙ্গে যে কেউ আলাপ জুড়ে দিতে পারে। যাঁরা তাকে চেনেন তাঁদের কাছে মনে হবে ঠিক তিনিই কথা বলছেন, প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন ঠিক যেভাবে সত্যিকারের রক্ত-মাংসের মার্টিন স্যালিগ্‌ম্যান দিয়ে থাকেন। এটি সম্ভব হয়েছে ওই প্রাক্তন ছাত্ররা তাঁর যত বক্তৃতা, আলোচনা, লেখাজোকা, নিবন্ধ, অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা ডিজিট্যাল রূপে পেয়েছেন সব উপাত্ত তাঁদের সফটওয়্যারে দিয়ে উপাত্ত-ভাণ্ডার গড়ে তুলেছেন মেশিন লার্নিঙের জন্য। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্য বৈশিষ্টগুলোর প্যাটার্ন তাতে ধরা পড়েছে। স্যালিগম্যান এটি তাঁর স্ত্রী এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের দিলেন কিছুটা সময় নিজেদের কাছে রেখে এর সঙ্গে আলাপ করার জন্য। তাঁরা বল্‌লেন এতে তাঁরাও সত্যিকার স্যালিগম্যানের সান্নিধ্য অনুভব করেছেন– তিনি যে ভাবে আচরণ করেন, প্রশ্নের উত্তর দেন, পরামর্শ দেন সে রকম। এরকম সত্যিকার মানুষের ডিজিট্যাল নকল আরো অনেক হয়েছে, কেউ কেউ এতে বেশ বিব্রতও বোধ করেছেন। এতটাই হচ্ছে যে কোন কোন দেশে এ নিয়ে একটি পৃথক আইন করারও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছে।

আরো মজার বিষয় হচ্ছে এরকম এআই সৃষ্ট ডিজিট্যাল নকল বর্তমান মানুষের নয় অতীতের ঐতিহাসিক কোন কোন চরিত্রেরও করা হয়েছে–

যাদের সঙ্গেও ওভাবে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে, তাঁর সময়কার এবং তাঁর কাজকর্ম নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে। বোঝা যাচ্ছে যে ঐতিহাসিক সব দলিল, তাঁর রেখে যাওয়া লেখা, ছবি, এবং অন্যরা তাঁকে যে ভাবে লেখায় বা ছবিতে চিত্রিত করেছেন তার উপাত্ত-ভাণ্ডার থেকে মেশিন লার্নিং ট্রেনিং এই ডিজিট্যাল অতীত মানুষকে সৃষ্টি করেছে। এদের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম কোম্পানী মেটা'র ১৭০০ শতকের ইংরেজ মহিলা ঔপনাসিক জেইন অস্টেনের ডিজিট্যাল রূপটি যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাঁর নির্দিষ্ট প্রফাইলে গেলে সেখানে ডিজিট্যালি তৈরি তাঁর সময়ের পোষাকে তাঁর ভিডিও, ছবি, যেখানে তিনি সাহিত্য চর্চা করেছেন সেই সময়ের ইংল্যাণ্ডের সেই জায়গাগুলো ইত্যাদি তো আছেই, সে সবের আবহে ডিজিট্যাল জেন অস্টেনের সঙ্গে আপনি চ্যাট আলাপ করতে পারবেন, তাঁর নানা উপন্যাস নিয়ে, সে সবের নানা চরিত্র নিয়ে, তখনকার সমাজ নিয়ে। ব্যক্তিগত প্রশ্নও করতে পারেন– দেখুন তিনি কী জবাব দেন, কী ভাবে দেন।

চিন্তা করা যায় আজ যদি রবীন্দ্রনাথ এভাবে আমাদের মধ্যে ফেরৎ আসতেন এআইয়ের কল্যাণে– শান্তিনিকেতন কোন অনুষ্ঠানে তাঁর নিজের কণ্ঠে বক্তৃতা, গান ইত্যাদি আমরা শুনতাম; পরে পরেই চ্যাট এর মাধ্যমে এই নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করতে পারতাম; অথবা অন্য পরিবেশে অন্য যে কোন বিষয়ে– কোন কবিতা, কোন গান, কোন উপন্যাস, নিয়ে। তিনি সকণ্ঠে সেগুলোর উত্তর দিতেন, বা আরো কিছু আলাপের অনুমতি দিতেন– তাঁর সমাজ সংস্কার বা গ্রাম সংস্কার নিয়ে। কেমন হতো?

এ কার আঁকা ছবি:

কিন্তু এআই শুধু আর্টের ইতিহাসকে সৃষ্টি করেনা, নিজে আর্ট সৃষ্টিও করে। চিত্রশিল্পের ইতিহাসের সম্প্রতি আবিষ্কৃত একটি বিষয়ের সূত্র ধরে এটি একটু দেখা যাক। ইউরোপীয় রেনেসাঁর, সময়ে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রাফায়েলের একটি মাস্টারপীস ছবি 'গোলাপের ম্যাডোনা'কে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই নানা কারণে কেউ কেউ তাঁর আঁকা ছবি নয় বলে সন্দেহ করছিলেন। সম্প্রতি বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য একটি এআই সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে যাতে নিশ্চিত ভাবে রাফায়েলের ছবি হিসেবে জানা প্রায় সব ছবির ইমেজকে দেয়া হয়েছে উপাত্ত-ভাণ্ডার গঠনের জন্য। ওতে বিশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে রাফায়েলের

সকল অঙ্কনভঙ্গির ও সেগুলোর নানা উপাদানের পরস্পর-সম্পর্ক, এআই ঠিকই বুঝতে পেরেছে তার ভেতরের সূক্ষ্ম প্যাটার্নগুলো– যেমন তুলির পোঁচের বৈশিষ্ট, রং ব্যবহারের আলো-ছায়া সৃষ্টির এবং অন্যান্য বৈশিষ্টগুলোর। এই সফটওয়্যার সংযুক্ত ইমেজ পরীক্ষার সেন্সর যখন 'গোলাপের ম্যাডোনা' ছবির ডিজিট্যাল ইমেজকে পরীক্ষা করেছে তখন ওই বৈশিষ্টগুলো খুঁজে বুঝতে পেরেছে এতে ম্যাডোনার সঙ্গে থাকা সেন্ট জোসেফের অংশটিতে ওসব বৈশিষ্ট নেই– ওই অংশ রাফায়েলের আঁকা নয়।

এই কাজ যদি এআই করতে পারে, তাহলে রাফায়েলের ছবির বৈশিষ্টগুলো বজায় রেখে যে সব থীমের ওপর তিনি তাঁর ছবিগুলো এঁকেছেন সে রকম একটি থীমে সম্পূর্ণ নতুন আরেকটি ছবি নিজেই আঁকতে পারবে এআই, ছবি আঁকা একটি প্রোগ্রাম ব্যবহার করে। রেনেসাঁ চিত্রশিল্পের যে কোন বিশেষজ্ঞ এর মধ্যে রাফায়েলের বৈশিষ্টগুলো এতটাই দেখতে পাবেন যে তিনি একে আরেকটি নতুন আবিষ্কৃত রাফায়েল ছবির ইমেজ মনে করবেন। এআই এভাবে নকল মাস্টারপীস সৃষ্টি করতে পারে। তা হলে এআই সম্পূর্ণ নিজের অনন্য ছবিও আঁকতে পারবেনা কেন। যেই রকম ছবি আঁকার সিদ্ধান্ত হবে সে রকমের অতীত অসংখ্য ছবির নানা বৈশিষ্ট মিশিয়ে এআই সম্পূর্ণ নতুন একটি ছবি আঁকতে পারে। সেটিতে ওগুলোর সংখ্যা এতো বিশাল এবং প্রভাব এতো সূক্ষ্ম পর্যায়ে, হবে যে তা এর অনন্যতায় কোন বাধা হবেনা। শিল্পকলার ক্ষেত্রে এআইয়ের সৃজনশীলতাটি এভাবেই। শুধু চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে নয়, অন্য দৃশ্যমান শিল্প, মিউজিক ইত্যাদি অন্যান্য ক্ষেত্রেও একই ভাবে একই রকম সৃজনশীলতা এটি দেখাতে পারে। রাফায়েলের ছবি 'গোলাপের ম্যাডোনাতে' একটি অংশ রাফায়েলের বৈশিষ্টের সঙ্গে যে মেলেনি সেটি কিন্তু অতি সূক্ষ্ম প্যাটার্ন পার্থক্য বুঝতে পারার কারণেই সম্ভব হয়েছে, যেটি মানুষ বুঝতে পারেনি। এখন যদি মনে করি ছবিটি ডাক্তারের পরীক্ষার জন্য রুগীর বুকের একটি এক্সরে' ইমেজ। একই সঙ্গে বহু সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক বুকের এক্স রে ইমেজ এবং বহু রুগীর এর নানা রকম ব্যত্যয় সংক্রান্ত বহু ইমেজ যদি এআই সফট্ওয়্যারের ট্রেনিঙে থাকে তাহলে তার পক্ষে এই নতুন রুগীর বুকের এক্সরে ইমেজে বিন্দুমাত্র পার্থক্যগুলোও ধরে ফেলা সম্ভব হবে– ঠিক কী ধরনের পার্থক্য, সেটি রোগের কোন্ অবস্থায় হয় ইত্যাদি। হয়তো ডাক্তার সাহেব নিজে এতটা সূক্ষ্মতায়

এত দ্রুত এগুলো ধরতে পারতেন না। বোঝা যাচ্ছে প্রায় একই কৌশলে কী ভাবে এআই আর্ট ও সায়েন্স উভয় ক্ষেত্রেই পারদর্শিতা দেখাতে পারে।

বিজ্ঞান গবেষণায় এআই বেশি বেশি দায়িত্বে

গবেষণার কোন্ কোন্ কাজে এআই:

পূর্ববর্তী অনেক উপাত্ত থেকে একটি বড় উপাত্ত-ভাণ্ডার ডাটাবেস গড়ে তোলা গেলে সেখান থেকে মেশিন লার্নিং কীভাবে উপাত্ত বিশ্লেষণে প্যাটার্ন আবিষ্কারের মাধ্যমে বিজ্ঞান গবেষণায় রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যবহৃত হচ্ছে তা আমরা এই বইয়ে ইতোমধ্যে বহু ভাবে দেখেছি। এআইয়ের অনুপস্থিতিতে এরকম উদ্ঘাটন মোটেই সহজ হতোনা। যে সব ব্যাপক গবেষণা এলাকায় ধারাবাহিক ভাবে ব্যাপক ভিত্তিক ডাটাবেস রয়েছে সেখানে প্রায় রুটিন পদ্ধতি হিসেবে এআইয়ের এই ব্যবহার হচ্ছে। এরকম একটি ক্ষেত্র হলো ওষুধ আবিষ্কারের গবেষণা। যে ওষুধগুণ আমরা কোন সম্ভাব্য যৌগ অণুর মধ্যে আছে কিনা দেখতে চাই তার সূক্ষ্ম আণবিক প্যাটার্ন নানা সম্ভাব্য অর্গানিক যৌগের মধ্যে আছে কিনা আগে তা এক এক করে রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে খুঁজতে হতো। এটি প্রায়ই অত্যন্ত সময় ও পরিশ্রম সাপেক্ষে হতো। এ ছিল বছরের পর বছরের ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া। এখন সব রকম অর্গানিক অণুর আণবিক গঠনের যে বিশাল ডাটাবেস বহু কাল ধরে গড়ে উঠেছে তার ওপর এআইয়ের মেশিন লার্নিং বিশ্লেষণ চালিয়ে নানা কাম্য প্যাটার্নগুলো খোঁজা হয়– সেটির সাফল্য খুব দ্রুত আসতে পারে। অল্পায়াসে প্রায় স্বয়ংক্রিয় ভাবে সেই কাম্য ওষুধগুণ সম্পন্ন অণুকে সনাক্ত করা যেতে পারে। আগামি দিনের ওষুধ গবেষণায় এমন সুযোগ নি:সন্দেহে নতুন যুগ আনবে।

তবে এটি গবেষণার একটি দিক, অন্যান্য দিকেও এআইয়ের খুব বড় ভূমিকা আছে, এমনকি পুরো গবেষণার পরিকল্পনা থেকে ফলাফল প্রকাশনা পর্যন্ত সব কাজ একদিন এআই করবে তেমন আশা ভবিষ্যতের জন্য রয়েছে, এখনো তার অনেক ধাপ হচ্ছে। যেমন ইন্টারনেটের একটি আধুনিক রূপায়ন হলে 'ইন্টারনেট অফ থিংস' যার মানে বিভিন্ন রকম তথ্য-যোগাযোগ ডিভাইসকে একটি নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসা হয় এতে– স্মার্টফোন, শরীরের মনিটর করা রোগনির্ণয় যন্ত্র, কোন প্রক্রিয়ার চালিকা মোটর, বৈজ্ঞানিক পরিমাপক ব্যবস্থা ইত্যাদি। ফলে এগুলো সব এক সঙ্গে পরস্পরের

সঙ্গে যোগাযোগ কাজ করে। অন্য দিকে বহুকাল ধরে চর্চা হচ্ছে রবোটিক্সের, যেটি মানুষের কাজকর্মের অনুকরণের নানা কৌশল গড়ে তুলেছে। এআই এই 'ইন্টারনেট অফ থিংস' এবং রোবোটিক্সের সহায়তায় চমৎকার কাজ করে বিজ্ঞান গবেষণায়। এআই প্যাটার্ন আবিষ্কার, ইমেজ রিকগ্‌নিশন ও অন্যান্য ভাবে অনেকটা মানব মস্তিষ্কের মতই যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় তা রোবোটিক্সের মাধ্যমে ল্যাবোরেটরির বিজ্ঞানীর কাজে পরিণত করতে পারে, বিজ্ঞানীর অংশ গ্রহণ ছাড়াই। কোন যন্ত্রকে সূক্ষ্ম ভাবে সেট করে দেয়া, সব কিছুর সুচারু চালনা হচ্ছে কিনা নজর রাখা, পরিমাপ যন্ত্রের রিডিং নেয়া, উপাদান বা রিয়েজেন্ট মেপে নিয়ে সাবধানে একটি সঙ্গে অন্যটি মেশানো– এরকম অনেক কাজ থাকে ল্যাবোরেটিরিতে যা বুদ্ধিমানের মতই রবোটিক্স করতে পারে। ওই সূক্ষ্ম বুদ্ধিটি আসে এআই থেকে। তার সঙ্গে সংযুক্ত যে সেন্সরগুলো থাকে তা যন্ত্র ও অন্যান্য সব কিছুর পরিস্থিতি বুঝে নিতে পারে এবং তার উপাত্ত-বিশ্লেষণের জন্য তার কাছে পাঠাতে পারে। যেমন পরিবেশের ওপর গবেষণার সময় সেন্সর পরিবেশের উপাত্ত নেয়, তখন পরিবেশ বিজ্ঞানীর বিবেচনাগুলো দেয় এআই। সেন্সর যদি শরীরের ভেতরে উপাত্ত নেয় তখন চিকিৎসা গবেষণার বিবেচনাগুলো দেয়। শেষের ক্ষেত্রে এআই শুধু রোবট গবেষকের কাছে নয় রোবট সার্জনের জন্যও কৃত্রিম বুদ্ধির যোগানটি দিতে পারে– যেই রোবট সত্যিকার সার্জনের কুশলতায় এবং বিভিন্ন দিকের নিরাপত্তা বজায় রেখে কঠিন অস্ত্রোপচার করতে পারে। ল্যাবোরেটরিতে বিজ্ঞানীর একটি সার্বক্ষণিক কাজ হচ্ছে গবেষণার সব জিনিসের পরিস্থিতিকে সর্বোত্তম রাখার চেষ্টা। যেমন গবেষণা-সিস্টেমের ভেতর উত্তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, এসিডিটি ইত্যাদিকে এভাবে রাখাটি জরুরি, একটি করতে গিয়ে অন্যটি যেন বদলে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে। সেন্সর দিয়ে তাৎক্ষণিক উপাত্ত নিয়ে সেগুলোর বিশ্লেষণ, প্যাটার্ন পরীক্ষা এবং রোবটিক্সকে নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির মাধ্যমে এআই যত সূক্ষ্ম ভাবে সবকিছু সর্বোত্তম রাখতে পারে, অন্য কিছু তা পারেনা।

বিজ্ঞান গবেষণার এবং তার কাছাকাছি কিছু কাজের একটি কৌশল হচ্ছে সিম্যুলেশন– আসল ঘটনার একটি ডিজিটাল ও গাণিতিক নকল তৈরি করা এবং আসল বাস্তবতাকে পরীক্ষা না করে এই নকলটির ওপরেই পরীক্ষার প্রক্রিয়াকরণটি চালানো। এখানে পাওয়া ফলাফল ও সিদ্ধান্ত এখন আসল

বাস্তবতাতেও প্রযোজ্য হয়– সিম্যুলেশন মানেই এক রকম অনুকরণ। গাণিতিক ও ডিজিট্যাল হবার কারণে এই সিম্যুলেশন মডেলের মধ্যে এআই প্রয়োগ অনেক সহজ হয়। উদাহরণ স্বরূপ জীববিদ্যার ক্ষেত্রে একটি বড় কাজ হচ্ছে এর অসংখ্য প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক গঠন নির্ণয়। এর কারণ প্রোটিন হলো জীবের সব কাজের কাজী, প্রত্যেকটির কাজ বুঝতে সেটির বিস্তারিত গঠন জানা দরকার। শুরুতে ২১টি এমাইনো এসিডের মধ্যে কয়েকটি বিভিন্ন ক্রমে একের পর এক সেজে গিয়ে একটি সরল চেইন গঠন করে, যা প্রোটিনের প্রাথমিক গঠন। ওই ক্রম অনুযায়ী ভাঁজ হয়ে দলা-মোচড়া পাকিয়ে ওই চেইনটি একটি জটিল ত্রিমাত্রিক গঠনে রূপ পায় যেটিই চূড়ান্ত প্রোটিন, যার খোপখাপ ওই শারীবৃত্তের কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। ওষুধ আবিষ্কার সহ জীববিদ্যার অনেক রহস্যের উদ্ঘাটনের চাবিকাঠি এর গঠন জানার ওপর নির্ভর করে। সেই গঠন জানা তাই এত জরুরি; কিন্তু কাজটি অত্যন্ত কঠিন– এক একটির গঠন নির্ণয়ে বিজ্ঞানীর বহুদিন কেটে যায়। সম্প্রতি ইতোমধ্যে নির্ণিত অনেক প্রোটিন গঠনের যে বিরাট ডাটাবেস রয়েছে তার ভিত্তিতে এমন মেশিন লার্নিং সফটওয়্যার শুধু এই কাজেই তৈরি হয়েছে যা এক একটি বিশেষ এমাইনো এসিড চেইন তার নানা সম্ভাব্য অসংখ্য ভাঁজে যে কী কী হতে পারে তা সবই অত্যন্ত দ্রুত বের করে ফেলতে পারে। এবং একই সঙ্গে একের পর এক কোন্ কোনটি ভাঁজ সত্যি হতে পারবে এবং কী ত্রিমাত্রিক গঠন হবে তাও নির্ণয় করে। এর সবই হচ্ছে সফটওয়্যার-সৃষ্ট প্রোটিনের ওই ডিজিট্যাল মডেলে, আসল প্রোটিন অণুর ওপর নয়। কাজেই অতি দ্রুত করে করে দেখে ফেলতে পারে কোথায় গিয়ে ঠেকেছে। এই এআই সিম্যুলেশন কাজটি এত সহজ ও দ্রুত করে ফেলেছে যে এখন শরীরের সব প্রোটিনের গঠন নির্ণয় করা হয়ে গেছে! শুধু তাই নয় যে প্রোটিন সত্যি সত্যি জীবদেহে নাই সে রকম অনেক কাল্পনিক প্রোটিনের গঠন সিম্যুলেশনে নির্ণয় হয়ে গেছে। এখন এই গঠনের প্রোটিন থাকলে কী কাজ করতে পারতো তা নির্ণয় করা এবং সেটি উপকারী কিছু হলে কৃত্রিম ভাবে সেই বাস্তবে না থাকা প্রোটিন সংশ্লেষণ করা একটি খুবই চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক গবেষণার দুয়ার খুলে দেবে।

এআই আনছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে যুগান্তর:

এআইয়ের জীবন পরিবর্তনকারী ক্ষমতাগুলো ভাল বোঝা যায় চিকিৎসার ও জনস্বাস্থ্যের কাজে। বিশেষ করে একটি নাটকীয় পরিবর্তন এখনই লক্ষ্য করা যাচ্ছে রোগ নির্ণয়ের উপায়ে। বহুদিন ধরে এবং বর্তমানেও রোগ নির্ণয়ে বড় ভূমিকা রাখছে শরীরের ইমেজিং ও তার ব্যাখ্যা– সেই এক্সরে' আবিষ্কারের দিন থেকে শুরু আজকের এম আর আই ও আরো উন্নত ইমেজিংগুলো পর্যন্ত। সুস্থ ইমেজের সঙ্গে পার্থক্য দেখলে রোগের উপস্থিতি ধরা পড়ে। এখন এআই এগিয়ে এসেছে শারীরবৃত্তের অতি সূক্ষ্ম প্যাটার্ন অথবা বিশেষ মার্কার অণুর উপস্থিতি লক্ষ্য করে তার সঙ্গে এক একটি রোগ বা বৈকল্যের সম্পর্ক নির্ণয় করে অনেকটা আগাম ভাবে রোগ বলে দেবার কাজে। এতে যেমন দেরি হবার আগে রোগের কথা জানা যাচ্ছে, তেমনি ভবিষ্যদ্বাণীটি বেশ নিখুঁতও হচ্ছে। এই নতুন উপায়টি এত দ্রুত উন্নতি লাভ করছে যে মনে হচ্ছে শিগ্‌গির রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রটাই পুরো বদলে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ গুগল কোম্পানীর চামড়ার ক্যানসার নির্ণয়কারী সফটওয়্যারটির কথা বলা যায়– ২০১৭ সালে স্কিন ক্যানসার আগাম বলে দেয়ার ক্ষেত্রে এর সাফল্য ছিল ৭৯%, ২০১৮ সালে ৮৫%, এবং ২০২০ সালে ৯৬%! স্তন ক্যানসারের সময়মত ধরা পড়ার বিষয়টি এতই জনগুরুত্বপূর্ণ যে ইমেজিং ও আনুসঙ্গিক পদ্ধতিগুলোর দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে নিত্য; তারপরও এখন দেখা যাচ্ছে এর সব চেয়ে ভাল ইমেজিঙের থেকেও এআই মার্কারের পদ্ধতি ইতোমধ্যেই বেশি সাফল্য পাচ্ছে। আগামী দিনের রোগ নির্ণয় কোন্ দিকে যাচ্ছে সেটি বেশ স্পষ্ট এখন।

মজার ব্যাপার হলো এই নতুন পদ্ধতি শুধু আগাম এবং নিখুঁত ভাবে রোগ নির্ণয় করবেনা, ব্যবহারকারীর দিক থেকে এটি হবে খুবই সরল ও সুলভ। অনেক ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ে এআইয়ের ওপর নির্ভর করার মানে হবে নিজের স্মার্টফোনের ওপর নির্ভর করার মতই, নিজেই নিজের রোগ নির্ণয়ের মত। অনেকগুলো রোগ নির্ণয়ের জন্য চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে ঠিকই, কিন্তু সেখানেও ডাক্তার আর নার্সরা সাধারণত নির্ভর করবেন সরাসরি সফটওয়্যারের সহজ ব্যবহারের ওপর। আর তাঁরাও হয়তো রুগী নিজে কী দেখেছেন সেটি আগে জানতে চাইবেন ও সেখান থেকে অনুসন্ধান শুরু

করবেন। এতে হাসপাতালে অপ্রয়োজনীয় ভাবে রুগীর ভিড় ও বেশিক্ষণ অবস্থান, এবং ব্যয় একেবারেই কমে যাবে।

এআই সফটওয়্যার যে তথ্য নিয়ে কাজ করছে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুবই মামুলি, যেমন নিশ্বাসের গন্ধ, রক্তের একটি ফোটা, কিংবা কাশির আওয়াজ। কোভিড সংক্রমণের সময় যুক্তরাষ্ট্রের এম আই টি বিশ্ববিদ্যালয় এমন পদ্ধতি উন্নয়ন অনেকটা সফল ভাবে এগিয়ে নিয়েছিলো যাতে স্মার্টফোনের একটি অ্যাপস্ ফোনে গলার কাশির শব্দ শুনে ওখানে থাকা এআই সফ্টওয়্যারে সেই শব্দের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারে এটি সাধারণ সর্দির কাশি, না মৌসুমি ফ্লুর কাশি, না কোভিডের কাশি। এর প্রাথমিক সিষ্টেমটি এখন কাজ করছে। এই যে মামুলি সব জিনিস, যেমন নিশ্বাসের গন্ধ– তার মধ্যে এমন কিছু অণু মার্কার রয়েছে যার থেকে কোন কোন ক্যানসারও সনাক্ত করা সম্ভব।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চিকিৎসা গবেষণার তথা পুরো বিজ্ঞান গবেষণায় এআইয়ের খুব সুদুরপ্রসারী কৃতিত্ব হলো আশ্চর্য রকম দ্রুততার সঙ্গে কোভিড টিকার আবিষ্কার– ভাইরাসটি সনাক্ত হবার এক বছরের মধ্যেই! সাধারণত এসব টিকা আবিষ্কারে বছরের পর বছর সময় লেগে যায়; তেমনিটি হলে কোভিডের ভয়াবহতা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারতো তা ভাবলেই শিউরে উঠতে হয়। টিকা হিসেবে শরীরে যা ঢুকানো হচ্ছে তা শরীরের প্রতিরক্ষাকে কোভিড ভাইরাসকে চিনিয়ে দেয়ার কাজ করে, হয়তো এই ভাইরাসের একটি অনুরূপ কম ক্ষতিকর ভাইরাস ঢুকিয়ে, অথবা কোভিড ভাইরাসের গায়ের যে বিশেষ প্রোটিন আবরণ তেমনি প্রোটিন সৃষ্টির মত একটি আরএনএ (ডিএনএর মতই অণু) ঢুকিয়ে। এসবের অসংখ্য বিকল্প হতে পারে– তার মধ্যে কোন্টি যে কার্যকর ও নিরাপদ তা একটি একটি করে পরীক্ষায় বের করতে হতো। কিন্তু এআই মেশিন লার্নিং সবগুলোর প্রতিক্রিয়ার উপাত্ত দ্রুত বিশ্লেষণ করে, তার প্যাটার্ন দেখে সেই কাজটি খুব অল্প সময়ে করতে পেরেছে– তার সম্ভাব্য বিষক্রিয়া, পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সব। সময় যেটুকু লেগেছে তা প্রধানত সত্যিকার মানুষের ওপর তার বাধ্যতামূলক পরীক্ষা নিরিক্ষায়– সেখানে এআইয়ের কিছু করার ছিলনা।

পুরো বিজ্ঞান গবেষণার কতখানি দায়িত্বে এআই:
যে প্রশ্ন এখন সবার মনে তা হলো বিজ্ঞানের নানা শাখায় বিজ্ঞানীর কতখানি কাজ এআই নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারছে বা পারবে; সব কাজই কি নিতে কখনো পারবে? এখনকার অবস্থাটি একটু দেখতে পারি কোন কাজগুলো এআই করতে পারছে, কোন্‌গুলো বিজ্ঞানীকে করতেই হচ্ছে। বিজ্ঞানীর প্রায় সব গবেষণার মধ্যে সাধারণত কাজের যে ধাপগুলো আসে সেগুলো হলো- গবেষণার সমস্যা বাছাই, এ পর্যন্ত এ সম্পর্কে যা কাজ হয়েছে তার সব জানা, সমস্যাটি সমাধানে একটি তাত্ত্বিক মডেল খাড়া করা, মডেলটিকে বাস্তবে যাচাই করার জন্য একটি পরীক্ষার ডিজাইন করা, পরীক্ষায় বাস্তব উপাত্ত সংগ্রহ করা ও সেগুলোর বিশ্লেষণ করা, ফলাফল বুঝে নেয়া ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, একটি ভাল প্রকাশনা হিসেবে গবেষণার উপস্থাপন।

গবেষণার সমস্যা খুঁজে বের করা এবং এর সমাধনে তাত্ত্বিক মডেল খাড়া করা এখনো এআইয়ের পক্ষে খুবই কঠিন কাজ হয়ে রয়েছে। এআই এখানে বিজ্ঞানীর অন্তর্দৃষ্টির ভাল বিকল্প হতে পারেনি। এআই চেষ্টা করতে পারে ব্যাপক ভাবে গবেষণা প্রকাশনা ও গবেষণা-উপাত্তগুলোর মধ্যে সাঁতরিয়ে একটি ভাল গবেষণা সমস্যা বের করে আনার, কিন্তু সেটি খুব বিবেচনা প্রসূত হচ্ছেনা অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তাত্ত্বিক মডেল খাড়া করতেও শুধু উপাত্ত ঘেঁটেই হয়না– একটি ইউরেকা গোছের অন্তর্দৃষ্টিও প্রয়োজন যা এখনো অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষেরই একচেটিয়া। কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য সমস্যার এলাকাটি এমন ছিমছাম ভাবে জানা আছে যে সেখান থেকে কম্পিউটার সফটওয়্যার নতুন কিছু বলে দিতে পারে। এমন একটি উদাহরণ আমরা একটু আগে দেখেছি– জৈব রসায়নে বাস্তবে অনুপস্থিত প্রোটিনের গঠন নিজ থেকে আবিষ্কার। তারপর নিজ থেকেই সেটির গুণাগুণ নির্ণয়ের ও কৃত্রিম উপায়ে তার বাস্তব সৃষ্টির একটি নতুন গবেষণা ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারছে এআই সফটওয়্যার। আর তার মডেল দেবার দায়িত্বও তো তখন সফটওয়্যারেরই হাতে। হ্যাঁ, অন্যান্য ক্ষেত্রেও আগের উপাত্ত ঘেঁটে একটি মডেল বা কল্পতত্ত্বের আইডিয়া সফটওয়্যার দিতে পারে, বেশ দ্রুতই দিতে পারে; কিন্তু মানুষ বিজ্ঞানী যাচাই না করলে সেই কল্পতত্ত্ব প্রায়ই উদ্ভট কিছুও হতে পারে।

পরীক্ষার পদ্ধতি নির্ণয় ও ডিজাইনের সফ্‌টওয়্যার বেশ সফল হয়, কারণ এখানে প্রয়োগযোগ্য আগেকার অনুরূপ সব পদ্ধতি ও ডিজাইন এটি খুব সহজে দেখে ফেলে এই বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলোর প্রয়োগযোগ্যতা যাচাই করে ফেলতে পারে বেশ দ্রুত। আর পরীক্ষার উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে এআইয়ের অগ্রগণ্যতা তো এর অবিচ্ছেদ্য অংশ– আমরা বার বার দেখেছি। মানুষ বিজ্ঞানীর বরং এক্ষেত্রে নানা ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে, ফাঁকি এড়ানো ও নিখুঁত হবার দিক থেকেও এসবে এআই এর কাজ বেশি গ্রহণযোগ্য। উপাত্ত ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। তবে এখানেও এআইয়ে কিছু সীমাবদ্ধতার কথা কেউ কেউ উল্লেখ করেন। একটি হলো সংগৃহীত উপাত্তের মধ্যে যে প্যাটার্নগুলো এআই দেখে তার ভেতর একেবারে কাকতালীয় ভাবে হয়ে যাওয়া প্যাটার্নও থাকতে পারে, কার্যকারণ সম্পর্ক থাকা ছাড়াই। এরকম হলে মানুষ বিজ্ঞানী তার কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে এটি বুঝতে পারে, এআই পারেনা। কাজেই এখানেও বিজ্ঞানীর চূড়ান্ত বিবেচনায় গ্রহণযোগ্য মনে হলেই শুধু তা গ্রহণ করা যায়, একা এআইয়ের সিদ্ধান্তে নয়।

গবেষণার প্রকাশনার ক্ষেত্রে প্রথম খসড়াটি আজকাল নিশ্চিন্তে এআইয়ের ওপর ছেড়ে দেয়া যায়- কারণ এর জন্য খুব ভাল লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল এখন রয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত লেখাটি বিজ্ঞানী নিজে পরিমার্জন করা উচিত। কারণ এই ভাল মডেলও প্রায়ই অদ্ভুত কিছু কথা লিখে ফেলে, তথ্য ভুল করে বসে। কাজেই সব কিছুতেই বিজ্ঞানীর একটি ভূমিকা সবল ভাবে এখনো দেখা যাচ্ছে, যদিও কাজের অনেকখানিতে এআই অনেক ভাল, অনেক দ্রুত করে ফেলতে পারছে। সব বিজ্ঞানীর কাজ যে শেষ হয়ে যাবেনা তা বোঝাই যাচ্ছে, বিশেষ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বড় বিজ্ঞানীর কাজ। সহকারী বিজ্ঞানীর কাজতো এআই নিয়েই নিয়েছে বলা যায়। কিন্তু ওই বড় বিজ্ঞানীরও তো সহকারী বিজ্ঞানী হিসেবে আগে কাজ করার সুযোগ পাওয়া উচিত, নইলে তিনি বড় বিজ্ঞানী হবেন কী ভাবে?

কারখানায়, ব্যবসায় কী ঘটতে পারে?

কারখানার উৎপাদন যন্ত্র শ্রমিকের বদলে রোবটে চালিয়ে সেখানে আগামী দিনের কিছু নমুনা পাওয়া যাচ্ছিলো বহু আগে থেকেই। এক্ষেত্রে বার বার

একই কায়িক শ্রমের কাজ করতে হয় এমন ক্ষেত্রে শ্রমিকের থেকে রোবট সুবিধাজনক এই সুবিধাটি নেয়া হচ্ছে। যেমন গাড়ি নির্মাণের কারখানায় নির্মাণাধীন একটি গাড়ি যখন কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে কোন রোবটের সামনে আসে তখন রোবট হয়তো বিশেষ জায়গায় কয়েকটি ওয়েল্ডিং করে দেয় – দুই-তিনটি সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম করা নড়াচড়ার মাধ্যমে যা এটি করতে পারে। তারপর গাড়িটি পরের রোবটের কাছে যায়। আগে শ্রমিকও ঠিক এটিই করতো। রোবট মানে অবশ্য মানুষের মত দেখতে কেউ নয়– এই ক্ষেত্রে হয়তো হাতের মত দন্ড ও ওয়েল্ডিং যন্ত্র হলেই চলে। তারপর থেকে রোবট ক্রমাগত স্মার্ট হয়েছে, সর্বশেষ এআই যোগ করে বুদ্ধিমান হয়েছে। এটি শুধু কাজটি করছেই না, তাৎক্ষণিক বিবেচনা করে করতে পারছে, যেমন ভুল হলে ভুল শুধরে নিতে পারছে, কিছু পড়ে গেলে তুলে নিতে পারছে, ওয়েল্ডিঙের মান ভাল না হলে ঠিক করে নিতে পারছে। ফলে সবদিক থেকে এটি শ্রমিকের বিকল্প হতে পারছে।

এই প্রক্রিয়াটি দিন দিন কারখানার ও উৎপাদনের আরো ব্যাপক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হচ্ছে। এখন তো কিছু কিছু কারখানায় উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা থেকে শুরু করে তার উপাদান সরবরাহের প্রবাহ, উৎপাদনের সার্বিক গুণমান রক্ষা, প্যাকেজিং পর্যন্ত পুরো ব্যবস্থাকেই স্বয়ংক্রিয় ও সর্বোত্তম অবস্থায় রাখতে পারছে এআই। এভাবে চল্‌তে থাকলে কিছু দূরবর্তী সময়ে হয়তো দেখা যাবে যে পুরো কারখানার, এমনকি পুরো সম্পূর্ণ কোম্পানীর পরিচালনা ব্যবস্থায় এআই মুখ্য ভুমিকা পালন করছে– এর প্রত্যেকটি অংশ থাকবে এআইয়ের হাতে স্বায়ত্ত্বশাসনে, আবার সার্বিক ভাবে কোম্পানীও। মানুষের হস্তক্ষেপটিকে দিন দিন ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনাটাই হবে স্বাভাবিক– হয়তো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তগুলোকে দেখে দেয়াটাই মানুষের জন্য অবশিষ্ট থাকবে। তবে ওই অবস্থা আসতে এখনো বেশ সময় লাগবে, ইতোমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধিমান মানুষেরও খবরদারিটি বজায় থাকবে বলেই মনে হচ্ছে।

এআই এভাবে স্বায়ত্ত্বশাসিত হচ্ছে কেমন করে? বহুদিন ধরে আমরা কারখানায় সম্পূর্ণ কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত যন্ত্র দেখেছি, এখনো দেখছি। সেখানে কম্পিউটারকে প্রোগ্রাম করে দিয়ে দেয়া ডিজাইন মত পর পর ধাপে যন্ত্রে

উৎপাদনের কাজগুলো করে ফেলা হয় স্বয়ংক্রিয় ভাবে। এখন এআই ওই প্রোগ্রামে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মত পরিবর্তন আনতে পারছে। যন্ত্রের ও উৎপাদনের প্রত্যেক অংশ থেকে যেই অনেক সেন্সর অসংখ্য তথ্য নিত্য এআই সফটওয়্যারে হাজির করছে সেখান থেকেই বিশ্লেষণে প্যাটার্ন দেখে সে ওই প্রোগ্রামে পরিবর্তন আনতে পারছে। উৎপাদনের সময় নিজস্ব বিবেচনায় মানুষ বিশেষজ্ঞ যা যা করতেন এআই সে সবই অনেক বেশি তাৎক্ষণিক ও অনেক বেশি সূক্ষ্ম নির্ভুলতার সঙ্গে করতে পারছে এবং সব সময় সব কিছুকে সর্বোত্তম অবস্থায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। উৎপাদনে প্রাসঙ্গিক সবকিছুর ওপরেই কথাটি খাটে– উপাদান সরবরাহ প্রবাহ, কর্মীর ও যন্ত্রের নিরাপত্তা, চাহিদা ও উৎপাদন পরিকল্পনা, সম্পূর্ণ কারখানার নিরাপত্তা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা সবকিছু।

উদাহরণ স্বরূপ যন্ত্রের প্রত্যেক যন্ত্রাংশ আলাদা ভাবে নিজেই স্মার্ট হবার কারণে নিজের অবস্থা সব সময় প্রাসঙ্গিক সিস্টেমটিকে জানিয়ে রাখছে, ভাল অবস্থায় থাকলেও। যখনই এটি সর্বোত্তম ব্যবস্থার থেকে নিচে চলে এলো এটি নিজেই নিজের নবায়ন করার নতুন যন্ত্রাংশ নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে সঠিক স্থানে জরুরি সংবাদ পাঠিয়ে। এভাবে তথ্য চলাচলটি শুধু প্রয়োজনীয় স্থানীয় জায়গায় সীমাবদ্ধ থাকবে– একেবারে সব কিছু একই জায়গায় গিয়ে কেন্দ্রীয় যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ভারাক্রান্ত করে ফেলবেনা। এটিই স্বায়ত্ত্বশাসন, যার যার এআই কাজ করে যাচ্ছে।

ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি, অগমেন্টেড রিয়্যালিটি, ইন্টারনেট অফ থিংস ইত্যাদি আধুনিক প্রযুক্তির পরিচয় আমরা ইতোমধ্যে পেয়েছি। প্রত্যেক পর্যায়ে মানুষ ব্যবস্থাপক বা যান্ত্রিক ব্যবস্থাপক উভয়ের কাছে এই প্রযুক্তিগুলোর পূর্ণ সুযোগ থাকবে। যেমন ভার্চুয়াল রিয়্যালিটিতে সে দেখবে যন্ত্রের একেবারে ভেতরের ঘটনাবলী কী, আবার ইন্টারনেট অব থিংসের মাধ্যমে গ্রাফিক ও অন্যান্য ইমেজের রূপে তার পরিস্থিতি জানবে ও সহজ হস্তক্ষেপ করতে পারবে, তারা কাছে থাকুক কি দূরেই থাকুক। শিল্প উৎপাদনের জন্য যা সত্যি কৃষি, প্রাণী সম্পদ, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। গাড়ি, বিমান ইত্যাদি চালনার ক্ষেত্রেও। সবই প্রায় স্বায়ত্বশাসিত ভাবে চালাবে।

মানুষের জীবিকা, কর্মসৃষ্টি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত বলে উৎপাদন ব্যবস্থা ও ব্যবসা প্রশাসন আগামী দিনে কোনদিকে যাচ্ছে তাতে সবার আগ্রহ রয়েছে। স্পষ্টত এসবে পদে পদে অনেক ভবিষ্যদ্বাণীর বিষয় আছে। আগেকার প্রবণতা, বর্তমান উপাত্ত এসব লক্ষ্য করে এই কাজে এআইয়ের অগ্রগণ্যতা তো অবশ্যই রয়েছে। তাই বিক্রয় ভবিষ্যদ্বাণী করে যে ব্যবস্থাপনা তা তো এআই ভাল করবেই। তবে সার্বিক মোটা দাগের ভবিষ্যদ্বাণী যার ভিত্তিতে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল ঠিক করা যাবে সে ক্ষেত্রে শুধু অতীত উপাত্তে চলেনা, ভবিষ্যতের অপ্রত্যশিত পরিবর্তনগুলোও আন্দাজ করতে হয়। একাজে এআই ততটা পারদর্শী নয়, এখানে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষই ভাল। অফিসের দৈনন্দিন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মধ্যে মানুষের থেকে এআইকেই যে ক্রমে বেশি বেশি দেখা যাবে তা প্রায় স্পষ্ট। যেমন কোন্ বীমা দাবীটি কোর্টে চ্যালেঞ্জ করা উচিত, কোন্ ঋণ প্রস্তাবটি গ্রহণ করা উচিত, সুনির্দিষ্ট আগের বহু উপাত্তের ভিত্তিতে জটিল বিশ্লেষণের এসব সিদ্ধান্ত যে রকম দ্রুত ও সঠিক ভাবে এআই নিতে পারে, মানুষ তা পারবেনা। এরকম সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে প্রচুর, অথচ তাড়াতাড়ি, কাজেই উদ্যোক্তারা এআইকেই চাইবে। কিন্তু হয়তো এখানেও সবগুলোর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি কী নেয়া হলো তা একজন অভিজ্ঞ মানুষ ব্যবস্থাপক দেখে দেয়াটি এখনো নিরাপদ।

কতগুলো ক্ষেত্র থেকে মানুষকর্মী উচ্ছেদ হওয়া এখন অনেকটাই সময়ের ব্যাপার। যে সব কাজ নেহাতই কায়িক শ্রম, সাধারণ বুদ্ধির, সাধারণ দক্ষতার এবং বার বার একই রকম গতানুগতিক কাজ, কিসের পর কী হবে তার ছক সুনির্দিষ্ট, তা শেষ পর্যন্ত মানুষের হাতে থাকবেনা– তা সে যেই ক্ষেত্রেই হোক না কেন। সাদা কথায় বলা যায় শ্রমিকের করার মত কাজ আর কেরাণীর করার মত কাজগুলো এআইয়ের কাছে অনায়াসে চলে যাবে প্রথম ধাক্কাতেই। এক্ষেত্রে প্রতিকারের কথায় একটু পর আসছি।

অন্য এক আর্টিস্ট

অভিনয়ে, সঙ্গীতে:

হলিউডকে নিয়ে ‘রিমেইক’ নামের একটি সায়েন্স ফিকশন লেখা হয়েছিলো– এখন দেখা যাচ্ছে ওই ফিকশনই সত্যি হতে চলেছে। একটি জনপ্রিয় সিনেমার রিমেইক বা পুনর্নির্মাণ তো হতেই পারে। তবে ওই উপন্যাসটিতে

রিমেইক ছিল দারুণ অভিনব রকমের। এক তরুণী হলিউডে এসেছিলেন কোন রকম একটি 'অভিনয় পার্ট' পাওয়া যায় কিনা সে ব্যাপারে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করতে। কিন্তু এসে তিনি পেলেন অন্য এক হলিউডকে যেখানে অভিনেতা বা অভিনেত্রী বলতেই কোন মানুষ নেই। সিনেমার নির্মাতারা তাঁদের ইচ্ছে মতো ডিজিট্যাল অভিনেতাদের তৈরি করে নিচ্ছিলেন। তাঁদের অভিনয়েই তৈরি হচ্ছিলো নানা সিনেমা। এরকম অনেক ডিজিটাল অভিনেতা অভিনেত্রী অবশ্য আগেকার বিখ্যাতদের কেউ কেউ, ডিজিট্যাল রূপে তাঁদেরকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে– যেমন গ্রেগরি প্যাক, এলিজাবেথ টেইলর– দর্শক এখন যাঁদেরকে নতুন সিনেমায় আবার দেখতে চাইছেন।

রিমেইক উপন্যাসটিতে আগেকার সত্যিকার অভিনেতাদের নকলের কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু একই ভাবে সম্পূর্ণ নতুন তারকা সৃষ্টি করলেও কোন ক্ষতি ছিলনা, যাঁরা তাঁদের অভিনয় বৈশিষ্টে পুরানো বিখ্যাতদের মতই হৈ চৈ ফেলে দিতে পারে। ওদেরকে হয়তো অনেক নতুন সিনেমার জন্য তাদের সব থেকে জনপ্রিয় অভিনয় বয়সে, যেমন নায়ক নায়িকার ভূমিকায়, সব সময় রেখে দেয়া হবে; দিন যত যাবে বাবার বা দাদার ভূমিকায় অভিনয় করতে হবেনা। সবই তো তাঁদের ডিজিট্যাল-বিশেষজ্ঞ নির্মাতাদের হাতে! অবশ্য মৌলিক সিদ্ধান্ত তাঁদের হলেও তার কৃতিত্ব আসলে দিতে হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এআইকে। অভিনেত্রী হতে চাওয়া 'রিমেইক' উপন্যাসের তরুণীটি যেমন হতাশ হয়েছিলেন তেমনি হতাশ আজ হলিউডের বহু কর্মরত অভিনেতারাও, ওই এআই ডিজিট্যাল অভিনেতাদের আংশিক আবির্ভাব দেখতে পেয়ে। মাত্র কিছু দিন আগে হলিউডের স্ক্রিপট রাইটাররা (চিত্রনাট্য লেখক) একটানা বহুদিন ধর্মঘট করেছিলেন, যা ছিল হলিউডের ইতিহাসে নজিরবিহীন। কারণ ছিল একই রকম– এআই চিত্রনাট্য লেখকরা তাঁদের কাজ নিয়ে নিচ্ছে। ওই ধর্মঘটে অভিনেতা অভিনেত্রীরাও এক পর্যায়ে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের বিপদটি এখনো পুরোপুরি আসেনি, কিন্তু আসার আলামত সুস্পষ্ট।

মোদ্দা কথা হলো অন্য অনেক কিছুর মতো সৃজনশীল আর্টের কাজও এআই করতে পারছে, তার কিছু কিছু উদাহরণ আমরা ইতোমধ্যেই দেখে ফেলেছি। এটি আর্টে'র যেই রূপই হোক এআইয়ের কৌশল কিন্তু মোটামুটি

একই রকমের। যেমন ফিল্মের নতুন বা পুরানোর নকল থেকে একজন ডিজিট্যাল অভিনেতা সৃষ্টির জন্য অতীতে অনুরূপ অনেক অভিনেতার লক্ষ লক্ষ ঘন্টার তোলা ফিল্ম ফুটেজ ব্যবহার করে বিশাল উপাত্ত-ভাণ্ডার গড়ে তুলতে হয়েছে। তার ভেতরের প্যাটার্ন আবিষ্কার করে এবং তা ব্যবহার করে নির্দেশমত নতুন অভিনয় করতে তো সে পারবেই। তার সফ্টওয়্যারেই তার অভিনয়ের মৌলিক কাঠামোগুলো থাকে। পুরানোর থেকে উপাত্ত প্যাটার্ন ব্যবহারটি এতো সূক্ষ্ম পর্যায়ের যে, এবং সেগুলোর এত মিশ্রণ ঘটছে যে এই নতুন সৃষ্ট আর্টকে অভিনব, অনন্য এবং অরিজিন্যাল না বলে উপায় নেই।

হলিউডে এরকম এআই-সৃষ্ট তারকাদের অভিনয় দেখতে আমাদেরকে আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে, যদিও বর্তমানে বেঁচে থাকা তারকাকে দিয়ে তাঁর নানা বয়সের অভিনয় একই কাহিনীর মধ্যে করানোর ব্যবস্থা এভাবেই হয়ে গেছে, তা আমরা এই বইয়ে আগে দেখেছি। তবে ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা, এলভিস প্রিসলি, মাইকেল জ্যাকসন যাঁদেরকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি তাঁদেরও চির পরিচিত ভঙ্গিতে গাওয়া নতুন গান এখন আমরা ইচ্ছে হলেই শুনতে পারি যদিও ওই গান ওই শিল্পী জীবনে কখনো গাননি বা শুনেননি, কারণ গানটি সম্প্রতি তৈরি করে তাঁর কণ্ঠে দেয়া হয়েছে! 'ওপেন এআই জ্যুক বক্স' নামের সফ্টওয়্যার এখন সেই ব্যবস্থা করেছে– ওপেন এআই হলো সেই কোম্পানী যা চ্যাট জিপিটি তৈরি করেছে। এই জ্যুক বক্স তার কাজ অসম্পূর্ণ রাখেনি, গানের কোন অংশ মানুষ শিল্পীর জন্য বাকি রাখেনি। ওই যে ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা নতুন গান গাইবেন সেই গানের কথা ও সুর, এআই নিজেই তৈরি করেছে; যে কোন গান বানিয়ে সিনাত্রার গলায় তুলে দেয়নি, লেখার আর সুর দেয়ার সময় সিনাত্রার কথা পুরাপুরি মনে রেখেই করেছে। যদিও একেবারে আনকোরা নতুন গান, তবুও সিনাত্রার সকল বৈশিষ্ট নিয়েই তৈরি করা হয়েছে। এটি এআইয়ের পক্ষেই সহজ, হুবহু ভাবে করা সম্ভব।

সঙ্গীতের এআই সফ্টওয়্যারকে তৈরিই করা হয়েছে যাতে এটি অতীতের অনুরূপ সঙ্গীতের বিশাল ডাটাবেস থেকে নতুন মিউজিক সৃষ্টি করতে পারে। কাম্য অতীত সঙ্গীতে তাকে মেশিন লার্নিঙে ট্রেনিং এমন ভাবে দেয়া হয়েছে যেন প্রয়োজনীয় সঙ্গীত-বৈশিষ্টগুলো নিয়ে এটি খেলতে পারে– যেমন চাওয়া

হয়েছে তেমনি ভাবে। যা সৃষ্টি করছে তার সুর, তাল, লয়, মাধুর্য সব যেন উপভোগ্য হয়, মান সম্মত হয় তা মেলোডি, হারমোনি, রিদম, টেম্পো, এবং সর্বোপরি আবেগের সঠিক ঘনঘটা এনে নিশ্চিত করার ব্যবস্থাটি তাতে আছে। এখনো শেষ পর্যন্ত ওস্তাদ সঙ্গীত কলাকারের একটি চূড়ান্ত হাত এর ওপর থাকে– তিনি চূড়ান্ত সম্পাদনাটি করে দেন। ভবিষ্যতে একদিন হয়তো এই সম্পাদনাটির প্রয়োজন হবেনা– একমাত্র তখনই ওস্তাদের ডাক কম পড়বে। নইলে বড় কাজগুলো হবে এআই আর ওস্তাদের মিলিত প্রয়াস।

তবে মানের দিক থেকে এখনই এআই কম্পোজার মানুষ মাস্টার কম্পোজারের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে। তাছাড়া এর কিছু আলাদা সুবিধা রয়েছে। মাস্টার কম্পোজার সেক্ষেত্রে ভাল কিছু সঙ্গীত রচনার জন্য সময় নেন্ দিনের পর দিন, এআই কম্পোজার কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় অনুরূপ মানের সঙ্গীত তৈরি করে ফেলতে পারে। তাছাড়া মানুষ কম্পোজার বা সুরকার কখনো একটানা পর পর একই খুব ভাল মান সম্পন্ন সুর দিয়ে যেতে পারেন না– তাঁর মানের ওঠা-নামা হয়। উঁচু দরের সঙ্গীতকে মস্তিষ্ক থেকে তৈরি করতে প্রতিভাবানদেরকেও অনেকটা মানসিক প্রয়াস নিতে হয়; যে কারণে সময় লাগে, সব সময় এক মানে হয়না। এআইকে মানবিক সেই চাপ নিতে হয়না বলে তার এসব সমস্যা নেই– একই ভাবে একই মানের সৃজন সে করে যায়। তাই বলে তার সৃজনশীলতায় বৈচিত্রের কোন অভাব হয়না– হয়তো মাস্টার কম্পোজারের থেকেও অনেক বেশি।

কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়– একজন বীটাফোনের সিম্ফোনি শুনে বোদ্ধা শ্রোতা যা অনুভব করেন, প্রায় একই মানের এআই সৃষ্ট সিম্ফোনিতে তিনি কি এতই মুগ্ধ, এতই আবেগ-প্রবণ হবেন? এই ব্যাপারে সবার মত এক না হলেও অধিকাংশ বোধ হয় বীটাফোনের পক্ষেই থাকবেন। এটি হয়তো সঙ্গীত-মানের বিষয় নয় শ্রোতার মনস্তত্ত্বের একটি বিষয়। কারো মনে হতে পারে বীটাফোনের সঙ্গীতে তিনি ওই মানুষটির অনুভূত আনন্দ-বেদনাকে শুনতে পারছেন যা আর্টের রূপ নিয়েছে। যন্ত্রের সৃষ্ট অনবদ্য সঙ্গীতেও এই সহমর্মিতাটি হয়তো অনেকে অনুভব করেন না, কৃত্রিমতার একটি বাধা এসে পড়তে পারে। তবে সেটি তুলনামূলক বিবেচনার ব্যাপার। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার উৎসের কথা চিন্তা না করে সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ শুধু দেখতে চান যে

সঙ্গীতের দ্যোতনা তাঁর মনে খেলা করে যাচ্ছে কিনা, তাঁকে অন্য জগতে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে কিনা। যাঁরা ব্যবসার দিকটি দেখেন তাঁরা অবশ্য আর একটি প্রশ্ন তোলেন- যে লক্ষ লক্ষ ঘন্টার সঙ্গীত আত্মস্থ করে এআই এখন অপূর্ব 'নতুন' সঙ্গীত সৃষ্টি করছে তা কি আসলে নতুন? যে মানুষ-সঙ্গীতকারদের সুর ঐ ডাটাবেসে ঢুকেছে তাঁদের কপি রাইট কোথায়?

আর্ট জেনারেটর:

চ্যাট জিপিটি ভাষায় লেখাজোকার জন্য যে কাজ করছে, সে রকম কাজ ছবি আঁকার জন্য করছে এরকম বেশ কিছু ব্যবস্থা রয়েছে, যাদের বলা হয় আর্ট জেনারেটর। চ্যাট জিপিটির মত সবার কাছে সহজলভ্য প্রোগ্রাম যেমন আছে, তেমনি বিশেষায়িত চিত্রশিল্পের জন্যও আছে। এখানে লিখে নির্দেশ দিয়ে দিয়ে কাম্য ছবি সৃষ্টি করা যায়। ইতোমধ্যে আঁকা সব রকমের ছবি থেকেই এর উপাত্ত-ভাণ্ডার তৈরি হয়, ওই একই ভাবে মেশিন লার্নিঙের ট্রেনিং দেয়ার ওপরো অনেক কিছু নির্ভর করে। সবই ডিজিট্যাল ছবি। এতে যা সৃষ্টি হয় তা ডিজিট্যাল আর্টেরই একটি রূপ। যেহেতু আর্ট জেনারেটর তার ভাণ্ডারে চিত্রের শিল্প রূপে সব দিককেই সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করছে– রং, রেখা, থীম কিছুই বাদ যায়নি, কাজেই তার সৃজনশীলতায়ও কোন কিছুর অভাব নেই।

চ্যাট জিপিটির মতো সর্ব-সাধারণের কাছে উন্মুক্ত একটি আর্ট জেনারেটর ড্যান-ই-২ খুব নাম করেছে। যিনি লিখে নির্দেশ দিয়ে দিয়ে আর্টটি তৈরি করান তিনি এতে একজন বিশেষজ্ঞ হতে পারেন, আবার একেবারেই সাধারণ আর্ট-উৎসাহী সরল ভাবে কী চাচ্ছেন তা বলতে পারেন। একজন শিশুও এটি আনন্দের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারে। ধরা যাক শুধু বল্‌লাম 'একটি রেল গাড়ি আঁকুন'। আর্ট জেনারেটর তার ইচ্ছেমত যে কোন একটি রেলগাড়ির ছবি দিতে পারে– যে কোন ঢঙে ড্রইং, পেইন্টিং যাই হোক। আমি যদি আগে ওভাবে বলে দিতাম বা এখন যদি বলি 'একটি পুরানো দিনের রেল গাড়ির পেইন্টিং করুন'। তাহলে সে সেভাবে এবার সংশোধন করে দেবে– যত সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেবো ততো সুনির্দিষ্ট ছবি পাব। এখন যদি বলি 'শিল্পী টার্নারের ভঙ্গিতে বাংলাদেশের গ্রামের পরিবেশে বৃষ্টিস্নাত দিনে ধোয়ায় আচ্ছন্ন অবস্থায় ছুটে চলা রেলগাড়ি আঁকুন। হয়তো আমরা টার্নারের বিখ্যাত ইমপ্রেশনিস্ট ছবি 'বৃষ্টি, বাষ্প, আর বেগ' এর একটি বাংলাদেশী রূপ পাব।

এটি চিত্রশিল্পে একটি ভাল সংযোজনও হতে পারে– আর যাই হোক অন্য কোন ছবির অনুকরণ হবেনা, অনন্য অরিজিন্যাল একটি ছবি হবে। ইচ্ছে করলে নির্দেশদাতা তাঁর মনের মাধুরি মিশিয়ে একটি ছবি সৃষ্টি করতে পারবেন, খুব পছন্দ না হওয়া পর্যন্ত নির্দেশ দিয়ে দিয়ে নানা দিক থেকে তাকে বদলাতেও পারবেন।

ওখানে ছবিটি এআই আঁকলো বটে, কিন্তু নির্দেশদাতার ভূমিকাটিও কম নয়। তাঁকে বলা হয় প্রম্পট আর্টিস্ট অর্থাৎ নির্দেশ দেয়ার আর্টিস্ট। আর্ট জেনারেটর থেকে ভাল আর্ট পেতে হলে তাঁকেও আর্টের শৈল্পিক দিকগুলো সম্পর্কে এবং তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হবে। একজন উচ্চ দক্ষতার প্রম্পট আর্টিস্ট একই আর্ট জেনারেটর থেকে অনবদ্য একটি আর্ট আদায় করে নিতে পারেন। আর্ট জেনারেটরটির সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য বাড়িয়ে চলবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর্টটি এআইয়ের। এছাড়া অন্যান্য বিশেষায়িত ও স্বায়ত্বশাসিত আর্ট জেনারেটর স্বত:প্রণোদিত ভাবে বিভিন্ন ঘরানার খুবই উচ্চ মানের সম্পূর্ণ নতুন আর্ট সৃষ্টি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।

বিভিন্ন কালের এত প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীর এত ছবি মিউজিয়ামে, আর্ট গ্যালারিতে, মানুষের সংগ্রহে রয়েছে– বোদ্ধাদের কাছে এগুলোর যে উচ্চ মূল্য সে তুলনায় এআই সৃষ্ট আর্টের স্থান কোথায়? আর্ট সমালোচক এই দুইয়ের মধ্যে কোনটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেন কিনা? উত্তরটি হবে মিউজিকের ক্ষেত্রে একই প্রশ্নের উত্তরের মত। গ্রেট মাস্টারদের আঁকা বিখ্যাত ছবিগুলোকে এখনো সবার ওপরে রাখা হবে, প্রশংসা করার ক্ষেত্রে এবং মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও। ঐতিহাসিক প্রাচীনত্বের মূল্যটি বোঝা যায়, কিন্তু শিল্পগুণের প্রশংসায় পক্ষপাতিত্বটি কেন? ওই মানুষের মনের ব্যাপারটিই সেখানে কাজ করে– রক্ত-মাংসের মানুষের আনন্দ-বেদনা যেখানে তুলির আঁচড়ে রূপ পেয়েছে ওই মনের কাছে তার অগ্রগণ্যতা থাকবেই। তবে এআই এই জগতে এসে দর্শনযোগ্য আর্টকে তার গজদন্ত মিনার থেকে নামিয়ে আনছে। এর কল্যাণে সাধারণ সব মানুষও ভাল আর্ট কাছে পাবে, উপভোগ করবে, নিজেও সৃষ্টি কারবে– অনেক বেশি শিল্প-মনা হবার সুযোগ পাবে।

আর্টের আরেকটি বড় দিক সাহিত্যেও এআইয়ের রাজত্ব খুবই উপস্থিত রয়েছে। তবে সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পের তুলনায় এটি অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে বলতে হবে এখনো। চ্যাট জিপিটিকে কবিতা বা গল্প লিখতে দিলে সেটি সাবলীল কোন সাহিত্যিকের কাজ বলে মনে হয়না। অন্যান্য যে সব সফটওয়্যার সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টি করেছে তাও এখনো উঁচু মানসম্মত হতে পারেনি– হয়তো যথেষ্ট অভিজ্ঞতা এখনো এক্ষেত্রের এআইয়ের হয়নি বলে।

আগামী দিন

আগামী দিনগুলোতে আমাদের জীবন এবং বিশেষ করে আর্টর্স ও সায়েন্সের সৃষ্টি ও আস্বাদনের ক্ষেত্রে যে বহুমুখী পরিবর্তন আসবে আজকের সব প্রবণতা থেকে তা বেশ বুঝতে পারছি। এর অনেকগুলো ধারা নিয়ে আলোচনা করা যায়। তবে মনে হচ্ছে এর মধ্যে সব কিছু একেবারে উল্‌টে পাল্‌টে দেবার মত একটি দূত নীরবে কাজ করে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত। আগামী দিন সে নীরব থাকবেনা, আমাদের জীবন-জীবিকাকে না চেনার মত করে বদলে দেবে– সেটির মূলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আমরা তাই এখানে আগামী দিনের কথাগুলো তার ওপরেই নিবদ্ধ রেখেছি।

এই পরিবর্তনকে অনেকে আশঙ্কা হিসেবে দেখ্‌ছেন, আবার অন্যরা সুযোগ হিসেবে দেখছেন। আমার কাছে দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গিটিই বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে, কারণ ইচ্ছে করলেই আমরা আশঙ্কাগুলো দূর করে সুযোগগুলো নিতে পারি। আশঙ্কার বড় জায়গাটি হলো ব্যাপক হারে মানুষের কাজ হারিয়ে জীবিকার সংকটে পড়ার ভয়। তাছাড়া নিজের পেশাগত সামাজিক অবস্থান হারিয়ে মর্যাদা হারোনোও বটে, নিজের দক্ষতার ব্যবহার হারিয়ে নিজকে মূল্যহীন করে ফেলাও একটি আশঙ্কা বটে। এখনো যে খুব বড় হারে মানুষ কাজ হারিয়েছে এমন প্রমাণ নেই, তবে প্রবণতাটি সেদিকেই। কায়িক শ্রম এবং গতানুগতিক বার বার করার কাজগুলোই যে এআইয়ের কাছে প্রথম হার মানবে সেটি দেখেছি। তবে বিষয়টি পেশাজীবীর কাজ এবং সৃজনশীল কাজের দিকেও শিগ্‌গির সম্প্রসারিত হবে সুনিশ্চিত ভাবে। এমনকি যেই কম্পিউটারের ভিত্তিতে আমরা এআই সৃষ্টি করেছি সেই কম্পিউটার প্রোগ্রামারদেরকে এতো বেশি সংখ্যায় আর প্রয়োজন হবেনা- কারণ এরও দায়িত্ব এআই নিয়ে নিচ্ছে। এভাবে বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিক্ষক,

সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী সবার চাহিদা ক্রমে কমে যেতে থাকবে। নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক দিক থেকে এটি দুনিয়াজোড়া বড় বিপর্যয়ের সূচনা করতে পারে। এই বিপর্যয় রোধ করার জন্য চিন্তা ভাবনাও বেশ গুরুত্ব দিয়েই শুরু হয়েছে। এই ব্যাপারে সবার সদিচ্ছা এবং বিশ্ব ঐক্যমত্য থাকলে সেটি কঠিন হবেনা।

সান্তনার কথা হলো এটি ধীরে ধীরে হবে, চট্ করে সবার ক্ষেত্রে এক সঙ্গে হবেনা। কারণ এটি এখনো ব্যয়বহুল, উদ্যোক্তাদের জন্য এখনো সব ক্ষেত্রে লাভজনক হচ্ছেনা। যতই লাভজনক হতে থাকবে, ততই এআই এর ব্যাপক ব্যবহার বাড়বে। তাই আমরা এর মোকাবেলা করার জন্য সময় পাবো, যদিও সেই সময় এসেই পড়েছে। অবশ্য কোন ক্ষেত্রেই এআই রাতারাতি একা বাজিমাত করতে পারছেনা– মানুষের কারণে, মানুষের সহযোগিতাতেই তার অগ্রগতি চল্‌ছে। পুরো ব্যাপারটি ঘটছে মানুষ আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি চমৎকার সহযোগিতার মাধ্যমে। এর মধ্যেই এক একটি ক্ষেত্রে এআই নিজে স্বায়ত্তশাসিত ভাবে কাজ করতে পারছে একটু একটু। তবে যে ভাবে চল্‌ছে স্বায়ত্বশাসনটি বাড়বে, মানুষ বিশেষজ্ঞের চাহিদা কমবে। যেভাবেই চলুক এআই মানুষের হাতকে ক্রমেই শক্তিশালী করতে থাকবে, কখনো তাকে দুর্বল করার মতো কিছু অন্তত এখন দেখা যাচ্ছেনা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয়ের বিষয়টি অবশ্য সামাল দিতে হবে, কিন্তু সক্ষমতার দিক থেকে মানব জাতি এআইয়ের কল্যাণে একটি খুব উচ্চ স্থানে চলে যাবে নিসন্দেহে, ঘটনাটিকে আমরা মানব মস্তিষ্কেরই একটি বড় সম্প্রসারণ হিসেবে ধরে নিতে পারবো। এখনই জীবনের অনেকগুলো ক্ষেত্রে সেটি বেশ কিছুটা ঘটছে– আমরা এখনকার চমকপ্রদ নানা প্রযুক্তিকে কৃতিত্ব দিই, কিন্তু মনে রাখিনা যে এর অনেক কিছুর মধ্যে মূল জিনিসটি হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। সবকিছু যদি ঠিকঠাক চলে, এর অপব্যবহার যদি নিয়ন্ত্রণে থাকে, এর কারণে সবার জীবন অনেক সহজ সরল হবে, নিরাপদ হবে এবং উপভোগ্য হবে।

অবশ্যই দুনিয়াজোড়া অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের যে কারণ এটি হবে তাকে রোধ করতে হবে। আজ হোক কাল হোক মানুষ কর্মীকে বাদ দিয়ে এআইকে ব্যবহার করা ও দায়িত্ব দেয়া অত্যন্ত লাভজনক জিনিস হবে– কারণ এর মাধ্যমে স্বল্পব্যয়ে সীমাহীন উৎপাদনের সুযোগ ঘটবে এবং তার জন্য দুনিয়ার

সম্পদগুলোর আহরণেরও কোন সীমা থাকবেনা, বিত্তবানরা আর ক্ষমতাশালীরা একে কুক্ষিগত করে ফেলতে পারবে। আইন কানুন ভাল থাকলে সীমাহীন ভাবে হয়তো পারবেনা, কিন্তু তবুও বিপুল পরিমাণে পারবে। ফলে সম্পদের বৈষম্য যেটি এখনো বিশাল, সেটি অসম্ভব ভাবে বেড়ে যাবে। এতে বাকি মানুষের দুরবস্থা আরো সঙ্গিন হবে। এরও সম্ভাব্য সমাধান একটু পর দেখছি।

তবে এও ঠিক যে এআই একটি দারুণ কাজ করবে– মানুষকে অবশেষে দুঃসহ কায়িক শ্রম থেকে মুক্তি দেবে। মানুষ আবির্ভাবের পর থেকে, বিশেষ করে কৃষির ওপর নির্ভর করে নগর ও শিল্পসভ্যতা গড়ে ওঠার পর থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাগ্যই হয়েছে সারা জীবন অমানুষিক কায়িক শ্রমের মধ্যে জীবন কাটানো– কখনো সুবিধাভোগীদের দাস হিসেবে, ভূমিদাস হিসেবে, কখনো শ্রমজীবী মানুষ হিসেবে। আর এখন আধুনিক দাস প্রথার মধ্যেও অসংখ্য মানুষ কমবেশি অসহ্য কায়িক শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। অথচ মানুষের জন্ম এজন্য হয়নি– হয়েছে মানবিক গুণগুলো বিকাশের জন্য, যার যার মত আর্ট-সায়েন্সকে উপভোগ করার জন্য। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ কায়িক শ্রম দেয়া মানুষের জীবনে তা স্বপ্ন হয়েই থেকেছে; অনুন্নত বিশ্বে তো বটেই, উন্নত বিশ্বেও অনেকটা সেরকমই, যেন সারাক্ষণ এই শ্রম দেবার জন্যই জন্ম। এআই উৎপাদনের শ্রমঘন কাজগুলো নিয়ে নিলে তাঁরা অন্তত এর থেকে মুক্তি পাবেন চিরতরে। তবে তার জন্য যেই রুটি রুজির ব্যবস্থা তাঁরা হারাবেন তার একটি বিকল্প ব্যবস্থা করতে হবে।

একটি আশার কথা হলো আজ যেই এআইয়ের ব্যয় অনেক বেশি, তা সময়ের সঙ্গে অতি দ্রুত কমে যাবে, যখন এর ব্যবহার দ্রুত বিস্তার লাভ করবে। কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তির সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকে সেটি আমরা জানতে পারি। এক্ষেত্রে 'মূরের নিয়ম' বলে খ্যাত একটি নিয়মই রয়েছে যে প্রতি বছর কম্পিউটার হার্ডওয়্যার আর সফটওয়্যারের মূল্য আগের বছরের অর্ধেক হয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যেহেতু একই ঘরানার প্রযুক্তি এর ক্ষেত্রেও এরকম হবার কথা। সব পণ্য ও সার্ভিস যখন এআই থেকে আসবে সেগুলোর মূল্যও দ্রুতগতিতে কমে যাবে। অন্য দিকে মানুষ তখন এআইয়ের সঙ্গে সহযোগিতা করার বা তাকে নিয়ন্ত্রণ করার মত দক্ষতা অর্জন করে নিজেদের

হারিয়ে যাওয়া কাজগুলোকে প্রতিস্থাপিত করার চেষ্টা করবে। সব পণ্য ও সার্ভিস অতি কম মূল্যে এআই থেকে আসবে বলে মানুষের আয়ের ক্রয়-ক্ষমতা অনেক বেশি হবে। যতদূর দেখা যাচ্ছে বুদ্ধিভিত্তিক ও মানব চেতনা ভিত্তিক কাজ করার জন্য প্রচুর মানুষ আরো দীর্ঘ কাল প্রয়োজন হবে। তাই বহু মানুষ কাজ হারাবেনা, কাজ বদলাবে।

তারপরও অনেক মানুষ কাজ হারাবে– সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। তাঁদের অনেকে আনুষ্ঠানিক কাজ হয়তো আর পাবেননা। কিন্তু তাঁরা তাঁদের পছন্দের কাজ বেছে নিতে পারবেন স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে; জ্ঞান বিজ্ঞান- প্রকৌশলের অথবা নানা আর্টের নাগরিক চর্চাকারী হিসেবে; কিংবা মানুষের এবং সমাজের সেবায়- নিজেকে সে জন্য তৈরি করে নিয়ে। এ ধরনের সেবা এআই বা রোবট সর্বাংশে দিতে পারবেনা, মানুষের ছোঁয়া, তার সহমর্মিতার বিকল্প তারা হতে পারবেনা। তাই অন্তত অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও সেখানে খুবই অর্থপূর্ণ কাজের দুয়ার খোলা থাকবে। তবে সকল নাগরিক স্বেচ্ছাসেবীর, সকল সহমর্মী স্বেচ্ছাসেবীরও জীবিকার জন্য আয় থাকতে হবে। পৃথিবীর অনেক নামকরা অর্থনীতিবিদ এর সমাধান দেখছেন একটি বাধ্যতামূলক সর্বজনীন ন্যুনতম আয়ের মধ্যে। এটি একই সঙ্গে এআইয়ের সৃষ্ট অতিমাত্রায় ধন-বৈষম্যেরও সমাধান করবে। এআইয়ের মালিক হবার কারণে- উচ্চতম সম্পদ ও আয়ের অধিকারীদেরকে খুবই উচ্চ হারে করের আওতায় এনে যে বিপুল অর্থ আসবে সেটিকেই ব্যবহার করতে হবে সর্বজনীন ন্যুনতম আয় সবাইকে দেবার জন্য। এই আয় সুন্দর স্বচ্ছন্দ জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট হবে, উচ্চাকাঙ্খী কিছু হবার জন্য না হলেও। এআইয়ের কল্যাণে অত্যন্ত সুলভে সব পণ্য ও সুবিধাদি যে ভাবে পাওয়া যাবে তাতে জীবনমানের কোন অভাব কারো হবেনা। মানব ইতিহাসে ওটিই হবে এআইয়ের দান। ওই কর ব্যবস্থা এবং ওই সর্বজনীন ন্যূনতম আয়ের বিস্তারিত রূপ বিভিন্ন চিন্তাশীল অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন প্রস্তাবে রাখছেন। সেগুলো দুনিয়া জুড়ে আলোচিত হচ্ছে, কোন কোনটি কোন কোন দেশে পরীক্ষামূলক ভাবে বাস্তবায়িতও হচ্ছে। কাজেই যে বিপর্যয়ে আশঙ্কা করা হচ্ছে তার প্রতিকার মোটেই অসম্ভব নয়। প্রয়োজন ঐক্যমত্যের ও অর্থনৈতিক শৃঙ্খলার।

এতে মানুষকে অন্তত খাওয়া-পরার চিন্তার জন্য জীবনপাত করতে হবেনা। মানুষ মাত্রই অনেকটা অবকাশ ভোগ করতে পারবে। এখনই অনেক জায়গায় মানুষ দিনে চার ঘন্টা কাজ আর সপ্তায় তিন দিন কাজের কথা ভাবছে, ইতোমধ্যে কাজের সময় যথেষ্ট কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়েছে ওই প্রযুক্তির কারণেই– এতে অর্থনীতির কোন ক্ষতি হয়নি। আনুষ্ঠানিক কাজও আনন্দের কাজ হচ্ছে; ভবিষ্যতে সব আনুষ্ঠানিক ও স্বেচ্ছাসেবী কাজ সেরকমই আনন্দের হবে। ওই দ্বিতীয়টিরও মর্যাদা বাড়বে, জীবিকার কাজ নেই বলে কারো কোন মর্যাদাহানি হবেনা– বরং এতে কাজের মর্যাদা ও স্বাধীনতা বাড়বে। কিন্তু তখনো মানুষের হাসি-কান্না, আনন্দ-দুঃখ থাকবে, ট্র্যাজিডি থাকবে, বড় কীর্তির উদযাপন থাকবে। তখনো ছোট বড় অনুসন্ধান থাকবে, আবিষ্কার থাকবে, অভিযাত্রা থাকবে। এই সব আর্টের অন্তর্ভুক্ত হবে, সায়েন্সেরও অন্তর্ভুক্ত হবে। সৃজনশীলতার সন্তুষ্টি মানুষ উপভোগ করবে বেশি, অন্যের সৃজনশীলতার মূল্যগুলো উপভোগও করবে বেশি– এমনকি সেই ‘অন্য’ যদি এআইও হয়। আর্টে-সায়েন্সে মানবিক সক্ষমতাকে বিকশিত করার জন্যই মানুষের জন্ম হয়েছিলো, শুধু টিকে থাকার জন্য নয়। আগামী দিনকে তার জন্য আরো যথার্থ দিন বলেই তো মনে হচ্ছে, আশঙ্কিত হবার দিন নয়। এখনো মানুষ পরস্পরের সঙ্গে এবং এআইয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে, কিন্তু সেটি জীবিকার জন্য নয়, বরং সৃজনশীলতার স্ফূরণ দেখাবার ও অন্যের সেবা করার কাজে।

হ্যাঁ, এআই দিয়ে মানুষের ক্ষতি করারও অনেক রাস্তা আছে, সহজে গুজব ছড়িয়ে, প্রোপাগান্ডা করে, নকল বাস্তব সৃষ্টি করে, বিধ্বংসী অস্ত্র বানিয়ে, মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীতা নষ্ট করে ইত্যাদি নানা ভাবে। ওই সব স্বাভাবিক সুশাসন দিয়েই দমন করতে হবে পুরো বিশ্ব এক হয়ে, কারণ এতে ঝুঁকি বড়। যেমন পারমাণবিক অস্ত্রের ঝুঁকি বড় হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব সংস্থাগুলো তাকে এতগুলো বছর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছে। তবে সায়েন্স ফিকশন থেকে আসা একটি সুদূর কল্পনা এখন অনেককে আতঙ্কিত করছে। তা হলো এআই একদিন মানুষের থেকেও শক্তিশালী হয়ে মানুষকে দাসে পরিণত করবে, এমনকি ধ্বংসই করে ফেলবে। এই আশংকার মতে ছোট্ট একটি ভুলের জের হিসেবেও বেপরোয়া এআই মানুষকে বিলুপ্ত করে ফেলতে পারে। এগুলো আসলে কষ্ট কল্পনা– যদিও নীতিগত ভাবে সম্ভব। এটি সায়েন্স ফিকশন জাত

একটি দুঃস্বপ্ন মাত্র, এরকম দুঃস্বপ্ন আরো আছে যেমন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে। মানুষ যদি সুবিবেচনা মত চলে এর কোনটাই বাস্তবতার কাছে ধারেও ঘেঁষতে পারবেনা, বাস্তব হওয়াতো দূরে থাক। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানী ও চিন্তাবিদ এই বিধ্বংসী সম্ভাবনার কথা প্রায়ই মনে করিয়ে দিচ্ছেন। হয়তো সেটি করছেন সম্ভাবনাটি তাঁদের কাছে খুব বড় মনে হচ্ছে বলে নয়, বরং বিশ্বকে এআইয়ের ব্যাপারে সচেতন করার জন্য, তাকে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে ব্যবহার করার জন্য, যথেচ্ছ ব্যবহারের সুযোগ না রেখে। সেটিই দরকার।

সেই মূল লক্ষ্যে থেকে এখন চাই এমন একটি আবহ এবং এমন একটি শিক্ষা যেখানে আমরা আজই, আজকের দিনেই যতটুকু সময় পাই আর্টস-সায়েন্সকে উপভোগ করি, তার মাধ্যমে উচ্চ একটি বিশ্ব-দৃষ্টি লাভ করি।

ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম বিজ্ঞান লেখক হিসেবে এবং নানা মাধ্যমে বিজ্ঞানের জনপ্রিয়করণের জন্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। ষাটের দশকে এদেশের প্রথম বিজ্ঞান মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী প্রতিষ্ঠা করে আজ অবধি তার সম্পাদনা করছেন। সত্তরের দশকে প্রতিষ্ঠা করেন একটি অনন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস), এখনো তিনি যার নেতৃত্বে। বাংলা একাডেমী সাহিত্য পুরষ্কার সহ বেশ কিছু সাহিত্য বিষয়ক পুরষ্কার প্রাপ্ত এ লেখকের বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের সংখ্যা পঞ্চাশের ওপর।

ড. ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং বর্তমানে ইউনিভার্সিটি অব লিবারাল আর্টস বাংলাদেশের সাধারণ শিক্ষা বিভাগের অ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর।